একশ বছরের সেরা ভৌতিক

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বারিদবরণ ঘোষ
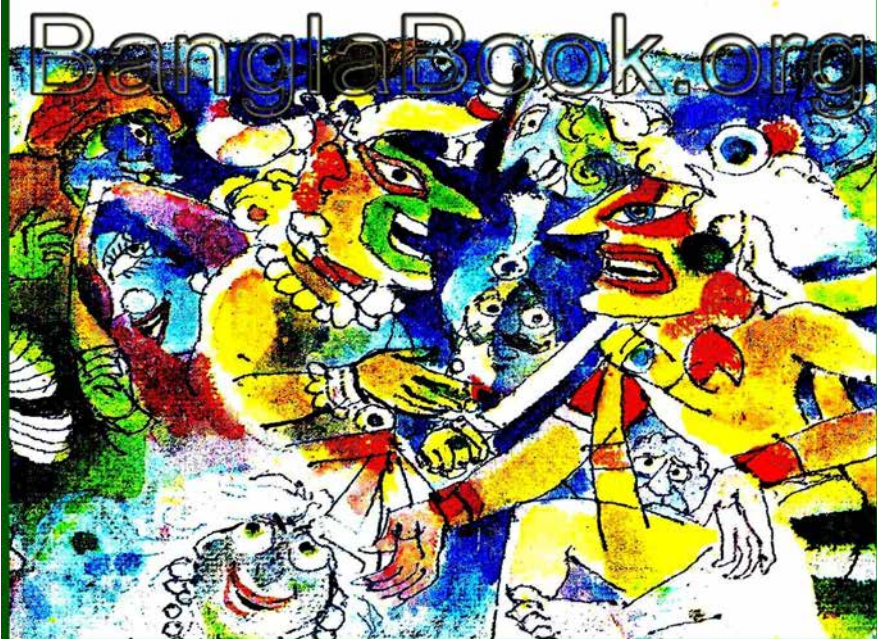
নিবেদন

ভূত প্রসঙ্গটাই আবহাওয়া বদলে দেয়, রহস্য ঘনীভূত করে তোলে, মানুষ নড়েচড়ে বসে। ভূত আছে কি নেই এই প্রশ্ন তো অবান্তর, কারণ কেউই জানে না তা। তবে ভূত আমাদের প্রিয় বিষয়। ভূত এবং ভৌত পরিমণ্ডল আমাদের জীবনের ধরাবাঁধা সীমানাকে প্রসারিত করে দেয়। ভূত মানে শুধু ভয় নয়, মজা, কল্পনার চিন্তার এবং অবশ্যই এক প্রয়োজনীয় অসঙ্গতি। রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান বা ননসেন্স ভার্সে যেমন লোকে যুক্তি-বিজ্ঞান খুঁজতে যায় না, তেমনি ভূতের গল্পেরও কিছু অধিকার আছে। এই সংকলনটি অনেকগুলো মাথা এক হয়ে তবেই করেছে। ওই মাথাগুলির একটি আমার। সম্পাদকের অনেক দোষ, তবু বলি দোষগুলো ধরতে পারলে সংশোধন করা যাবে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
১২.০১.৯৬

প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, মাঘ ১৪০২

—একশ চল্লিশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : সুধীর মৈত্র

মুদ্রণ : রাজা প্রিন্টার্স

EKSO BACHARER SERA BHAUTIK

A collection of ghosts & horror stories of different writers.

Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,

10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Reprint : May 2014

Price Rs. 140/-

ISBN : 81-7293-346-0

Website : www.mitraandghosh.co.in

শব্দগ্রন্থন

[illegible], ১/[illegible] নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

ভূতিকা

সব দেশেই ভূত একটা সমস্যা বিশেষ। কারণ জীবনে কোনো সময়ে ভূতের ভয় পাননি—এমন মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে নেই। আবার ভূতকে ভয় পান—এমন কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন—এমন বয়স্ক লোকের সংখ্যাও পৃথিবীতে খুবই কম আছে। অনেকে দিনের আলোয় বুক ফুলিয়ে বলেন 'ভূতে বিশ্বাস করি না,' সন্ধে হলে তাঁদেরই বুকের স্পন্দন একশো আশিতে পৌঁছে যায়। ভূত-প্রেত নিয়ে জগতে গবেষণাও কম হয়নি। এককালে থিওজফিক্যাল সোসাইটি এদেশে এই নিয়ে দারুণ আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। প্ল্যানচেটে আত্মাকে নামানো তো একসময়ে একটা দারুণ বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দের 'লাইফ বিয়ন্ড ডেথ' বইয়ে আত্মার ছবি পর্যন্ত মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা একটা গ্রন্থের উপকরণ জুগিয়েছে। কাজেই ভূতকে কোনোক্রমেই অবহেলা করা উচিত হবে না। ভূত একটা ভালো 'ইন্ডাস্ট্রি'তে এখন পরিণত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা তা স্বীকার করে নেবেন। সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত ভূতের নাচ ছবিতে দেখিয়ে বাজার মাত করেছিলেন।

সব দেশেই ভূতের এক একটা নাম আছে স্ত্রী, পুরুষ এবং জাতি বা বৃত্তি ভেদে। সেই বেদের আমল থেকে ভূতেদের অগ্রগতি ও প্রগতি শুরু হয়েছে। তার আগেও নিশ্চয়ই ছিল, 'ভূত' শব্দটির মুখ্য অর্থই তার প্রমাণ—যদিও তার লিখিত-পড়িত কোনো নিদর্শন আমরা দিতে পারছি না। এজন্যে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে, সেজন্যে আগেভাগেই ভূতনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অর্থাৎ ভূতেদেরও একজন নাথ ছিলেন এবং এখনও নিশ্চয়ই আছেন। একজন প্রমথনাথ শিব। শ্মশানচারিণী মহাকালীও আদি দেবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। দুজনেরই প্রচুর স্ত্রী-পুরুষ ভূত-পেত্নী শিষ্য-শিষ্যা। আগে তাঁরা প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করতেন—এখন মনুষ্যভূতের অত্যাচারে একটু অন্তরালে গেছেন। তবে যেরকম লোডশেডিং চলছে তাতে তাঁদের ফিরে আসার প্রচুর সম্ভাবনা। কারণ ভূত-ভূতিনীরা অন্ধকারটাকেই বেশি পছন্দ করে। দুর্যোগপূর্ণ অমাবস্যার রাত্রিতে তাঁরা একটু বেশি সচল হন।

বেদে 'ভূত' কথাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'প্রেত' এবং 'পিশাচ' শব্দ দিয়েই বোঝানো হয়েছে। অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ড অষ্টম অনুবাক অথবা অষ্টাদশ কাণ্ডের ২-৪ অনুবাকে এদের বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে। সত্যি কথা বলতে, অথর্ববেদেই প্রেত-পিশাচ তাড়ানোর মন্ত্রেরও সৃষ্টি। তবে তারা সে সময়ে আমাদের ব্রহ্মদত্যি বা মামদোর চরিত্রের ভূত হয়ে ওঠেনি। তারা মাংস খেতে ভালোবাসত। পিশাচ কথাটার অর্থই অবশ্য তাই—যারা পিশিত বা মাংস আশ বা ভক্ষণ করে। এদের আবার 'বিবাহিত' বউও ছিল—তারা পিশাচী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এরা শিবের অনুচর হয়। 'ধিয়া তা ধিয়া, তা ধিয়া ভূত নাচে। উলঙ্গী উলঙ্গ পিশাচী পিশাচে।' এদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ থেকে জন্মগ্রহণ করত তারা হত ব্রহ্মপিশাচ—'বিল্ব বিটপে ব্রহ্মপিশাচ, হাসিছে বাজায় গালে।' (ছায়াময়ী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

আর প্রেত জন্ম নিত তখনই যখন নিয়মানুসারে ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হত। এই মৃত ব্যক্তির আত্মার নাম প্রেত—যা সূক্ষ্মদেহে বিরাজ করে। এদের খাওয়ানোর জন্যে গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা দেখে মনে হয় এরা নিরামিশাষী। মহানির্বাণ তন্ত্রেও এইসব প্রেত ইত্যাদির সবিশেষ উল্লেখ আছে। এই সংকলনের অন্যতম সম্পাদক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে ভূতের দলে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেলে তা জগতের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে একারণে একজাতের ভূতেদের জন্যে গয়ায় পিণ্ডদান তিনি নিষেধ করেছেন—কারণ এই ভূতেরা মঙ্গলজনক।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশেই ভূতেদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। স্পুক, স্পিকি, গবলিন প্রভৃতি বিলিতি ভূতেরা গোস্ট, স্পিরিটদের পাশে নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন। জিন, জান, আফিদ, মারিদ প্রভৃতি আরবি-কাবুলি ভূতেদের দাপাদাপি নিশ্চয়ই অব্যাহত। সুকুমার সেন আরও নানান ভূতের তালিকা দিয়েছেন—হাঙ্গেরির ভ্যামপি, আয়র্ল্যান্ডের বন্‌শি, জার্মানির পলটারজাইস্ট, উত্তর ইউরোপের ওয়ারউল্‌ফ্ প্রভৃতি। এদেশে সাহেব ভূতদের নিয়ে নানা গল্প আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বীরবালা' গল্পে বীরবালার দীর্ঘনিশ্বাসে এমন এক সাহেব ভূতের শরীরের সব জোড় খুলে গিয়েছিল। তাঁর বইয়েই দুটি ভূতের নাম ছিল স্কাল এবং স্কেলিটন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখে গেছেন—'আকাশে কুমুদা আছিলা মামুদা ভাঙ্গিলা মাথার খুলি।' বাংলা প্রবাদে আছে—'সাত গেঁয়ের কাছে মামুদাবাজি'। গল্পে আছে, হিন্দুপ্রধান সপ্তগ্রামের বেশি-চালাক হিন্দু ভূতের কাছে কম-চালাক মুসলমান ভূতের নিষ্ক্রিয়তার কথা। ভরসা করি এটি কোনো হিন্দু ভূতের তৈরি গল্প। ভূতের সমাজেও যে সাম্প্রদায়িকতা আছে—এই গল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আবার বাঙালি ভূত ছাড়া, হিন্দুস্তানী ভূতের সন্ধানও আমরা পেয়েছি রাজশেখর বসুর 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পে। এর সুপরিচিত 'কারিয়া পিরেত'—মাথায় পাগড়ি কালো লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মতো সেই জীবাত্মার বিখ্যাত গানটি জানে না—এমন রসিক ভূ-বাংলায় আছেন কিনা জানি না—রা রা রা রা রা রা। আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া/কেক্‌রাসে সাজিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—।' ইত্যাদি। হিন্দুস্তানী গুটিয়া দেও—বেঁটে ভূতের সন্ধানও পেয়েছি আমরা।

এখন আমাদের বাঙালি ভূত, তাদের বাসস্থান, আবির্ভাব, খাদ্যাভাব, চেহারা, পোশাক-আশাক, অত্যাচার এবং বিচিত্র নামকরণের আগে তাদের সৃষ্টির ইতিহাস এক শাব্দিক অনামা কবির কাছ থেকে আগে ঋণ করে পাঠকদের নিবেদন করি :

আসমান থাক্যা পড়িল বালি
তাতে উঠিল গাছাগাছালি
এক গাছের তিন পাতা
শুন ভূতের জন্মকথা
কালিকা কালিকা বর
খালের পাড়ে দিগম্বর
দিগম্বর নাচে লেংটা হইয়া
নাচন গান পড়ে পর্বতে মাথা বাইয়া

পর্বত কাঁপে থরথর সায়রে কাঁপে পানি
তাতে জনমিল ভূতযোনী
পার ভাঙ্গে বিরক্ষ ভাঙ্গে সাগর শুকায়
ভূতের ভয়ে দেবী দুর্গা নিদ্রা নাহি যায়...

কাজেই আমাদের ভূত স্বয়ং শিবসৃষ্ট—অন্নদা নিজেই বলেছেন 'ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে' (অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র)। মনে হয় সেই সুযোগেই কিছু ভূত পৃথিবীতে থেকে গেছিল—কৈলাসে ফিরে যায়নি। এবং অনুমান করি সেটা ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। কারণ এই তিথিকেই ভূত চতুর্দশী বলা হয়।

এবার ভূতেদের বংশপরিচয় দিই। প্রথমে স্ত্রী ভূতের কথা—লেডিস ফার্স্ট। ভূতের স্ত্রী হিসেবে পেত্নীর ('পত্নী'-জাত?) খ্যাতিই সমধিক। আসলে কথাটা প্রেত্-এর স্ত্রীলিঙ্গ প্রেতিনী-জাত। তার থেকে লৌকিক উচ্চারণে পেত্নী। শিবায়ন কাব্যে আছে—'ভাগ্য বলে সন্ধ্যাকালে পেতি জ্বালে বাতি।' কাব্যনির্ণয়ে আছে—'ও যায় পেতিনী দানা, খাইছে সখের খানা, একখানা পচা ঠ্যাং নিয়া।' বাংলা গ্রাম্যকথায় 'পেত্তা' জ্বলছে বলে একটা কথা রয়ে আছে। মরাহাজা পুকুরে যে 'আলেয়া' জ্বলে তাকেই 'পেত্তা' বলা হয়ে থাকে—শিবায়ন কাব্যের 'পেতি' তাই 'জ্বালে বাতি'।

এছাড়া ডাকিনী-নাগিনী চেড়িরা আছে। ডাকিনীরা শিব-দুর্গার অনুচরীবিশেষ। অন্নদামঙ্গলে আছে—'ডাকিনী-যোগিনীগণ/ভূত প্রেত অগণন/সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়।' ডাকিনী কথা থেকেই ডাইনি এসেছে—একেবারে দেহধারিণী নারী, সূক্ষ্ম আত্মা নয়। যোগিনীরা হল দুর্গার সখী—চৌষট্টি সংখ্যক দেবী। কবিকঙ্কণে আছে—'রণে অলক্ষিত হয়ে, চৌষট্টি যোগিনী লয়ে উরিলেন শ্রীসর্বমঙ্গলা।' পেত্নীর পরেই ভূতসমাজে শাঁকচুন্নির স্থানই বর্তমান। শব্দটি এসেছে—শঙ্খচূর্ণি শব্দটি থেকে। মরবার সময় যে স্ত্রীলোক সধবা ছিলেন এবং হাতে শাঁখা নিয়ে মরেছেন—তাঁরই প্রেতাত্মা হল শাঁকচুন্নি। এরাও দুর্গা-অনুচরী, এদের অপর নাম 'শাঁখিনী'। অন্নদামঙ্গলে আছে—'চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে।' রাজশেখর বসুর গল্পে (আহা, যতীন সেন মহাশয়ের সেই অনবদ্য ছবি!) বিদেহী শিবুর সঙ্গে একটা শাঁকচুন্নির দেখা হয়েছিল— সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মতো লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলে যাচ্ছিল ! মাঝে মাঝে আমাদের সমাজেও আমরা শাঁকচুন্নির গান শুনে পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকি। জানি না এদের দেখেই আমরা ছড়া কাটি কিনা—

ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে করবে আমার কি!

এবার পুরুষ ভূতেদের কথা বলি। প্রথমেই ব্রাহ্মণ ভূত—ব্রহ্মদৈত্য বা বেম্মদত্যির কথা। হয়তো সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে কেউ কেউ খড়ম পায়ে একে ঘুরে বেড়াতে 'শুনে' থাকবেন! হয়তো বা বাড়ির কাছে ন্যাড়া বেলতলাটায় দেখেও থাকতে পারেন কেউ কেউ। এঁরাই ভূতের বংশে নৈকষ্য কুলীন। হয়তো শিবের খাসমহলের লোক, নইলে বেলগাছে বসতি কেন? শিবানুচর হয়ে তাল-বেতালও ভারতীয় সাহিত্যে দুই উল্লেখযোগ্য 'ভূত'। 'দানো' ঠিক ভূত নয়—দানব বা দৈত্য বিশেষ, আরবি সাহিত্যের জিনের জিগরি দোস্ত!

একানড়ে হল এক পা-ওয়ালা ভূত। এরই মতো আর এক প্রতিবন্ধী ভূত কন্ধকাটা। আসলে এটা হল কবন্ধ ভূত। এর মাথা নেই, কেবল ধড়। সাহেবদের ভূতেরও অনেক সময় মুণ্ডু থাকে না। প্রায়ই দেখা যায়—গলাকাটা এই ভূতের মাথাটা অনেক সময় ভূতের হাতেই ধরা থাকে এবং কাটা মুণ্ডটিই অনর্গল কথা বলতে পারে। তবে নাকিসুরে কিনা—তা আমি হলফ করে বলতে পারব না। তবে এরা নিশ্চয়ই হাসে। ভূতের হাসি সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার—গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে, চোয়ালে চোয়াল লেগে যায়।

ছোট ছেলেরা এক ধরনের ভূতের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়। কেন জানি না, এ ধরনের ভূতেদের পছন্দ কেবল খুব ছোটরাই—একেবারে আঁতুড়ে শিশুরা। এরা হল পেঁচো ভূত। পেঁচো কথাটা পিশাচ (না পঞ্চাননের চর?) থেকে এলেও এদের ঘোরা-ফেরা ছোটদের ঘিরেই। যক ভূতকে বিশ্বাস করেন এমন লোকের অভাব এখনও নেই। যক হল যক্ষ। যক্ষ হলেন ধনরক্ষক। আগে ধনী কৃপণেরা ধন যক দিত। তাদের টাকাকড়ি সুরক্ষিত রাখার জন্যে মাটির নীচে ঘর তৈরি করে সেখানে সব ধনরত্ন রেখে একটি বালককে ধরে পুজো করে সেই আবদ্ধ ঘরে রেখে দিত। পরে সেই বালকের মৃত্যু হলে সে যক্ষযোনি পেয়ে সেই ধন রক্ষা করত। এই ভূতের কাজ ছিল ধন রক্ষা করা, ভোগ করা নয়। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে এই ধন ফেরত দিতে পারলেই তার মুক্তি ঘটত। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পের পাঠক নিশ্চয়ই এদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের ধন'-এর যাঁরা পাঠক, তাঁরাও এদের জানেন।

পুকুরে থাকে যে ভূত নাম হাঁড়া-ভূত। মানুষ পুকুরে নাইতে নামলে এরা নাকি মাঝে মাঝে পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরে রক্তপান করে। কালবৈশাখীর ঝড়ে বর্তুল আকারে যে ঝড় ঘুরতে থাকে—তাকে বলে বাঁড়ুল ভূত। ইনি এলে মাঝউঠোনে একটা পিঁড়ে উল্টো করে দিয়ে বলতে হয়— 'বাঁড়ুল বাঁড়ুল—মাছ-পোড়া দিয়ে ভাত খেয়েছি—ছুঁয়ো না'। এই মন্ত্রটা আমরা ভুলে গেছি বলেই ফি-বছর ঘূর্ণিঝড় এসে আমাদেরকে নাজেহাল করে যায়। অবনীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'বীর-বাতাস'। 'ভূত-পত্রীর দেশে' তিনি লিখেছেন—'সর্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস। এ বাতাসের মুখে পড়লে তো আর রক্ষে থাকবে না। —পালকি-সুদ্ধ আমি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানা-বালিশ কাগজের টুকরোর মতো কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই।' বাঁশ-ঝাড়ে বাস করে ঝেরু-ভূত, এদের জন্যেই নাকি এক একটা বাঁশ রাতের বেলায় একদম শুয়ে পড়ে!

তবে দিশা-ভূত নিশা-ভূতের কথা এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন বেশি মাত্রায়। নিশিভূত ঘুমন্ত লোককে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত ঘুরিয়ে মারে। মাঝে মাঝে ঘাড় মটকেও দেয়। এরা নাকি একবারের বেশি ডাকে না। তাই রাতে নিরাপদে থাকতে হলে কেউ অন্তত তিনবার না ডাকলে সাড়া দেওয়া উচিত নয়! তবে এটা যে Somnambulism নামে একটা রোগ—তা সাধারণ মানুষকে বোঝানো কঠিন। কেউ কেউ একে দিশা ভূতও বলে। মানুষ ভূতের পাশে ঘোড়া-ভূত গোভূতেরাও (গো-দানো) আছে। অবনীন্দ্রনাথ নাকি ঘোড়া ভূত দেখেছিলেন। বাস্তুসাপের মতো বাস্তুভূতও নাকি আছে—যারা আমাদের কোনো ক্ষতি করে না। এদের মাঝে মাঝে মাছের বাসি অম্বল খাওয়াতে

হয়। বিভূতিভূষণ পূর্ব এশিয়াতে 'বিষ্মমণি' ভূতের উল্লেখ করেছেন তাঁর 'হীরামানিক জ্বলে' কিশোর উপন্যাসে।

ভূতেদের বাসস্থান বিচিত্র প্রকার। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এদের অবাধ অবস্থিতি। ব্রহ্মদত্যির পছন্দ বেলগাছ, তাল-বেতালের শিমুল গাছ। শাঁকচুন্নি ভালোবাসে ঘন শ্যাওড়া ঝোপের মধ্যে থাকতে। অন্য ভূতেরাও এই গাছ বেশ পছন্দ করে। একানড়ে জাতীয় ভূতেদের পছন্দ তালগাছ। নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—যেমন ভুশণ্ডীর মাঠে—এদের অনেকে থাকে। আর ভূতুড়ে বাড়ি পেলে তো এদের আনন্দের অবধি থাকে না। পুকুরেও কোনো কোনো ভূত থাকে। তবে সব মিলিয়ে গাছে থাকাটাই এদেরকে ফ্ল্যাটে থাকার মতো আনন্দ দেয়।

ভূতেরা দেখতে নানা ধরনের। কেউ দু তাল গাছ সমান উঁচু। এদের হাত-পা খুব লম্বা এবং ইচ্ছে করলেই ক্রেনের মতো হাত এগিয়ে দিয়ে শিকার ধরতে পারে। কারো সব শরীরটাই হাড় দিয়ে গড়া, চক্ষু কেবল কোটরগত, কিন্তু অনেক সময় দাঁত থাকে—ফোক্‌লা দাঁতে শিরশিরিয়ে হাসে। গায়ের রং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধকারের মতো কালো—সাহেব ভূতেদের কথা অবিশ্যি আলাদা। কালো-কুচ্ছিত খ্যাঁদা-নাকী কেউ কেউ থাকলেও মেয়ে ভূতেরা মোটের উপর সুন্দরী। অনেক সময় এদের একটা পা, কারো পায়ের পাতা পিছনের দিকে। বেঁড়ে ভূত যখন আছে, তখন কারো কারো লেজ আছে নিশ্চয়ই। সূক্ষ্ম মস্‌লিন জাতীয় কাপড় কেউ কেউ পরলেও বেশির ভাগই সাদা থান এবং শাঁকচুন্নি হলে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে থাকে। রাজশেখরবাবু গামছা পরে থাকতেও দেখেছেন। কোনো কোনো ভূত একেবারে ছায়াসর্বস্ব।

ভূত-সম্প্রদায়ের যিনি মাথা—তিনি হলেন কর্তাভূত। এদের খাওয়া-দাওয়ার রেসিপিও মন্দ নয়। মেনুতে সব চেয়ে পছন্দ পোড়া মাছ। ভাতের হাঁড়ি ভেঙে রান্না মাছ খেতে এদের দারুণ প্রীতি। মেছো ভূতেরা তো মাছ না দিলে পিছনই ছাড়ে না। মাঝে মাঝে ঘাড়-মট্‌কানো এদের খুব সহজ এক্সারসাইজ। রক্তপানও নিশ্চয়ই করে। এদের চলাফেরা খুব সহজ হয়ে পড়ে কার্তিক মাসের চতুর্দশীতে, অমাবস্যা তিথিতে অথবা শনিবারের বারবেলা হলে। এসব দিনে ওঝার মন্ত্র, ভূতপত্রীর লাঠিও অকেজো হয়ে পড়ে। পাঠক কি পরীক্ষা করে দেখতে চান? তবে তাদেরকে ভূত বশীকরণের একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিই চুপি চুপি :

> কুর কুর কুয়াশা ভরা/আসমানে নাই চান্দ তারা
> মানুষ গরু দিলাশা/গাঙ্গের পাড় সরিষা
> আন্ধারে আন্ধার/গান্ধারে গান্ধার
> নাই মানুষ নাই পউখ পাখালি
> হেনকালে সরিষা তুলি
> মন্ত্র ঝাড়রা মাইলাম ভূতের গায়
> আন্ধাইল সুন্ধাইল ভূত শয়ন লইল আস্যা পায়।
> রামকুণ্ডলী লক্ষ্মণ দ্বারী
> ওরে ভূত ছাইড়া যাও আমার বাড়ি
> যদি ছাড়্যা না যাও/ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাও।

দেখবেন আর ভূত হালছে না বলছে না—
জ্বলে কপাল ধঃ ধঃ ধঃ
এটা কার মাথা হি হি হঃ
ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া।

এতেও ভূতের প্রতি যদি অবিশ্বাস জেগে থাকে তবে ত্রৈলোক্যনাথের কথা তুলে বলি : 'এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজি-ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে বলে কিনা হিস্টিরিয়া হইয়াছে। এ কথায় রক্তমাংসের শরীরেই রাগ হয়, ভূত দেহে তো রাগ হইবেই।' পাঠক, তখন একটু সামলে চলাই ভালো।

২

পৃথিবীর তাবৎ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও ভূতের রমরমা কম নয়। এঁরা বিচিত্র নামে, বিচিত্র ধামে বঙ্গসাহিত্যের বৃক্ষে, আনাচে-কানাচে, পোড়ো-বাড়িতে, ডোবাপুকুরে বসবাস করলেন। ত্রৈলোক্যনাথের ঘ্যাঁঘো ভূত এবং নাকেশ্বরীকে কেই বা না চেনে! লুল্লু গল্পে ঘ্যাঁঘো লুকিয়েছিল কুয়োর মধ্যে। এর সঙ্গে 'গুপ্ত পৌষ মাসে নাকেশ্বরীর শুভবিবাহ' হয়েছিল। দীর্ঘ নাকের জন্য তার স্ত্রী 'নাকেশ্বরী' নামে পরিচিত ছিল। তিনি আরও দেখেছিলেন গোঁগোঁ, চুড়েল এবং সবুজ ভূত। সুকুমার রায় জ্যোৎস্না আলোতে স্বচক্ষে দেখেছিলেন 'পান্তাভূত'—'পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,/পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে।' আজকাল আবার আধুনিক ভূতের জমানায় বিচিত্র নামের ভূতেরা এসে গেছে। অচিরাৎ এদের নিয়ে একটি অভিধান রচনা করার বাসনা মনে মনে পোষণ করছি। এজন্যে একটা ছাপাখানার ভূত-এর সন্ধানে আছি। জানি না এই সংকলনে কোথাও কোথাও তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন কিনা!

এই শতবর্ষের ভৌতিক সংকলনের সূত্রপাত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে সেরা ভূতের জন্মদাতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প দিয়ে। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে 'স্কল স্কেলিটন এন্ড কোং' খুলে ভূতেদের ইন্ডাস্ট্রির শুভসূচনা হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে ভূতের রীতিমতো আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। তিনিই প্রথম সাহস করে ভূতের জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করে লিখেছিলেন—'যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমন ভূত হয়।...অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না?' তারপর সার কথাটি বলে দিয়েছেন—'অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প অল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব সস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। সস্তা হইলে গরিব-দুঃখী সকলেরই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।' জনদরদী ত্রৈলোক্যনাথের এই মনোভাব লক্ষ করে হিমানীশ গোস্বামী 'ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ' সস্তায় ভূত সরবরাহের সাধু প্রস্তাব করেছেন!

এই সংকলনে বাংলা সাহিত্যের প্রায় অর্ধশত প্রতিনিধিস্থানীয় ভূতকে এনে

পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে সংখ্যাটি অবহেলার নয়। এছাড়া একটি ভূত-বিষয়ক চর্চাও রয়েছে। এতে ভূতেরা কতখানি স্বস্তিতে রয়েছেন তা পাঠকেরা বিচার করবেন—আমরা কোনো মন্তব্য করছি না। এইসব গল্পের সবগুলিকে নিয়ে আলোচনা করার অবকাশও নিইনি। যাঁদের নিয়ে আলোচনা করছি না, তাঁদের গল্পের ভূতেরা যে সদাশয়—তা নিশ্চয়ই জানি। এই অপরাধে তাঁরা আমাদের ঘাড় মট্‌কাবেন না—এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ পূজার সময় একজাতীয় ভূতের গল্প লিখে নাম দিয়েছিলেন 'পূজার ভূত'। গল্পটি হানাবাড়ি গোছের একটা পরিবেশে একটি ছোট মেয়ে সীতাকে মাধ্যম করে অতীত ইতিহাসের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করেছেন। এক ঝড়জলের রাত্রিতে এই কাহিনী যেভাবে শামীমাসির জবানিতে কথিত হয়েছে তা খুবই লোমহর্ষক। সীতাকে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে যেভাবে ডেকে নিয়ে যায় সে মহাষ্টমীর রাতে, তার পিছনে বাড়ির একদা কর্তা জগমোহন চৌধুরির জীবনের ঘটনার সাক্ষ্য রেখে জীর্ণ দালানবাড়িতে লেখক যে ভৌতিক পরিবেশ গড়ে তুলেছেন তা রবীন্দ্রনাথের আগে এটিকেই সার্থক গল্প বলে ঘোষণা করতে আমাদের দ্বিধা নেই।

রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিকারের কোনো ভূতের গল্প লিখেছিলেন? ভূত থাকলে এবং গল্প থাকলেই ভূতের গল্প হয় না। রবীন্দ্রনাথের মণিহারা, না কঙ্কাল, না ক্ষুধিত পাষাণ—কোন্‌টা ভূতের গল্প—তা নিয়ে দ্বিধার শেষ নেই। আমরা কোনো বিতর্কে না গিয়ে 'মণিহারা' গল্পটি নিয়েছি ভাঙা পোড়োপাড়ি, কঙ্কালের খটখট শব্দের পটভূমি লক্ষ করে। মৃত পত্নী মণিমালিকা ফিরে পেতে চেয়ে ফণিভূষণ সালাঙ্কারা মণিমালিকার যে কঙ্কালময় রূপ দেখে, তা যদি ভূত না হয়ে শুধু 'ভ্রম' বলে ভ্রম হয়, তবে আমরা নাচার। তৃতীয় রাত্রিতে যে কঙ্কালকে সে দেখতে পায়, তার ঢিলা অলঙ্কারগুলো যে গা থেকে খুলে পড়ছে না—এটাই তো যথেষ্ট ভৌতিক।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'একটি ভৌতিক কাহিনী' গল্পে অশরীরী সত্তার অস্তিত্বকে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং সেজন্যে এর ভৌতিক রস অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। পাঁচকড়ি দে-র 'সর্বনাশিনী' গল্পের পাহাড়ি পরিবেশ নতুন মেজাজ সৃষ্টি করে। দুটি নারীকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। মন্মথদের বিবাহিত জীবনে যে মর্মান্তিক পরিণতি ঘনিয়ে আসে, ভুটিয়া কবি সোহোর জীবনের নিষ্ঠুর কাহিনী শোনা তার অন্যতম কারণ। সোহোর প্রণয়িনীর প্রেতসত্তা যেভাবে মন্মথর দরজায় করাঘাত করত তাতে ভৌতিক পরিবেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'উৎপীড়িতের প্রতিহিংসা' গল্পটি পড়তে পড়তে বহুপাঠী পাঠকের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পিছু পিছু চলে' বা বনফুলের 'পালানো যায় না' গল্প দুটির কথা মনে পড়ে যেতে পারে। গল্পটি ইংরেজি থেকেও নেওয়া হতে পারে। ইতিহাসের পটভূমিকাটি যথেষ্ট মনোরম। পরশুরামের 'মহেশের মহাযাত্রা' গল্পটির উপসংহারে পৌঁছে পাঠকের শরীর ও মনে যে রোমাঞ্চ জাগে তা আমি প্রত্যক্ষ করে আনন্দ পাই। এর হাস্যরস, শ্লেষ এবং বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী গল্পটিকে দারুণ উপভোগ্য করে তুলেছে এক অভাবিত ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মায়া' একটি ভিন্নস্বাদী ভূতের গল্প। একটি ভূতুড়ে বাড়ির বন্ধঘর থেকে জল পড়া, অট্টহাসির

ধ্বনি, রাত্রিবেলা ঝিঙে খেত থেকে ঝিঙে তোলা, জ্যোৎস্নারাতে সুবাস ছড়ানো—সবই এক ব্যাখ্যাতীত লোকে পাঠককে পৌঁছে দেয়। সবচেয়ে ধাঁধা লাগে সেই পরিবেশে এক বিদেশি মানুষের নিরুপদ্রবে থাকাটা। এই যে অপ্রাকৃত পরিবেশ—এর স্বাদটাই যেন আলাদা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নদীর তীর, সাঁকো জলজ পরিবেশে যে ভৌতিক রসের সৃষ্টি করেছে—তার মধ্যে একটা অদ্ভুত হাতছানি বর্তমান।

তারাশঙ্করের 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্' গল্পটি একটু অভিনব। প্রথমদিকে ভূতের কুলপঞ্জিকা নির্মাণের উদ্যোগ এবং পরে একটা লোমহর্ষক গল্প। লেখক যেভাবে আমদপুর-সাঁইথিয়া-বোলপুর স্টেশন এবং দার্জিলিং মেল-এর সহাবস্থান ঘটিয়েছেন তাতে গল্পটা যেন গল্প না হয়ে সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বুনি ও কুনি ভূতের সানুনাসিক [illegible] যদি সত্যি হয় তবে তো সন্ধেবেলায় গা ছমছম করারই কথা। বিশেষ করে পাঁচশো বছরের পুরনো বটগাছটার আত্মা যদি এমনতর কথা বলে তবে তো পাঠকের 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' গোছের অবস্থা হবে। সুকুমার সেনের গল্পটি তো গল্প না হয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হয়ে উঠেছে। তবে এটাই তাঁর কারসাজি কিনা জানিনে। মণীন্দ্রলাল বসুর 'ভেরনল' গল্পের বক্তা ডা. সরকার রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ নামধারী এক রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে জানতে পারেনা যে রোগীর বিশ্বাস মাথার ক্যান্সারে তার মৃত্যু হবে? সেজন্য তার সম্পত্তির অর্ধেক সে কোনো ক্যান্সার হাসপাতালে দিয়ে যেতে চায়। মরার আগে জীবনকে উপভোগ করতে লাগল। তারপর দেখল রোজেনবেয়ার্গ মরে গেছে, পাশে ভেরনলের শূন্য শিশি এবং উপভোগের পাত্রী গণিকা মাদেলিন উধাও। এমনতর এক ডিটেকটিভ গল্পের পরিবেশে গল্পটিতে এক ভৌতিক আবহাওয়া রচনা করেছেন লেখক অতি মুন্সিয়ানার সঙ্গে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কে?' গল্পটিকে সুকুমার সেন মশায় lycanthropy জাতীয় রচনা বলেছেন এবং অনুমান করেছেন এটির মূল কোনো ইংরেজি গল্প। তা হতে পারে, কিন্তু এর দেশীয় পরিবেশে ভৌতিক ছমছমানি বেশ উপভোগ্য।

ভূতের গল্পের আধুনিক যুগের রীতি[illegible] সূত্রপাত ঘটিয়েছেন সম্ভবত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মৃতি গল্প আর হ্যালুসিনেশন-জাতীয় অতিপ্রাকৃতিকতা মিশিয়ে এই যুগের সূচনা করেছেন তিনি। এই গল্পটি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র আত্মীয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কলকাতার গলি'তে যেভাবে মৃত বন্ধু জীবিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছে তাতে আমাদের প্রয়াত কোনো বন্ধু থাকলে তাঁর কথা স্মরণ করে আমাদেরও মনে হতে পারে—'জামার নিচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা শূন্য'। বনফুল মানবমনের চেতন-অবচেতন মনের দুর্জ্ঞেয়তাকে তুলে ধরতে গিয়ে কাহিনীর ভিতরে কাহিনী—তার ভিতরে কাহিনী বয়ন করে ডাকবাংলোয় জনৈক ভদ্রলোকের মুখে তাঁর শিকারী জীবনের কাহিনী শোনাতে শোনাতে একটা লোকহর্ষক পরিবেশ রচনা করেছেন।

অন্যদিকে প্রেতাত্মা, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে, 'হলুদপোড়া' গল্পের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ রচনা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী গল্পে একটা ডিটেকটিভ-সুলভ সাসপেন্সও এনে দিয়েছেন। এর সঙ্গে রোমান্স রস এনে দিয়ে একটি নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন মনোজ বসু 'লাল চুল' গল্পে। গল্পটি পড়তে পড়তে 'নিশীথে' গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়।

ধীরে ধীরে ভূতের গল্প নব্য আধুনিক যুগে এসে পড়ল। যন্ত্র এসে গল্পে স্থান নিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূত 'টাইপরাইটার'-এর ছদ্মবেশে খট্‌খট্‌ করে টাইপ করে ভূতের জবানবন্দী লিখেছে। টেলিফোন-এ ভূত আমদানি করেছিলেন কানাডার রসিক লেখক স্টিফেন লিকক। তাঁরই দৃষ্টান্তে একদা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'টেলিফোন'-এ ভূত এনে হাজির করেছিলেন। পরশুরামের গল্পের গামছা ছেড়ে সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পে 'কোট' একটা মুখ্য ভূমিকা যে নিয়ে বসেছে—সেও আধুনিক যুগের ইঙ্গ প্রভাবে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে একটা নব্যবাবুযুগীয় যানবাহনের ব্যাপার। তবে আধুনিকতম ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন তারাপদ রায় 'ভূত রিপোর্টার'-এ। অবশ্য ঘড়েল পাঠক এদের অস্তিত্ব সংবাদপত্রে দীর্ঘকাল ধরেই লক্ষ করে আসছেন।

আসলে পাঠক লক্ষ করেছেন গল্পকারেরা যত একালীন হয়ে এসেছেন—তাঁদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার ব্যাপারে ভূমিকা লেখক বেশ কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। আসলে তিনি এখনো হালআমলের ভূতেদের টেক্‌নিক সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেননি। ফলে লেসার রশ্মি কি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তাঁরা যদি কোনোপ্রকারে তাঁর উপ্পর 'দৃষ্টি' দেন—তাহলেই তো তাঁর 'গেছি রে বাবা' অবস্থা। ভূতগ্রস্ত অবস্থায় ভূমিকা লিখতে শুরু করেছিলাম। লেখকেরা তাঁদের ঝুলিতে নানারকমের ভূত থাকা সত্ত্বেও সেই 'ভর'প্রাপ্ত অবস্থায় যে 'ভূত'গুলিকে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলিই মাত্র গ্রহণ করেছিলাম। কেন তাঁদের অন্য ভূতের গল্পগুলি নিইনি—এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। কাজেই এই সংকলনের মেরিট-ডিমেরিট নিয়ে কেউ অভিযোগ করবেন না। তাতে বক্ষ্যমান ভূতেরা বক্ষ বিদীর্ণ করে দিতে পারে! যতক্ষণ ভূতগ্রস্থ ছিলাম, ততক্ষণ এলোমেলো বকেছি। ভূত একটু ছেড়ে যেতেই বুঝেছি তাঁদের নিয়ে আর বুক্‌নি না দিয়ে পাঠকের গায়ে ভূত ছেড়ে দেওয়াই উচিত। তবে যাঁদের লেখার আলোচনা করতে পারলাম না নিজের অক্ষমতাবশত, তাঁদের কাছে একটামাত্র প্রার্থনা—আপনারা প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজ নিজ ভূত আমার দিকে লেলিয়ে দেবেন না। মাননীয় প্রকাশকের পোষা ভূত কল্যাণস্বরূপ—তিনি আপনাদের আশীর্বাদ করবেন।

জানি না এই ভূতের বেগার খাটা কতখানি গ্রহণীয় হবে। ভূতের রাজা আমাকে বর দিন—এইমাত্র প্রার্থনা।

রোজভিলা, বর্ধমান
কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৬

বারিদবরণ ঘোষ

সূচিপত্র

সূচিপত্র

পূজার ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায় : ভয়ঙ্কর বাড়ি

আমার নাম তারক। কলিকাতায় আমি বোর্ডিংয়ে থাকি। পূজার সময় আমি বাড়ি আসিয়াছি। আমার নিজের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি। মামার বাড়িতেই আমরা মানুষ হইয়াছি। আমি ও আমার ভগিনী প্রভা। শামীমাসি আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। আমার মাকেও সে মানুষ করিয়াছিল। শামীমাসি সদ্‌গোপের মেয়ে।

সন্ধ্যার সময় আমরা শামীমাসিকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমি, প্রভা, আর আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীগণ। আমি বলিলাম,—"শামীমাসি, আজ তোমাকে একটি গল্প বলিতে হইবে। কেমন মেঘ করিয়াছে দেখ। কেমন অন্ধকার হইয়াছে। কেমন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর বাতাসের একবার জোর দেখ। গাছের পাতার ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিতেছে। যেন রাগিয়া কি বলিতেছে। এই অন্ধকারে এমন দুর্যোগের সময় ভূত-প্রেত সব বাহির হয়। বাপ রে! গা যেন শিহরিয়া উঠে।"

শামীমাসি বলিল,—"এই পূজার সময়—এইরূপ দুর্যোগের সময় তোমার মাকে লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। এখনো সে কথা মনে করিলে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল শামীমাসি?"

শামী উত্তর করিল,—"না, সে কথা এখন তোমাদিগকে আমি বলিব না। তোমরা ছেলেমানুষ। সে কথা শুনিলে তোমাদের ভয় করিবে।"

আমরা সকলেই বলিলাম,—"সে কথা শুনিলে আমাদের ভয় করিবে না।"

যাহা হউক, অনেক জেদা-জেদির পর শামীমাসি সে গল্প বলিতে সম্মত হইল। শামীমাসি বলিল,—"তারক ও প্রভার মায়ের নাম সীতা ছিল। সীতার মা, অর্থাৎ তোমাদের মাতামহীর নাম তারামণি ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়া যান,—'শামী! আমার কাছে তুই সত্য কর যে সীতাকে তুই কখনো ছাড়িয়া যাবি না। সীতা পাঁচ বৎসরের শিশু, পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই।'

সীতাকে আমি দিদিমণি বলিয়া ডাকিতাম। আমি বলিলাম,—'মাঠাক্‌রুণ! দাদাবাবু (অর্থাৎ তোমাদের মা'র ভাই) ও দিদিমণি কোথায় কাহার কাছে থাকিবে, তাহা আমি জানি না। দিদিমণি যাহাদের কাছে থাকিবে, তাহারা যদি আমাকে ছাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তাহারা যদি আমাকে রাখে, তাহা হইলে তোমার গায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, দিদিমণিকে আমি কখন ছাড়িব না।'

তোমাদের মাতামহীর মৃত্যু হইল, তোমাদের মামা, যাঁহার এই বাড়ি, তিনি তখন বালক। লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত একজন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। সীতা তাহার মামার বাড়িতে গেল। সীতার মামা আমাকে ছাড়াইলেন না। আমি দিদিমণিকে মানুষ করিতে লাগিলাম।

দিদিমণির মামারা একসময়ে খুব বড়মানুষ ছিলেন। শুনিলাম যে, তাহার মাতামহ জগমোহন রায়চৌধুরী একজন দুর্দান্ত লোক ছিলেন। দিদিমণিকে লইয়া আমি যখন তাঁহার বাড়িতে যাইলাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। দিদিমণির মামাও দেশে থাকিতেন না, পশ্চিমে কোথায় কর্ম্ম করিতেন। দিদিমণিকে বাড়িতে রাখিয়া তিনি সে স্থানে চলিয়া গেলেন। সে বাড়ি কি ভয়ঙ্কর! তিনমহল বাড়ি, বাহির বাড়িতে, মাঝের বাড়িতে, ভিতর বাড়িতে, একতলায় দোতলায় কত যে ঘর, তাহা গণিতে পারা যায় না। কিন্তু সব ভোঁ ভোঁ, দেখিলেই যেন ভূতের বাড়ি বলিয়া মনে হয়; বাহিরের বাড়িতে কি মাঝের বাড়িতে জনপ্রাণী বাস করে না। এতবড় বাড়িতে আমরা কেবল ছয়জন রহিলাম—(১) তোমার মায়ের পিসি অলক ঠাক্‌রুণ, তাঁহার বয়স প্রায় আশি হইয়াছিল, আর তিনি সম্পূর্ণ কালা ছিলেন। (২) আর একজন ব্রাহ্মণী, তাঁহার নাম সহচরী, তাঁহারও বয়স বড় কম হয় নাই। তিনি রন্ধন করিতেন। (৩) একজন চাকর, তাহার নাম পিতেম। (৪) পিতেমের স্ত্রী, তাহার নাম বিলাসী। (৫) তাহার পর আমি ও (৬) তোমাদের মা, আমার দিদিমণি, সীতা। বাড়ির ভিতর দোতলায় তিনটি ঘরে আমরা ছয়জনে বাস করিতে লাগিলাম। প্রথম অলক ঠাক্‌রুণ ও সহচরীর ঘর; তাহার পার্শ্বে আমার ও দিদিমণির ঘর। তাহার পার্শ্বে পিতেম ও বিলাসীর ঘর। পশ্চিমদিকে এই তিনটি ঘরে ছিল। উত্তর ও পূর্ব দিকে অনেক ঘর পড়িয়াছিল। বিলাসীর ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর লইয়া আমি দিদিমণির খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। বাটীর চারিদিকে অনেকদূর পর্যন্ত আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি নানা গাছের বাগান ছিল। বাগানের ভিতর চারি-পাঁচটি পুকুর ছিল। উত্তরদিক ভিন্ন বাটীর আর চারিদিকে গ্রাম ছিল। কিন্তু সে মিথ্যা গ্রাম, ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে; অনেক লোক ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাটীর উত্তরদিকে মাঠ, যতদূর দেখিতে পাই, ততদূর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

শ্মশানের ন্যায় সেই বাড়িতে গিয়া আমি মনে করিলাম,—ওমা! এ বাড়িতে আমি কি করিয়া থাকিব, ভয়েই মরিয়া যাইব।

যাহা হউক, যেখানে আমার দিদিমণি, সেখানে সব ভালো,—সেইখানেই আলো,—সেইখানেই সুখ। দিদিমণির দৌড়াদৌড়ি, দিদিমণির খেলা, দিদিমণির কথা, দিদিমণির হাসিতে সেই শ্মশানভূমি,—যেন স্বর্গতুল্য হইল। এমন যে অলক ঠাক্‌রুণ, যাঁহার গোমড়া মুখ দেখিলে ভয় হয়, দিদিমণিকে দেখিলে তাঁহারও মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হইত, তাঁহারও মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিত। দিদিমণির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তেমন ফুটফুটে,

দুধে-আলতার রং আমি আর কোনো মেয়ের দেখি নাই। কেমন পুরন্ত গাল দুইটি, কেমন ছোট্ট হাঁ-টুকু। কেমন টুকটুকে ঠোঁট, কেমন পটল-চেরা ঢুলু ঢুলু উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন কাল কাল চক্ষুর পাতা, কেমন সরু সরু চকচকে রেশমের মতো নরম চুল! হা কপাল! সে দিদিমণিকে ছাড়িয়া এখনো আমি প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর দিদিমণি যখন কথা কহিত, তখন প্রাণ যেন শীতল হইত, প্রাণের ভিতর দিদি আমার যেন সুধা ঢালিয়া দিত।

দিদিমণিকে লইয়া আমি সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। একবার এই সময় ঘোরতর দুর্যোগ করিয়াছিল। বাহিরে বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছিল। দিদিমণিকে লইয়া আমি শুইয়া আছি। সহসা বাহির-বাড়িতে বেহালার শব্দ হইল। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, এত রাত্রিতে আমাদের বাহির-বাড়িতে বেহালা বাজায় কে? বাহির-বাড়িতে তো কেহ বাস করে না।

পরদিন আমি বাহির-বাড়িতে গিয়া চারিদিক দেখিলাম। জনপ্রাণীকেও সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না। পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ির যেরূপ অবস্থা হয়, বাহির-বাড়ির সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সেদিন বিলাসীকে একবার একেলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বিলাসী, কাল রাত্রিতে বাহির-বাটীতে বেহালা কে বাজাইতেছিল?'

আমার কথা শুনিয়া বিলাসীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। আম্তা আম্তা করিয়া সে উত্তর করিল,—'বেহালা! বেহালা আবার কে বাজাইবে? ও বাতাসের শব্দ।'

বিলাসীর কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে আমার নিকট কোনো বিষয় গোপন করিতেছে।

বিলাসী পুনরায় বলিল,—'যাহা হউক, দিদিমণিকে তুমি সদর-বাড়িতে যাইতে দিয়ো না। সাপ-খোপ কি আছে না আছে, কাজ কি ওদিকে গিয়া।'

আরো কিছুদিন গত হইয়া গেল। একবার নয়, আরো অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখনই রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্যোগ হয়, তখনি বাহির-বাড়িতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা বাজায়। কেবল বেহালা নহে, সে বৎসর পূজার সময় মহা-অষ্টমীর রাত্রিতে বাহির-বাড়িতে আমি শাঁক-ঘণ্টারও শব্দ শুনিয়াছিলাম, ধূপ-ধূনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন একজন ভক্ত বিকট স্বরে মা মা বলিয়া চিৎকার করে, সে শব্দ শুনিয়াছিলাম। এ সমুদয় ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা সহচরীকে, পিতেমকে, বিলাসীকে আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে বলে নাই—'ও কিছু নয়', এই কথা বলিয়া সকলে প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এইরূপে সে স্থানে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। মহাষ্টমীর দিন দুই প্রহরের সময় দিদিমণি পিতেম ও বিলাসীর সহিত গ্রামের ভিতর পূজা দেখিতে গিয়াছিল। আমি বিদেশী লোক, আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, সেজন্য আমি তাহাদের সঙ্গে যাই নাই। পূজা দেখিয়া বেলা পাঁচটার সময় দিদিমণি ফিরিয়া আসিল। বিলাসী আমাকে বলিল,—'যদু ভড়ের বাড়ি পূজার এবার খুব ধুম। আহা! কি চমৎকার প্রতিমা করিয়াছে। আর শামীদিদি, ভড়গিন্নি তোমাকে অনেক করিয়া যাইতে বলিয়াছে।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা, বিলাসী! তবে আমি একবার মাকে দেখিয়া আসি। তুই ভাই দেখিস, যেন দিদিমণি কোথাও না যায়।'

এই কথা বলিয়া আমি ভড়েদের বাড়ি ঠাকুর দেখিতে যাইলাম। ভড়গিন্নী আমাকে অনেক আদর করিলেন। অনেকগুলি খই-মুড়কি, নারিকেল-সন্দেশ, রসকরা—আরো কত কি আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আয় না ভাই

বাড়ি আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। দিদিমণিকে সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

বিলাসী বলিল,—'বোধহয় অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে আছে।' রুদ্ধশ্বাসে সে ঘরে আমি দৌড়িয়া যাইলাম। অলক ঠাক্‌রুণ ও সহচরী দুইজনেই তখন সে ঘরে ছিল। দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া সহচরীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সহচরী উত্তর করিলেন,—'কৈ! সীতা তো এ ঘরে আসে নাই।'

এই কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উড়িয়া গেল। পুনরায় আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিলাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম।

বিলাসী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল,—'এইমাত্র আমার ঘরের বারান্দায় সে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর আমি কাজ করিতেছিলাম। বোধ হয়, অন্য কোনো ঘরে সে খেলা করিতেছে।'

এমন সময় পিতেম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার কান্না ও বিলাসীকে ভর্ৎসনার শব্দ শুনিয়া সহচরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রদীপ হাতে লইয়া সকলে মিলিয়া আমরা বাড়ি আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম। ভিতর-বাড়ি খুঁজিয়া মাঝের বাড়ি, তাহার পর সদরবাড়ির সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কোনো স্থানে দিদিমণিকে দেখিতে পাইলাম না। মাথা খুঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, হয় গহনার জন্য দিদিমণিকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা পুষ্করিণীতে পড়িয়া সে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ি ওলট-পালট করিয়া অবশেষে আমরা বাগান ও পুকুরের ধারগুলি মনোযোগের সহিত দেখিলাম। কিন্তু কোনো স্থানে দিদিমণির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। শেষে পিতেম আমাকে বলিল,—'তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মন কেমন করিয়াছিল, তোমাকে খুঁজিবার নিমিত্ত নিশ্চয় সে পূজা-বাড়ির দিকে গিয়াছে। আমি এখনই তাহাকে আনিতেছি।' এই কথা বলিয়া পিতেম গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বাড়ি ও বাগানের উত্তর দিকে দূর পর্যন্ত মাঠ ছিল। দিদিমণিকে খুঁজিবার নিমিত্ত বিলাসী ও আমি সেই মাঠের দিকে যাইলাম। মেঘ করিয়াছিল, খুব অন্ধকার হইয়াছিল। তাহার উপর এখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে আমরা একপ্রকার সাদা কি দেখিতে পাইলাম। বিলাসীর বড় ভয় হইল। সে বলিল,—'দিদি, ঐ দেখ একটি শাকচুর্ণী আসিতেছে। এখনি আমাদের খাইয়া ফেলিবে। আর গিয়া কাজ নাই। এস, বাড়ি ফিরিয়া যাই। এতক্ষণে দিদিমণি বাড়ি আসিয়া থাকিবে।'

কোনো উত্তর না দিয়া আমি বিলাসীর হাত ধরিলাম, আর সেই সাদা জিনিসের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সেও অন্য দিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বিলাসী তাহাকে চিনিতে পারিল। সে আমাদের প্রতিবাসী একজন কৃষক! কাপড় ঢাকা তাহার বুকের উপর কি ছিল। আমরা কোনো কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে বলিল,—'তোমাদের মেয়েটি মাঠের মাঝখানে গাছতলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিয়া সে মাঠের মাঝখানে আসিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতে পাইয়া এখন তোমাদের বাড়ি লইয়া যাইতেছি।'

তাড়াতাড়ি দিদিমণিকে আমি তাহার কোল হইতে আপনার কোলে লইলাম। কিন্তু দিদিমণির সর্ব শরীরই ঠাণ্ডা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার নাকে ও বুকে হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। আর বুক অল্প অল্প ধুক্-ধুক্ করিতেছে। তাহা দেখিয়া আমার প্রাণে কতকটা আশা হইল। তাড়াতাড়ি মাঠ পার হইয়া আমরা বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনেক তাপসেঁক করিতে করিতে দিদিমণির চেতনা হইল। সেই চন্দ্রমুখে মধুর হাসি দেখা দিল, সুধামাখা দুই একটি কথা দিদিমণির মুখ হইতে বাহির হইল। অল্প গরম দুধ আনিয়া সহচরী তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার সেই পদ্মচক্ষু দুইটি ঘুমে বুজিয়া গেল। সে রাত্রিতে দিদিমণিকে আমরা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দূরে মাঠের মাঝখানে একেলা সে কি করিয়া গিয়াছিল, পরদিন সেই কথা দিদিমণিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমণি বলিলেন,—'বারেন্ডায় আমি খেলা করিতেছিলাম। তাহার পর যে ঘরে আমার খেলা-ঘর আছে, আমি তাহার ভিতর যাইলাম। সেই ঘরের জানলার ধারে যেই দাঁড়াইয়াছি, আর দেখি না ঠিক তাহার নীচেতে বাগানে একটি মেয়ে রহিয়াছে। মেয়েটি আমার মতো বড়, কিন্তু খুব সুন্দর। উপর দিকে আমার পানে চাহিয়া সে বলিল,—'সীতা! নেমে আয় না ভাই, আমরা দুইজনে খেলা করি।' আমি বলিলাম,—'না ভাই! এখন আমি নীচে নামিয়া যাইতে পারিব না। সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন নীচে নামিবার সময় নয়। বিলাসী আমাকে বকিবে, তাহার পর শামী আসিয়া আমাকে বলিবে। কাল সকালবেলা তুমি আসিও, দুইজনে তখন অনেকক্ষণ খেলা করিব।' মেয়েটি বলিল, —'এখনো তেমন সন্ধ্যা হয় নাই, এখনো অনেক আলো রহিয়াছে। এই দেখ আমার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবুও দেখ আমি খেলা করিতেছি। আয় না ভাই।'

'তবুও আমি নামিলাম না। নীচে নামিতে মেয়েটি আমাকে বার বার বলিতে লাগিল। শেষে সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নীচে নামিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আমি তাহার কাছে যাইলাম। কিছুক্ষণ বাগানের ভিতর আমরা দুই জনে খেলা করিলাম। এক স্থানে অনেকগুলি রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা আমরা তুলিলাম। সাদা টগর ফুল ফুটিয়া আর একটি গাছে আলো করিয়াছিল। নীচে হইতে যত পারিলাম, সেই টগর ফুলও আমরা তুলিলাম। কেমন করিয়া জানি না, তাহার পর বাগান পার হইয়া আমরা মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেমন করিয়া জানি না, সেই মেয়েটির সঙ্গে অনেক পথ চলিয়া ক্রমে মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটি গাছ ছিল। সেই গাছতলায় একটি মেয়েমানুষ

বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমার মাকে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে পড়ে। সে মেয়েমানুষটি ঠিক আমার মায়ের মতো। সেই রকম রং, সেই রকম মুখ, সেই রকম চুল, সেই রকম কথা। আদর করিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন, আমার মুখে তিনি কত চুমা খাইলেন। কোলে বসাইয়া আমার মাথায় তিনি হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর কি হইল, আর আমার মনে নাই।'

তৃতীয় অধ্যায় : বালিকা ভূত

দিদিমণির এই কথা শুনিয়া সহচরী পিতেমকে চক্ষু টিপিলেন। তাহার পর তিনি বিলাসীর গা টিপিলেন। ইহার মানে আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সে মেয়েটি কে? সে তো বড় দুষ্ট মেয়ে দেখিতেছি। তাহাকে আর বাগানে আসিতে দেওয়া যাইবে না।'

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়া সহচরী বলিলেন,—'এ বিষয় অলক ঠাক্‌রুণকে জানাইতে হইবে। তিনি যেরূপ বলেন, সেইরূপ করিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া সহচরী সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে, পিতেমকে ও বিলাসীকে অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে ডাকিতে পাঠাইলেন। দিদিমণিকে কোলে লইয়া আমি পিতেম ও বিলাসীর সঙ্গে সেই ঘরে যাইলাম। অলক ঠাক্‌রুণ থুড়থুড়ে বুড়ি হইয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হইয়া সহচরী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'অলক ঠাক্‌রুণ তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, সে মেয়েটি মানুষ নহে। তাহার মা, যাঁহাকে সীতা গাছতলায় দেখিয়াছিল, তিনি অলক ঠাক্‌রুণের ভাইঝি, সীতার মাসি। অনেকদিন হইল তিনি ও তাঁহার কন্যা অপঘাত-মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গতি হয় নাই, যখন তাঁহারা এরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্বদা, বিশেষত ঝড় বাতাস বাদলার দিনে, আর এই পূজার সময়, বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। পিতেম, বিলাসী আর তুমি শামী, তোমাদের সকলকে অলক ঠাক্‌রুণ বলিতেছেন যে, সীতাকে তোমরা খুব সাবধানে রাখিবে, নিমিষের নিমিত্ত তোমরা তাহাকে চক্ষের আড় করিবে না। সে মেয়েটা এবার যদি সীতাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমরা সীতাকে পাইবে না।'

এই কথা শুনিয়া আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। কি করিয়া মেয়েকে ভূতের হাত হইতে বাঁচাইব, সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তোমার মামার তখনো কর্ম-কাজ হয় নাই, এক দিন গিয়া দাঁড়াই, এক বেলা এক মুঠা কেহ যে ভাত দেয়, এমন স্থান ছিল না। কাদায় গুণ ফেলিয়া দিদিমণিকে লইয়া কাজেই আমাকে সেই ভয়ানক বাড়িতে থাকিতে হইল। কিন্তু সেই দিন হইতে দিদিমণিকে আমরা নিমিষের জন্যও চক্ষুর আড় করিতাম না। হয় আমি, না হয় বিলাসী, না হয় পিতেম, কেহ না কেহ সর্বদা তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু মাঝে মাঝে জানালার দ্বারে দাঁড়াইয়া দিদিমণি আমাদিগকে বলিত, 'ঐ সেই মেয়েটি আসিয়াছে, ঐ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শামী, তুই আমাকে পাগল বলিস, কিন্তু ওর পানে একবার চাহিয়া দেখ। আহা! কি চমৎকার রূপ। কেবল ওর পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ দেখ, আবার আমাকে ডাকিতেছে। আমি যাইতেছি না বলিয়া আহা! মেয়েটি ঐ দেখ, কতই না কাঁদিতেছে। তাহার কাপড় যে আমাকে দেখাইতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, টস্

টস্ করিয়া তাহার কাপড় হইতে জল পড়িতেছে। এ আবার কি? হাত দিয়া সে আপনার মাথা আমাকে দেখাইতেছে। আহা! মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে, মাথা হইতে গাল বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে। শামী! একবার আমাকে ছাড়িয়া দে। আমি উহার কাছে যাই, উহাকে বাড়ির ভিতর ডাকিয়া আনি। তুই উহার মাথায় ঔষধ দিয়া দিবি। আমার ঐ কাপড়খানি আমি উহাকে পরিতে দিব। যাই ভাই, যাই!'

এইরূপ বলিলে তাড়াতাড়ি আমি তোমার মাকে গিয়া কোলে লইতাম। উপর হইতে বাগানের দিকে আমি চাহিয়া দেখিতাম, কিন্তু আমি কিছু দেখিতে পাইতাম না। কি করিব! ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া মেয়েকে কোলে লইয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া আমি বসিয়া থাকিতাম।

এইরূপে অতি কষ্টে আমরা সেই বাড়িতে দিনপাত করিতে লাগিলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। এই সময় দিদিমণি সেই মেয়েটাকে ঘন ঘন দেখিতে লাগিল। বাগানের দিকে জানালা এখন আমি সর্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতাম। তথাপি দিদিমণি বলিত, —'শামী! জানালা খুলিয়া দে। মেয়েটি নীচে আসিয়াছে, সে আমাকে ডাকিতেছে। শামী! তোর পায়ে পড়ি, একবার জানালা খুলিয়া দে, একবার তাহাকে আমি দেখি।'

মহাষ্টমীর দিন মেয়েকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইলাম। সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ হইয়াছিল। সীতাকে কোলে লইয়া আমি ঘরে বসিয়া ছিলাম। এখন আর বাহিরে নয়, সেদিন দিদিমণি সেই মেয়েটিকে বাড়ির ভিতরেই দেখিতে লাগিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া ছিলাম, তথাপি দিদিমণি বলিতে লাগিল,—'ও শামী! মেয়েটি আজ বাড়ির ভিতর আসিয়াছে, ঘরের বাহিরে আমাদের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ছাড়িয়া দে শামী! আমি একবার তাহার কাছে যাই। একবার তাহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব।'

এই বলিয়া দিদিমণি হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিল। কি যে করি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মেয়ে লইয়া আমি অলক ঠাক্রুণের ঘরে গেলাম। সে স্থানে সহচরী উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম—'আজ বাছা, আমাদের খাওয়া দাওয়াতে কাজ নাই। সকলে মিলিয়া এস, আজ আমরা মেয়েকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকি। তা না করিলে, দিদিমণিকে আজ আমরা বাঁচাইতে পারিব না, সেই দুষ্ট মেয়েটা আসিয়া দিদিমণিকে নিশ্চয় আজ লইয়া যাইবে।'

সহচরী অলক ঠাক্রুণকে সকল কথা বলিলেন। অলক ঠাক্রুণ আমার কথায় সম্মত হইলেন। পিতেম ও বিলাসীকে ডাকিয়া দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া দিদিমণিকে ঘিরিয়া, সকলে আমরা অলক ঠাক্রুণের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্বে এই বিড়ম্বনা নিবারণের জন্য অনেক প্রতিকার করা হইয়াছিল। গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল, রোজা আনিয়া ঝাড়ান ও ভূত নামানো হইয়াছিল, দিদিমণির অষ্টাঙ্গে কবচ, মাদুলি ও নেকড়ার পুঁটুলি বাঁধা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায় : বিষম মহাষ্টমী

সকলে ঘিরিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সেই মহাষ্টমীর সমস্ত দিন দিদিমণি বড়ই ছটফঠ্ করিয়াছিল। 'ঐ সেই মেয়েটি আসিতেছে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; দাও আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহার কাছে

যাই।' এই বলিয়া দিদিমণি বার বার কাঁদিতেছিল, আর আমার কোল হইতে উঠিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া বার বার বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। অতি কষ্টে আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পর দিদিমণি ঘুমাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার বুঝি আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল, আর বুঝি কোনো উপদ্রব হইবে না। কিন্তু আমরা কেহ নিদ্রা যাইলাম না, ঘরে দুইটা আলো জ্বালাইয়া সকলে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এমন সময় সহসা বাহির-বাটীতে সেই বেহালা বাজিয়া উঠিল। কেবল বেহালা নহে, তাহার সঙ্গে ঢাক-ঢোল, শাঁক-ঘণ্টা কাঁসর-ঘড়িও বাজিয়া উঠিল। সেই সকল বাজনা ছাপাইয়া বলিদানের সেই ভয়ানক মা মা চিৎকারে আমাদের যেন কানে তালা লাগিতে লাগিল, আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। হতভোম্বা হইয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় ধড়মড় করিয়া দিদিমণি উঠিয়া বসিল। আমরা কিছু বলিতে না বলিতে চোঁৎ করিয়া সে দ্বারের নিকট গিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহাকে ধরিতে না ধরিতে রুদ্ধশ্বাসে বাহির-বাড়ির পূজার দালানের দিকে সে দৌড়িল। 'ও মা, কি হইল, সর্বনাশ হইল।' এই কথা বলিতে বলিতে অলক ঠাক্রুণ ছাড়া আর সকলেই আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। দিদিমণি আমাদের আগে আগে গিয়া বাহির-বাড়ির পূজার দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা জ্ঞানহারা হইলাম। এখন আর সে ভাঙ্গা জনশূন্য বাড়ি নাই। খুব ধুমধামের দুর্গোৎসব হইলে যেরূপ হয়, সে স্থানে এখন সেইরূপ হইয়াছে। দালানের মাঝখানে প্রতিমা রহিয়াছে—বৃহৎ প্রতিমা, নানা সাজে সুসজ্জিত। প্রতিমার চারিদিকে নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার আয়োজন রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিতগণ বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে একজন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ধূপ-ধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে। দালানে, উঠানে, সকল স্থানে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ফল কথা, এমন ধুমধামের পূজা আমি কখন দেখি নাই।

দিদিমণি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দালান পার হইয়া দালানের পূর্বদিকে চলিয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দালানের পূর্বদিকে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর তক্তাপোষের উপর একজন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বামহাতে বেহালা, আর দক্ষিণ হাতে যা দিয়া বাজায় তাই ছিল। একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটিতে বসিয়া বৃদ্ধের পা দুইখানি ধরিয়া কি বলিতেছেন। সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্বে সাত আট বৎসরের এক বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল।

দিদিমণি বরাবর গিয়া সেই ঘরের দ্বারে এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। খপ করিয়া আমি গিয়া দিদিমণির হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমরা সকলেই সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে স্ত্রীলোক বৃদ্ধের পা ধরিয়া ছিলেন, তিনি এখন কাঁদ-কাঁদ মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, 'বাবা, অপরাধ করিয়াছি সত্য! কিন্তু আমি তোমার কন্যা। শত অপরাধ করিলেও কন্যাকে ক্ষমা করিতে হয়! এই মেয়েটিকে লইয়া আমি এখন কোথায় যাই।'

বৃদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাষায় বলিলেন,—'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোর আমি মুখ দেখিব না। কালামুখ লইয়া এ বাড়ি হইতে এখনই দূর হইয়া যা।'

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন,—'বাবা! আমি কোনোরূপ দুষ্কর্ম করি নাই, স্বামীর ঘরে গিয়াছি, এই মাত্র।'

বৃদ্ধ বলিলেন,—'তুই দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।' স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, আমি দুর হইতেছি, কিন্তু আমার কন্যাটি তো কোনো অপরাধ করে নাই! ইহাকে আমি তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। পাতের হাতের দুইটি ভাত দিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিও।'

সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আরো জ্বলিয়া উঠিলেন,—'তোর ঝাড় আমার এ বাড়িতে থাকিতে পারিবে না। দূর দূর, এখনি দূর হ।'

স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সত্বর দূর হইতেছে না, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া তিনি সেই বেহালার বাড়ি কন্যার মাথায় মারিয়া বসিলেন। কন্যার মাথা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। গাল বাহিয়া সেই রক্ত মাটিতে পড়িল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া সেই স্ত্রীলোক তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার যেন আগুনের ফিন্‌কি বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—'বাবা! তুমি এ কাজ করিলে!!! যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িল।'

এই কথা বলিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর দালানের ভিতর দিয়া উঠানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর উঠান পার হইয়া বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেলেন।

যেই তিনি বাড়ির বাহির হইলেন, আর বৃদ্ধ ভয়ানক চিৎকার করিয়া সেই তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই সময় ঝাড়লণ্ঠন সব নিবিয়া গেল। প্রতিমা, পুরোহিত, লোকজন সব অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ঢাকঢোলের কলরব সব থামিয়া গেল।

অন্ধকারে আমি পিতেমের কথা শুনিতে পাইলাম। পিতেম বলিল,—'শামী! সীতা তোমার কাছে আছে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'হ্যাঁ, আমি তাঁহাকে ধরিয়া আছি।'

পিতেম পুনরায় বলিল,—'তবে চল, ঘরে চল।'

পঞ্চম অধ্যায় : পূর্ব-বিবরণ

সকলে পুনরায় অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে যাইলাম। সীতা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কোনো উপদ্রব হইল না।

কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের নিদ্রা হইল না। আমরা সকলে বসিয়া রহিলাম। পিতেম তখন আমাকে সকল কথা বলিল। পিতেম বলিল—

'ঐ যে বৃদ্ধ দেখিলে, উনি বাড়ির কর্তা ছিলেন। উঁহার নাম জগমোহন রায়চৌধুরী ছিল। উনি বড় দুর্দান্ত লোক ছিলেন। একবার যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন, তা সে ভালোই হউক আর মন্দই হউক। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল একটি সখ ছিল। বেহালা বাজাইতে তিনি বড় ভালোবাসিতেন। সময় নাই, অসময় নাই, সর্বদাই তিনি বেহালা

বাজাইতেন। বিশেষত ঝড় বাতাস বাদলার রাত্রিতে তাঁহার সখটি কিছু প্রবল হইত। অলক ঠাক্‌রুণ তাঁহার ভগিনী। জগমোহন রায়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র সীতার মামা, যিনি এখন পশ্চিমে কাজ করেন। বড় কন্যার নাম ছিল রামমণি, যাঁহার ভূতকে সীতা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় দেখিয়াছিল। ছোট মেয়ের নাম ছিল তারামণি, তিনি সীতার মা। রায়চৌধুরী বড়মানুষ লোক, কোন পুরুষে কন্যা শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেন না। কিন্তু রামমণির এক তেজস্বী পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে—'ঘর-জামাই হইয়া আমি কিছুতেই থাকিব না।' আপনার স্ত্রীকে তিনি নিজের বাড়ি লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্তা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্বশুর-জামাতায় ঘোর বাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে কর্তা এক দিন রামমণিকে ডাকিয়া জামাতার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ইহাকে চাও—না আমাকে চাও।' রামমণি উত্তর করিলেন,—'বাবা! তুমি পিতা বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই সর্বস্ব।' এই উত্তর শুনিয়া কর্তা ঘোরতর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'বটে! তবে এখনি আমার বাড়ি হইতে দূর হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি তোমার মুখ দেখিব না।' রামমণি শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নয় দশ বৎসর স্বামীর ঘর করিলেন। তাঁহার একটি কন্যা হইল। সে কন্যাটির ভূত সীতাকে মাঠে লইয়া গিয়াছিল। নয় দশ বৎসর পরে রামমণির স্বামীর মৃত্যু হইল। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। রামমণি ঘোর বিপদে পড়িলেন।

পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পিতা কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে ভাবিলেন,—'পূজার সময় লোকের মন নরম হয়। এই পূজার সময় বাবার পায়ে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় ক্ষমা করিবেন।' পূজার সময় কন্যাকে লইয়া রামমণি পিতার বাটীতে আসিলেন। তাহার পর তোমরা এইমাত্র যাহা দেখিলে, অষ্টমীর দিন সত্য সত্যই সেই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। কন্যার হাত ধরিয়া রামমণি চলিয়া গেলেন। পক্ষাঘাত রোগ হইয়া কর্তা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে তুমুল ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পরদিন সকলে দেখিল যে, রামমণি ও তাঁহার কন্যা দুইজনেই মাঠের মাঝখানে গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া আছেন। কর্তা আরো কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতেই আর তিনি কথা কহিতে পারেন নাই, কি উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। সেই তাঁহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। জমিদারী, টাকাকড়ি কিরূপে কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঘরজামাই রাখার অহঙ্কারও সেই সঙ্গে দূর হইল। সেজন্য সীতার মাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আর কোনো আপত্তি রহিল না। কর্তা রামমণি ও তাঁহার কন্যা—তিনজনেই এখন ভূত হইয়া আছেন। কতবার গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভাবিলাম যে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও স্বীকার; তবু সীতাকে লইয়া সে বাড়িতে আর আমি থাকিব না। সীতার ভাই, তোমার মামাকে আমি পত্র লিখিলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার একটি কর্ম হইয়াছিল। তিনি আসিয়া আমাকে ও সীতাকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সীতার বিবাহ হইল। তাহার পর তুমি ও প্রভা হইলে। কিছুদিন পরে তোমার পিতার কাল হইল। অল্পদিন পরে দিদিমণিও তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। দিদিমণিকে হারাইয়া কি করিয়া আমি যে প্রাণ ধরিয়া আছি তাহাই আশ্চর্য। যাহাহউক, তোমাদের দুইজনকে পাইয়া আমি শোক অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছি। মা দুর্গা তোমাদিগকে আর যত ছেলেপিলেকে বাঁচাইয়া রাখুন।

মণিহারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপর মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রং হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থ-মূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাক্‌রের যেমন একরকম বহুকালজীর্ণ সংস্কারবিহীন চেহারা, ইঁহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি, কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়বড় চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কলেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমনকি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট্-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগা পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশ বন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিন্তু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে

ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিতি স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা—ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গিটুকু এবং ভঙ্গির মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমতো পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসা-মানযন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি, না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর

হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী-নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিনীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটা চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্‌ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুন্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন-সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের। ইহারা মেয়ে মানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষ মানুষের যে-কটা বড় বড় কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমতো স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী?'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল—অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সঙ্গত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মাণিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যূষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।'

মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ ঈকার এবং দন্ত্য-স'কে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমতোই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনাটা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া

জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকারী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নেই। স্বামীর বুকের মধ্যে ধক করিয়া একটা ঘা লাগিল! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিশে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার

গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্টস্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড় বড় কড়ি, এমন-কি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোট শখের কেরোসিন-ল্যাম্প্ সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমরা অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গিয়াছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নে বাহিরে এমন একটা জগদ্‌ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া গেল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধদ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সেকথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসঙ্গত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রির অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌মট্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুৎবেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গিয়াছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ, দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসব-জাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দ-বৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গারের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে 'সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ!'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে

যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলঙ্কারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্ ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলঙ্কৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আমি বি.এ. পাশ করিয়া চাকরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনোরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ি জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ি বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোটখাটো সস্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড মাস্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে।

স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—ইয়ংবেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে চোর-ডাকাতের ভয়ও তো আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি.এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবার প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগানে অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল। নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী—তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান-রন্ধনের জন্য সেই জল আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপরখানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেইসঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদব্রজে সিউড়ি যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপজপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"সিউড়ি স্কুলে আমার মাস্টারি চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরি, কামাই হওয়াটা বড় খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও-রূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

—"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাস্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।" —বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ি পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে! তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরানি এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরিবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরানি লিখিতেছেন—"তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন—'মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ি রওনা হইয়াছে, পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনো বিষয়ে ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।' সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনোমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এখানেই থাকবি তো? তোর খাবার জোগাড় করি?"

সে বলিল, "আজ্ঞে না, মা ঠাকুরানি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, 'তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে'।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে

দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দু'টা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরানির পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রক্ষাকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয়?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে :

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরানিকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোনো উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনোরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনো বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনো ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনি আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনো কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরানিকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনো পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনোরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

—"তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনো আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোনো বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়া ছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরো কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। এক দিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ি মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এ-পাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোনো প্রকারে শুইয়া

ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন-সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরিবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়া রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইয়া থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু, এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?"

আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম—"হয়তো পথে কোনো ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে?"

গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক, আজ আর কাজ নাই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।

তাহার পর আরো সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনো কোনোরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনো ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তো দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত ও অবিকল সত্য।

সর্বনাশিনী

পাঁচকড়ি দে

তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয় দেখিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে নিতান্তই বলবতী ছিল, তাই আমার চিরসহচর প্রাণের বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমি একদিন দার্জিলিং রওনা হইলাম।

আমরা পথে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়েরই মত যে, রেলে গেলে হিমালয় প্রকৃতভাবে দেখা হইবে না। রেল যেন উড়িয়া যায়, এরূপ অবস্থায় রেলে গমন করিলে হিমালয়ের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য প্রকৃত উপলব্ধি করা কোনো প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য আমরা উভয়েই স্থির করিলাম যে, আমরা শিলিগুড়ি হইতে পদব্রজে দার্জিলিং রওনা হইব।

সকালে শিলিগুড়ি উপস্থিত হইলাম। যতক্ষণ দার্জিলিং-এর সুন্দর ক্ষুদ্র গাড়িগুলি দৃষ্টিপথে রহিল, ততক্ষণ স্টেশনে আমরা তাহার বিচিত্রগতি দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে দুই কুলির মস্তকে আমাদের দুইজনের দুই ট্রাঙ্ক চড়াইয়া দিয়া নিজ নিজ হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া বাজারের দিকে চলিলাম।

পথেই দুই একটি বাঙালির সহিত দেখা হইল। আমরা বাজারেই বাসা লইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা করিতে দিলেন না। জোর করিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। আমরা যাঁহার বাড়িতে উঠিলাম, তিনি এখানে শালকাঠের ব্যবসা করেন।

সেদিন সে রাত্রি আমরা শিলিগুড়িতেই রহিলাম। সকলেই আমাদিগকে বলিলেন, পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইতে ভারি কষ্ট হইবে, বরং গরুর গাড়ি করিয়া যান। আমরা পদব্রজে যাওয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। প্রকাশ্য সদর রাস্তা দিয়া যাইব না, তাহাও স্থির। সে রাস্তায় বহু লোক চলাচল করে, বহু গরুর গাড়ি মাল লইয়া সর্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহারই পার্শ্ব দিয়া রেল গিয়াছে। সুতরাং এ রাস্তায় হিমাচলের গুরুগম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধা হইবে না, সুতরাং আমরা সে পথে প্রাণ থাকিতে যাইব না।

যে পথে পাহাড়িয়াগণ চলা-ফেরা করে, সেই ক্ষুদ্র অপরিসর পথ দিয়া আমরা

যাইব। তবে পাহাড়ের পথ দুর্গম, তাহাতে আমরা পথ চিনি না, সুতরাং আমাদের একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক।

অর্থে কি না হয়? আমাদের নূতন বন্ধুদিগের অনুগ্রহে আমরা তাহাদের বিশ্বাসী একজন মহাবলবান ভুটিয়া পথপ্রদর্শক পাইলাম। সে তাহার তিনজন বিশ্বাসী কুলি সংগ্রহ করিল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে কুলির মস্তকে দ্রব্যাদি দিয়া ভগবানের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রথমে আমাদের অগ্রে—কোমরে দুই খুক্‌রী, হস্তে এক বৃহৎ লগুড়, ভুটিয়া থম্বিমেনা। তৎপশ্চাতে আমরা দুইজন, তৎপশ্চাতে তিনজন কুলি। আমরা মহানন্দা নদীর পোল পার হইয়া মাটিয়াখোলার হাট উত্তীর্ণ হইলাম, তৎপরে নক্সাবারীর পথ ধরিয়া চলিলাম।

পথে এক কাঁইয়ার দোকান পাইয়া তথায় রন্ধন ও ভোজনকার্য সারিয়া লইলাম। এই দুর্গম জঙ্গলেও মাড়োয়ারি মহাত্মাদিগের অভাব নাই, মধ্যে মধ্যেই দোকান, দোকানে প্রায় সর্বদ্রব্যই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইলাম। আমাদের হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য বর্ণনা করিবার এখানে উদ্দেশ্য নহে, নতুবা আমরা এই রূপের শেখর শ্রীযুত হিমালয় মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইতাম। সুতরাং আমরা এ কথার উত্থাপন করিব না।

এই হিমালয়ে এমন প্রায়ই ঘটে যে কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ কুয়াশা উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইয়া যায়। তখন আর কিছুই দেখা যায় না—অতি কষ্টে, অতি সাবধানে পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, তাহা অতি দুর্গম,—একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, পড়িলে সহস্রহস্ত নিম্নে আসীন হইতে হয়। একজনের অধিক দুইজনে পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই। অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়া কষ্টে উঠিতে হয়। অতিকষ্টে কুয়াশার অন্ধকার ঠেলিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এ দিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়—দারুণ প্রবল শীত, তাহার উপর বৃষ্টি। হিমালয়ে এই বৃষ্টি না থাকিলে বোধ হয় ইহাই ইন্দ্রের অমরাবতী ও নন্দনকানন হইত। একটা মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই আমরা তথায় আজিকার মতো বিশ্রাম করি। নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কুয়াশার ভিতর দিয়া কোন্ দিকে যাইতেছি তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিতেছিল যে, নিকটেই কাঁইয়ার দোকান ও বস্তি আছে। কিন্তু আমরা এক ঘণ্টা কষ্টে চলিয়াও কোনো পল্লী পাইলাম না।

হিমালয়ের সন্ধ্যা আমাদের দেশের মতো সহজ রকমের হয় না। সন্ধ্যা বলিয়া কোনো ব্যাপার এখানে নাই। সহসা না বলিয়া কহিয়া অবাধ্য মেয়ের মতো যেন একেবারে তিমিরবসনা নিশা হিমালয়কে নিজের কৃষ্ণাঞ্চলে ঢাকিয়া দেয়। আজ ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অনুভব করিলাম, সহসা চারিদিক ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। আর কিছু দেখিবার উপায় নাই।

আমাদের পথপ্রদর্শক উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে চলিল, আমরা তাহার গলার স্বর অনুসরণ করিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিলাম। একটু পা পিছলাইলেই গিয়াছি

আর কি—ভয়াবহ মৃত্যু। এখন আমরা বুঝিলাম, আমাদের শিলিগুড়ির বন্ধুগণ হিতবাদী বটেন। কিন্তু—মরণকালেতে রোগী ঔষধ না খায়—গতানুশোচনায় আর ফল কি?

সহসা পথপ্রদর্শক দাঁড়াইল, আমরাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন বুঝিলাম, সে নিজেই অন্ধকারে পথ হারাইয়াছে—গ্রামের পথে না গিয়া অন্য পথে আসিয়াছে, দুর্গম পাহাড়ের দুর্গমতম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—কোন্‌দিকে কোথায় যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। সে নিজে এ কথা স্বীকার না করিলেও তাহার গলার স্বরে আমাদের বেশ উপলব্ধি হইতেছিল।

তখন আমাদের হৃদয়ের ভিতর হৃদয় বসিয়া গেল। বুঝিলাম, রাত্রে এই পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলমধ্যেই আজ রাত্রি কাটাইতে হইবে। তাহাতে বড় কিছু যায় আসে না—তবে পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ না হইলেই এক্ষণে ভগবানের অসীম দয়া।

থম্বিমেনা বলিল, "ফিরিয়া এই পথে একটু নামিয়া গেলেই একটা বস্তি পাইব।"

অগত্যা তাহাই করা শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমরা ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক পদ যাইবামাত্র আমি একটা গড়ানে স্থানে আসিলাম। তাহার পর কি হইল, ঠিক মনে নাই। আমি গড়াইতে গড়াইতে কতদূর চলিলাম, তাহাও মনে নাই। এইমাত্র বুঝিলাম আমার লম্বা কোট দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্রও ঠিক আমার গতি অনুসরণ করিয়া আমার অনুসরণ করিতেছে। শব্দে বুঝিলাম, গুণবন্ত থম্বিমেনারও সেইরূপ দশা,—গড়াইয়া আসিতেছে।

সহসা কিসে লাগিয়া আমাদের অধঃপতনের গতি বন্ধ হইল। স্পর্শে বুঝিলাম কি একটা কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যে আমাদের বেগ নিরোধ হইয়াছে। পকেটে দেশলাই ও বাতি ছিল, জ্বালিলাম।

সেই অন্ধকারে দীপালোকেও ভালো দেখা যায় না।

আলোটা উচ্চে তুলিয়া দেখিলাম, সেটা একখানা কাষ্ঠনির্মিত ঘর। আমরা তিনজনেই সেই গৃহের কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীরপার্শ্বে পতিত। আমরা কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যাহা হউক, প্রাণটা যে বাজে খরচ হয় নাই, ইহাই ভালো! সম্ভবত আশ্রয়ও মিলিবে। এ গৃহে যেই থাকুক না কেন, এ অবস্থায় আশ্রয় দিতে কখনো অসম্মত হইবে না। আমরা আলো ধরিয়া ধরিয়া গৃহের দ্বারে আসিলাম। দরজা বন্ধ।

আমি দরজায় করাঘাত করিলাম—কেহ উত্তর দিল না। এবার আমি আরো বেশিরকম শব্দ করিয়া সবলে করাঘাত করিলাম, তবুও কেহ উত্তর দিল না। তখন আমি দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলাম, কড় কড় শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে বাহির হইতেও অন্ধকার।

আমি আলো লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম—প্রবোধ ও থম্বিমেনা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু তৎপরে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিল। থম্বিমেনা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, তৎপরে ছুটিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আমরা উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকার হইতে কেবল একটি ভীতিব্যঞ্জক আর্তরব আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, আমরা কেবলমাত্র সেই শব্দের এইমাত্র বুঝিলাম

"শয়তান কা ঔরত।"

প্রবোধ বলিল, "বোধ হয় এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই বাড়িতে ভূত আছে—পাহাড়িমাত্রেই ভূত বড় বিশ্বাস করে। যাহাই হউক, খাদে পড়িয়া যে আজ প্রাণটা

যায় নাই, এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। শীতে বুক গুর্-গুর্ করিতেছে। এ আশ্রয়ও ভগবান মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালা যাক। আলো দেখিলে কুলি দুইটা আর গুণবন্ত থম্বিমেনা প্রাণের দায়ে এখানে আবার ফিরিয়া আসিতে পথ পাইবে না।

আমরা বাহিরে আলো লইয়া কতকগুলা শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিলাম, তৎপরে তাহা জ্বালাইয়া গৃহমধ্যে আগুন করিলাম। আগুনে হাত সেঁকিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদের ব্যাগে সর্বদাই আমরা কিছু না কিছু আহার্য রাখিতাম। প্রবোধ তাহাই বাহির করিয়া প্রবলবেগে ভোজন আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, ''আগে ঘরটা ভালো করিয়া দেখা যাক্।''

প্রবোধ বলিল, ''আগে প্রাণে বাঁচলে তো আর সব, ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এই পাহাড়ে শীতে আর এই পাহাড়ে রাস্তায় যেন ক্ষুধা হাজার গুণ বাড়িয়া উঠে।'' অগত্যা আমরা উভয়ে সেই আগুনের পাশে বসিয়া কিছু আহার করিয়া লইলাম।

আহার শেষ হইলে উভয়ে বাতি লইয়া ঘরটি ভালো করিয়া দেখিতে চলিলাম, একটি ঘর নহে, পাশাপাশি দুইটি ঘর। গৃহমধ্যে নানাবিধ তৈজসপত্র পড়িয়া আছে। দেখিলেই বোধ হয়, শেষে যাহারা এই বাড়িতে ছিল, তাহারা যে কারণেই হউক, হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেক জিনিসপত্র পড়িয়া আছে, লইয়া যাইবার সময় হয় নাই—তাড়াতাড়ি যে চলিয়া গিয়াছে, এই ঘরের অবস্থা দেখিলে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

একটা বাক্সও ঘরের কোণে পড়িয়া আছে।—দেখিলাম, ডালা খোলা। তুলিয়া দেখি, তাহার ভিতর অনেকগুলি নানা তারিখের বাংলা চিঠি রহিয়াছে।

এই দুর্গম স্থানে এই নির্জন বাড়িতে তাহা হইলে পূর্বে কোনো বাঙালি বাস করিয়াছিল। কে সে? এত স্থান হইতে এখানে আসিয়াছিল কেন? দারুণ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমরা বাতিটি সেই বাক্সের উপর রাখিয়া পত্রগুলি একে একে পাঠ করিতে লাগিলাম। যখন সর্বশেষ পত্রখানির পাঠ শেষ হইল, তখন নিম্ন হইতে সেই অন্ধকার আলোড়িত করিয়া এক হৃদয়বিদারক উচ্চ আর্তনাদ উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এই ভয়াবহ শব্দ আমাদের কানে আসিতে লাগিল। ইহা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা না কোনো মানুষের আর্তনাদ, তাহা কেবল ভগবান বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি সেই গৃহমধ্যে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম, ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিতে সাহস করিলাম না।

যে সকল পত্র আমরা পাঠ করিলাম, তাহার প্রথমখানি এই—

প্রথম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

কলিকাতার সেই সোরগোল অশান্তির মধ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন পাহাড়মধ্যে এই স্থানে আমি যে কি শান্তি অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আর লোকালয়ে থাকিব না। লোকালয়ে থাকিলে আর আরাম হইতে পারিব না, এইজন্য এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইয়াছি। আমার মস্তিষ্কও যেরূপ উষ্ণ হইয়াছিল—তাহা আর নাই,

আমি এখন শান্তচিত্তে চিন্তা করিতে পারিতেছি। আর এই স্থানের ন্যায় চিন্তা করিবার স্থান দ্বিতীয় আর কোথায়?

আমার এই বাড়ি পর্বতের মাঝামাঝি স্থাপিত, পশ্চাতে স্তরে স্তরে পর্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, সম্মুখে একটু আগে একেবারে মহাখাদ, দুই সহস্র হাত নিম্নে একটি নদী রজতসূত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এ বাড়িখানিতে দুইটি মাত্র ঘর। ঘর বলিতে চাও, আর যাহা বলিতে চাও, তাহাই ইহাকে বলা যায়। কতকগুলি শালকাঠ জোড়া দিয়া প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে—চালও ঐ শালকাঠ জোড়া। এখানে শালকাঠের অভাব নাই, চারিদিকেই শালকাঠ—কাটিয়া লইলেই হইল। আমার সঙ্গে চাকর-বাকর নাই, চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটা ভুটিয়া বস্তি আছে, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন সকালে রওনা হইয়া আমার দরকারমতো দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরি।

সময় কাটাইবার জন্য একখানা খুব বড় উপন্যাস লিখিতেছি। বোধ হয় তাহাতেই আমি জগদ্বিখ্যাত হইব।

আমি একজন লোক পাইয়াছি। রাত্রে সে কিছুতেই এ বাড়িতে থাকিতে চাহে না। তা না থাকুক ক্ষতি নাই। দিনেই সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং আমার স্ত্রীকে আর পূর্বের ন্যায় খাটিতে হইতেছে না।

এই নির্জন দুর্গম স্থানে থাকিতে সে সম্পূর্ণ নারাজ হইয়াছিল। আমিই বুঝাইয়া রাখিয়াছি, লোকালয়ে থাকিলে আমার রোগ আরাম হইবার আশা নাই। এই কথা বলায় সে সম্মত হইয়াছে।

রাত্রে সে পার্শ্বের ঘরে নিদ্রা যায়—আমি সম্মুখের ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই প্রকাণ্ড উপন্যাসখানা লিখি।

তোমার মন্মথ।

দ্বিতীয় পত্র

(দ্বিতীয়পত্রে কেবল সেই উপন্যাসের কথা এবং সেই উপন্যাসের প্রশংসার ভাগই অধিক।)

তৃতীয় পত্র

প্রিয় সুরেশ,

তোমাকে দুইখানা পত্র লিখিয়াছি, এইখানা লইয়া তিনখানা হইবে, কিন্তু কোনোখানাই এখনো ডাকে দিতে পারি নাই। ডাকঘর প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। পত্র তিনখানা ডাকে দিবার জন্য এখনো কোনো লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার একটা গুরুতর কারণ আছে। সহজে এ বাড়ির নিকট কেহ আসিতে চাহে না, অধিক পয়সা দিতে চাহিলেও না। আগে ইহার কারণ জানিতে পারি নাই, একদিন এক বৃদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বৃদ্ধ আমাকে এ রহস্যের বর্ণনা করিল। ব্যাপার এই—

সোহো বলিয়া একটা লোক এই কুটির নির্মাণ করে। সে ভুটিয়াদিগের মধ্যে একজন কবি বলিয়া গণ্য ছিল। সে নির্জনে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াই এই দুর্গমস্থানে এই কুটির নির্মাণ করিয়াছিল। এখানে সে নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বাস করিত।

সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিকটস্থ এক ব্যক্তির একটি

ভুটিয়া যুবতী সেই নিভৃত-নিবাসী কবির প্রেমে পড়িল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কুটিরে দুইটি ঘর। যখন গভীর রাত্রে পার্শ্বের গৃহে সোহোর যুবতী স্ত্রী নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে এই যুবতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া মৃদুমন্দকণ্ঠে প্রেমালাপ করিত।

একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রী সমস্তই জানিতে পারিল, কিন্তু কোনো কথা কহিল না।

এই যুবতীকে এই কুটিরে আসিতে হইলে একটা কাঠের সাঁকো পার হইয়া আসিতে হইত। এই সাঁকোর প্রায় পাঁচশত হাত নিম্নে এক ঝরনা বা ঝোরা। প্রবলবেগে সেই ঝরনা দিয়া জল পড়িত বলিয়া ভুটিয়ারা ইহার নাম "পাগলা ঝোরা" রাখিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে এই ঝরনার উপরের সাঁকো দিয়া সেই যুবতী যাতায়াত করিত।

একদিন সোহো গৃহে না থাকায় তাহার স্ত্রী সুবিধা পাইয়া সেই সাঁকোর কাঠ একদিন টাঙ্গি দিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। এমন সামান্যমাত্র সাঁকোর কাঠ পাহাড়ে সংলগ্ন রহিল যে, মনুষ্যভার পড়িলেই তাহা নিশ্চিত পতিত হইবে।

তাহাই ঘটিল। সে রাত্রে, পূর্বের ন্যায় সোহো প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করিতেছে, সহসা তাহার কর্ণে এক মর্মভেদী আর্তনাদ প্রবেশ করিল। তাহার পরই প্রকাণ্ড কাঠ ও পাথরের শব্দ আসিল, তাহার প্রণয়িনী পাঁচ শত হস্ত নিম্নে পাগলা ঝোরায় বিসর্জিত হইয়াছে।

কে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সোহোর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইহার ফলে একদিন সোহো ও তাহার স্ত্রী উভয়েই গভীর খাদে পতিত হইল।

সোহো তাহার স্ত্রীর গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ভুটিয়া স্ত্রীলোকদিগের দেহে অসীম বল, সোহোর স্ত্রী তাহাকে টানিতে টানিতে খাদের নিকট লইয়া আইসে, তথাপি সোহো তাহার গলা হইতে হাত অপসারিত করিল না। তাহার স্ত্রীর চক্ষু কপালে উঠিল, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে তাহার স্বামীকে ছাড়িল না। উভয়েই দুই সহস্র হাত নিম্নে গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

এতদূর বলিয়া বৃদ্ধ ভুটিয়া বলিল, 'সেই পর্যন্ত সোহোর প্রণয়িনী সোহোর বাড়িতে প্রেত হইয়া আইসে। ভিতরে আলো দেখিলে সে দরজায় আঘাত করে। তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। অনেকে এই বাড়িতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু এ বাড়িতে যে বাস করে তাহারই মৃত্যু হয়।'

এইজন্যই এই সোহো-প্রণয়িনীর ভূতের জন্য কেহ সাহস করিয়া এখানে আসে না। আমার দ্রব্যাদি হাট হইতে আমাকেই নিজে আনিতে হয়, এই জন্যই এ পর্যন্ত পত্র ডাকে পাঠাইতে পারি নাই।

তোমার মন্মথ।

চতুর্থ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

দেশে হইলে এ কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। বোধ হয় অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই একথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এই নির্জন দুর্গম স্থানে ভূতের কথা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

রাত্রে—অনেক রাত্রি পর্যন্ত—বসিয়া আমার সেই বিরাট উপন্যাসখানা আমি প্রত্যহ লিখিয়া থাকি, কিন্তু বৃদ্ধ ভুটিয়ার নিকট এই কথা শোনা পর্যন্ত রাত্রে আমার লেখা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি শুনিলে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, কিন্তু সত্য গোপন করাও

ঠিক নহে, প্রকৃতই সেই দিন হইতে রাত্রে লিখিতে লিখিতে মধ্যে মধ্যে লেখা বন্ধ করিয়া আমি কান পাতিয়া শুনিতাম, দরজায় কেহ ঘা মারিতেছে কিনা। যথার্থ-ই কি আমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইহারই মধ্যে যেন সোহো-প্রণয়িনী আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে! হাসিও না, এই নির্জন দুর্গম লোকশূন্য স্থানে সকলই সম্ভব। তোমার সেখানে যাহা হাস্যজনক, এখানে তাহা ভীতিপ্রদ।

কাল যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমারও যে বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, মাথা খারাপ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমারই নিজের বিশ্বাস হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে আমি কুটিরের বাহিরে বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভগ্ন সাঁকোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। উঁকি মারিয়া সাঁকোটার নিম্নস্থ পাগলা ঝোরা দেখিতেছিলাম, সহসা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, দূরে সুন্দর বনফুলে সজ্জিত একটি পাহাড়িয়া যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তখন চারিদিক ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। এখানে এ কুটিরের এত নিকটে এ-পর্যন্ত আমি কোনো স্ত্রীলোক বা পুরুষ জনপ্রাণী দেখিতে পাই নাই। এখান হইতে লোকালয় দুই ক্রোশের নিকটে নহে। রাত্রে এই দুর্গম পথ দিয়া কাহারও গমন করা সম্ভব নহে।

তবে এ তরুণী কে? এ এখনো এখানে কেন? আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কণ্ঠ পরিষ্কারের অব্যক্ত শব্দ করিলাম, তথাপি সে নড়িল না। আমি ডাকিলাম, তবুও সে নড়িল না। এই দুর্গম পর্বতে আমার গলার শব্দ তাহার নিকট পৌঁছিতেছে না ভাবিয়া, আমি তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিলাম। তখন সে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।—আমি গৃহের দিকে ফিরিলাম, আমার শিরায় শিরায় যেন কে বরফের প্রবাহ ছাড়িয়া দিল। কেন আমার এ ভাব হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি মনুষ্য নহে,—এই কি সেই সোহো-প্রণয়িনী?

তোমার মন্মথ।

পঞ্চম পত্র

(পূর্বোক্ত পত্রের এগার দিন পরে লিখিত।)

প্রিয় সুরেশ,

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সে আসিয়াছে। আমি যেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে পর্বত-মধ্যে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলাম সে নিশ্চয়ই একদিন আসিবে।

কাল রাত্রে সে আসিয়াছে। আমরা উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ বসিয়াছিলাম।

তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, আমি উন্মত্ত হইয়াছি—আমার রোগ সারে নাই, এখনো সেই জ্বর আছে, তাই সে জ্বরের প্রকোপে বিকৃতমস্তিষ্কে কল্পনায় আমি প্রেতাত্মা দেখিতেছি।

তুমি বলিবে কেন, আমি নিজেকেই নিজে এ কথা অনেকবার বলিয়াছি, এ সকল সত্য ও সে আসিয়াছে। কি সে? রক্তমাংসের দেহধারিণী নারীমূর্তি অথবা আকাশের প্রাণী—বায়ুমূর্তি—আমার কল্পনার সৃষ্টি? যাহাই হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। আমার নিকট ইহা কল্পনা নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, মিথ্যা নহে। সত্য—অতি সত্য।

গত রাত্রে সে আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে নিদ্রিতা, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত সম্মুখের ঘরে বসিয়া সেই উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। ওই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রত্যহ রাত্রে আমি ইহার প্রতীক্ষা করিয়াছি—দ্বারে তাহার মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়াছি, ইহার আশায় প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইয়াছি। এখন আমি আমার মনের এ অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আমি সাঁকোর উপর ইহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি, তিনবার দরজায় আঘাত সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি—তিনবার মাত্র।

ইহাতে আমার কঙ্কালের ভিতর যেন তীক্ষ্ণ তুষারধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মস্তিষ্কে একরূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমি সবলে আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছি, তবুও সেই শব্দ, সেই দ্বারে আঘাত—তিনবার মাত্র। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিয়াছি।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধীরে ধীরে গিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম—দ্বারে শিকল টানিয়া দিলাম। তৎপরে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আবার সেই শব্দ—সেই দ্বারে আঘাত, তিনবার—তিনবার মাত্র।

তখন আমি গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলাম—অতিশীতল বায়ু প্রবলবেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার কাগজপত্র কতক উল্টাইয়া, কতক গৃহতলে ছড়াইয়া দিল। রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, আমি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

সে তাহার মস্তক হইতে শাল সরাইয়া স্কন্ধে ফেলিল, কণ্ঠদেশ হইতে একখানা রঙ্গীন রুমাল খুলিয়া পার্শ্বে রাখিল, তাহার পর আমার সম্মুখে আগুনের কাছে আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, তাহার উন্মুক্ত পা দুখানি তখনো শিশিরসিক্ত রহিয়াছে। আমি তাহার সম্মুখে বসিলাম, বিস্ফারিত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিল—সে হাসি মধুর, অথচ বিস্ময়কর, যেন ধূর্ততা শঠতা তাহাতে মাখা। সেই হাসিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি তাহাকে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত—সর্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত।

সে কথা কহিল না, নড়িলও না। আমি তাহার কথা শুনিবার কোনো আবশ্যকতা মনে করিলাম না। সেই বিলোল চোখ, সেই চপল দৃষ্টি, তাহাই যেন আমার সহিত কত প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি—তাহার চক্ষু আমার চক্ষুর সহিত—আমার চক্ষু তাহার চক্ষুর সহিত পরস্পর সম্মিলিত—সে আনন্দ সে সুখ—সে যে কি, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আমি কতক্ষণ এইরূপভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সহসা সে নিজের বুকের কাছে একটা হাত তুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। তখনি পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটা অতি মৃদু শব্দ কানে আসিল। অমনি সেই অপরিচিতা বামা সত্বর সেই শালখানা তাহার মাথায় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে অতি দ্রুতপদে দরজা খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

আমি ভিতরের ঘরের শিকল খুলিয়া কান পাতিয়া শুনিলাম, কোনো শব্দ নাই। তখন আমি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। তাহার পর বোধ হয়, সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র আমার মনে হইল যে, রমণী রাত্রে রুমালখানি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার চলিয়া যাইবার পরও আমি তথায় রুমালখানি দেখিয়াছিলাম। তাই ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র সেখানা লুকাইয়া রাখিব বলিয়া সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রুমাল তথায় নাই।—আমার স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিয়া সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, আমার চা-এর জল গরম করিতেছে। সে আমার দিকে দুই এক বার চাহিল—আমি তাহাকে এমন করিয়া চাহিতে আর কখনো দেখি নাই। কিন্তু সে কোনো কথা কহিল না—রুমালের কথাও কিছু বলিল না।

তাহাতেই আমার মনে হইল যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র। কাল রাত্রে যাহা সত্য ভাবিয়াছিলাম, তাহা আর কিছু নহে, স্বপ্নমাত্র। কিন্তু অপরাহ্ণে আমি একবার বাহির হইতে দেখিলাম, আমার স্ত্রী সেই রুমালখানি হাতে লইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতেছে। তাহার মুখ অপরদিকে ছিল, সুতরাং সে আমাকে দেখিতে পাইল না।—আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রুমালখানা দেখিতেছে।

আমি কতবার মনে করিলাম যে, রুমালখানা আমার স্ত্রীরই। কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই আমার কল্পনা—স্বপ্ন মাত্র। আর তাহা যদি না হয়, তবে কাল রাত্রে যে আসিয়াছিল, সে প্রেতাত্মা নহে—প্রকৃতই কোনো স্ত্রীলোক।

কিন্তু মানুষ মানুষে চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে। কাল রাত্রে যে আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সে রক্তমাংসের কোনো জীব নহে—ইহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

সম্ভবত সে কোনো স্ত্রীলোক হইতে পারে। এখান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে কোনো বস্তি বা লোকালয় নাই। দিনেই এই পার্বত্যপথে চলা-ফেরা বিপজ্জনক—রাত্রে অসম্ভব। কোন্ স্ত্রীলোক অন্ধকার রাত্রে এই ভয়াবহ কঠিন পর্বত পথে আসিতে সাহস করিবে? তাহাতে ঘোর অন্ধকার, দারুণ শীত—কোনো স্ত্রীলোকের এই দুর্গম স্থানে, এ কুটিরে আগমন একেবারেই অসম্ভব।

আরো কারণ—কোনো স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে শিরায় শিরায় অস্থিমজ্জায় গলিত তুষারস্রোত প্রবাহিত হয়?

যাহাই হউক, সে যেই হউক, সে যদি একবার আসে, তাহা হইলে তাহার সহিত কথা কহিব। আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিব। তাহা হইলেই দেখিতে পাইব সে রক্তমাংসের জীব, না বায়ু—কেবল কল্পনা, কেবল শূন্য, একটা ছায়ামাত্র।

তোমার মন্মথ।

ষষ্ঠ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

এই সকল পত্র কখনো যে তুমি পাইবে, সে আশা আমার নাই। আমি এখান হইতে এ সকল চিঠি তোমাকে পাঠাইব না। তোমার নিকট এ সকল পাগলের পাগলামি, উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। যদি কখনো দেশে ফিরি, তাহা হইলে হয়তো কোনোদিন-না-কোনোদিন এই সকল পত্র তোমায় দেখাইতে পারি, তাহাও শীঘ্র নহে। যখন আসিয়া এইসব লইয়া হাস্যবিদ্রূপ করিতে পারিব, কেবল সেই সময়েই তোমায় এ সকল পত্র দেখাইব। এখন আমি এগুলি লিখিতেছি, আমার মনের যাতনায়। এগুলি এইরূপে না লিখিলে হয়তো আমাকে চিৎকার করিয়া মনের যাতনা লাঘব করিতে হইত।

সে প্রত্যহ রাত্রে আসে, সেইরকম আগুনের কাছে বসে, সেইরকম আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টিবিন্যাস করে—সেই কুহকিনী মৃদুমধুর হাসি হাসে—আমার মস্তিষ্ক ঘোরতররূপে বিচঞ্চল হইয়া উঠে, আমি আত্মহারা হই—আমার অস্তিত্ব যেন তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়।

এখন আমার লেখা সম্পূর্ণ-ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—লিখিবার চেষ্টাও করি না। আমি সাঁকোর উপর তাহার শুভাগমনের পদশব্দ—ঘাসের উপর পদশব্দ—দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া থাকি।

সে আসিলে সেই ভাব—আমি আর কথা কহিতে পারি না—আমি আর আমাতে থাকি না—কোনো কথাই আর মনে হয় না—সেও কোনো কথা কহে না, কেবল সেইরূপভাবে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ হাসি হাসে।

প্রত্যহ আমি মনে করি, আজ সে আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা কহিব, নিশ্চয়ই তাহাকে স্পর্শ করিব। কিন্তু সে আসিবামাত্র আমি সকলই ভুলিয়া যাই, আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কাল রাত্রে যখন আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমার মন তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি পার্শ্ববর্তী কক্ষের গবাক্ষের দিকে চাহিলাম, চাহিবামাত্র বোধ হইল, কে জানালা হইতে সহসা মুখ সরাইয়া লইল। এদিকে নিমেষমধ্যে সে শাল মস্তকে টানিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি আলো লইয়া পার্শ্বের গৃহে গেলাম। দেখিলাম আমার স্ত্রী নিদ্রিতা রহিয়াছে।

তোমার মন্মথ।

সপ্তম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

রাত্রির জন্য আমি ভীত নহি, দিনের জন্যই ভীত। যে স্ত্রীলোককে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া আসিতেছি, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত এখন ঘৃণা করি। সে ঘৃণার ইয়ত্তা নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। তাহার যত্ন শ্রদ্ধা সোহাগ সমস্তই এখন বিষবৎ বোধ হয়। কি জানি, কেন তাহার চোখের দিকে চাহিলে আমি শিহরিয়া উঠি।

সে সকলই দেখিয়াছে, সকলই জানিতে পারিয়াছে, আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি।
—তাহাই কি?

অথচ সে আমাকে এখনো ভালোবাসে, যত্ন পূর্ব্ববৎ, অনুরাগ পূর্ব্ববৎ—ভক্তি পূর্ব্ববৎ। তথাপি আমার মনে হইতেছে সমস্ত জাল, সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই ছলনা, প্রতারণা—আমরা পরস্পরে প্রণয় ভালোবাসা জানাইতেছি—অথচ সব জাল, সব মিথ্যা, সব ছলনা। আমি জানি—সে সব দেখিয়াছে, সব জানিয়াছে, তাহার চোখ আমাকে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে। আমি জানি, সে কেন এই ভীষণ প্রতিহিংসার আয়োজন করিতেছে।

তোমার মন্মথ।

অষ্টম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

আজ সকালে হাটে যাইব বলিয়া আমি বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়াইয়া

রহিল, ক্রমে আমি তাহার দূরবর্তী হইতে লাগিলাম। পরে একবার চাহিয়া দেখি, দূর হইতে আমার স্ত্রীকে একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় দেখাইতেছে। অবশেষে পর্বত বেষ্টন করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আমি উঠিতে উঠিতে পড়িতে পড়িতে মহাবেগে ছুটিয়া অন্য পথ দিয়া গৃহের দিকে আসিতে লাগিলাম। পার্বত্যপথ সহজ নহে, কত উঠিয়া পড়িয়া তবে অন্যদিক দিয়া আমার গৃহের নিকট আসিলাম। তথায় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার গৃহপ্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিলাম।

কিয়ৎক্ষণে পরে দেখিলাম, আমার স্ত্রী এক টাঙ্গি লইয়া কাঠের সাঁকোর নিকট আসিল। আমি যেখানে ছিলাম, তথা হইতে, সে কি করিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই দূর হইতেও আমি তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু মনে হইল, সে হাসির ভিতরে প্রতিহিংসার বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে।

সে গৃহে চলিয়া গেলে আমি আবার হাটের দিকে চলিলাম। হাট হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম, সে আমাকে পূর্বের ন্যায় সমাদরে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

আমি যে তাহার ভয়াবহ কার্য দেখিয়াছি, তাহা ঘুণাক্ষরে তাহাকে জানিতে দিলাম না। তাহার শয়তানী কার্য ঐরূপই থাক। সে ভাবিয়াছে, কোনো স্ত্রীলোক রাত্রে সাঁকো পার হইয়া আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসে, তাই সে সাঁকো কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। আজ সে আসিলে অতল খাদ-নিম্নে পতিত হইয়া যাইবে।

আমি কিছু বলিলাম না। ইহাতে আজ সপ্রমাণ হইবে যে প্রত্যহ রাত্রে আমার কাছে যে আসে—সে কে। যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে ভগ্নপ্রায় সেতুতে তাহার কোনো অনিষ্ট ঘটিবে না, আর যদি সে প্রকৃতই কোনো স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে—

আমি এ চিন্তা প্রাণ হইতে দূর করিলাম। ভাবিতেও আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

যদি প্রকৃতই মানবী হয়, তাহা হইলে কথা না কহিয়া কেবলই আমার দিকে চাহিয়া থাকে কেন? আমিই বা কেন তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? কেন তাহার সম্মুখে আমার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়? নিশ্চয়ই মানবী নহে। আমার স্ত্রী তাহার কোনো অনিষ্টই করিতে পারিবে না। হতভাগিনী প্রতিহিংসার এই ব্যর্থ চেষ্টায় আরো জ্বলিয়া অস্থির হইবে।—বেশ হইবে।

কিন্তু যদি সে প্রেতলোকবাসিনীই হইবে, তবে আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই কেন? কেনই বা তাহার পায়ে স্পষ্ট শিশিরের দাগ দেখিতে পাই—কেনই বা তাহার দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিতে পাই? এ সকল তো প্রেতের চিহ্ন নহে।

রাত্রি হইয়াছে, পূর্বের ন্যায় পার্শ্বের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমাইতেছে। আমি একান্তমনে গৃহে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদশব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে সে পূর্বের ন্যায় আমার কাছে আসিবে, আর যদি সে যথার্থ-ই কোনো স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাঁকো হইতে পড়িবার সময়ে আর্তনাদ শুনিতে পাইব। অথবা কোনো প্রেতাত্মালোকের অজানিত কুহকজালে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে! সহসা একি—একি এ প্রেতাত্মার বিদ্রূপ!

আমি শুনিয়াছি—আমি সেই ভয়াবহ আর্তনাদ এইমাত্র শুনিয়াছি, হৃদয়ভেদী—গগনভেদী আর্তনাদ আমি শুনিয়াছি।

আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া, অন্ধকাররাশি আলোড়িত করিয়া সেই ভয়ানক আর্তনাদ সাঁকোর নিকট হইতে উত্থিত হইল, সেই গভীর খাদ-মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে আর্তনাদের বর্ণনা নাই—সে আর্তনাদ এখনো আমার কর্ণপথ দিয়া আমার শিরায় শিরায় শোণিতের সহিত ছুটিতেছে।

আমি গৃহ হইতে সবেগে বাহির হইলাম। সাঁকোর নিকটে আসিলাম। শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, সাঁকো আর নাই।

নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর অন্ধকার—সেই গভীর গহ্বর ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ—কিছু দেখিবার উপায় নাই!

প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিলাম। সেই প্রবল বাতাসে আমার উচ্চ প্রবল চিৎকার যেন পৈশাচিক হাস্যকল্লোলের ন্যায় দিগ্বলয় কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি বুঝিতেছি। এতদিন যে উন্মত্ততা ধীরে ধীরে আমাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, আর কোনো উপায় নাই—চেষ্টা বৃথা—বৃথা—বৃথা—

আমি কতবার মনে মনে বলিতেছি, এ কেবল আমার বিকৃত অসুস্থ পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র—এ আর্তনাদও আমার কল্পনামাত্র।—না—না—না—ঐ সেই শব্দ! ঐ সেই আর্তনাদ! ঐ সেই মর্মভেদী আর্তনাদ!

প্রতিক্ষণে আমার মস্তিষ্কে কে যেন গুরুভার লোহার হাতুড়ি দিয়া নির্দয় আঘাত করিতেছে। আমি বুঝিয়াছি সে আর আমার কাছে আসিবে না। —এই শেষ!

তোমার মন্মথ।

শেষ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

আমি একটা বড় খামে সমস্ত পত্রগুলি রাখিয়া তোমার ঠিকানা লিখিয়া যাইব। যদি কখনো কেহ এইখানে আসে, তাহা হইলে সে হয়তো তোমাকে এই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারে।

আমার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী—তোমাকে বুঝাইবার জন্য যাহাকে এখনো আমার স্ত্রী বলিতে হইতেছে,—আমরা উভয়ে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকি, কেহ কোনো কথা কহি না। এ এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন।

যখন কথা কহি, তখন এইরূপভাবে কথা কহি, যেন আমাদের উভয়ের এই প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দুই একটা কথা কহি, তাহাও আমাদের পরস্পর মনের ভাব গোপন করিবার জন্য—আমাদের উভয়ের কেহই আর পূর্বের মতো নাই। আমি সর্বদাই তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখিতেছি।—সে ইহা গোপন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি ইহা দেখিতেছি। তাহার চেষ্টা বৃথা!

প্রত্যহ রাত্রে নির্জনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয়, যেন সে পূর্বের ন্যায় দ্বারে আঘাত করিতেছে, আমি সত্বর গিয়া দরজা খুলিয়া দিই, কিন্তু কই, কেহ নাই, কেবল অন্ধকার—সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে বাহিরের কতকটা শীতল বাতাস প্রবেশ করে মাত্র—আর কিছুই না।

এই দুর্গম স্থানে বাস করিয়া আমি দানব হইয়াছি। ভালোবাসা ও ঘৃণা দুইই

ভয়াবহভাবে আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটাইয়াছে, আমার মস্তকে শত চিতানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমার লেখাপড়া, শিক্ষা, সদ্‌গুণ—সমস্ত এই পাহাড়ের বাতাসে যেন আমার হৃদয় হইতে উড়িয়া গিয়াছে! আমি হিংস্র পশু হইয়াছি।

কবে ইহার—এই স্ত্রীলোকের, যে এক সময়ে আমার স্ত্রী ছিল, তাহার কুসুমকোমল কণ্ঠদেশ আমার এই রোগশীর্ণ কঙ্কালসার কঠিন অঙ্গুলি দ্বারা সবলে পেষণ করিব—তাহার চমৎকার চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিবে, তাহার ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইবে—তাহার আরক্ত জিহ্বা লতাইয়া পড়িবে, কবে তাহার গলা ধীরে ধীরে, জোরে জোরে, আরো জোরে টিপিতে থাকিব! দেরি নাই—দেরি নাই—দেরি নাই! তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিতে ঠেলিতে এই কুটির হইতে লইয়া যাইব—এই বন্ধুর কঠিন পাথরের উপর দিয়া লইয়া যাইব—এই খাদের নিকট আনিব। সে বড় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল বটে! এবার হাসির পালা আমার! হো-হো-হো—

আমি জোর করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া যাইব, ধীরে ধীরে আদর করিয়া—এই খাদের ধারে যখন তাহার পায়ের একটিমাত্র অঙ্গুষ্ঠ পাহাড়ে থাকিবে—সে হেলিয়া পড়িবে, তখন আমি তাহার দিকে অবনত হইয়া তাহার আরক্ত অধর চুম্বন করিব।—তাহার পর নিম্নে—নিম্নে—নিম্নে—কুয়াসার মধ্য দিয়া, লতাপাদপগুল্ম ভেদ করিয়া, পশুপক্ষীকে স্তম্ভিত করিয়া—নিম্নে—নিম্নে—গভীরতর নিম্নে—দুইজনে একত্রে যাইব—যাইব—যাইব—যাই—যতক্ষণ না তাহার সহিত মিলিত হই—"

(এই পত্র অসম্পূর্ণ)

এই শেষ পত্র—এই ভয়াবহ পত্র কয়েকখানি পাঠ করিয়া আমি প্রবোধের মুখের দিকে চাহিলাম, সেও আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার মুখে যে ভাব দেখিলাম সে বোধ হয় আমার মুখে তাহাই দেখিল। আমি দেখিলাম, প্রবোধের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা উভয়ে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে সাহস করিলাম না। উভয়েরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল।

সংসারে এই ভয়াবহ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক থম্বিমেনা "শয়তান কা ঔরত" বলিয়া যে ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে, এখন বুঝিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে।

এতদিন ভূতপ্রেতের কথা বিশ্বাস হয় নাই। ভূতপ্রেত হউক বা না হউক, পত্রলেখক মন্মথ এই নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ভূতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই উন্মত্ততায় হতভাগ্য আপনার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, নিজেও মরিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই সকল পত্র।

ভোর হইতে-না-হইতে আমরা সে স্থান হইতে পলাইলাম। রামোচন্দ্র! আর সেখানে এক মিনিট থাকে! বস্তিতে আসিয়া আমাদের দুই কুলি ও থম্বিমেনাকে পাইলাম। আমরা যে সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া এখনো জীবিত আছি, ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা দার্জিলিং পৌঁছিয়া পত্রগুলি সমস্ত কমিশনার সাহেবকে দিলাম। শুনিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞায় এই ভয়াবহ কুটিরটা একদিন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উৎপীড়িতের প্রতিহিংসা

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১

সিপাহী-বিদ্রোহ তখন শেষ হইয়াছে। ইংরেজের প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহিগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের ক্রোধবহ্নি তখনো নির্বাপিত হয় নাই। অস্ত্রধারী সিপাহী দেখিলেই ইংরেজ সৈনিকগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেছে, কিংবা গাছে লটকাইয়া সঙ্গীনের আঘাতে উদর-বিদারণ-পূর্বক নিদারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করিতেছে।

সিপাহী-বিদ্রোহের বিভীষিকা তখনো দূর হয় নাই। এক একদিন এক-একটা নতুন হুজুগ উঠিয়া রণশ্রান্ত ইংরেজ সৈনিকগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সকল হুজুগ হয়তো সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু একদিনের হুজুগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। একদিন সকালে জনরব উঠিল,—ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা আবার জোট বাঁধিতেছে, টুপিওয়ালার গোঁফে আগুন লাগাইয়া দিবে, বেরেলী বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এই জনরব প্রচারের পর একদিন বেরেলীর ইংরেজ-দুর্গ হইতে আধ ডজন বন্দুক চুরি গেল। সকলে বুঝিল, ইহা নিরস্ত্র সিপাহীদিগেরই কাজ।

চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতির আদেশে বেরেলী দুর্গ হইতে দলে দলে অশ্বারোহী সৈন্য বন্দুকচোর সিপাহীদিগের সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু চোর ধরা পড়িল না, তথাপি নির্দোষ ব্যক্তিগণ চৌর্যাভিযোগে দণ্ডিত হইতে লাগিল। যিনি ফরিয়াদী, তিনিই বিচারক, সাক্ষী ইংরেজসৈন্য; অপরাধ সপ্রমাণ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডদান উভয়ই সমান উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতে চুরির হ্রাস হইল না। বন্দুকচুরির সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা চতুর্দিকে সংক্রামিত হইয়া পড়িল, ইংরেজের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। শেষে সেনাপতিগণ মন্ত্রণা করিয়া এক মিলিটারি কমিশন বসাইলেন। তাহার সভ্যসংখ্যা দশজন। কমিশনের সভাপতির প্রতি অপরাধিগণের সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ডদানের ক্ষমতাপ্রদত্ত হইল। এই সভাপতি মহাশয়ের নাম কাপ্তেন থরন্‌টন্‌।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে একদিন অপরাহ্ণে কাপ্তেন থরন্‌টন্‌

অশ্বারোহণে বায়ুসেবনার্থে সেনানিবাস হইতে বহির্গত হইবেন, এমন সময় একজন এডজুটান্ট একখানি আদেশপত্র তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য লইয়া আসিল। মি. থরন্‌টন্‌ অশ্বগতি সংযত করিয়া তাঁহার সহকারী এডজুটান্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

"আবদুল গফুর নামক একজন মুসলমান সিপাহীর কোতলের পরওয়ানা। একজন সারজেন্ট তাহাকে পাহাড়ের উপর গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

"আসামির জবাব কি?"

"কোম্পানির সৈন্য দেখিয়া সে তাহার হাতের বন্দুক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আসামি বলে, সে তাহার ভাই আবদুল আব্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, তাহার কোনো কু-মতলব নাই। আবদুল আব্বাস পাঞ্জাবে সওদাগরী করে, আজ কয়েকদিন এদেশে আসিয়াছে। আসামি আবদুল গফুরের এ কথায় বিশ্বাস করা যায় না। সে সরকারের বন্দুক চুরি করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতেছিল। তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।"—এই বলিয়া এডজুটান্ট নীরব হইল।

"ঠিক কথা। বদমায়েসকে গুলি করিয়া পশুর মতো হত্যা কর।" কাপ্তেন অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই অকম্পিতহস্তে হত্যার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন।

অবিলম্বে এই আদেশ নির্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইল।

২

যাহাদিগের চক্ষুর উপর এই হত্যা ব্যাপার সংশোধিত হইল, তাহাদের মধ্যে আবদুল গফুরের ভ্রাতা আবদুল আব্বাস একজন দর্শক ছিল। নীরবে সে তাহার ভ্রাতার শোচনীয় হত্যা সন্দর্শন করিল। তাহার শোকসন্তাপবিদ্ধ, হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে সবলে বিদলিত করিতে লাগিল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

আবদুল আব্বাস তাহার ভ্রাতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ ধরাতলে পড়িয়া অশ্রুধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে, শিশুপুত্র দুইটি তাহাদের মায়ের কোলের কাছে পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আবদুল দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দানের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। গৃহে একটি পিস্তল ঝুলিতেছিল—পিস্তলটি কিছু পুরাতন ও মরিচা-ধরা। সেই পিস্তলে কাপ্তেনের প্রাণবধের জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ঠিক এই সময়ে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আবদুল গফুরের কুটিরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রাচীন কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার দেহে যুবজনোচিত সামর্থ্য বর্তমান। সন্ন্যাসীর নাম কি, তাহা কেহ জানিত না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি করিত। মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির বলিয়া ডাকিত, হিন্দুরা বলিত—স্বামীজি। কোম্পানির নফরেরা তাঁহাকে কোনো বিদ্রোহপরায়ণ ক্ষত্রিয়রাজার 'পলিটিক্যাল স্পাই' মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু কোনো বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংসারের সুখদুঃখ ও জাতিভেদের গণ্ডীর অনেক ঊর্ধ্বে তিনি বিচরণ করিতেন।

সন্ন্যাসী একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ভূম্যবলুণ্ঠিতা বিধবা ও তাহার রুদ্যমান সন্তানদ্বয়ের দিকে চাহিলেন। তাহার পর আবদুল আব্বাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, প্রতিহিংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছ?"

আবদুল আব্বাস অবিচলিতভাবে বলিল, "যাহারা আমার নিরপরাধ ভ্রাতাকে অবিচারে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের স্বহস্তে বধ করিয়া ভ্রাতৃশোক নিবারণ করিব। প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার।" সে অবিচলিত উৎসাহের সহিত বন্দুক ঘষিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস শান্ত হও। অত্যাচারের দণ্ডবিধানের কর্তা স্বয়ং ভগবান, তোমরা যাহাকে খোদা বল, তিনিই। প্রতিদিন প্রচুর রক্তস্রোত প্রবাহিত, তুমি আর সে স্রোতের বৃদ্ধি করিও না। পরমেশ্বর তাঁহার কাজ করিবেন, অনুতাপে পাপীর হৃদয় দগ্ধ হইবে। রক্তপাত করিয়া আর তুমি তাহার অপেক্ষা কি অধিক দণ্ড বিধান করিবে।"

আবদুল আব্বাস দৃঢ়হস্তে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপন পূর্বক বলিল, "ফকির সাহেব, আপনি হিন্দু তাই হিন্দুর মতো পরামর্শ দিয়াছেন। কাফেরের প্রাণবধেই মুসলমানের পরম পুণ্য, তাহাই মুসলমানের পরম ধর্ম। আমি সেই ধর্ম পালন করিব, আপনি বাধা দিবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, তোমার এই ক্রোধের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের উপর একই ধর্ম আছে তাহা পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমি এই হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিলে কখনো কর্তব্যচ্যুত হইবে না। আমি কাহাকেও কখনো অন্যায় অনুরোধ করি নাই।"

আব্বাস মিঞা বন্দুক হাতে করিয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আমরা সকলে আপনাকে পীরের ন্যায় মান্য করি, কখনো আপনার অবাধ্য হই নাই, আজও হইব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হস্ত শত্রু-শোণিতপাতে বিরত হইবে। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে। কতদিনে এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল প্রদত্ত হইবে?"

সন্ন্যাসী একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেই স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশে নবোদিত তারকার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর দূরবর্তী বনভূমির দিকে চাহিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন, "এক বৎসরের মধ্যে।"

বন্দুকটা যেখানে ঝুলানো ছিল, কক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্বক আবদুল আব্বাস সেখানেই ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

৩

রাত্রি আটটা। কাপ্তেন থরন্টন্ তাঁহার শয়নগৃহের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার মন আজ চিন্তাপূর্ণ। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইয়াছে, এই যে তিনি ক্ষমতাদর্পে স্তব্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত মনুষ্যবধের আদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত বা বৈধ হইতেছে, তাহা কি কোনোদিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কতকগুলি অসহায় দুর্বল মনুষ্যকে ধরিয়া তিনি তাহাদিগের বধের আদেশ দান করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের কতটুকু অপরাধ

আছে, তাহারা সত্যই অপরাধী কিনা, তাহার কি কোনোদিন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তিনি তাঁহার এই ব্যবহারে বৃটিশ রাজমহিমাই যে কলঙ্কিত করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত অবজ্ঞাত করিতেছেন।—এ সকল চিন্তা আজ প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তিনি মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা, কিছু কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

একজন দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিক যুবা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে মিলিটারি প্রথায় কাপ্তেন সাহেবকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে গালামোহর করা নীলবর্ণের লেফাফা-মোড়া একখানা পত্র প্রদান করিল। কাপ্তেন থরন্টন্ যদি সে সময় একবার তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাহার মুখ মলিন ভীতি-বিস্ময়সমাকুল, তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বলন্ত গোলা অগ্নিস্রোতের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেও তাহার মনের ভাব হয়তো এরূপ হইত না, আজ সহসা তাহার এ ভাব কেন?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যপাতমাত্র না করিয়া মি. থরন্টন্ লেফাফার গালা-মোহর ভাঙিয়া পত্রখানি টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, নীলবর্ণের চিঠির কাগজে ইংরাজিতে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিত।

"১৮৫৮ সালের ১৭ই জুলাই আবদুল গফুর নিহত হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই কাপ্তেন থরন্টন্‌কে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এক বৎসর মাত্র বিলম্ব।"

পত্রের নীচে একটা স্বাক্ষর, অতি অস্পষ্ট স্বাক্ষর। তাহা কাহার হস্তাক্ষর, কাপ্তেন সাহেব বহু চেষ্টাতেও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

কাপ্তেন থরন্টন্ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রবাহী পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই পত্র আনিয়াছে?"

"আবদুল গফুর, একজন মুসলমান সিপাহী।"—ভগ্নস্বরে পদাতিক এই উত্তর দিল।

"অসম্ভব। আব্দুল গফুরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"হ্যাঁ খোদাবন্দ, যাহাদের গুলিতে আবদুল গফুরের প্রাণ বাহির হইয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে একজন। তাহার প্রাণদণ্ডের পর যখন তাহার মৃতদেহ পর্বতগুহায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আবদুল গফুর এই কেল্লার ভিতর আসিয়া স্বহস্তে আমাকে এই পত্র দিয়া গিয়াছে।"

কাপ্তেন থরন্টন্ কুসংস্কারান্ধ লোক ছিলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, পদাতিকের নিশ্চয়ই কোনোরকম চক্ষের দোষ ঘটিয়াছে। তথাপি একটা অজ্ঞাত ভয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ভাষায় লিখিত পত্রখানি প্রেতলোকের এক অপরিজ্ঞাত রহস্যময় ইঙ্গিতের ন্যায় তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তিনি ইংরেজ গবরমেন্টের একজন সাহসী কাপ্তেন, স্বহস্তে অনেক সিপাহী বধ করিয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অপ্রীতিকর পত্রের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন।

কাপ্তেন থরন্‌টনের স্ত্রী বিবি থরন্‌টন্‌ তখন আগ্রায় ছিলেন। ১৬ই আগস্ট রাত্রে কাপ্তেন সাহেব বেরেলী হইতে স্ত্রীকে দেখিবার জন্য আগ্রায় আসিলেন। স্ত্রীর নিকট হইতে এক জরুরি পত্র পাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আগ্রায় চলিয়া আসিতে হয়। ১৭ই আগস্ট প্রভাতে কাপ্তেন সাহেব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখসুপ্তিমগ্ন ছিলেন। পূর্বদিনের পথশ্রমে তাঁহার শয্যাত্যাগে বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া মশারির বাহিরে আসিতেই, বিবি থরন্‌টন্‌ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। পত্রখানি সেই পূর্বের পত্রের মতো নীল লেফাফায় আঁটা। পত্রখানি দেখিয়াই সহসা কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কম্পিতহস্তে মেমসাহেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, পত্রের ভাষা ও নামস্বাক্ষর অবিকল পূর্বের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে এই পত্রে লেখা আছে, ''পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এগার মাস বিলম্ব।''

কাপ্তেন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে?''

''সাতটার সময় বাংলোর বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম। একটা দীর্ঘদেহ মুসলমান সিপাহী পত্রখানা আমার হাতে দিয়া কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।''

কে এই সিপাহী? সাহেব শয়নের বস্ত্র পরিবর্তন না করিয়াই কক্ষমধ্যে অধীরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বিবি থরন্‌টন্‌ সহসা স্বামীর এই প্রকার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কাহার পত্র, কি সংবাদ?''

''কিছু নয়'',—বলিয়া কাপ্তেন পত্রখানি শতখণ্ড ছিন্ন করিয়া বাতায়নপথে কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। একখণ্ড উড়িয়া তাঁহার মুখের উপরে আসিয়া পড়িল। সাহেব সেই কাগজ-টুকরা হাতে করিয়া পুনর্বার বাহিরে ফেলিতে যাইবেন, হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। লেখা আছে,—''এগারো মাস।''

কাপ্তেন সাহেবের হৃদয় চিন্তাভরে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। আজ তাঁহার মনে হইল নিশ্চয় কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনার সহিত এই পত্রের সংস্রব আছে। তিনি বেরেলী হইতে পূর্বরাত্রে হঠাৎ আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার বেরেলী ত্যাগের কথা তাঁহার দুই একটি বিশ্বস্ত বন্ধু ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ভিন্ন অন্যের বিদিত ছিল না। তথাপি কে কিরূপে তাঁহার আগ্রা আগমনের সংবাদ পাইয়া এই পত্র পাঠাইল? ইহা কি কেবল মিথ্যা ভয়প্রদর্শন মাত্র? কোনোক্রমে তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না। এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুধা নিদ্রা দূর হইয়া গেল। হুইস্কির সাহায্যে তিনি এই চিন্তা, এই অজ্ঞাত ভয় নিবারণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল, ঘোর অস্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কোনো রাজকার্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লি যাইতে হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় দিল্লির ইংরেজ সেনাপতির গৃহে এক প্রকাণ্ড ''ডিনারের'' আয়োজন হইয়াছে। কাপ্তেন কার্নেল লেফটেনান্ট মেজর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটবড় সকল 'মিলিটারি জিনিয়াস' টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। মিলিটারি কুললক্ষ্মীগণ দেশের টেলরসপ অন্ধকার করিয়া সুপক্ষ প্রজাপতিবৃন্দের ন্যায়

যোদ্ধৃবর্গের পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক—"None but the brave deserves the fair"—সুকবি ড্রাইডেনের এই স্মরণীয় উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিতেছেন। ব্রোচ্ ব্রেসলেট নেকলেসের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত, আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত, সুন্দরীগণের রূপজ্যোতিঃ সৌরকর-প্রতিফলিত নির্ঝর-ধারার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে। কাপ্তেন থরন্টন্ একটি সুন্দরী যুবতীর স্বাস্থ্যপানের আকাঙ্ক্ষায় গ্লাসটি তুলিয়াছেন, এমন সময় একজন আরদালি টেবিলের সন্নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি নীল লেফাফার ভিতর বন্ধ গালা-মোহর করা। পত্রখানি দেখিয়াই সাহেবের হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্বশরীর বাতাহত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সহসা তিনি ভয়ানক অসুস্থ বোধ করিতেছেন বলিয়া ডিনার টেবিল পরিত্যাগ পূর্বক অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে পত্র খুলিতে সাহস হইল না। অনেক চেষ্টার পর পত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেই এক কথা। নূতনের মধ্যে তাঁহার পরমায়ুর আর একমাস হ্রাস হইয়াছে, তাহাই লেখা আছে। পরদিন কাপ্তেন সাহেব দিল্লি ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানেই থাকুন, পর পর কয়েক মাস ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল।

৫

কয়েকমাস পর একদিন কাপ্তেন সাহেব দেরাদুনের সন্নিকটবর্তী কোনো পার্বত্য অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দিবাবসানকালে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তিনি অত্যন্ত শ্রান্তিবশত একটি ক্ষুদ্রকায়া গিরিতরঙ্গিনী-তীরে সংকীর্ণ পার্বত্যপথের উপর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটি মনুষ্যমূর্তি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্তী গিরিগুহাপ্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো ঘনীভূত হয় নাই। কাপ্তেন সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—সেই নিশ্চল নির্বাক দেহ আবদুল গফুরের।

সেই সায়ংকালে নির্জন গিরিনদীতটে অল্পপরিসর পথের উপর ছয়মাস পূর্বে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ সজীব দণ্ডায়মান দেখিয়া কাপ্তেন থরন্টন্ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। প্রায় তাঁহার সর্বাঙ্গ কন্টকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বীরপুরুষ, কাপুরুষের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার কক্ষস্থিত চর্মনির্মিত কোষ হইতে একটি রিভলভার আকর্ষণ পূর্বক আগন্তুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। কিন্তু আগন্তুক নিশ্চল। গুলি খাইয়া অক্ষত দেহে সে হা হা করিয়া হাসিয়া যেদিকে পূর্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল, সেই দিকেই দ্বিতীয় বার তাহার অকম্পিত হস্ত প্রসারিত করিল। তাহার সেই অবজ্ঞাপূর্ণ, জীবনের হর্ষোচ্ছ্বাসবর্জিত, নীরস উচ্চহাস্য সেই মৌন সায়াহ্নের শত গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহার নির্নিমেষ চক্ষুর তারকাদ্বয় দীপ্তিমান্ অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সেই অবজ্ঞাব্যঞ্জক, রোষানলপ্রদীপ্ত তীব্র দৃষ্টি মনুষ্যেরও নহে, পশুরও নহে। তাহা উৎপীড়িত আহত, প্রতিহিংসা-লোলুপ পৈশাচিকতায় পরিপূর্ণ। কাপ্তেন থরন্টন্ চক্ষু অবনত করিলেন। তাহার পর চক্ষু তুলিয়া যখন তাহার দিকে পুনর্বার চাহিলেন দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, অস্তমান অংশুমালীর অন্তিম কিরণরেখার ন্যায় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শব্দহীন, গতিহীন ভাবে সে ছায়ামূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল? ছায়া না ছায়া? কিছুই তিনি স্থির করিতে

পারিলেন না। সেই মূর্তি যে স্থান নির্দেশ করিয়াছিল, কাপ্তেন অবসাদশিথিল পদক্ষেপে অত্যন্ত মন্থরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। গুহাপ্রান্তে চাহিয়া দেখিলেন, নীল লেফাফায় মোড়া একখানা পত্র, পূর্বপত্রের ন্যায় গালামোহর করা, সেখানে পড়িয়া আছে। লেফাফার উপরে তাঁহারই শিরোনামা! সাহেবের ললাটে স্থূল ঘর্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। তিনি সেই গুহাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর পত্রখানি তুলিয়া লইয়া মোহর ভাঙিয়া সন্ধ্যার মৃদু আলোতে তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায়ই সংক্ষিপ্ত। পত্রে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাঁহার আয়ুঃকাল আর ছয়মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬

ইহা নিশ্চয়ই যে অনৈসর্গিক ঘটনা, কাপ্তেন সাহেবের অতঃপর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ শতগুণ সংবর্ধিত হইল। তাঁহার মুখ হাস্যহীন, পাংশুবর্ণ। চক্ষু জ্যোতিহীন, কোটরগত। দেহের লাবণ্য নাই, মনের দৃঢ়তা নাই, সংকল্পের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। এক একখানি পত্র কেবল যে তাঁহার পরমায়ু হ্রাসের সংবাদ বহন করিয়া যথানিয়মে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল তাহা নহে, প্রত্যেক পত্র তাঁহার দেহের শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কি দিবসে কি নিশীথে, কি আলোকে কি অন্ধকারে, কি জাগরণে কি নিদ্রায়, বিধাতার অসংখ্য কঠোর বিধানের ন্যায়, অনির্দেশ্য হস্তলিখিত সেই সংক্ষিপ্ত পত্র সর্বক্ষণ তিনি তাঁহার হৃদয়পটে মুদ্রিত দেখিতেন।

বেরেলী ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে একদিন কাপ্তেন থরন্টন্ অশ্বারোহণে প্রাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে অশ্বচালন করিয়া অবশেষে অনেক দূরে একটি সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক অনতিদীর্ঘ খালের উপর এই সেতু প্রসারিত।

সংকীর্ণ সেতু। কাপ্তেন সাহেব সেতুর অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই দেখিলেন একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম—রামহিত তেওয়ারি। মি. থরন্টন্ রামহিতকে চিনিতেন। তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতকে বিদ্রোহী সন্দেহে সাহেব তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার আদেশে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন ক্ষুদ্র কুটিরে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীতে রামহিত তেওয়ারির আপনার বলিতে আর কেহ নাই, কিছু নাই।

সেই শিরাবহুল জীর্ণ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, সেই জীবিত কঙ্কাল মি. থরন্টনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পরে সাহেবের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাপ্তেন সাহেব, চিনিতে পার কি? আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি।"

সাহেব বলিলেন, "অপেক্ষা? আমার কাছে বিদ্রোহীর পিতার কি দরকার থাকিতে পারে? ভিক্ষুক, পথ ছাড়িয়া দে। নতুবা বুকের উপর আমার অশ্বের ক্ষুর বিদ্ধ হইবে।"

"আমি সে ভয়ে ভীত নহি। ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, উৎপীড়কের দমনকর্তা। তোমার দমনের জন্য তাঁহার ন্যায়দণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে। সাহেব সাবধান!"

কাপ্তেনের দেহের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে আসিয়া জমা হইল। তিনি বলিলেন,

"নিমকহারাম, আমার অপমানে সাহসী হইতেছিস্?"—সাহেব বন্দুক তুলিয়া রামহিতের মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

বৃদ্ধ অচঞ্চল। বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র উন্মোচন করিয়া দক্ষিণহস্ত সাহেবের দিকে প্রসারিত করিল। বলিল, "সাহেব, তুমি দীনদুনিয়ার মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমার অপমান করি, আমার এমন কি সাধ্য? খাপ্পা হইও না। তোমার নামে একখানি পত্র আছে, লও।"

সেই নীল লেফাফা, গালামোহর করা পত্র। সাহেবের হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ রামহিত সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া পত্রখানি কাপ্তেনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। মি. থরনটন্ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে সেখানে অবস্থান করিলেন। তাঁহার চক্ষুর উপর চরাচর ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোক নিবিয়া গেল। দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, সেই ভীষণ দৈববাণী। স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—তাঁহার পরমায়ু আর এক মাস।

'মেডিক্যাল লিভ' লইয়া সাহেব পরদিন বিলাতযাত্রা করিলেন। এতদিনে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, একমাস পরে তাঁহাকে দেহ বিসর্জন করিতে হইবে। দেশত্যাগ করিয়া যদি কোনোক্রমে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

৭

মি. ম্যাক্ফারসন্ বোম্বের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি কাপ্তেন থরনটনের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব জীর্ণদেহ, উদ্বেগতাড়িত হৃদয় লইয়া বোম্বে নগরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। স্নেহময়ী ভগিনী দীর্ঘকাল পরে ভ্রাতার দেহ ও মনের অবস্থা দেখিয়া অশ্রুসম্বরন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ অবস্থায় তুমি কোনোক্রমেই জাহাজে উঠিতে পাইবে না, আমার এখানে থাকিয়া কিছু সুস্থ হও, পরে দেশে যাইও।"

কাপ্তেন ভগিনীর অনুরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এই রৌদ্রদগ্ধ অভিশপ্ত ভারত-বক্ষে আমার সমাধি রচনা না করিয়া তুমি ছাড়িবে না। আর একমাসের মধ্যেই আমার জীবনের অবসান হইবে।"

"এ বিশ্বাস তোমার কেন হইল? তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে দেখিতেছি। তুমি সংসারের সকল চিন্তা ছাড়িয়া দাও।"

"চিন্তা আমি ছাড়িয়াছি, কিন্তু সে রাক্ষসী আমাকে ত্যাগ করিবে না। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সে আমার বক্ষে বসিয়া আমার হৃদয়শোণিত শোষণ করিতেছে—আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"—কাপ্তেনের মস্তক সোফার উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মি. থরনটনের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিবি ম্যাক্ফারসন্ তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিবি থরনটন্ কিছুই জানিতেন না।

ভ্রাতার সুখশান্তি বিধানের জন্য বিবি ম্যাকফারসন্ প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমোদ ও আনন্দের মধ্যে সর্বদা তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা

করিলেন। কিন্তু আমোদের প্রবৃত্তি কাপ্তেনের হৃদয়পিঞ্জর পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্হিত হইয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পিঞ্জরের বিহঙ্গম পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিল না।

ভগিনীর আগ্রহে কাপ্তেন থরন্টন্ কোনো খ্যাতনামা বিলাতী থিয়েটারে একদিন সায়ংকালে অভিনয় দেখিতে গমন করিলেন। সেদিন মহাকবি সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অভিনয় ছিল।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে 'বক্সের' উপর হইতে কাপ্তেন সাহেব আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আত্মীয়বন্ধুগণ নিকটেই ছিলেন। তাঁহারা যুগপৎ ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, কাপ্তেন মূর্ছিত। বহু চেষ্টায় তাঁহার মূর্ছা ভঙ্গ হইল। সাহেব বলিলেন, "তোমরা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা দেখিয়াছ? আমি দেখিয়াছি সে প্রেতাত্মা হ্যামলেটের পিতা নহে, আবদুল গফুরের প্রেতাত্মা।"

বিবি ম্যাক্ফারসন্ ভ্রাতার মস্তকে পাখা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? আবদুল গফুর কে?"

"একজন সিপাহী। বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছি।"

কাপ্তেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া বিবিধ যন্ত্রসংযোগে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'কাপ্তেনের 'ব্রেন ফিভার' হইয়াছে। অনেক দিনের রোগ—অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।"

তিন দিন সাহেব শয্যাগত রহিলেন।

চতুর্থ দিন সাহেবের অবস্থা অল্প ভালো বোধ হইল। অপরাহ্ণে একখানি ইজিচেয়ারে তিনি বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। বাংলোর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। সমুদ্রের দিক হইতে মুক্তবায়ুপ্রবাহ আসিয়া ললাটের ঘর্মবিন্দু ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছিল।

নীল-পরিচ্ছদধারী, নীল-উষ্ণীষশোভিত, নীল-পতাকাধারী একজন মুসলমান সৈনিকপুরুষ সেই বারান্দায় আসিয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাপ্তেন দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। সৈনিকপুরুষ একখানি নীলবর্ণের পত্র বাহির করিয়া সাহেবের স্থির নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর ধরিল। আজ পত্র লেফাফায় আবদ্ধ নহে। খোলা পত্র—অক্ষরগুলি লোহিত কালিতে অঙ্কিত। সাহেব নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করিলেন—

"আজ ১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই।
সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার পরমায়ু শেষ হইল।"

সাহেব চিৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্ছা আর ভঙ্গ হইল না। বিবি ম্যাক্ফারসন্ নিকটেই ছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া তীব্রস্বরে সেই মুসলমান সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

"উৎপীড়িতের প্রতিহিংসক।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

মহেশের মহাযাত্রা পরশুরাম

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন,—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরো একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা—এঁয়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল, —'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস ক'রব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বাল্ডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনো কখনো তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায়?'

'জ্যাঠামি করিসনি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায়!'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেননি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শূয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনো জাত বড় হতে পারেনি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হলে কি হয়, দুজনের হরদম ঝগড়া হত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তাছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতিচর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয়নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত—বউ ভালোবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিত মশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পাল্টা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে। তাই তো পরকালের আশায় বসে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফলে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ঐ হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ

কর, কেউ কিচ্ছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোকে আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জমে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বসে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল রফা করে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-ই নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর = 0, আত্মা = ভূত = 0।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হল গিয়ে দস্তুরমতো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার বয়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো, হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিবচতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনো বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কেটে দিয়ো। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হলেই হল।

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু-ধারে বাবলা গাছে আরো অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনো তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদারপ্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা

কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনো অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কালো মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরো দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না।'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ করে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনসেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করো।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কালো মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতোমতো খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেন্ড ইয়ার স্যার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'বলি স্যার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুই ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্টা কিল মেরে বললেন—'আহাম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয়নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ করে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালোই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে করেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন করে বললেন,—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ, তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও,

তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কলেজে আর ভূতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনো প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশিদিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরি দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনো পাননি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচ-বকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল, তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আলজেব্রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদিকবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হোন আর রবীন্দ্রনাথই হোন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবারে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু, চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই করে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোনো লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে,
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি-চাপা।
সার হয়ে যাবি,
ঢ্যাড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরো অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বাহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন। কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলীতি বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরো প্রবল হল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তু বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চটে উঠলেন। শেষটায় এমন হল যে ভূতের গুষ্ঠিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

পড়ে পড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাতে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন

ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন বলে নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হতে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ করে ঐ ভূতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন। কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা খুব খারাপ। হরিনাথ তখনি হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয় নেই। বললেন—'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেব না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিয়ো না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হলে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ করে বসে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাস আমরা বইব? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা বলেই তাঁরা সরে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠা সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরনী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনি সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিন জন লোক যোগাড় হল। পনের টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীরা খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওআলিস স্ট্রিট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হতে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন।

বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ মরে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন—'ঢের ঢের বয়েছি মশায়, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনো কাঁধে করিনি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনের টাকায় হবে না মশায়, আরো পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয় চিরকাল সমদর্শী—এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখ্‌রা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হল না। তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হল মোষের গাড়ির বোঝা। আরো পাঁচ টাকা লাগবে।

এমন সময় আরেকজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কালো র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না করে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, চল, চল।

আবার যাত্রা আরো একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্য এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই। বললেন, 'ওটাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হন হন করে চলছে। হরিনাথের আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হল।

'আরে অত তাড়াতাড়ি কেন একটু আস্তে চল।' কেই বা কথা শোনে! ছুট—ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! বিডন স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেলে যে! লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের।' কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওআলিস স্ট্রিট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে? এ কি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি, খাটের উপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে,..ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ফিরে লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কি বলছে?

দূর-দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ, আছে আছে সব আছে, সব সত্যি।—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে গেল, তখনো তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে, আছে—'

হরিনাথ মূর্ছিত পয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়! পিণ্ডিদাদনখাঁ'এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

'মানে, মহেশ পিণ্ডি নিলে না, কিংবা তাকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য! মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনো ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে, সেই টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশ ফান্ডের নাম কেউ করে না।'

নরক এক্সপ্রেস সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জলটা চেপে এল। ঝড়ের ধাক্কায় দোর-জানলা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রাত দশটা বেজে গেছে; তখনো আমরা বসবার ঘরে আড্ডা দিচ্ছি। জয়ন্ত আমি আর সুরমা।

'আজ আর তোমার যাওয়া হয় না ভাই জয়ন্ত'—এই নিয়ে বার সাতেক অনুনয় করা হল জয়ন্তকে।

সুরমা কথায় ঝাঁজ মিশিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলো—'আজ এই রাক্ষুসে রাতে রওনা না হলে কী আপনার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, বলুন তো জয়ন্তবাবু?'

'দুই দিনের কড়ারে এসে আটদিন রয়েছি বউদি। এর পরে শেষকালে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করবেন, সেটা না আপনাদের দিক থেকে শোভন, না আমার দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হবে।'

গম্ভীরভাবে এই কথা বলে একটা পান মুখে পুরলো জয়ন্ত।

তার কথা বলার ধরন দেখে আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। সুরমারও ঠোঁটের কোণে দেখা গেলো হাসির ঝিলিক।

কড় কড় করে বাজ পড়লো নিকটেই কোথাও।

'কিন্তু সত্যি বলো তো, এই দুর্যোগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে চাপতে তোমার ভয় হবে না? ঈশ্বর না করুন, অ্যাকসিডেন্ট তো হামেসাই হচ্ছে!'

আমার তূণের শেষ বাণ এইটি। ট্রেন-দুর্ঘটনার ভয়েও যদি ও নিরস্ত না হয়, তবে আর উপায় কী? বন্ধু বই আর কিছু নয় যে জোর করে বলব—'হবে না যাওয়া!' বন্ধু মাত্র। তাও মাঝে কয়েক বৎসর কোনো খোঁজই রাখিনি ওর। হঠাৎ সেদিন একটা চিঠি এসে হাজির; কে জানে কোথা থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে নিয়ে জানিয়েছে—'তোমার জঙ্গলে দুটো দিন কাটিয়ে আসতে চাই। পরশু রওনা হব।'

আমার এটা জঙ্গলই বটে। ফরেস্ট অফিসার আমি, যে বাংলোতে থাকি, তা থেকে স্টেশন অন্তত আধ মাইল। রাস্তা পাকা বটে, কিন্তু নিরাপদ নয়। রাত্রে বুনো হাতি চলাচল করে, আর সাপ অগুনতি।

জয়ন্ত এসেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বাস করতে হয় তো, এইরকম জায়গাতেই। একেবারে আইডিয়াল নিভৃত-নিবাস। বেশ আছ তোমরা—'কপোতকপোতী যথা বাঁধি নীড় সুখে...।'

'থাকো না দিনকতক, তুমিও বেশ থাকবে'—এই বলে সুরমাকে ফিরিস্তি দিতে বসে গেলাম—ছাত্রজীবনে ও চা-য়ে কয় চামচ চিনি খেত, ডিমের পোচ্ পছন্দ করত, না মামলেট, আর ফুলের ভেতর বেলফুলের বেশি পক্ষপাতী ছিলো, না রজনীগন্ধার।

'দেরাদুন এক্সপ্রেসে ভয়?'—আমার কথা শুনে ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলো জয়ন্ত—'নরক এক্সপ্রেসে চড়েও বেঁচে ফিরে এসেছি যখন, পৃথিবীর কোনো ট্রেনের কোনো অ্যাকসিডেন্টই আমার কিছু করতে পারবে না ভাই!'

'নরক এক্সপ্রেস?—সে আবার কী?'—দু'জনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম—সুরমা আর আমি।

হাই তুলে দু'হাতে একসঙ্গে তুড়ি দিলো জয়ন্ত। 'কথাটা বলে ফেলেছি তাহলে! এটা আমার একটা ব্যারামে দাঁড়ালো দেখছি। যেখানেই যাই—ঐ ছাই নরক এক্সপ্রেসের কথা না বলে পারিনে! এটা অবচেতন অহমিকা। একে দমন করতে হবে।'

'তা দমন করতে হয়, করো এর পর।'—আমি পেয়ে বসলাম। 'এখন তো গল্পটা আমাদের বলো।'—আশা হল এই গল্পের নেশায় মেতে উঠলে ট্রেন-ধরার নেশা ছুটে যাবে হয়তো।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখলো জয়ন্ত। দশটা বাইশ। দেরাদুন এক্সপ্রেস এগারোটা পঞ্চাশে। দেড় ঘণ্টা। আধ মাইল যেতে—এই ঝড়-বৃষ্টির দরুন সময় বেশি লাগবে—তবু আধ ঘণ্টার বেশি কিছুতেই লাগতে পারে না। 'এক ঘণ্টা হাতে আছে যখন, নরক এক্সপ্রেসের গল্পটাই শুনিয়ে যাই তোমাকে—'

'বছর তিনেক হল লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—যেমন চিরদিন বেড়াই। মধ্যভারতের ঐ দিকটায়।

হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা একটা ছোট্ট স্টেশন প্রথম নজরেই বড় ভালো লেগে গেলো। দূরে দূরে নীল পাহাড়, স্টেশনের লাল ঘরগুলি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিলো তাদের ছায়ায়। আমগাছে কোকিল ডাকছে, হরিণ ছুটছে মাঠের ভিতর।

ভালো যখন লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। স্টেশনের নামটাও তখনো দেখিনি।

আমি নামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলো। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম ওয়েটিং-রুমের দিকে; ব্যাগটা বিছানাটা কারো জিম্মা করে দিয়ে বেড়াতে বেরুব।

স্টেশনের নাম দেখতে পেলাম—বুলন্দশহর।

বুলন্দশহর! কী যেন মনে পড়ে-পড়ে, পড়ে না। ঐ নামের সঙ্গে জড়ানো কী যেন কবেকার একটা কাহিনী। রবিবাবুর গল্পে এক বুলন্দশহরের কথা পড়েছি না? যেখানকার নবাবপুত্রী—কিন্তু না; যে-গল্পটা আমার মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিচ্ছে, অথচ ধরা দিচ্ছে না, সেটা কোনো নবাবপুত্রীর গল্প নয়।

তবে, কী সেটা?

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে মাঠে পড়েছি, মাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছি বনে। রেললাইন আমার পাশে পাশেই চলেছে।

বন তখনো আদ্ধেক পেরুতে পারিনি, একটা নদীর ধারে এসে পড়লাম। সরু নদী, কিন্তু গভীর খুব। এখন গরমের দিনে জল বেশি নেই, মাঝে মাঝে চড়াও বেরিয়েছে। কিন্তু বর্ষার দিনে এ নদীতে যে অনেক জল থাকে আর স্রোতও হয় প্রবল, তা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম।

এই নদীর উপর মজবুত কংক্রিটের পুল, তারই উপর দিয়ে চলে গিয়েছে রেললাইন।

কিন্তু বাঁয়ে ওটা কী? আর একটা পুল না?

একটা কাঠের পুল, মাঝখানে ভাঙা। অর্থাৎ হাতদশ-বারো জায়গায় না আছে কাঠ, না আছে লোহা; না আছে থাম, না আছে লাইন।

বেশ বোঝা যায়, ঐটিই এ-নদীর আদি পুল, এককালে ঐ পুল দিয়েই রেললাইন নদী পার হত।

যা এতোক্ষণ কিছুতেই মনে পড়ছিলো না, তা চট করে মনে পড়ে গেলো এইবার। বুলন্দশহর! এই সেই বুলন্দশহর! তিন বৎসর আগে এই স্টেশনে, এই নদীর উপরেই একটা ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। এক দুর্যোগের রাত্রে ঐ কাঠের পুলটা ভেঙে গোটা একখানা ট্রেন পড়ে গিয়েছিলো নদীর জলে। একটি প্রাণীও বাঁচেনি সে ট্রেনের।

বটে! এই সেই বুলন্দশহর! ঐ সেই পুল!

একটা গোটা ট্রেনের সমস্ত যাত্রী সমুখের ঐ জায়গাটাতে জলে ডুবে মরেছিলো, জলে-ডোবা রেলগাড়ির কামরায় বন্ধ হয়ে, বা তার নিচে চাপা পড়ে। ঠিক খাঁচায়-বন্ধ ইঁদুর যে ভাবে জলে ডুবে মরে, সেই ভাবে।

মনে পড়ে। আর কল্পনাতে শিউরে শিউরে উঠি।

হঠাৎ খেয়াল হল—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পুব আকাশে ঐ জ্যোছনা চিকচিক করছে—মস্ত-বড় চাঁদ, দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী তিথি হবে।

রাতে বেড়ানো অভ্যাস আছে। বাঘ-ভাল্লুককে বড়-একটা কেয়ার করি না। তবু আজ এই পহাড়ে নদীর ভাঙা পুলের কাছে ভর-সন্ধ্যাবেলা দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে গা ছমছম করে উঠল। জানা জিনিসের চাইতে অজানার ভয় আমাদের হাড়ে মজ্জায় অনেক বেশি নিবিড় করে মেশানো আছে। আমি তাড়াতাড়ি স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

ছোট্ট জায়গা, বাজার দোকান নেই বললেই হয়। এক ভুজাওয়ালার দোকানে ডাল-রোটির ব্যবস্থা করতেই দু'ঘণ্টা কেটে গেলো। তারপর ফিরে এলাম প্ল্যাটফর্মে।

স্টেশনমাস্টারকে টিকিটখানা দেখানো দরকার ছিলো। মাঝপথে নেমে পড়েছি; এই টিকিটেই বাকি দূরত্বটুকু পাড়ি দেওয়া চলবে তো?

'চলবে'—একগাল হেসে উত্তর দিলেন তিনি।

লোকটিকে মিশুক অমায়িক বলেই ধারণা হল। আমার হাতে কাজ নেই তো বটেই; তাঁরও কিছু আছে বলে মনে হয় না। অনাহূত একটা টুল অধিকার করে গল্প শুরু করা গেলো।

'বেশ জায়গাটি আপনাদের।'

‘তা যা বলেছেন।’ মাস্টারমশাই উত্তর করলেন—‘জায়গাটি এমনিতে বেশ; তবে বাঘ-ভাল্লুক আছে; আর—’

‘আর’ বলে থেমে পড়লেন ভদ্রলোক।

‘আর কী?’—আমি জিগ্যেস করলাম—‘কী যেন বলতে বলতে থেমে গেলেন বোধ হচ্ছে?’

‘না, ও কিছু নয়। বছর তিনেক আগে এইখানটাতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, শুনে থাকবেন। বেশ বড়-রকমের অ্যাকসিডেন্ট।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ’—আমি আগ্রহের সঙ্গে সায় দিলাম—‘খুব শুনেছি। পুল ভেঙে—’

‘লোকের মাথায় পোকা আছে, জানেন তো?’—স্টেশনমাস্টার বললেন—‘ভূত থাক না থাক, লোকে ভূতের গল্প করতে ভালোবাসে।’

একটা মালগাড়ি এসে পড়লো। স্টেশনমাস্টার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভূতও আছে তাহলে এই ছোট্ট জায়গাটিতে; থাকবে বই কি! শত শত লোকে পাইকারি হারে একসাথে যেখানে মারা যায়—

বেরিয়ে ভুজাওয়ালার দোকানে হাজিরা দিলাম। ডাল-রোটি সে পাকিয়ে ফেলেছে। আমিও চোখ কান বুজে খেয়ে ফেললাম।

ওয়েটিংরুমে ফিরে এসে একটা বেঞ্চি অধিকার করলাম। সতরঞ্চিটা পেতে, কম্বল মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম আরাম করেই। রাত একটায় আমার ট্রেন। ঘুম যদি ঠিক সময়ে ভাঙে, ধরব সেটা। যদি না ভাঙে, কুছ্ পরোয়া নেই, কাল সকালে যে ট্রেন পাব, সেটাইতে উঠে পড়ব। রাত একটার গাড়ি আমায় ধরতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ আমায় দেয়নি।

দেহ ক্লান্ত, কিন্তু ঘুম সহজে আসে না। এটা, ওটা, নানা চিন্তা। কলকাতার মেসে এক বামুন ঠাকুর ছিলো, সে অড়হর-কা দাইল রাঁধত—চমৎকার। আজকের এই ভুজাওয়ালার ডাইল তার কাছে কিছু না। মেসের সেই বামুন ঠাকুর দাঙ্গার সময় খুন হয়, ভূত হয়ে সে সারা রাত রান্নাঘরে হাঁড়ি-কড়া ঘট্‌ঘট্ করত। ট্রেনভর্তি যে লোকগুলো তিন বছর আগে এখানে নদীর জলে ডুবে মরেছে, তাদের মধ্যে মেসের ঠাকুর কেউ ছিলো কিনা, কে বলবে?

কিন্তু, এত লোক ওয়েটিংরুমে ঢুকলো কেন? কখনই বা ঢুকলো? একটু বোধহয় তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো এর ভেতরে। এরই মধ্যে ঘর যেন গিস্ গিস্ করছে লোকে। চুপি চুপি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, ফিস্‌ফাস্ কথা কইছে পরস্পরে। এরা কোন্ ট্রেনে যাবে? রাত একটার সেই ট্রেনে? ভীষণ ভিড় হবে দেখছি!

চোখ মেলে লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখবার উৎসাহ আর হল না। চৈতন্য হারিয়ে ফেললাম ঘুমের কোলে।

কে জানত—এ ঘুম কাল ঘুম?

কতক্ষণ এই কাল ঘুমে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো একটা অস্পষ্ট কোলাহলে। ঘর-ভরা লোক দুদ্দাড় ছুটে চলেছে। ট্রেনে উঠবার জন্যে নাকি? উঠে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি—তাই বটে, গাড়ি এসে গিয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের পাশে। উঃ, খুব সময়মতো ঘুমটা ভেঙেছে।

তাড়াতাড়ি বিছানাটা গুটিয়ে বগলে তুললাম; ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুমুখেই যে

কামরাটা চোখে পড়লো, উঠে পড়লাম তাতেই। আলোয়-আলো সারা গাড়ি, জানলায় জানলায় অগুনতি মানুষের মাথা, হাঁক-ডাঁক—কেউ চা-ওলাকে ডাকছে, কেউ চাইছে গরম দুধ, কেউ-বা দেশলাই বিড়ি!

গাড়িতে উঠে বসে পড়লাম একটা খোলা জানলার পাশে। হঠাৎ বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেন, কে জানে?

হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই!

প্ল্যাটফর্মটা, স্টেশনঘরটা জনপ্রাণী-শূন্য।

একটা আলো পর্যন্ত কোথাও নেই!

গাড়িতে কামরায় আলো ঝলক দিচ্ছিলো, তাই আগে লক্ষ্য করি নি স্টেশনের আলোর অভাব। এ কি রকম? দূরপাল্লার একটা এক্সপ্রেস ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। স্টেশনে আলো নেই, মানুষ নেই! ট্রেন স্টেশনে এসে ঢুকলো কি করে? সিগন্যাল না পেলে এখন ট্রেন ছাড়বেই বা কী করে? স্টেশনমাস্টারকে তো কোথাও দেখছি না! স্টেশনের ঘরটাই বন্ধ!

কিন্তু গাড়ি ছাড়লো ঠিকই। কেউ ঘণ্টা বাজালো না, কেউ নিশান দেখালো না, তবু ছাড়লো গাড়ি। ঘটাং-ঘট-ঘট-ঘটাং শব্দে দুলতে দুলতে স্টেশনের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

হাতঘড়ির দিকে দৈবাৎই চোখটা পড়েছিলো; চমকে উঠলাম—রাত মোটে বারোটা!

আমার এক্সপ্রেস গাড়ি তো রাত একটায় আসবার কথা!

এ তবে কোন্ ট্রেন?

যাঃ, কোথায় গিয়ে পড়ব এবার, কে জানে! এখন রাগ হল স্টেশনমাস্টারটার ওপরে! লোকটা কিনা আমায় অম্লান বদনে বললো যে রাত একটার আগে কোনো গাড়ি নেই?

গাড়ি নেই যদি, এটা তবে কী?

পাশের এক ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম—'ও মশাই, বিদেশী লোক, না-জেনে উঠে পড়েছি, গাড়িটা যাবে কোথায়?'

লোকটা একবার তাকিয়ে দেখলো আমার পানে, কিন্তু জবাব কিছু দিলো না। লোকটা কালা নাকি?

অন্য পাশে ছিলো এক পাৎলুন-পরা পার্শি। তাকেও জিগ্যেস করলাম ঐ একই প্রশ্ন। নাঃ, জবাব এও দিলো না।

রেগে গেলাম রীতিমতো। স্টেশনমাস্টারের ওপর, এই সহযাত্রীদের ওপর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর। এরা আমায় উজবুক বানিয়ে ছেড়েছে! গোল্লায় যাও সব।

রেগে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ খেয়াল হল—রাতটা বড় অন্ধকার ঠেকছে। চাঁদটা গেলো কোথায়? সেই সন্ধেবেলা দেখেছিলাম—এত বড় সোনার থালার মতো ত্রয়োদশীর চাঁদ সারা পৃথিবী আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছে—সে-চাঁদ আমার গেলো কোথায়? রাত মোটে বারোটা, ত্রয়োদশীর চাঁদ তো এক্ষুনি অস্ত যেতে পারে না!

তবে মেঘে ঢেকে ফেলেছে?

ওঃ, তাই বলো! জমাট মেঘ সারা আকাশে। কালো। নিকষ কালো। ঐ যাঃ, বিদ্যুৎ চমকালো যে!

শুধু বিদ্যুৎ? কড় কড় করে বাজ ডেকে উঠল। আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত গড়িয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটলো। কড়-কড় কড়াৎ!

কোথায় ছিলো ঝড়, আর কোথায় ছিলো বৃষ্টি! দুই মিনিটের ভেতর প্রলয়-দুর্যোগ শুরু হয়ে গেলো। জানলা বন্ধ করে বসলাম সাবধানে। সহযাত্রীরা যেন ক্ষেপে উঠেছে ততোক্ষণে। ডাক ছেড়ে কাঁদছে, এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে, কপাল চাপড়াচ্ছে, যেন ভয়ে আর নৈরাশ্যে।

দুই একজনকে জিগ্যেস করলাম—'ক্যা হুয়া, রোতা কাহে? তুফান বরখা কভি দেখা নেহি?'

কে কার কথা শোনে। আমার দিকে কানই দিলো না কেউ। সমানে কাঁদতে থাকলো বাপ-দাদার নাম করে।

বিরক্ত হয়ে জানলা খুললাম। ঝড়-বাদলের ঝাপ্টা বরং সহ্য হবে, এদের এ পাগলামি অসহ্য।

জানলা খুলে ফেললাম। সেই মুহূর্তে এল একটা বিদ্যুতের চমক। চোখের পলকে যা দেখলাম, তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো আমার।

নদীর ধারে এসে পড়েছি আমরা। আর—

ডাইনে ঐ কংক্রিটের পুল।

বাঁয়ে সেই ভাঙা কাঠের পুল।

আমাদের ট্রেন কংক্রিটের পুলের দিকে গেলো না, বাঁয়ে মোড় খেয়ে তীরবেগে ছুটলো কাঠের পুলের পানে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। গাড়ি-ভর্তি পঞ্চাশটা লোকের ভয়ার্ত রোদনের ওপরেও আমি শুনতে পেলাম আমার নিজের সেই চিৎকার।

ঘড়াস! ঘস্! ঝপাস্! ঝপ্!

আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে খোলা জানলা দিয়ে লাফ দিলাম। গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে লাফ দিলাম—কিসের ভিতরে লাফ দিচ্ছি, না দেখেই দিলাম লাফ।

তারপর কী হল, জানি নে।

জ্ঞান হল যখন, তখন আমি নবীনগরের হাসপাতালে। আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা। শুনলাম, সকালবেলায় কারা নাকি আমায় নদীর চড়ায় অজ্ঞান আর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্টেশনে নিয়ে যায়। স্টেশনমাস্টার আমায় পাঠান হাসপাতালে।

লোকটি ভালো। একদিন আমায় দেখতে এলেন হাসপাতালে। কথায় কথায় তাঁর মুখেই শুনলাম সব। ও ট্রেনটা আসলে ট্রেনই নয়, ট্রেনের ভূত। ওখানকার লোকে ওর নাম দিয়েছে—নরক এক্সপ্রেস। তিনবছর আগের সেই মারাত্মক দুর্ঘটনায় যে ট্রেনটা নদীতে উল্টে পড়ে গিয়েছিলো, সে এখনো রোজ রাতে একবার বুলন্দশহরের পাশ দিয়ে পুলের পানে ছোটে আর রোজ রাতে একবার ঝাঁপ খায় নদীর জলে।

আমার বরাত মন্দ যে সেই ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম। আবার বরাত ভালো যে নরক এক্সপ্রেসও আমাকে নরকে নিয়ে যেতে পারে নি।'

গল্প শেষ হল। সুরমা চুপ, আমিও চুপ। হঠাৎ জয়ন্ত গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'এবার বেরুতে হয়। নইলে গাড়ি পাব না।'

'সত্যিই এই জল-ঝড়ে?'—আর কথা ফুটলো না আমার।

'সেরাত্রের জল-ঝড় এর চেয়ে বেশিই ছিলো ভাই। শুধু কি জল-ঝড়? চারিধারে ঘিরে ছিলো নরকের অধিবাসীরা। সামনে ছিলো মৃত্যুর হাতছানি। সেখান থেকে যখন ফিরতে পেরেছি, তখন কিছু ভয় করো না—আমি ঠিক পৌঁছে যাব।'

বেরিয়ে পড়লো জয়ন্ত।

তার বর্ষাতি-মোড়া সুদীর্ঘ দেহটা অচিরেই হারিয়ে গেলো বর্ষার ঘন-চিকের আড়ালে।

মায়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার-দোকান এ পর্যন্ত এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজেকাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হল কিন্তু পেট সমানে জ্বলচে। এ সময়ে কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

আমি বল্লাম—আমি গরিব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্চি। আপাতত বড় খিদে পেয়েচে, খাব কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বল্লে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি।

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বল্লে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বল্লাম—থাকতে পারি।

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী খুশি হল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বল্লে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরোনো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল। কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে। আমায় বল্লে—চা করতে জানো? একটু চা করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বল্লে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলুভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে।

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিয়ো। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জ্বেলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছনদিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধু হাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো, একটি বউ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাতদশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে তুলচে। দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছন ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বউটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বল্লে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আরো একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশি জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটি বউ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বল্লে—কোথায় বউ? চলো দিকি দেখি!

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বল্লে—কৈ বউ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ওই ঝোপটার কাছে।

—হুঁঃ, যত সব! চলো, চলো। দিনদুপুরে বউ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বউ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে। তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে-চুরির কথা তুললে। বল্লে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কি ঝিঙে-চুরি-করা বউকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বল্লে—না না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন?

—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়!

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে। ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাঃ, কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বল্লে—আমি?

—হ্যাঁ, অনেক রাতে।

—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।

—আমাকে বল্লেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙে ভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মতো থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—এ তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখাশুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি?

চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বল্লে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইলো তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই। বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ।

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনব বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁখানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি, তার সীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। সেও তেল কিনতে যাচ্ছে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।

—নিবারণ চক্কত্তি? কেন?

—দেখাশুনো করি। কাল এসেচি।

—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিয়ো। কত লোক ও বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বউয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক, খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে। অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই লোকটার ভয় দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্কত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিয়ো না।

কিছু না, গাছপালার ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বউটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশি করব।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটা ধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটা ধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তিমশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হল, চক্কত্তিমশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে গিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার

চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি, এমন কোনো সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বউ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়। আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বউটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বউ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে-রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বনজঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করব, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকত, তবে এ কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠল। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠল সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠল সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরে সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেমে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোনো ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে যাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার এ একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরিব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার

শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়তো সবটাই আমার মনের ভুল। মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল।

এরপর ন'দিন আর কোনো কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না, কি শুনতে কি শুনেচি, বউ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল। সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই আর শুধু ঘুমুই। কাজকর্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুঁড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণত খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েছে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতব, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেব। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেচি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বউটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নিচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা কলরব উপস্থিত হল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হই-হই করে উঠল—সব দরজা জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম—কৈ, একটা দরজা-জানলার কপাটও খোলেনি দোতলায়! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চিৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চিৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

সেই বউটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে! দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের

সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠল—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে, সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে। কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শ করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরে জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না, ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিলুম? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেচি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েচি, তা কোথা থেকে এল? সেই বউটি যখন চলাফেরা করে তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে।

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বল্লে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখচো নাকি?

—না।

—শুনচো কিছু?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক! তুক-তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি? বউ-মতো? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকত, তারা সবাই একটি বউকে দেখত ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইত না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেত। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না। তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হল নাকি? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমার মনে হল, নাঃ, সব ভুল। পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাব? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি।

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তিমশায় মাইনেটাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

"ক্লাইম্যাক্স"

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটা ফেঁদেছি, উদ্দেশ্য, গল্পের ক্লাইম্যাক্স জিনিসটা কি তাই বোঝানো। শ্রোত্রী বা শিষ্যা আমার স্ত্রী এবং তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া ভগ্নী মীরা। প্রথমে সংজ্ঞাটা সম্বন্ধেই ধারণাটুকু পরিষ্কার করে দিলাম; বললাম, ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে কোনো রচনা বা রচনাংশের চরম পরিণতি—সে রচনা গল্প, উপন্যাস, কাব্য, মহাকাব্য যাই হোক। কোনো একটা বিশিষ্ট ব্যাপক অনুভূতিকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে চূড়ান্ত

পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হল ক্লাইম্যাক্স। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যেমন সমগ্র বইখানার শেষাংশ তার ক্লাইম্যাক্স হতে পারে, তেমনি তার একটা অধ্যায় বা আরো খণ্ডিত অংশেও একটি বিশেষ অনুভূতি বা পরিস্থিতির ক্লাইম্যাক্স সৃষ্ট হতে পারে। এই ক্লাইম্যাক্সটিকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলাতেই রচনা বা রচনাংশের সার্থকতা। ক্লাইম্যাক্স জিনিসটা খুব পরিষ্কার রূপ নিয়ে ওঠে কোনো তীব্র অনুভূতি নিয়ে রচনার মধ্যেই। তাতে পাঠক বা শ্রোতা তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতে পারে যে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসতে পারে, কী বলছি, কী করছি, কোথায় আছি সে বিষয়ে কোনো সম্বিৎই থাকে না। এমন কি পরিণতিটা যতই খারাপ হোক, হঠাৎ উল্টে গেলে একটা আশাভঙ্গের ধাক্কাও লাগে বুকে। মীরার দিকে চেয়ে বললাম—"এই সবের জন্যেই তোমার দিদি বই হাতে করে রান্নাঘরে ঢুকলে শুক্ত হয়ে যায় টক, অম্বল হয়ে যায় তেতো, দুধ হয়ে যায় নোন্তা, ডাল হয়ে যায়..."

স্ত্রী বললেন, "গল্পটা বলবে তো বসি, ব্যাখ্যানা করতে হয় তো শুধু ওর কাছেই করো।"

"বসো।"—বলে আরম্ভ করে দিলাম।

"একবার দিন সাতেকের জন্যে আমি আমার বন্ধু বিকাশের ওখানে বেড়াতে যাই। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনের কথা, বিকাশ একটা বিশেষ দরকারে সকালেই বাইরে বেরিয়ে গেল, ফিরবে খানিকটা রাত করেই। সমস্ত দিনটা বই পড়ে আর এদিক-ওদিক করে সন্ধ্যার একটু আগে মনে হল খানিকটা বাইরে ফাঁকা থেকে না হয় বেড়িয়ে আসি, বিকাশ এলেই তো আবার শহর দেখা, রাজবাড়ি দেখা, পার্টি, ক্লাব এই সব আরম্ভ হবে। ট্রেনে আসবার সময় শহর থেকে আন্দাজ মাইল দুয়েক দূরে একটি জায়গা বড় ভালো লেগেছিল; একটি বেশ চওড়া নদী—তা কলকাতার গঙ্গার প্রায় আধা-আধি হবে সব নিয়ে—ওপরে একটা নেড়া পুল, তার ওপর দিয়েই গাড়িটা এল, দূরে দূরে পাহাড়; কাছেও, পাহাড় না হোক এখান-ওখানে কিছু টিলা ছড়ানো, কয়েকটা বেশ খানিকটা উঠেও গেছে। আমাদের গাড়িটা পাস্ করল ঠিক সূর্যাস্তের মুখে। পাহাড়ে নদী, মাঝখানে শুধু কয়েকটা জলের রেখা ছড়ানো রয়েছে, বাকি সমস্তটায় ধু ধু করছে বালি। সেই গেরুয়া রঙের বালির ওপর প্রচণ্ড সূর্যের রাঙা রশ্মি পড়েছে ছড়িয়ে, গাংচিলের ছোটবড় ঝাঁক বাসায় ফিরছে, জলের ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচার গায়ে সোনালী রোদটা ঝিক-ঝিক করে উঠছে—সমস্তটুকু মনে গেঁথে গিয়েছিল। জানতাম বিকাশকে বলতে যাওয়া বৃথা, কেননা যারা বইয়ের নেশায় ডুবে থাকে তাদের মতন, কবি বল, ঔপন্যাসিক বল, কোনো লেখককেই ও বিশেষ পছন্দ করে না—অর্থাৎ তার ঐ অংশটাকে নেকনজরে দ্যাখে না..."

স্ত্রী একটু বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে শুনছিলেন, ওঁকে কটাক্ষ করছি ভেবে মন্তব্য করলেন, "কেউই দ্যাখে না নেকনজরে।"

বললাম, "আমি অবশ্য ঠিক সে জিনিসটি দেখতে পাব না। কেননা বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যাস্ত হয়ে যাচ্ছে, পৌঁছুব ক্রোশ-খানেক পথ হেঁটে। তবে শুক্ল পক্ষের মাঝামাঝি যাচ্ছে, একটা অন্যরূপে দেখতে পাব, সে বোধ হয় আরো ভালোই হবে।

"রেলের লাইন ধরে একটু পা চালিয়েই গেলাম। যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য একেবারেই ডুবে গেছে, শুধু আকাশে এদিক-ওদিক ছড়ানো যে মেঘের টুকরোগুলো

রয়েছে তাতে, একটু একটু রঙের পোঁচ লেগে রয়েছে; কোনোটাতে হাল্কা, কোনোটাতে একটু গাঢ়। আকাশের মাঝখানে চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি পুলটা পেরিয়ে একেবারে ওপারে চলে গিয়ে লাইন থেকে নেমে পাশেই একটি ছোট্ট টিলার ওপর গিয়ে বসলাম। বসলাম পশ্চিমমুখো হয়ে, সামনে হাত-পাঁচেক পরেই নদীর তীরটা গেছে নেমে।

"দেখলাম, আগে বেরুবার কথা যে মনে পড়ে নি, খুব ভালোই হয়েছে। এমন একটি পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে আমি বহু দিনই পাই নি নিজেকে, এর আগে কখনো পেয়েছি বলেই মনে পড়ছে না। চঞ্চল জীবনের সব শব্দই গেছে থেমে, শুধু অনেক দূরে নদীটা একটা বাঁকের পর যেখানে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, খুব ক্ষীণ একটা পাখির ডাক, খুব সম্ভবত চখা-চখী, ওরা শুনেছি দূরে আলাদা আলাদা থেকে এইরকম করে ডাকতে থাকে পরস্পরকে। বোধহয় ভাবে এতে দাম্পত্য কলহের সম্ভাবনাটা একেবারে দূর না হোক, কমে আসে। একেবারে কাছে জীবন্ত কোনো শব্দই নেই, শুধু একটা টানা হাওয়া, যেটাকে আমার কেমন করে যেন মনে হচ্ছিল, এই যে মুমূর্ষু দিনটি পৃথিবীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে, তারই যেন দীর্ঘশ্বাস। এরকম অবস্থায় মনটা আপনিই কি করে এক হয়ে যায় এইরকম পরিস্থিতির সঙ্গে। আমার বয়সও তো প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি; আমারও জীবনের সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এইবার বিদায়ের পালা—এই মনে করে চোখের পাতা ভিজে-ভিজে হয়ে আসছে—একটা দীর্ঘশ্বাসও ঠেলে আসছে বুকে, এমন সময়..."

"মীরা, জিজ্ঞেস কর্ বাজে কথাই চলবে? তা হলে উঠি, আমার কাজ আছে ঢের। সাহিত্যিক নই।"

এবার অন্যরকম ভাব, বেশ কিছু গুরুতরই মনে হল। আমি স্বভাবদোষে পড়ে গিয়েছিলামই একটু ঘোরে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আবার শুরু করে দিলাম, 'দীর্ঘশ্বাসটা চেপে আসছে বুকে, এমন সময় যেন হুঁশ ফিরে এল—নিজের মনেই বললাম—বা-রে! এরকম যদি বাজে কাব্যিতে পেয়ে বসে এখানে তা হলে তো সমস্ত রাত বসেই থাকতে হবে। তখন বেশ কিছুক্ষণ কেটেও গেছে সেখানে, ফিরতে অনেকটা পথও, তার ওপর নতুন জায়গা, ভাবলাম এইবার উঠে পড়া যাক। কিন্তু ভাবুকতাটকু মন থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলেও, জায়গাটার নিজের একটা মোহ আছেই, মনে হল আর একটু বসে যাই, এ সুযোগ তো জীবনে বেশি আসে না। এইরকম ওঠবার কথা মনে হতেই আর একটু বসে যাই করে করে অনেক বারই হয়ে গেল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। কোনো আত্মীয়-কুটুমের বাড়ি গেলে—যেমন ধর, যখন তোমাদের বাড়ি যাই, একবার এর কথায় একবার ওর কথায় আটকে যেতে হয়। এখান জায়গাটাই যেন টেনে টেনে রাখছে। বেশ খানিকটা এইভাবে কাটবার পর হঠাৎ এক সময় যেন আমার চমক ভাঙল, যেন কোথায় বা কিসের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম—হয়তো বা নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও, এই আবার ভেসে উঠেছি। ভেসেও যে উঠলাম তাও একটা নতুন পরিস্থিতির মধ্যে। সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ, সেই যে হাওয়ার শনশনানিটুকু ছিল তাও আর নেই। তোমরা আবার চটে যাবে, নইলে বলা যেত হঠাৎ যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই দিনটার মৃত্যু ঘটে গেছে কখন। আমার নিজের অনুভূতিটাও গেছে বদলে একেবারে। সেই মুগ্ধ আনন্দের ভাবটা গিয়ে গভীর রাতে এই রকম খোলা নির্জন জায়গার নিটোল নিস্তব্ধতা আমায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে অভিভূত করে ফেলছে আস্তে আস্তে! গা-টা ছমছম করে আসছে, একটা অহেতুক

ছেলেমানুষী ভয় বুকটাকে চেপে যেন সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ করে করে আনতে লাগল। শনশনানিটুকু গেলেও হাওয়া একটু রয়েছেই, এত খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, আমার মন শুধু যেন বলতে লাগল—'একটু শব্দ দাও, পৃথিবীর এতটুকু শব্দও শোনাও আমায় কেউ।'

ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা শব্দ উঠলও আকাশ-বাতাস চকিত করে। শব্দের সেরা শব্দই—রাম-নাম : কিন্তু বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। পেছন ফিরে দেখি লাইনের পাশ দিয়েই, প্রায় শ'খানেক গজ দূরে কতকগুলো লোকের একটা ছোট দল চালি করে একটা শব নিয়ে আসছে। জানো বোধ হয়, এইরকম উপলক্ষ্যে হিন্দুস্থানীরা 'রাম নাম সত্ হ্যায়' বলে পথ চলতে থাকে। ওরা ঐখানেই লাইনের বাঁধ থেকে নেমে গেল। আমি তা হলে একটা শ্মশানের কাছেই বসে আছি।

সেই ভয়টা যেমন বেড়ে গেল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সাহসও খানিকটা এল ফিরে। হোক শ্মশান, কিন্তু কাছাকাছি অনেকগুলি লোকের সঙ্গ তো পাওয়া গেল। একটুও বসেও রইলাম, তার পর ফিরব, দাঁড়িয়েও উঠেছি, ওদের মধ্যে একটা যেন কি নিয়ে একটু চঞ্চল আলোচনা উঠল। শ্মশানটা খানিকটা দূরেই, কিন্তু ঐ রকম ফাঁকা জায়গায় আওয়াজটা স্পষ্ট হয়েই ভেসে আসে। একটু কান পেতে থাকতেই বুঝতে পারলাম, শবদেহটা তীরের কোল থেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে এসে দাহ করবার কথা হচ্ছে, কারণটাও টের পেলাম—নদীতে জল নেমেছে।

পাহাড়ি নদীতে এই রকম হয়। এদিকে কিছুই নেই, দূরে পাহাড়-অঞ্চলে বৃষ্টি নেমে হঠাৎ প্রবল তোড়ে দু কূল চেপে জল নেমে আসে। তার সঙ্গে ছোটবড় গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, অসাবধান থাকলে মানুষও। কোটালের বানের চেয়েও নাকি ভয়ানক। কখনো দেখি নি, ঠিক করলাম দেখে যেতে হবে।

শোঁ-শোঁ একটা শব্দ উঠেছে দূরে।

একটু দোমনা হয়ে গেছি, এপারে বসেই দেখে নোব, না, ওপারে গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে দেখব? ঠিক করলাম, পেরিয়েই যাই, নীচে স্রোত থাকলে একটু নার্ভাস করে দিতে পারে। পা বাড়ালাম। কিন্তু এই সময় সেই শব্দই হঠাৎ বেড়ে গেল। আবার বসে পড়লাম আমি, ভাবলাম, তোড়টা ঠিক এসে পড়ার মুখে পুল পেরুনো আরো খারাপ হবে।

এইখানে মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেল। ঠিক যে জেনেশুনে ভুল তা নয়, হিসেব বা আন্দাজ করতে ভুল। জলের তোড়টা সেই অনেক দূরের বাঁকটা ঘুরতে শব্দটা হঠাৎ বেড়ে উঠেছিল, এসে পৌঁছুতে যে সময়টা নিল, দেখলাম তাতে আমি স্বচ্ছন্দে পুলটা পার হয়ে যেতে পারতাম। এ যা প্রলয়কাণ্ড দেখছি—হাজার উঁচুতেই হোক না কেন পুলটা, সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু ঐ দশটা কামানের গর্জন কানে নিয়ে, আর ঐ তোড়ের ওপর দৃষ্টি রেখে—রাখতেই তো হবে—এখন পেরুই কি করে?...অনেক ওপরে আমি, দেখছি এপার-ওপার নিয়ে বোধ হয় পাঁচ-ছ ফুট উঁচু একটা ফণা তুলে নেমে এল স্রোতটা,—কী গর্জন, ছোট বড় গাছপালা বুকে চেপে কি আপসানি! কী সে ওলট-পালট খাওয়া! দেখতে দেখতে পুলের থামগুলোয় ধাক্কা খেয়ে যেন আরো ক্ষেপে উঠে হুঙ্কার দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতেই নদীর জল এক ফুট দু ফুট করে বাড়তে বাড়তে তীরের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠে এল।

"দেখা হল একটা জিনিস জীবনে, পঞ্চানন রুদ্রের ভ্রূকুটি-কুটিল আননটা। কিছুক্ষণ পর্যন্ত যেন কোনো চিন্তা করবার ক্ষমতাই হারিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হল। সেই তখনকার মতনই গেছি তলিয়ে—তখন ছিলাম সৌন্দর্যের মধ্যে, এখন যেন প্রলয়ের বিভীষিকায়। তখনকার মতোই এক সময় ভেসেও উঠলাম সেই অতল থেকে; চিন্তা হল—পেরুই কি করে?

"গোড়াতেই যেমনটা ছিল, শুকনো নদীর ওপর হঠাৎ যেন সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়া, এখন ঠিক ততটা না হলেও খুবই ভীষণ তো। নেড়া পুলের এক ফুট অন্তর পাতা কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে পেরুনো, একটু যদি মাথা ঘুরে পা টলে গেল তা হলেই আর দেখতে নয়। শুনেছি এসব স্রোত যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ চলে যায়, কিন্তু সে-হঠাতের তো কোনো আন্দাজ নেই; জলের পরিমাণ যেমন দেখছি, পাহাড়ে বৃষ্টি থেমে গিয়ে থাকলেও এ জল বেরিয়ে যেতে অন্তত সমস্ত রাত কেটে যাবে। বৃষ্টি হতে থাকলে তো কথাই নেই।

"কি করব ভাবতে ভাবতেই রাত অনেকটা এগিয়ে গেল। ঘড়িটা নিয়ে যাই নি, কিন্তু আকাশে চাঁদ যেমন ঢলে পড়েছে নীচে, প্রায় বোধ হয় দশটা হয়ে এল।

"ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা কথা মনে হল; একজন সঙ্গী পাওয়া গেলে বোধ হয় সুবিধে হত, যদি নেমে গিয়ে ওদের বলি, এক জন কাউকে দেয়—শুধু পুলটা পেরিয়ে দিয়ে আসতে...

"আমার চিন্তাটাই যেন রূপ নিয়ে আমার পাশে এসে পৌঁছাল; দেখি আমার পেছন দিয়ে কখন একটি লোক এসে রেলের বাঁধের ওপর উঠতে যাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, আমি গিয়েছিলাম পুজোর ছুটিতে, পুজো শেষ করে, বেশ একটু ঠাণ্ডার ভাব এসে গেছে তখন। লোকটার গায়ে আগাগোড়া একটা সাদা চাদর জড়ানো, মাথার ওপর দিয়েও ঘুরিয়ে আনা, এদিকে বেশ সরল বলে মনে হল। একেবারে তালের মাথায় পেয়ে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, ওই, যেন এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, হঠাৎই দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবু, আপনি অসময়ে এখানে বসে যে!'

"হিন্দিতেই করল জিজ্ঞেস। বললাম, "দেখো না, বেড়াতে এসেছিলাম, আচমকা নদীতে ওই বান ডেকে এসে..."

"'পেরুতে ভয় হচ্ছে?'—একটু অদ্ভুতভাবে হাসল লোকটা, মনে হল তাতে যেমন ভরসা দেওয়ার চেষ্টা আছে, তেমনি একটু যেন ব্যঙ্গও রয়েছে মেশানো, বলল—'অমন হয় পেরুতে ভয়, ভয়ঙ্কর নদীই তো। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছুই নেই। এই তো আমিই যাচ্ছি, আসুন না, আসবেন?...আসুন তা হলে, আমার আবার সময় নেই।'

"বলতে বলতেই পা বাড়িয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসে সঙ্গ নিলাম; ও আগে আগে, আমি ঠিক পেছনে। পুলের ওপর উঠে যেতে যেতে একটু কথাও হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঐ ওদের দলের লোক?...যেন ওদিক থেকেই উঠে এলে মনে হল।'

"বললে, 'হ্যাঁ।'

" 'কোথা থেকে আসছ তোমরা?'

"কি একটা নাম বললে মনে নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, লোকটার বেশ সহজ সিধা চাল দেখেই হোক, বা যেজন্যেই হোক, আমিও বেশ স্বচ্ছন্দেই স্লিপারের ওপর পা

ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছি, ভয়ের ভাবটা একেবারেই নেই। সেই কথাই বললাম ওকে। বললাম, 'একজন সঙ্গী পেলে সত্যিই বড় সুবিধে হয়। তোমার আবার দেখছি পা খুব শক্ত, একটুও ওদিক-ওদিক হচ্ছে না।'

''আমার যে অব্যেস হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক বলেছেন যে একজন সঙ্গী পেলে ভালোই হয়। নৈলে এ অবস্থায় বড্ড যেন একলা আর অসহায় বোধ হয়, না?'

''বললাম, 'সত্যি তাই, খুব পেয়ে গেলাম তোমায়, কপালের জোর বলতে হবে আমার।'

''আবার ঘুরে চেয়ে সেই রকম হেসে বলল—'কপালের জোর কি আমারই নয়? কেমন পথের মাঝেই পেয়ে গেলাম আপনাকে!...যেন আমার জন্যে বসেছিলেন নয় কি?'

''আমিও হেসেই বললাম, 'তা ভিন্ন আর কি? কিন্তু, হ্যাঁ, ঠিক কথা, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তা তুমি সবাইকে ছেড়ে হঠাৎ এমন করে একলা যে নদী পেরুতে যাচ্ছ? যাচ্ছই বা কোথায়?

''এবার আর কথায় নয়। এ প্রশ্নের উত্তরটা একেবারে অন্যভাবে পাওয়া গেল; দেখি কেউ নেই আর আমার সামনে!''

''ঠিক পরের মুহূর্তটা আমার কি হয়েছিল মনে নেই। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া থাকার জন্যে বা যে কারণেই হোক, সম্বিৎটা ফিরে আসতে নিশ্চয় দেরি হয়নি। দেখি পুলের মাঝখানে একটি কাঠের স্লিপার প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। বিপদটা খুব উগ্র গোছের হওয়ার জন্যেই বোধ হয় জ্ঞানটা বেশ তাড়াতাড়ি আর স্পষ্ট হয়েই ফিরে এল, লোকটার... আর লোক বলিই বা কি করে—প্রত্যেকটি কথা তার আসল মূর্তি ফুটে ফুটে উঠল আমার কাছে—বুঝতে বাকি রইল না কী দুকূল হারা নদী পার হয়ে ওর কাছে এ নদী যে গোষ্পদমাত্র এখন! সত্যিই কত যে অসহায় ও, কী যে একা!

''এই 'একা' কথাটা হঠাৎ আমার কাছে যেন অতিরিক্ত বিভীষিকাময় হয়ে উঠে ভয়ের তোড়ের ওপর আর একটা তোড় এনে ফেললে—একা, তাই কি অনন্তপথের যাত্রী এই বিদেহী আত্মা আমায় তার সঙ্গী করে নিতে এসেছিল? নিজের প্রশ্নটাতেই ভয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকট হুঙ্কার শুনে সামনে চাইতেই দেখি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু ছুটে আসছে সামনে। এক মুহূর্তের বিভ্রম, তার পরেই ব্যাপারটা বুঝলাম, সামনের উঁচু টিলাটা ঘুরে একটা ট্রেন মত্ত গতিতে আসছে ছুটে, তার ইঞ্জিনের সার্চলাইট এসে পড়েছে আমার ওপর, দেখেছে ড্রাইভার, প্রাণপণে হুইসিল দিতে দিতে সতর্ক করতে করতে ছুটে আসছে—কিন্তু ফল কি আর সতর্কতার? মৃত্যু আমার দু দিকেই—সামনে ঐ, নীচে এই বিক্ষুব্ধ প্রলয়-পয়োধি।

''তবু ঝাঁপিয়েই পড়ে লোকে এ-অবস্থায়, কিন্তু শরীরের সমস্ত স্নায়ু আমার তখন একেবারে শিথিল হয়ে গেছে। ওদিকে আর এইটুকু মনে আছে যে দুটো হাতে চোখ দুটো চেপে ধরে মাথাটা দিয়েছি নুয়ে।

''তার পরেই মনে পড়ছে একটা যেন বিকট অন্ধকার মূর্তি, ঠিক হাত দুয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে বজ্র-কঠোর স্বরে হুঙ্কার ছাড়ছে...

''ইঞ্জিনটা আর কি। ড্রাইভার ব্রেক্...''

''যাঃ! বেঁচে গেলেন!''

মুখ থেকে কথাটা যেন হঠাৎ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল মীরার, তীব্র উৎকণ্ঠায় হাত দুটো মুঠো করে বুকের ওপর চেপে ধরেছিল, আলগা হয়ে গেল।

স্ত্রীও ঠিক ঐ ধরনেরই কিছু বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে ওর পিঠে একটা মৃদু চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "দ্যুৎ অমন করে বলে! হুঁশ হারাস যে গল্প শুনে!..."

"উঃ ভাগ্যিস!" বলে আরো খানিকটা সামলে নিলেন।

অক্ষয়বটোপাখ্যানম্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরগণা তিনভুবনপুরের অন্তর্গত ঘাটভুবনপুরের পত্তনীদারনী মহামহিম মহিমার্ণবা শ্রীল শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাক্‌রুণের পাল্লায় পড়ে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে যে কি নাজেহাল হয়েছিলাম তা আগে বলেছি, এর জের আজও চলছে, মেটেনি। ঘাট ভুবনপুরের ঘটনার জের টেনে এসে পড়ল আগয়া নদীর তটভূমিতে সেই বিশাল বটবৃক্ষের ঘটনা। অক্ষয় বট-উপাখ্যানম্। এর জন্য ভূতভুবনপুরের ব্যাপারে যতখানি নাজেহাল হয়েছিলাম আমি; না, আমি না, নাজেহাল হয়েছিলেন রামকালীবাবু।

অবশ্য রামকালীবাবু আমারই ছদ্মনাম। ভূত সম্পর্কে গবেষণা করবার আগে ওই নামটা আমি গ্রহণ করেছিলাম।

যাক গে।

না, যাবেই বা কেন? ভাগ্যে নামটা নিয়েছিলাম—না হলে ওই রামনামটা ধরে কি লোকেরা অজ্ঞান অচেতন আমার কানের কাছে চিৎকার করে ডাকতেন? আর রামনাম শুনলে কি গয়েশ্বরী ঠাকরুণ তাঁর দাসিনী ঝি এবং ঘাটভুবনপুরের সেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত ভয়ঙ্কর মূর্তি কেঁপে ওঠা এবং ধেই ধেই নৃত্যরত ভূতকুল পিন ফোটানো বেলুনের মতো চুপসে যেত?

এখন জ্ঞান তো ফিরল। মানে মানে কলকাতায় ফিরে এলাম। এবং ভূতপুরাণটা লিখে ফেললাম। তাতে কিন্তু উলটো ফল হল। আমি আমার থিসিসে প্রমাণ করতে চাইলাম এক, কিন্তু লোকে বুঝলে অন্য।

বলতে চাইলাম—ভয়ের মধ্যে ভূতের বাস—

লোকে বুঝলে—ভূত না মানলে সর্বনাশ।

আমি বলতে চাইলাম—মানুষকে ভূত পারবে না।

লোকে বুঝলে—ভূত কখনো হারবে না। ঘাড়ের দখল ছাড়বে না। যাক—একথা আরো অনেক রকম করেই বলা যায়—কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তবে ফ্যাসাদে পড়লাম তাতে সন্দেহ নেই; কারণ চিঠিপত্রসহযোগে নানান প্রশ্ন আসতে লাগল। বিশেষ করে রামাইভূত আর কালীবাবুর বাড়ির সেই প্রেতটির খোঁজ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসতে লাগল। একটি ছেলে তো আমাকে লিখলে—রামাইয়ের ঠিকানা দেবেন—আমি তার পেন-ফ্রেন্ড হতে চাই। এসব থেকেও নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু এটা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল যে মধ্যে মধ্যে কেউ যেন আশপাশে খসখস ফিসফাস করে ওঠে। কখনো বা ফিসফিসিনির মধ্যে শুনি—বলি—শুনছ!

বুক ঢিবঢিব করে ওঠে, চোখ পিটপিট করে, সামনে যেন সরষে ফুল ফোটে—মনে মনে বলি—"জয় রাম শিবরাম! সীতারাম হে! ভূতেদের হাত থেকে কর ত্রাণ হে!"

আশ্চর্য, যে নামে গয়েশ্বরী এবং তাঁর ভূতকুল পিন ফোটানো বেলুনের মতো চুপসে গিছলেন প্রায় এক মুহূর্তে, সে নামেও ফিসফিসিনি এবং এই খসখসানি বন্ধ হয় না! বুঝতে পারি-না ব্যাপারটা কি?

যম দত্তকে জিজ্ঞাসা করলাম। দত্তমশায় মালদার আমসীর মতো লম্বা শুকনো মুখখানা নিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে গোটা মুখের মধ্যে অবশিষ্ট সাড়ে চারখানা দাঁত বের করে বললেন—ওসব গল্প-লিখিয়েদের মাথায় আসবে না। মাথায় তো গোবর পোরা আছে। বলি ভূত কতপ্রকার সেটা জানা আছে কি?

বললাম—ভূত প্রেত পিশাচ—

দত্ত বললেন—তোমার মাথা। ভূত প্রথমত দুই প্রকার—মৌলিক ভূত এবং যৌগিক ভূত। সেটা জান?

হাঁ হয়ে গেলাম। দত্ত বললেন—মৌলিক ভূত তারাই যাদের ভূত করেই ব্রহ্মা তৈয়ারি করেছিলেন। তারা পুরুষানুক্রমে ভূত—যেমন ধর মহাদেবের প্রধান ভূত নন্দী মহারাজ—নন্দী মহারাজের বেটা দণ্ডী কি শৃঙ্গী, তস্য বেটা জঙ্গী, তস্য তস্য বেটা রঙ্গি—; এ নামগুলো অবশ্য ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু বেটার বেটা তস্য বেটা তস্য তস্য বেটা তো আছেই। অর্থাৎ খাঁটি ভূত। মানে কালিকট বন্দরে ভাস্কোডিগামার সঙ্গীসাথী খাঁটি পর্টুগিজের মতো খাঁটি ভূত। এদেশের লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা খ্রিস্টানের মত হল যারা, তারা হল মানুষ মরে ভূত। কেউ কিছুর জন্যে মানে অপঘাতে মরার জন্যে ভূত হল—কেউ পিণ্ডি না পেয়ে ভূত হল—কেউ মরার সময় খারাপ লগ্নে মরে ভূত হল। তারা হল দুসরা রকমের ভূত। তারাই রাম নামে চুপসে যায়। অরিজিনাল ভূতেরা হল খোদ শিবের খাস চেলা—তারা এই কালের হিপিদের মতো চব্বিশ ঘণ্টাই সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে বোম বোম রাম রাম করে নাচছে—তারা রাম নামে ভয় খাবে সেটা বলে কেডা? হুঃ—যত সব—!

আমাকে মানতে হল কথাটা। হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিক। এটা তো আমার বোঝা উচিত ছিল। ভূত দুই প্রকার—ভূতের বেটা ভূত, আর মানুষ মরে ভূত। ভূতের বেটা ভূত হয়, তাদের মরণ নাই। মানুষ মরে ভূত হয়, তারাই—আবার ভূত মরে মানুষ হয়।

দত্ত বললেন—আরো আছে হে বাপু। মানুষ মরা ভূতগুলো শুধুই ভূত, তার বেশি বিশেষ কিছু না; ওই ধর—বামুন মরে ব্রহ্মদৈত্যি, কায়েত মরে যমরাজার আদালতে কেরানী, গলায় দড়ি দিয়ে মরে 'গলায় দড়ে', আগুনে পুড়ে মরলে চামড়া-ওঠা ছালছাড়ানো ও ওলের মতন রং যথা ভূত, তারপর ধর—জলে ডুবে মরা মানুষ—মেয়ে হলে শাঁকচুন্নী, পুরুষ হলে 'বিলচর' কি 'খালচর' ভূত। অনেক আছে। এরাই রাম নামকে ভয় করে। আর আসল ভূতেরা হল শিবের সেপাই—নন্দীর সন্তান—ওরা দেবতাদের মতোই—সেই কারণে ওদের আর এক নাম হল 'অপদেবতা'।

বটে ত! ঠিক বলেছে দত্ত। অপদেবতাই তো বটে। শিব পঞ্চমুখে রামনাম গান করেন ডমরু বাজান নন্দী মধ্যে মধ্যে শিঙাতে ফুঁ দেয়। আর অপদেবতা ভূতেরা—ভূত পত্নীরা বা অপদেবীরা ধুতরা গুলতে এবং কল্কে ফুলের মালা পরে, পায়ে মরার হাড়ের নূপুর পরে তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ—থিয়া থিয়া করে নাচে। তারা রাম নাম শুনে ভয় করবে কেন?

তা হলে? একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তুমি বলছ যারা খসখস করে নড়েচড়ে বা অদৃশ্য থেকে ফিসফিস করে সাড়া দিচ্ছে তারা মানুষ মরে ভূত নয়?

না—। বলছি যারা রাম নাম শুনেও মরছে না—তারা মানুষ মরা ভূত নয়, খাঁটি তুর্কীর মতো খান-খানান, কিংবা খাঁটি হারমাদ কি ইংরেজ কি ফরাসি ফরাসিদের লর্ড কাউন্ট কি মিস্টার মশিয়েদের মতো খাঁটি ভূতের বেটা ভূত কি অপদেবতা, কি উপদেবতাও হতে পারে।

কথাগুলি যম দত্ত কট্-কট্ করে কামড়ে-কামড়ে বলার মতো বললে। তবে তাতে ফোকলা দাঁত বুড়োর কামড়ের মতো খুব কষ্ট বা যন্ত্রণাদায়ক মনে হল না। তার উপর বুড়ো আমাকে ভালোবাসে। বললে—দেখ না ইশারা-টিশারা দিয়ে—যদি কিছু নতুন তত্ত্ব কি তথ্য মেলে, তা হলে আমেরিকা রাশিয়াকেও হারিয়ে দিতে পারবে। ওরা চাঁদে ল্যান্ড করে যা জানবে—তা থেকে অনেক বেশি জানা যাবে। মানে মানুষ মরে যেখানে যায় সেখানকার খবর পেয়ে যাবে।

কথাটা বুড়ো মন্দ বলেননি; মনে লাগল। রাশিয়া আমেরিকা চাঁদে নেমে ফিরে আসবে। আমি ঘাটভুবনপুরে বৈতরণীর ঘাটের এলাকা পর্যন্ত গিয়ে তো ফিরে এসেছি। আমারই বেকুবি, আমি কিছু নিদর্শন আনতে পারিনি। এক আধটা ভূতের নখ কি পেতনীর চুল কি মূলোর মতো দাঁতের একটা দাঁত কিংবা খেয়াঘাটের মাটি, এসবের কিছুই আনতে পারিনি। পারলে তো বাজিমাৎ হয়ে যেত, তা যখন আনা হয়নি তখন তো প্রমাণ করতে কিছু পারছি না। তবে দেখছি গ্রহগ্রহান্তরে—রেডিও সিগন্যালের মতো ওদের কাছ থেকে ইশারার যেন সিগন্যাল পাচ্ছি। সেই ইশারায় সাড়া দিয়ে দেখাই যাক না। যম দত্ত উপদেশ দিলে—প্রথমেই কিন্তু 'রামনাম সত্য হ্যায়'; বুঝেছ! তাহলে আর ট্যাস ফিরিঙ্গি কি কালো দেশী তুর্কীর মতো মানুষ মরা ভূত আসবে না। মানুষ মরা ভূত হলে চামচিকে হয়ে ফুড়ুৎ হয়ে যাবে; আর খানদানী মৌলিক ভূত হলে বলবে—নাচব নাকি? যেমন নাচি শিবের সঙ্গে?

ফলটা হাতে-হাতেই ফলল।

আশেপাশে যখন তখন ফিসফিসিনি খসখসানি কমে গেল। তবে মধ্যে মধ্যে

দু'চারখানা দীর্ঘনিশ্বাস কি মিহি নাকিসুরে করুণ খুনখুনুনি আওয়াজ পেতে লাগলাম। যার অর্থ হল—হায়রে হায় বা তুমি মানুষটা বড় খট্‌রোগা। বেরসিক লোক।

ওতে আমি কিন্তু এতটুকু সংকোচবোধ করলাম না।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'রামনাম সত্য হ্যায়'! মানুষ মরা ভূতের পরওয়া হম নেহি করতা হ্যায়! আওয়াজ ছাড়লেই সব একেবারে নিস্তব্ধ। বুঝতে পারি—শূন্যলোকে অদৃশ্য চামচিকে বা ফড়িংয়ের মতো ভূতের দল উধাও হয়ে গেল।

হঠাৎ সেদিন। এই তো ১৯৭৬ সালের ৪ঠা বৈশাখ।

ওই যে ঝড়ের দিন। পেল্লায় ঝড় হয়ে গেল। গোটা বাংলা দেশই প্রায় তছনছ হল সেদিন। বেলা তিনটে থেকে ঝড়ের শুরু হল—দমকায় দমকায় তিনবারে প্রায় ঘণ্টা চারেক ঝড় আর জল। পশ্চিম আকাশ অন্ধকার করে সে ভীষণ কালো পালবন্দী বুনো মহিষের দলের মতো মেঘ যেন তেড়েফুঁড়ে খুরের দাপটে, শিঙের খোঁচায় গাছপালা টেলিগ্রাফের পোস্ট উপড়ে দিয়ে (বোধ করি সমূলে উৎপাটিত করে বলাই ভালো) ঘরের চাল উড়িয়ে দিয়ে উলটে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। আমি তার আগের দিন রাত্রি থেকে ট্রেনে আসছিলাম। ৩রা রাত্রে পাটনা থেকে রওনা হয়ে দেড়টা দুপুরে নেমেছিলাম আমাদের বাড়ির ইস্টিশান—আমদপুরে; সেখান থেকে একটা মোটরে লাভপুর গিয়ে মাকে প্রণাম করে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম—তখন বেলা দুটো। গাড়িতে চড়ে মনে হল পশ্চিম আকাশের একেবারে দিগন্তে—প্রথম বুনো মোষের পালটা যেন গর্ত থেকে মুখ বের করে তৈরি হচ্ছে; ওদের দলপতি একটা হাঁক দিয়ে ছুটতে শুরু করলেই দড়বড় দড়বড়—গাঁ-গাঁ শব্দ তুলে গোটা পালটাই দৌড়ুতে আরম্ভ করবে। ভয় হল কিছুটা, কিন্তু হলে কি হবে আমারও একটা কেমন গোঁ আছে, সেই গোঁয়ের বশে মেঘ গ্রাহ্য না করেই বললাম—চলো, ছেড়ে দাও গাড়ি।

মোটরে সাত মাইল পথ? পথ এখন নতুন কালের পিচঢালা পথ। কতক্ষণ লাগবে? বড় জোর বিশ মিনিট। ইতিমধ্যে মনে হল মোষের দলটা যেন দিগন্তের ওপাশে মুখ সরিয়ে নিয়ে—বোধহয় মতলব বদলালে। দৌড়টা আজ মুলতুবি রাখলে। শুধু তাদের নিশ্বাসে ওড়া খানিকটা লাল ধুলো উড়ল—কিছুক্ষণ বৃষ্টি হল; আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু হরি হরি! হরির মতলব বোঝা ভার। তিনি মারতেও আছেন রাখতেও আছেন। সবেতেই বোধ করি সমান খুশি। আমদপুর স্টেশনে এসে পৌঁছলাম যখন তখন পশ্চিমাকাশে কালো স্লেটের মতো রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দক্ষিণে বোলপুর, উত্তরে সাঁইথিয়া পর্যন্ত আকাশ জুড়ে সোজা পুবমুখে এগিয়ে চলেছে। উপমা ওই পালবন্দী বুনো মোষ বা বাইসনের সঙ্গে। শিং নীচু করে লেজ পিঠে ফেলে পরস্পরের গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি লেগে গর্জন করতে করতে ছুটেছে।

এরই মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো; একটা তীব্র আলো ঝলসানির সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জালে। যেন মোষেরা শিঙে শিঙে টুঁ মারলে—তাতেই উঠল আগুন এবং আওয়াজ। তার সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে এল বৃষ্টি। সামনেই প্ল্যাটফর্মের ওপাশে পয়েন্টসম্যান প্রভৃতিদের কোয়ার্টারের ওধারে অনেককালের একটা বাগান। বাগানটার গাছগুলোও অনেকদিনের। যেন মাথায় বাঁশের বাড়ি খেয়ে বড় গাছগুলো একেবারে বাপ বলে শুয়ে পড়ল। স্টেশনের

ওয়েটিং রুমের খোলা জানলা একখানা উড়ে চলে গেল। কোথা থেকে ঝড়ে উড়ে এসে প্ল্যাটফর্মের উপর সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ল একখানা আস্ত টিন বা করোগেটেড শিট। স্টেশন ওয়েটিং রুমে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল, পাখা চলছিল, ফুস করে আলো নিভে গেল। পাখা চলার শব্দ থামল এবং ঘোরার বেগ মন্থর হল—বোঝা গেল ইলেকট্রিক গেছে। ওয়েটিং রুমটার মধ্যে একঘর লোক ঠাসাঠাসি হয়ে বসে রইলাম। বাইরে খোলা প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, সেখানে মোটামোটা ফোঁটায় ঘন ধারায় বর্ষণ চলছে। দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মের রাঙা কাঁকর ফেলা জায়গায় জল জমে জল বইতে লাগল। আমরা বোবা হয়ে বসে রইলাম। এর মধ্যে সৌভাগ্য বা সুরাহা হল এই যে, ঝড় বৃষ্টির ফলে গুমোট গরমের অসহনীয়তা আর রইল না। একঘর লোক, তা প্রায় জন তিরিশেক—সবাই বোবা হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর জমা জলের উপর বৃষ্টি ধারাপাতের একঘেয়ে দৃশ্য দেখছে এবং শব্দ শুনছে। জলঝড় যখন হয় তখন মানুষকে অভিভূত করা একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মানুষ অবাক হয়ে দেখে, বিমূঢ় হয়ে শোনে। দেখে বৃষ্টি পড়া আর শোনে ঝড়ের গোঙানি।

এরই মধ্যে ঝড়টা কিছু কমল। আকাশ ফরসাও কিছুটা হল। ঝড় অবশ্য বইছিল। আকাশের কালো মেঘ সেই ঝড়ের বেগে পুবদিকে চলে গেল। ওদিকে আপ দার্জিলিং মেলের ঘণ্টা পড়ল। স্টেশনে খবর নিলাম, কলকাতার ট্রেনের কত দেরি? খবর পেলাম না। মাস্টার বললেন—টেলিফোনে সাড়া পাচ্ছি না; বোধ হয় টেলিফোন লাইনে গোলমাল হয়ে থাকবে। দাঁড়ান একটু, মেলটা পার হয়ে যাক।

মনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ঘরে বসতে গিয়ে বসলাম না; প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আপ লাইনের সিগন্যালের দিকে চেয়ে রইলাম। এরই মধ্যে একসময় মনে হল আবার অন্ধকার ঘনালো। উপরে আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম—আকাশে যেন কালো ছায়া পড়েছে। মেঘের ছায়া। পশ্চিমে আবার ঘন কালো মেঘ উঠেছে। তার চেহারা এমন ভয়াল এবং ভীম যে মনে হল এবার স্বয়ং মহিষাসুর বোধ করি গদা হাতে তার বাছা বাছা সৈন্য-সেনাপতির ঠাসা দল নিয়ে বেরিয়েছে।

এরই মধ্যে এল দার্জিলিং মেল। এল, ছেড়ে গেল। মেলখানা ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার হল—আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এক সময় কে যেন বললে—ঘরের ভিতর যান।

কে বললে? কাউকে দেখলাম না। তবে ঝড় এবং জল আবার দ্বিগুণ বেগে নিশ্চিত আসছে বুঝে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকলাম। ঘরে তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে। গুমোটও বেশ ঘন হয়েছে দেখলাম। আর একজন এসে ঘরে ঢুকে বললে—কলকাতার ট্রেনের খবর মিলল না। টেলিফোন টেলিগ্রাফ গন্!

—গন্ মানে?

—গো, ওয়েন্ট, গন। তার ছিঁড়ে গিয়েছে। পোস্ট ধরাশায়ী হয়েছে। অথবা যন্ত্র কোনোপ্রকারে অচল হয়েছে।

—তা হলে?

কে বললে—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। চুপচাপ বসে থাকুন অভিসারের প্রতীক্ষায়—

আকস্মিক প্রচণ্ড গর্জনে সব থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখ তার আগেই ধেঁধে গেছে। রসিকতা করার সব শক্তি মন যেন মাথায় লাঠি খেয়ে অচেতন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল।

ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হতে শুরু হল—তার সঙ্গে সে এক মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত দীর্ঘকায় জটাধারী পাগলের মাথা নেড়ে নেড়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল।

ঘরের ভিতরটা তখন থমথমে অন্ধকারে ভরে গেছে। মধ্যে মধ্যে দু'একজন এক আধ বারের জন্য হাতের টর্চ জ্বেলেই আবার নিভিয়ে দিচ্ছেন। কথাবার্তা নেই। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কথা কইবেই বা কি করে। শুধু খেয়ালী মানুষের পাথর বা কাঁকর ছুঁড়ে ঘুমন্ত কুকুরটাকে সজাগ করবার মতো কথা ছুঁড়ছেন। কেউ ডাকছেন—বাচ্চু! বাচ্চু কোথায় রে?...উত্তর আসে না। তার বদলে ওদিক থেকে কেউ আপসোসের সুরে বলেন—

—ওঃ, গাছের পাকা বেলগুলোন আর একটা গাছে থাকবে না, সব পড়ে যাবে। রমন্দ বললে পেড়ে নাও। তা নিলাম না। আঃ, আর একটা পাব না! খাসা বেল। মড়ার মাথার মতো। আঁ! কজন হাসলে। আবার কেউ বললে, মনটা চাঁহা চাঁহা করছে রে! কিন্তু যাই বা কি করে স্টলে? এনেই বা দেবে কে? কেউ বললে—খিদে পেয়েছে। আমি এরই মধ্যে শুনছিলাম—কেউ যেন খুনখুন শব্দে কাঁদছে। চাপা কান্না। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। মধ্যে মধ্যে দমকা ঝড় এসে ঢুকছিল। হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে বললে—বাস, সব খতম রে বাবা! হয়ে গেল!

একসঙ্গে কয়েকজনই প্রশ্ন করে উঠল—মানে?

—সারারাত এখন থাকুন বসে!

—কেন? কেন বসে থাকব?

—ট্রেন আসবে না।—

—আসবে না?

—না। ঝড়ে গাছ উলটে লাইনের ওপর পড়েছে। সাঁইতের আগে। দার্জিলিং মেল বাতাসপুরে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোপাইয়ের কাছে গাছ পড়েছে, সেখানে আটকেছে দানাপুর প্যাসেঞ্জার। তার পিছনে বোলপুরে দাঁড়িয়ে গেছে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার। সারা জেলার ইলেকট্রিক বুত গিয়া। বাস। তখনো প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে এবং ঝড় চলছে। এরই মধ্যে মনে হল পিছনের দিকে বাথরুমের দরজাটি খুলে গেল এবং কেউ যেন খুন-খুন-খুন-খুন করে করুণ সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"বুঁনি! বুঁনি! শেঁষে গাঁছ চাঁপা পড়ে অপঁঘাতে মরলি বুঁনি! ওরে আমার বুঁনিরে! কতবার বঁলেছি—বঁনে থাকিস নে। হাঁয় হাঁয়, ঝঁড়ের সময় তো চলে এলে পারতিস!

অস্পষ্ট ফিসফিসানি নাকিসুরে কথা কটি ঘরের বাইরে প্ল্যাটফর্মের ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি চমকে উঠলাম। "বুনি! কতবার বলেছি বনে থাকিস নে!" কথা যে বললে সে বাথরুমের কোণ থেকে বেরিয়ে এল। তা হলে ও কি কুনি? রাম রাম রাম! কিন্তু তবুও কুনির যেন খসখসানি ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

মনে পড়ে গেল মা বলেছিলেন "কুনি বুনি" দুই বোন ভূতনীর কথা। 'কুনি' থাকে ঘরের কোণে—'বুনি' থাকে বনে। একদিন এক বামুন গেছিল বনের মধ্যে। কি যেন

জড়িবুটি খুঁজতে গিছল। সেখানে বামুন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শুনতে পেলে কেউ যেন বলছে—'কুনিকে বলো গিয়ে বুনির ছেলে হয়েছে।' বামুন প্রথমটা কেয়ার করে নি, পরে বার বার ওই কথাগুলো শুনে কেয়ার না করে পারলে না। শুনলে কিন্তু বুঝতে কিছু পারলে না। যাই হোক, বাড়ি ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে ধর একটু চা খেতে খেতে বললে—'বামনী, আজ বনে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে!'

বামনী বললে—আশ্চর্য কাণ্ড? কি রকম আশ্চর্য কাণ্ড? তারপর বললে—তোমার তো সবই আশ্চর্য কাণ্ড! যতসব—হুঁঃ!

বামুন বললে—শোন তবে। বলে বললে—বনের মধ্যে বুঝলি কিনা—আমি মাটি খুঁড়ছি আর কে যেন কোথা থেকে বললে—কুনিকে বলো গিয়ে বুনির ছেলে হয়েছে!

আমি প্রথমটা কেয়ার করিনি। কিন্তু সে নাগাড়ে বলে চলল—মেয়েছেলের গলা, তাও একটু একটু খোনা খোনা, ওই এক নাগাড়ে বলে গেল—কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হয়েছে। কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হয়েছে—ও বাঁমুন, কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেলে হয়েছে।

আমার শেষটা কেমন গা ছমছম করে উঠল; আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

বামনী বললে—খুব বীরপুরুষ আমার। ভালো করে দেখলে না একবার খুঁজে পেতে? কোনো বদমাশ মেয়েছেলে তোমার সঙ্গে মস্করা করেছে। ভয় দেখিয়েছে। খুব ছুটেছ তো?

বলতে বলতে কথা বলা আর শেষ হল না, বামনীর মুখের কথা মুখে থাকল চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল—বামুন আতঙ্কে আঁ আঁ করে উঠল। কারণ ঘরের মধ্যে থেকে—অর্থাৎ ঘরের কোণ থেকে এই এক কালো ধিঙ্গী মেয়ে, এই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, এই ভাঁটার মতো চোখ, পেঁচার মতো নাক, মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। আর মুখে সে বেশ সুর করেই বলছিল—কঁয় দিবঁসে? কঁয় দিবঁসে? কঁদিঁন হঁলো, কঁদিঁন হঁলো?

বলতে বলতে এবং নাচতে নাচতে সে বেরিয়ে চলে গেল বনের দিকে।

এরা কি সেই কুনি এবং সেই বুনি?

মনে তো তাই হচ্ছে। বললে—ঝড়ের সময় তো পালিয়ে এলে পারতিস! সেই বুনি এবং সেই কুনি না হলেও তাদেরই সন্তান-সন্ততি কেউ হবে। এরা তো মানুষ মরা ভূত নয়, এরা হল আদিকালের মৌলিক ভূত—কোণের অন্ধকারের ভূত কুনি—বনের অন্ধকারের ভূত বুনি। এরা মৌলিক ভূত—এদের বংশানুক্রম আছে, এরা বিয়ে করে, এদের ছেলেপিলে হয়। এরা রামনামে গয়েশ্বরী বা মানুষ মরা ভূতদের মতো পিন ফোটানো বেলুনের মতো চুপসে মরা চামচিকের মতো হয়ে যায় না।

আমি তখনো শুনছিলাম—কুনি কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের মধ্যে চলেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। না ফেলে পারলাম না।

ঝড় থামল কিন্তু সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকার। ইলেকট্রিক লাইন হয়েছে, বড় বড় গ্রামে ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক জ্বলে, স্টেশনে ইলেকট্রিক জ্বলে। সব অন্ধকার। কেবল টর্চ মধ্যে মধ্যে জ্বলছে এবং নিভছে। তাতে যেন অন্ধকার আরো ঘন হচ্ছে। এরই মধ্যে মানুষ আটকে আছে স্টেশনে। রেললাইনে গাছ উলটে পড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ। বাস নেই। রাস্তার উপর গাছ পড়েছে। দোকানে খাবার নেই। অন্ধকারের মধ্যে টর্চের ইশারা আর হাঁক।—

ও হে—!

ও—!

এরই মধ্যে একটা আশ্রয় পেয়েছিলাম। ছোট লাইনের মাস্টার একটি ঘরে একটি বিছানা-পাতা খাটে আশ্রয় দিয়ে বলেছিলেন—কি করবেন? উপায় তো নেই—এইখানে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিন!

সামান্য খাদ্যও মিলেছিল। ক্লান্ত হয়েই ছিলাম—শুয়ে পড়ে ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। আলো ছিল না, পাখা ছিল না। না থাক, মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছে—ঝড় থেমেছে—একটু একটু শীত-ধরা-ধরা হাওয়া দিচ্ছে; রাত্রি গভীর বলে মনে হল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়েছিলেন মাস্টার, সেটা নিভে গিয়েছে। একটা খোলা জানালা দিয়ে দুধের মতো সাদা জ্যোৎস্না এসে মেঝের উপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। শান্ত পৃথিবী। এই ঘণ্টা কয় আগে যে এত বড় প্রলয়ের মতো ঝড় হয়ে গেছে সে কথা কে বলবে! আমদপুর স্টেশনের সাইডিং লাইনে কোনো একটা এঞ্জিনের স্টিমের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ বেজে চলেছিল। তার সঙ্গে আরো কিছু। অর্থাৎ আরো শব্দ ছিল। এঞ্জিনের হুইসিল দিয়ে স্টিম বের হচ্ছে, বোধ হয় যার জন্য একটা টানা কোঁ বা পোঁ শব্দ মিলে রয়েছে। এবং আরো শব্দ রয়েছে।

হ্যাঁ, তার সঙ্গে আরো কিছু আছে। কানটাকে যথাসাধ্য খাড়া করলাম—অর্থাৎ সজাগ বা সতর্ক। বুঝতে পারছি না। একটা পেঁচা ডেকে গেল। দুটো কুকুর যেন কাঁদছে। অনেক দূরে যেন অনেক লোকের সাড়া।

হ্যাঁ, অনেক লোকের সাড়া। এই অনেক কিছুটা যেন অনেক লোকের সাড়া। যেন অনেক দূরে অনেক লোকে একসঙ্গে হয়তো বা জটলা করছে নয়তো গানটান করছে। যেমন ধর্মরাজ পুজোয় কি গাজনে ভক্তেরা মিলে বোলান গান করে। মনে পড়ল ছেলেবেলায় মনসার ভাসান গান শুনতাম—তাতে বেহুলা কলার মান্দাসে লখিন্দরের দেহ নিয়ে নদীতে ভেসে যেত; তাই বর্ণনা পরে পাঁচ-ছ জন গায়কে গান গাইত—

"জলে ভেসে যায় রে—সোনার কমলা—।"

আর দলসুদ্ধ সুরে ধুয়ো গেয়ে উঠত—"অ—গ—অ।"

কলার মান্দাসখানি নদীসে উচ্ছলা

মান্দাস উলটি দিতে হাসে খলখলা—

—অ—গ—অ! জলে ভেসে যায় রে—এঃ!

এতে একটা হ্যাঁক দিয়ে খপ করে থেমে যেত!

পাশের বিছানায় ভাইপো বাসু ঘুমুচ্ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকাচ্ছে। জলঝড় এবং সর্বনাশের মাতন থেমে গিয়ে এখন জমিয়ে ঘুম দেবার (বাসুরা বলে—'পিটোবার') বাত অর্থাৎ আবহাওয়া হয়েছে। আমিও চোখ বুজতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। জানালা দিয়ে ওই অনেক দূরের বোলান গানের মতো বহু লোকের সমবেত কণ্ঠের একটা কিছু আমাকেই ডাকছে বলে মনে হল। ওরা ডাকুক বা না-ডাকুক, আমার মনে হল আমাকেই ডাকছে বা এ-ডাক কিসের সেটা জানা উচিত। অবশ্য অবশ্য উচিত।

আস্তে আস্তে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। জানালার বাইরে পৃথিবীকে আশ্চর্য সুন্দর বলে মনে হল। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে বৈশাখ মাসের ফসলহীন মাঠটিকে

আশ্চর্য সুন্দর নরম মনে হচ্ছে—ঠিক যেন সদ্য স্নান করা, থান কাপড় পরা, পূজাবাড়িতে গিন্নীবান্নীর মতো লাগছে। মাথার উপরে আবহমণ্ডলের বায়ুস্তর, তার উপরে আকাশ একেবারে ধোয়া মোছা হয়ে তকতক করছে। নীল নির্মল আকাশে আধখানা চাঁদ ঝলমল করছে।

দেখা যাচ্ছে একবারে সেই দূরদিগন্ত পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকে পশ্চিম দিকে আমদপুরের বসতি; আজকাল অনেক বড় বড় হালফ্যাসানের পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। সেগুলো জ্যোৎস্নার মধ্যে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই দিক থেকেই আসছে সাইডিং লাইনে এঞ্জিনটার স্টিম এবং চাপা হুইসিলের শব্দ। কিন্তু ওই অনেক মানুষের সাড়ার মতো শব্দটা তো এদিক থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। উত্তর এবং পূর্ব দিক একেবারে খোলা মাঠ। উত্তর দিকটায় অনেক দূরে গ্রাম। পূবে খানিকটা খোলা প্রান্তরের পর 'আগয়া' নদীর ধারে জঙ্গল এবং রেলের ব্রিজ। ওদিকে তো জনমানবের সঙ্গে এই রাতে একসঙ্গে এত মানুষের সাড়া আসার কথা নয়।

এককালে ডাকাতেরা জমায়েত হত আগয়ার ধারের জঙ্গলে। তারও আগে লোকে বলে আগয়ার বটতলায় নাকি ধর্মরাজের সভা বসত।

বটগাছটার নাকি পাঁচশো বছর বয়স। কেউ কেউ বলে তারও বেশি। আবার অনেকে বলে—না-না—শ' খানেক—মানে একশো বছরের হবে।

তা যত শো বছরেরই হোক, বটগাছটা বিরাট। মূল কাণ্ডটা তো আর নাই-ই। কোন্ কালে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে—এখন গাছটার কাণ্ড যেটা সেটা নামমাত্র ছেলেবেলায় দেখেছি দিনে দুপুরবেলাতেও অন্ধকার থমথম করত গাছতলায়। এবং লোকে বলত—গাছতলায় বড় বড় সাপ আছে, পোকামাকড়ের তো অন্ত নেই। সারাটা গাছের ডালপালা ধরে ঝুলত—শ-দুশো বাদুড়। সন্ধে হলেই তারা আকাশে উড়ত। আর গাছের ডালে ডালে নৃত্য শুরু হত তাঁদের। মানে ভূতদের। আমি জানি না এরা কোন্ ভূত? অর্থাৎ ভেজালহীন আসল, মানে খাঁটি জাত ভূত? না মানুষ মরা ভূত? কেউ কেউ বলত ওই বাদুড়গুলোই ভূত। ভূতটুত নাচে না, রাত্রে বাদুড়গুলো উড়ে চেঁচায় আর খেয়োখেয়ি করে।

আবার এই গাছটাই ছিল অরণ্যষষ্ঠীর ষষ্ঠীবুড়ির আস্তানা। জষ্ঠি মাসে দু'চারখানা গ্রামের মেয়েরা গয়না কাপড় পরে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ষষ্ঠীবুড়ির পুজো দিয়ে যেত, গাছটার গুঁড়িতে হলুদ সিঁদুর লেপে দিয়ে তালশাঁস আম কাঁকুড় খেজুর জাম ছোলাভিজে ও মিষ্টির ভোগ দিয়ে গাছকে গামছা পরিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। গাছটা এখন মর-মর হয়ে এসেছে। সেখান বা ওদিক থেকে এ আওয়াজ কি করে আসবে!

হঠাৎ জানালার বাইরে মাঠের উপর যেন অকস্মাৎ একটি লোককে দেখা গেল। একটি মেয়ে লোক। বেশ একটি মিষ্টি চেহারার মা, চোখে কাজল, গৌরবর্ণ রঙের উপরেও হলুদ হলুদ আভা—হাতে শাঁখা, বেশ ঝলমলে করে কাপড়-পরা চমৎকার মেয়ে। তার পিছনে মুহূর্তে যেন আর একজন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটির ন্যাড়ামাথা, গলায় গুলঞ্চ ফুলের মালা—পরনে থান কাপড়, চেহারাটা ভালো নয় কিন্তু খারাপ লোক বলে মনে হল না।

আমাকে ইশারা করে ডাকলে। হাত নেড়ে নেড়ে ইশারা। আমি তাদের দিকে তাকিয়েই ছিলাম—হঠাৎ যেন অনেকটা অভিভূত হয়ে গেলাম। ভালো করছি কি মন্দ

করছি—এ বিচারের কথা যেন ভুলে গেলাম। এবং একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে—দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম সেই অনেক লোকের কলরব যেন মুহূর্তে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে এই কলরব—এ গাইয়ে হোক আর মন্ত্রপাঠই হোক আর কোনো বিচিত্র আলোচনা-বাসরই হোক—এটা ওই পূর্বদিক থেকেই আসছে। অর্থাৎ আগয়ার জঙ্গলের দিক থেকে!

সেই দিকে তাকালাম। ওদিকে মেয়েটি এবং লোকটি এগিয়ে এসে বললে—নমস্কার।

আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

লোকটি বললে—আসুন!

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বললে—আমাদের সঙ্গে। বলে তারা চলতে লাগল। আশ্চর্য, আমিও চলতে লাগলাম। চলছিই চলছিই। হঠাৎ মেয়েটি বললে—কোনো ভয় নেই আপনার।

লোকটি বললে—খুবই দুঃখিত আমরা—এই এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিলাম।

মেয়েটি বললে—কি করব বলুন! দুর্ঘটনার উপর তো হাত নেই!

লোকটি বললে—আপনি খুব ভাগ্যবান, বুঝেছেন! তা নইলে—

মেয়েটি ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর। কোনো বুদ্ধি নেই তোমার!

লোকটি বললে—কেন?

—কেন? ভয় পেয়ে যান যদি?

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ভয় পাব কেন?

—ভয় তো পায় লোকে। অনেক কারণে পায়।

এবার আমার চমক ভাঙল। মনে পড়ে গেল গয়েশ্বরী দেবীর এজেন্টের কথা। সেই নায়েব গোমস্তা জাতীয় জীবটি যে হ্যা-হ্যা করে হাসত। এঁরা আবার তাদেরই কেউ নাকি? আমার উপর এঁদের নেকনজরের কথা তো জানি। বলেছি ভূত ঝুট হ্যায়! ভয়ের মধ্যে ভূতের বাসা ভাই—নইলে ভূতের কোনো পাত্তা নাই! তা এরা দুজনেও তাই নাকি?

মনে পড়ে গেল দশরথ রাজার বড় ছেলের নাম। মনে মনে বললাম—রামরামরাম জয় রাম জয় রাম! ভূত আমার পুত—পেত্নী আমার ঝি—রাম লক্ষ্মণ বুকে আমার করবে ওরা কি?

আমি মনে মনে বললাম, ওরা কিন্তু দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল। মেয়েটি হাসলে খিলখিল শব্দে, লোকটার হাসি খ্যা-খ্যা বা খ্যাক্-খ্যাক্ করে। আমি চমকালাম এবং প্রায় নিশ্চিত করে বুঝলাম যে, এঁরা মানুষ মরা তাঁরা নন। এঁরা হলেন জাত তাঁরা। নন্দী মহারাজার সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউ এবং কাকার শালার মামার মেসোর পিসের জাতভাই। ভয় এসে গেল—বাতাস দিলে পাতা যেমন দোলে ঠিক তেমনিভাবে ওদের হাসির হাওয়ায় আমার মনের পাতা ভয়ের দোলায় দুলল একটু। তবু আমি সাহস সঞ্চয় করে বলতে গেলাম—হাসছ কেন তোমরা এমন করে?

আমি কিছু বলবার আগেই লোকটি বললে—জয় রাম সীতারাম রামকালীবাবু! রামজীর দোহাই, আপনার কোনো ভয় নাই! আমরা ওতে ভয় পাই না!

আমি বলতে গেলাম—তবে আপনারা সেই আদি ও অকৃত্রিম—

মেয়েটি তার আগেই বললে—উঁ-হু, উঁ-হু, উঁ-হু! আমরা তাও নই! আমরা ভূত মানে অপদেবতাই নই রামকালীবাবু। আমরা হলাম—

লোকটি বললে—উপদেবতা—

মেয়েটি বললে—এক নম্বরের মুখ্যু তুমি। অপতে উপতে তফাতটা কি? যা অপ তাই উপ। লালমুখো বাঁদর আর মুখপোড়া হনুমান—এই তো!

লোকটি বললে—তা হলে?

মেয়েটি বললে—আমরা হলাম শিডিউলড্ দেবতা।

এবার আমার বিস্ময়। এ রকম কথা কখনো শুনি নি। শিডিউল্‌ড কাস্ট আছে—কিন্তু দেবতার বেলায় এরকম তো শুনি নি!

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, তফশিলী দেবতা বলতে পারেন। ও তফশিলী—আমি ট্রাইবাল—মানে ''আদিবাসী''র মতো আদিবাসী দেবতা।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে বললে—ও হল ধর্মরাজের দেবাংশী দেবতা আর আমি হলাম মা ষষ্ঠীর সখী দেবতা। আমরা ভূত নই। আমাদের পুজো হয়।

হ্যাঁ, তা হয়। মনে মনে স্বীকার করতে হল—তা হয়। বারো মাসে তের ষষ্ঠী তেলে হলুদে ডগমগ চেহারা, চোখে কাজল, হাতে ঝিনুক, পরনে ঢেলা পাড় শাড়ি,—মা ষষ্ঠী মাসে মাসে আসেন; কখনো অরণ্যে, কখনো পুকুর নদীর ঘাটে নামেন। পরের সাত পুত কোলে করে নিজের সাত পুত পিঠে করে মা ষষ্ঠী সন্তানবতী মায়েদের আর ছোট খোকাখুকিদের দেবতা। মেয়েরা উলু দেয়, ব্রতকথা শোনে। ছেলেরা প্রসাদ পায়। আর ধর্মরাজও আসেন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায়। ড্যাং ড্যাং ড্যাড্যা ড্যাং; ড্যাডা, ড্যাডা, ড্যাডা ড্যাং—শব্দে ঢাক বাজে—ভক্তেরা নাচে। জয়ো ধর্ম রাজের হে! গুলঞ্চ ফুলের মালা গলায় পরে। পণ্ডিতেরা বলে ধর্মরাজ আসলে হলেন—''অমিতাভবুদ্ধ''। অহিংসার প্রেমের অমৃত তাপস সাক্ষাৎ দশ অবতারের অন্য অবতার। কিন্তু আশ্চর্যভাবে আমাদের দেশে বটগাছ তলায় কি অশত্থগাছ তলায় পাথর হয়ে বসে আছেন। অহিংসার তপস্বী পাথর হয়ে বামুন দেবাংশীদের পাল্লায় পড়ে পাঁঠা খাচ্ছেন। বাতের তেল হাঁপানির কবচ চোখের অসুখের 'আজন' দিচ্ছেন। কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। তাঁদের প্রতাপ খুব। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী থেকে কম নয়। অবিশ্যি এ-কালে সরস্বতী ঠাকরুণের নাম একসঙ্গে কারুর সঙ্গেই করা যায় না, তবে গ্রীষ্মের রাত্রে অচেনা অজানা জায়গায় অন্তত পাড়াগাঁয়ে শুয়ে কি রাত্রে মাঠের পথে যাবার সময় মা মনসাকে হেলা করা যায় না। এ সবই সত্যি কথা কিন্তু এই ধর্মরাজের দেবাংশী আর মা ষষ্ঠীর জয়া-বিজয়ার কেউ একজনা অকস্মাৎ জোট বেঁধে এই নিশুতি রাতে আমার কাছে কেন রে বাপু! উনি তফশিলী দেবতা—ইনি ট্রাইবাল আদিবাসী দেবী—দুজনে খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মতো কি মনে করে মিলেছেন? আর এত মানুষ থাকতে আমার কাছেই বা কেন?

মনে করবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম, সেই শিডিউল্‌ড দেবতা অর্থাৎ ধর্মরাজ ঠাকুরের দেবাংশী বেশ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আসেন না ক্যান মশায়—ঠিক ঠাঁইয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন! চোখে দেখবেন কানে শুনবেন!

মা ষষ্ঠীর জয়া বা বিজয়া।

আমার ভাবনা শেষ হতে না-হতে মেয়েটি হেসে বললে—আমি হলাম ষষ্ঠীবুড়ির

মেয়ে, মানে বুড়িকে হাত ধরে ধরে নিয়ে বেড়াই। তারপর মেয়েটি বললে—নোটন দেবাংশীর কথায় কিছু মনে করবেন না। বয়স হয়েছে তা ছাড়া মানুষটাই একটু গোঁয়ারগোবিন্দ। আজকের তো কথাই নাই। অক্ষয় বট উপাধ্যায় মশায় মারা যাচ্ছেন, আমরা নিরাশ্রয় হচ্ছি—এখন কোথায় যাব? কি হবে? কি করব? আমাদের আর ভাবনার শেষ নেই।

আমি বললাম—অক্ষয় বট উপাধ্যায়?

—হ্যাঁ। তাঁকে আপনি তো জানেন। কতবার তার পাশ দিয়ে গিয়েছেন—তার কাছে বসেছেন—তাকে নিয়ে কত ভাবনা ভেবেছেন। আগয়া নদীর ধারে, সেই আদ্যিকালের বুড়ো বটগাছ, যে দেহ পালটে পালটে—কাণ্ড মরে গেলে ঝুরি নামিয়ে তাকেই কাণ্ড করে বেঁচেছিল—এক সময় হয়েছিল সাত-বক্ষ মহাবট, রাবন হয়েছিল, দশমুণ্ড রাবণ আর আমাদের সাত সাতটা ঝুরি কাণ্ডের সাত ছাতি নিয়ে হয়েছিল মহাবট অক্ষয়বট। একালে তাঁর হয়েছিল একটি কাণ্ড, বাকিগুলো সব থ্রমবসিস্ হয়ে প্যারালিসিস্ হয়ে শুকিয়ে গেছে। আজ এই প্রলয় ঝড়ে সেই শেষ দেহটিও সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন।

নোটন দেবাংশী বললে—ভালোমন্দ অনেক খেয়েছে, সেই বসুমতীর বুকের মধ্যে মধ্যে শেকড় চালিয়েছে। পাথর ফাটানো শেকড়। তার ওপর বড়ঘরের ছাওয়াল তো, সজনে নাজনে শ্যাওড়া ফ্যাওড়া তো নয়—বট! শেকড় গাড়লে তো বাস—মানুষের কুড়ুল না ঠেকলে চক্ষু বুজে একশো দেড়শো বছর, বুয়েচ! তপিস্যেও তো আছে, মহাবিরিক্ষির মহাপেরান, ঠিক জানতে পেরেছে তুমি মশায় আমদপুরে এই গার্ড সাহেবদের—কি রুম কি রুম গো— ?

মেয়েটি একটু হেসে বললে—নেহাত পাড়াগেঁয়ে ভূত তুমি। এইকালে মানুষগুলো চন্দ্রলোকে যাচ্ছে—আর তুমি 'রানিং রুম' কথাটা মনে রাখতে পার না?

—উঁহু, এত সব মনে থাকে না আমার। আমি বাবার পেসাদী মদ পাঁট ভাঙটাঙ খাই আর ধরম বাবার সেই ঘোড়াটা যেটার ডান পা-টা লটরপটর, বাঁ পা-খান খোঁড়া, ধরম বাবার ঘোড়াটা চরিয়ে আনি আর বাস।

মেয়েটি বললে—তা নইলে তোমার এমন দুঃখের দশা কেন হবে বল! মানুষ দেবাংশীরা দিব্যি ধরমবাবার আশীর্বাদী দিয়ে পাফোলা গোদের ওষুধ বেচে টাকার কাঁড়ি করলে—দালান-কোঠা বানালে, আর তুমি—! মাগো চেহারা দেখলেই মনে হবে উপদেবতা না হয় অপদেবতা! হয় ট্রাইবাল নয় অচ্ছুত মানে শিডিউল! বলুন আপনিই বলুন?

শেষ কথাগুলি বললে আমাকে।

আমি বললাম—আমি কি বলব বলুন, আমি কিছু বুঝতেই পাচ্ছি না।

—আচ্ছা তাহলে শুনুন। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিই। মেয়েটি মাথার উপর টানা আধ-ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললে—ওই যে অক্ষয় বট উপাধ্যায়—

আজকের যে প্রলয়কর ঝড়টা গেল—যে ঝড়ে আজ তিনটে গাছ উপড়ে পড়েছে রেললাইনে উপর এবং দার্জিলিং মেল দানাপুর এক্সপ্রেস রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার বারাউনি প্যাসেঞ্জার আটকে পড়েছে, গোটা এলাকাটার ইলেকট্রিক লাইন ছিঁড়ে বিলকুল অন্ধকার

করে দিয়েছে, হাজার কতক ঘরের চাল উড়েছে, মানুষ মরেছে জখম হয়েছে—সেই ঝড়ে ওই অক্ষয় বট উপাধ্যায় সশব্দে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন।

ধরাশায়ী হয়েও একেবারে মরে কাঠ হয়ে যান নি। এখনো পাতা সবুজ আছে, শিকড়গুলো ছিঁড়ে গিয়েও সতেজ আছে, তার হাড়গোড় ডালপালা অনেক ভেঙেছে। একেবারে শিকড়গুলো আকাশের দিকে তুলে মাঠের উপর মাথা অর্থাৎ শীর্ষদেশের ডালপালা গুঁজড়ে পড়েছেন।

—সে ভীষণ শব্দ হয়েছিল। শুনতে পান নি?

বললাম—না।

—আমাদিগে ঝড়ের ঠিক আগে বলেছিলেন—তোমরা খুব সাবধান। তা সাবধান হয়ে হবে কি—একেবারে ডিগবাজি খেয়ে চিৎপটাং। বুড়ো বয়সে এই মরবার আগে আস্পর্ধার কাণ্ড দেখ তো! তার ফল লাও হাতে হাতে!

মেয়েটি বললে—তুমি থাম। আমি বলি।

"ঝড়ে উপড়ে পড়ে উনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। উনি অজ্ঞান হয়েছিলেন, তার সঙ্গে ভীষণ হতাহতের ঘটনা বিপর্যয়ের কাণ্ড। গাছে প্রায় পোকামাকড় ছিল আট দশ হাজার, সাপ ছিল গোটা বারো, বিছে ছিল সাতাশিটা আর মানুষ মরা ভূত ছিল পাঁচজন। একজন গলায়-দড়ে, তিনি এই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। একজন ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরা রাহী, গলা কাটা ভূত। একজন ঠ্যাঙাড়ে ভূত—সে ঠেঙিয়ে মানুষ মারত। একজন হল রাজনৈতিক নেতা ভূত, তিনি পাশের গাঁয়ে বক্তৃতা দিতে এসে হার্ট ফেল করে মরেছিলেন, আর একজন গেছো পেতনী সে বেঁচে থাকতে রাত্রে এসে গাছের ডালে চড়ে ডাল দুলিয়ে লোককে ভয় দেখাত, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে, ঘাড় ভেঙে মারা যায়। এ ছাড়া ছিল অসংখ্য বাদুড়। সেগুলোও হল ওই ষষ্ঠীবুড়ির ষষ্ঠীর ছা, যারা ষষ্ঠীর প্রসাদে মায়ের কোলে জন্মে ছেলেবয়সেই মরে ভূত হয়ে ফিরে এসেছে ষষ্ঠীর কাছে। ওই ডালে ডালে শুকনো হাড়জিরজিরে ছেলের মতো চেঁচাচ্ছে আর নিচু মুখ করে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে। মনে হচ্ছে ওরা বাদুড় কিন্তু বাদুড় ওরা নয়। বাদুড়ের চেয়েও বেশি আছে চামচিকে। বটগাছের গায়ে মরা ডালে গর্তে গর্তে অসংখ্য চামচিকে। ওরাও তাই। ওরা হল পঞ্চতন্ত্রের সেই অনাগত বিধাতারা। অর্থাৎ যারা পরে জন্মাবেন। মা ষষ্ঠীকে তো এরপর মুঠো মুঠো ছানা দান করতে হবে!

মেয়েটি বললে—এরা সব মরে একাকার হয়ে গিয়েছে। বেঁচেছি দেবতা—সে ট্রাইবালই হই আর শিডিউলড্ হই—যাই হই দেবতা বলেই আমরা বেঁচেছি।

এখন ওঁর জ্ঞান হতেই উনি বললেন—কে বেঁচে আছে?

আমরা দুজন গেলাম বললাম—আমরা আছি।

উনি বললেন—হ্যাঁ, তোমাদের থাকবার কথা বটে। তা দেখ, আমার শেষ কাল উপস্থিত। আমি মরব। এখন আমার শেষ ইচ্ছা তোমরা পূরণ কর দেখি, অনেক পুণ্য হবে তোমাদের।

আমরা বললাম—কি, বলুন?

উনি বললেন—আমদপুর ছোট লাইনে গার্ডদের রানিং রুমে রামকালী শর্মা নামক একজন ব্যক্তি আছেন। তিনি আজ ওখানে এই ঝড়ের জন্যই আটকে গেছেন। তাঁকে ডেকে

আন। শেষ কথা তাঁকে আমি বলে যেতে চাই। গতবার এই ছোট লাইনেরই ও-প্রান্তে ঘাটভুবনপুরে গয়েশ্বরী ঠাকুরানির বাপের শ্রাদ্ধের দিন গয়েশ্বরীর লোকেরা ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের কথা লিখেছেন। গয়েশ্বরীদের কাল যেতে বসেছে। লোকে তাদের উড়িয়ে দিচ্ছে। উড়েও তারা যাবে। ফুৎকারে যেমন শিমুল ফল ফাটার ছোট ছোট টুকরো উড়ে যায়—তেমনি ভাবেই উড়ে যাবে। তবু তারা ওই লেখায় থাকবে। সুতরাং তাঁকে ডেকে নিয়ে এস—তোমাদের কথা এবং আমার কথাও আমি তাঁকে বলে যেতে চাই।

মেয়েটি বলল—তিনি আপনার পথ চেয়ে রয়েছেন। তাঁর কথাতেই আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বললাম—আর কত দূর যেতে হবে?

নোটন বললে—তা দূর একটু আছে গো। এক কাজ কর না।

বললাম—কি?

চোখ বন্ধ কর; তারপর মনে কর তুমি যেন ঘুমিয়ে গেছ।

—সে কি—আমাকে তুলে নিয়ে যাবে নাকি?

—দেখ না। এই ফুসমন্তরের চোটে কি হয় দেখ না। মনসার কথায় শোননি—তুলোর চেয়ে হালকা হাওয়া, বাঁটুলের মতো গুড়িয়ে-সুড়িয়ে গোল হওয়া—আর সাপেদের ফণায় ভর করা? তেমনি করে ভর কর, বুঝলে?

বুঝতে না বুঝতে পা দুটো যেন মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—সোঁ—।

সোঁ-সোঁ-সোঁ-সোঁ!

বেশি না। গোটাচারেক বার। তারপরই মাটিতে পা ঠেকল।

লোকটি ঘাড় থেকে নামালে আমাকে; আমার হাত ধরে মেয়েটি বললে—আমরা এসে গিয়েছি। চোখ খোল।

চোখ খুলে অবাক হয়ে গেলাম। এই কি আগয়ার জঙ্গল নাকি? কোথায় জঙ্গল কোথায় উপড়ে পড়া বৃহৎ বট? এ যে ভেঙে পড়া এক ভাঙা ঠাকুরবাড়ি! বিরাট এক প্রাচীন ঠাকুরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ! পাশেই এক কানায় কানায় ভরা নদী। বাঁধানো ঘাট। নাটমন্দিরে আশ্চর্য এক বুড়ো মাথা ফাটিয়ে হাত ভেঙে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে হলুদ রঙের কাপড় পরা আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি—তার গায়ের রং সোনার রং সোনার বর্ণ; পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি, হাতে শাঁখা, বসে তালপাতার তৈরি পাখা নিয়ে হাওয়া দিচ্ছে আর মিটমিট করে তাকাচ্ছে। আর বুকের কাছে বসে ন্যাড়ামাথা গেরুয়াপরা এক বৃদ্ধ। এদের চিনতে দেরি হল না; একজন ষষ্ঠী ঠাকরুণ, অন্যজন ধর্মরাজ। এরা ছাড়া সে প্রায় শতখানেক কি তারও বেশি মানুষ; সে কাচ্চাবাচ্চা বুড়ো জোয়ান নানান বয়সের নানান জাতের মানুষ ঘিরে বসে আছে আর কাঁদছে। দৃষ্টি আরো পরিষ্কার হতেই দেখি—আজকের ঝড়েই এই পুরনো মন্দিরটা ভেঙে চাপা পড়ে কত মানুষ যে মরেছে সে আর গুনে শেষ করা যায় না। ওরে বাপরে! চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেই আশ্চর্য বিশালকায় আহত এবং রক্তাক্ত দেহ বৃদ্ধ আমাকে দেখে বললেন—আসুন, কোনো ভয় করবেন না। আমি গয়েশ্বরী নই, আমি অক্ষয় বট। আমি ধীর আমি স্থির আমি মহাবলী অথচ মহাশান্ত। আমার ধর্ম—ছায়া বিতরণ আশ্রয় দান। আজ আমার শেষ দিন শেষ ক্ষণ।

বৃদ্ধের সে কণ্ঠস্বর অতি আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর। গম্ভীর অথচ মিষ্ট, স্পষ্ট এবং ধীর—আজ এই শোকাবহ ঘটনার জন্য আমিই খানিকটা দায়ী। সে সব কথাই আপনাকে বলে যাবার সময় ও সুযোগ পেয়ে এই শোচনীয় ভাবে অপঘাত মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

—"আপনার কাছে আমি হার স্বীকার করে যাচ্ছি। আমরা পরাজিত।"

আমি অব্বাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। কি বলছে? কিসের পরাজয়?

বৃদ্ধ বললে—মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? তবে বেঁচেছি তো কম দিন নয়, অনেক দিন।

এই অনেক দিন ধরেই তোমাদের আমরা ছায়া দান করি ফল দান করি—তোমরা আমাদের দেবতা বলে পূজা কর। দেবতারা আমাদের আশ্রয় নেয়—ভূত প্রেত পেত্নী এ সবের কথা বলেই কাজ নেই, মরার পর তাদের গ্রাম-শহরই হল গাছের ডালপালা।

হঠাৎ একটু থেমে থেকে যেন কথাবার্তার সুর পালটে দিয়ে হালকা-পলকা ভাবে বললে—সোজা করে বলি শোন।

আমি আগয়ার ধারের বুড়ো বট।

আমি যখন জন্মাই তখন কালটা বোধ হয় মুসলমান আমলে। এই যে আগয়া নদী এবং এর আশপাশ সব ছিল খুব নির্জন। দেশের লোকসংখ্যা ছিল কম। এখানে ওখানে ছোট ছোট দু-দশখানা ঘরওয়ালা দু-একটা গ্রাম ছিল। এই যে পাকা রাস্তাটা, এটার চিহ্নই ছিল না। তবে পায়ে-হাঁটা পথ ছিল। এই জঙ্গলে নদীর ধারে ছিল বুনো-শুয়োর আর ভিতরে ছিল খরগোশ, শজারু, দু একটা বাঘ কখনো-সখনও আসত। সাপ ছিল বিস্তর আর পাখি ছিল অনেক। গাছের মধ্যে গাছ বেশির ভাগই ছিল অর্জুন। প্রতি বর্ষায় হাজার হাজার চারা হত। এরই মধ্যে জন্মালাম আমি।

এখানে আগয়া নদীর ধারে কতকগুলো কালো মোটা মোটা পাথর ছিল মাটির সঙ্গে। মাটির গড়নই এমনি। এখানে ওখানে পাথর আছে দেখছ তো, ঠিক তেমনি। সেই পাথরের উপর একটা পাখি একাধারে আমার পিতামাতা—বটবীজটিকে খেয়ে এখানে বসে বিষ্ঠা ত্যাগ করেছিল—সেই বীজকণা থেকে আমি জন্মে আস্তে আস্তে ওই অর্জুন গাছের জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম। তখন আমি প্রায় তিন-চারহাত লম্বা হয়েছি; চারপাশে তখন তিনটি শাখা মেলেছি।

এই সময় একদিন কাঁদতে কাঁদতে এল একটি অল্পবয়সী মেয়ে। তার ছেলে হয়ে মারা গেছে; ছেলের শোকে কাঁদবার জন্য এসেছে এই নির্জনে। এসে পাথর দেখে বসল এই পাথরে একেবারে আমার গোড়ায় এবং কাঁদতে লাগল। ভরতি দুপুর বেলা, গরমের সময়, আমি তখন ছোট গাছ—আমার একটুখানি ছায়া তখন; সেই ছায়াতেই কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে গেল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে যে, যে বটগাছটির ('মানে আমার'—বুড়ো বটের আত্মা বললে) ছায়ায় শুয়ে আছে তার কচি ডালগুলোর ডগায় ডগায় যে

'থোকা থোকা' বটফল ধরে আছে সেগুলো আসলে বটফল নয়—ওগুলো সব হল ছেলেপুলে।

হাওয়া লেগে ডাল দুলছে—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপুলেগুলোও দুলছে; তা দেখে ওই মা-টির মনে হল—যেন ছেলেগুলোকে নিয়ে দোলা দিচ্ছি আমি (মানে বটগাছ)।

ঘুমের ঘোরেই মেয়েটি ফোঁপাতে লাগল।

আমি—;—

সেই আহত রক্তাক্ত দেহ বুড়ো, সেই বট গাছের আত্মা বললে—বুঝেছ, আমি—তখন সেই কালের সেই আমি তাকে বললাম—দেখ, তুমি এক কাজ কর, কাল এখানে আমার গোড়ায় আবার এসো। স্নান করে পুজো সাজিয়ে এসো। এসে—তুমি যে দেবতা বা দেবী ছেলেপুলের দেবী তাকে পুজো করে যেয়ো, বুঝেছ? আমি সেই ঠাকুরকে ডেকে রাখব। মেয়েটি বললে—বেশ। বুঝেছ—সে কালে লোকে সহজেই এসব কথা বিশ্বাস করত। আলো দেয় সূর্যি ঠাকুর, জ্যোৎস্না দেয় চন্দ্র ঠাকুর, জল দেয় ইন্দ্ররাজা, আগুন দেয় অগ্নিদেব, ধান দেন লক্ষ্মীমা, বিদ্যে দেন সরস্বতীমা, তখন ছেলেমেয়েও নিশ্চয় কোনো না কোনো দেবতাই দেন। আমি মনে মনে তাকে ডাকতে লাগলাম।—আহা মেয়েটির বড় দুঃখু। ছেলেমেয়ে দেবার ঠাকুর বা ঠাকরুণ, তুমি বাপু দয়া করে এস। মেয়েটি কাল পুজো আনবে; তুমি পুজো নিয়ে ওকে দয়া করে একটি ছেলে দিয়ো।

পরের দিন মেয়েটি এল—গরমের সময়—গাছে গাছে খেজুর পেকেছে জাম পেকেছে আম পেকেছে, ফুটি পেকেছে মাঠে, চাষের ছোলা কলাই ভিজিয়ে নিয়ে—পুজোর থালা সাজিয়ে নিয়ে এল। তার সঙ্গে কাপড় গামছা দিলে। হলুদ বাটা সিঁদুর আনলে। এনে আমার গোড়ায় ঢেলে দিয়ে বললে—এই আমার পুজো নাও, তোমার অনেক ছেলে—অনেক ফল ধরেছে তোমার—আমাকে একটি ছেলে দাও।

আমি বললাম—হে দেবতা দয়া কর।

স্বর্গ থেকে এক বুড়ি এল, হলুদ মেখে কাজল পরে, সেই বলে যে 'হলুদ ঘুটুঘুটু—কাজলে ভুটুটু সিঁদুরে সুটুসুটু'—(এর মানে কি তা বুঝলাম না আমি, কিন্তু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না।) ঠিক তাই। বুড়ি বললে আমি এসেছি। আমি হলাম স্বর্গের দেবতার দাঈ। আমি ছেলেপিলের দেবতা। স্বর্গের ইন্দ্ররাজার ছেলে জয়ন্তের আঁতুড়ে আমি ছিলাম। মা দুর্গার গড়া পুতুল যখন জ্যান্ত হয়ে কেঁদে উঠল—তখনো আমাকে ডেকেছিল। গণেশকে তুলে আমিই দুর্গামায়ের কোলে দিলাম। আমার নাম 'ষষ্ঠী ঠাকরুণ'। আমি পৃথিবীতে বারে মাসে তের বার আসি—কখনো আসি অরণ্যে, কখনো পুকুর নদীর ঘাটে—কখনো কিছুতে কখনো মিছুতে। তা এই জষ্টিমাসে তোমার এই গাছতলায় এসে পুজো নিয়ে যাব। আর মেয়েটির ছেলে হবে।

এই বলে সে চলে গেল। আর তারপর আমি যত বড় হলাম তত ডালপালা মেললাম, ছায়া বড় হল; নানান পশুপক্ষী এসে আশ্রয় নিল। আর এল এক বামুন। সে হল মেয়েদের পুরুত। সে পুজো নিবেদন করতে আসত। সে পুজো করত আর ষষ্ঠী মায়ের মহিমা প্রচার করত। লোকে পুজো যা দিত সেই নিত। আমার গোড়া সে পরিষ্কার করত। আমার ডাল কাটতে দিত না। আমার ডালে বাদুড় চামচিকেরা এসে যখন ঝুলল তখন সেই বললে—ওরা মা ষষ্ঠীর ছানা। ওদেরই মা দান করেন মায়েদের।

তারপর অনেকদিন পর এল ধর্মরাজ।

ধর্মরাজকে নিয়ে এলেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ঠাকুরটি তকতকে গাছতলা নির্জন স্থান আর অরণ্য-অরণ্য ভাবের ঠাঁইটি দেখে বাসা গড়লেন। ঠাঁইটি মানে আমার তলদেশটি আরো ঝকঝকে তকতকে হল। বেদি বাঁধলে। মাটির বেদি। চেলা চামুণ্ডা জুটল। যত সব নিকেজো মানে বেকার বাউন্ডুলে লোক এসে জমে গেল বাবা সন্ন্যাসীকে ঘিরে। গাঁজা ভাঙ খেতে লাগল আর যারা কাজ করে—তাদের কাছে গিয়ে দেবতার নাম দিয়ে মাতব্বরি করতে লাগল।

রামকালীবাবু আজ আর তোমার কাছে লুকোব না, স্বীকার করব সত্য কথা। দেবতা কেউ চোখে দেখেনি, স্বর্গে কেউ যায়নি—কেউ স্বর্গ থেকে আসেনি—কিন্তু দেবতা স্বর্গ পরকাল আর ভূত এরা জীবন্ত মানুষের রাজ্যে আশ্চর্যভাবে এক অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করে বসে আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ গণেশ কার্তিক—গাজনের শিব ধর্মরাজ মনসা ষষ্ঠী, সুন্দরবনের বাঘের ঠাকুর কোথাও ভালুকের ঠাকুর—ঠাকুরের যে ছত্রিশ কোটি বংশাবলী এ সব ভুয়ো—সব ভুয়ো। ভালো মানুষ সহজ মানুষেরা এককালে আলো যে দেয় তাকে দেবতা ভেবেছে, জল যে দেয় তাকে দেবতা ভেবেছে—এমনি করে যা কিছুর কারণ খুঁজে না পেয়েছে তাই ধরে নিয়েছিল এসব করেন দেবতারা। কিছু কিছু চালাক চতুর লোক—তারা বেশির ভাগ বামুন পাণ্ডা বেকার বাউণ্ডুলে—তারা গাছতলায় পাথর বসিয়ে সিঁদুর লেপে বোম বিশ্বনাথ জয় ধর্ম রাজ্জো বলে বসে পড়েছে। আমার সেদিনকার এই বাড়বাড়ন্তর দিনে আমাকে ঘিরে এই সব ঠাকুরদের আস্তানা গড়েছিল। গোড়াতে একদিকে মা ষষ্ঠী একদিকে ধর্মরাজ, আর ওই দেখ একটু দূরে নদীর ওপারে ওই যে ডাঙ্গাটায় ওই যে ঘরটা ওটা হল মা মনসার ঘর—আরো খানিকটা দূরে এই তো সেদিন রেলের কুলিরা রামদাস হনুমানের নামে মহাবীরের ঝাণ্ডা টাঙিয়েছে।

বারো মাসে তেরো পার্বণ হত। মধ্যে মধ্যে মেলা বসত আমাকে মাঝখানে রেখে এই চারিপাশে। রাত্রে আলো জ্বলত। লোকেরা ঢোল বাজিয়ে গান গাইত; কবিগান যাত্রাগান হত; দিনের বেলা ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুজো দিত লোকেরা; বলিদান হত; ছাগ ভেড়া হাঁস কাটত; আবার খোল বাজিয়ে হরিনামও করত।

আমি মাথা তুলে আকাশকে যেন মাথায় ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মনে হত আমি সম্রাট। আমার নিজের শক্তিতে নিজেই আমি আশ্চর্য হতাম। প্রায় ঝগড়া হত আমার মেঘেদের সঙ্গে আর ঝড়ের সঙ্গে। সূয্যিঠাকুর লোক ভালো। চন্দ্রঠাকুর সেও খুব ভালো। কিন্তু এই ঝড়ো ঠাকুর আর এই জলের ঠাকুর মেঘের দেবতা, এরা দেবতা হিসেবে যা হোন মানুষ ভালো নন। কুটিল পেঁচালো জেদী, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার নাই—স্বেচ্ছাচারী। চাঁদসদাগরের সঙ্গে মনসা ঠাকরুণের বাদের কথা জান তো? তুই আমাকে পুজো কর—না করলে তোকে কামড়াব। তাও সামনাসামনি নয়—লুকিয়ে চুরিয়ে রাত্রিবেলা। আর ঠাকরুণের মুরদ তো খুব—একটা লাঠির এক ঘা পড়তেই কাৎ! তারপর শ্রীবৎস রাজা আর শনিঠাকুরের কথা। নলরাজা আর কলিঠাকুরের কথা। কত বলব বল! সব দেবতার এক বোল, আমাকে পুজো কর। না করলে ছলে বলে তোর সর্বনাশ করব। ওই যে বুড়ি ষষ্ঠীবেটি, ওর চরিত্তির তাই গো। শেতলা ষষ্ঠীর দিন কোন্ মা ষষ্ঠীর ভিজে ভাতের পেসাদ না খেয়ে গরমগরম খেয়েছিল—অমনি বুড়ির মেজাজ খাপ্পা!

দেখ না রামকালী, থুড়থুড়ি বুড়ি কটকট করে তাকিয়ে আছে দেখ না।

যাকগে। শোন যা বলছি শোন। সে কালে আমার সঙ্গে ওই ঝড় আর মেঘের দেবতাদের লড়াই হত। বুঝেছ! আওয়াজ দিয়ে ঝড় সমুদ্র লঙ্ঘনকারী হনুমানের মতো পশ্চিম দক্ষিণ কোণে স্থির হয়ে দাঁড়াত, দম ধরত, সারা শরীরকে শক্ত করে তুলত—বড় বড় কুস্তিগীরদের মতো, তারপর 'গোঁ-ওঁ-ওঁ' শব্দ করে দিত ঝাঁপ—শূন্যলোক তোলপাড় করে যে খানিকটা মাথা তুলেছে তারই মাথায় ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে দিয়ে চলে যেত। আজও যায়; আজই তো দেখলে। তার পিছন পিছন আসে মেঘ আর জল, তার সঙ্গে থাকে ইন্দ্রদেবতার বজ্র। বড় বড় তাল গাছের মাথা দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়। আজও পড়েছে বাজ। ওই সুন্দীপুরে পড়েছে তালগাছের মাথায়—হরিরামপুরে পড়েছে পুরোনো মন্দিরের চূড়ায়—আরো দুটো পড়েছে কোপাই নদীর ওপারে।

আগে আগে আমার উপর বজ্রের আঘাত করেছে—একবার নয়, চার চার বার। চারবারে চারটে ডাল শুকিয়ে গেল।

আমি ঝড়কে জলকে ইন্দ্রকে মানতাম না কিনা।

বলতাম—তোমাদের মানব কি হে? তোমরাই তো আমার তলাতে এসে আশ্রয় নিয়েছ। মনসার কাচ্চাবাচ্চারা থাকে, ষষ্ঠীবুড়ি থাকে, তার বাচ্চা বাদুড় চামচিকে থাকে, ভূতেরা থাকে। পাঁচটা ভূত থাকে আমার ডালে, ধর্মরাজ থাকে। আমি তোমাদের মানব কেন?

ঝড় বলত—তবে নে, সামাল।

আমিও তাল ঠুকে শক্ত মাটিতে খুঁটি নিয়ে দাঁড়াতাম আর মুখে কোনো কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। ঠিক ধুলোমাটি মাখা নেঙটা কষা মল্লবীরের মতো। ঝড় গোঁ-ওঁ শব্দে এসে ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ে মুচড়ে মাটিতে ঠেসে ধরে ঘাড় ভেঙে দিতে চাইত। আমি নুয়ে পড়তাম প্রথমটায়, তারপরেই ঝটকা দিয়ে ঝড়কে ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সোজা হতাম। আবার ঝাঁপ দিত ঝড়। আমি আবারও তেমনি করে লড়াই দিতাম। একবার দুবার তিনবার। তারপর ধস্তাধস্তি। সে ফেলে, আমি ছুঁড়ে ফেলে দি। সে গোঙায় গোঁ গোঁ, আমি হা-হা করে হাসি। আমার তলায় ভয়ে বোবা হয়ে বসে থাকে ধর্মরাজ—ষষ্ঠীবুড়ি। সাপখোপ পোকামাকড় বাদুড় চামচিকে আমার গায়ের গর্তটর্ত দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ত। ঝড় ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হত—বৃষ্টি শেষ হত, আমি মাথা তুলে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকতাম। হাসতাম মিটিমিটি। মাথার উপরে আকাশে চাঁদ থাকলে বলতাম—তুমি সাক্ষী ঠাকুর! সূর্য থাকলে তাঁকে বলতাম—প্রভু, তুমি সাক্ষী! অনেকে গাছের দর্প চূর্ণ করেছে, অনেকে হেরেছে, আমি হারিনি। আমার সঙ্গে একটা আপস হয়ে গিয়েছিল শেষ দিকে। কারণ অনেক দেবতার আশ্রয় তো আমি।

বেশ দিন যাচ্ছিল। আমার বয়স বাড়ছিল, তবু বুড়ো হইনি। মূল কাণ্ডটা মরল, তখন আমি নতুন ঝুরি নামিয়ে আরো তিনটে কাণ্ডে ত্রিদেহী মহাবট হয়ে উঠেছি। তোমাদের মধ্যে যমজ ছেলে হয় জোড়া লাগা যমজ—তোমরা তাকে বলো শ্যামটুইন—এ টুইনের থেকে বেশি।

লোক বলত, দেবচরিত্র বোঝা ভার।

হঠাৎ কাল পাল্টাল। মানুষ পরশমণির চেয়েও দামি মণি পেলো।

বিজ্ঞান-মণি।

যে জ্ঞানের বলে আগের কালের সকল বিশ্বাসের ওপর আলো ফেলে বিশ্বাসের কালো অন্ধকার ঘুচিয়ে বিশ্বাসকেই মুছে নিল।

আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল সব।

লোহার গাড়ি জলে আগুনে কয়লায় লাইনের ওপর চলতে লাগল। তারের মুখে বিদ্যুতের আলো জ্বলল। তেল নেই সলতে নেই প্রদীপ নেই ঝড়বাদলে নেভা নেই—আলো জ্বলছে। অবাক হয়েই দেখছিলাম। চমকাই নি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম—মানুষের চিৎকার শুনে।

—ভূত নাই! ভগবান মানি না—দেবতা মিথ্যে!

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

আশ্চর্য! আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা মিলিয়ে যেতে লাগল। তোমাদের গ্রামের সেই বিখ্যাত রামাই ভূত কেমন করে নিখোঁজ হল জান? সে সেই বড় শিমুল গাছটার মাথায় বসে পৈতে হাতে নিয়ে জপ করছিল—

ববম ববম ভোলা—জয়কালী জয়কালী—
ধিতাং ধিতাং নাচি—হাতে দিয়ে তালি।

ঠিক সেই সময়েই গাছটার একটু দূরের রাস্তা ধরে যত হাল আমলের ছোকরাদের মিছিল চলছিল—তারা হাঁক দিচ্ছিল—ভূত! নেহি হ্যায়। প্রেত—বিলকুল ঝুট। ভূত-প্রেত মুর্দাবাদ। ভেঙ্গে দেও—জাহান্নম! সঙ্গে সঙ্গে চমকে গিয়ে রামাই সেই উঁচু শিমুল গাছের সেই উঁচু ডগার ডাল থেকে ফট করে শিমুল ফলের মতো ফেটে গেল। শিমুল ফলের তুলো আছে, সেগুলো উড়ে বেড়ায় বাতাসে, খোলাটা লেগে থাকে বোঁটায়—এর খোলাও নেই ভেতরে তুলোও নেই। সুতরাং ফট করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে ভূত শূন্যে ফুস করে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো মিশে গেল।

শেষ পর্যন্ত ওই বৈতরণী ঘাটের ধারে যান, ভুবনপুরে ওরা জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু তাও আর থাকবে না। এবার মানুষরা চন্দ্রলোকে যাচ্ছে গো। মহা বিপদ। কোথাও গিয়ে পরিত্রাণ নেই। তাই—

বললাম—কি তাই? খুব বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল।

বৃদ্ধ বটের আহত আত্মাপুরুষ বললেন—দেখ, সব দেবতারা এবার শঙ্কিত হল। ভূত গেছে—এবার এরা মহাশূন্যে মহাযান চালিয়ে সব খুঁজে পেতে ভগবানকে ধরতে যাবে।

ভগবান বুড়ো কোথায় থাকে তা ওই ইন্দ্র বায়ু বরুণও জানে না। বিশ্বাস না হয় উপনিষদ পড়ে দেখো। তাই দেবতারা খুব চঞ্চল হল। সব দেবতা। এরা তো এবার দেবতা-টেবতাদেরও মানবে না। ঘাড় ধরে ধরে নিকাল দেবে। তখন কোথায় যাবে সব? মানুষ যদি দেবতাদের না মানে তবে তারা যাবে কোথায়? খাবে কি? অক্ষম পশু নড়তে পারে না, চড়তে পারে না, কথা কয় না—বেচারারা যে শুকিয়ে হেজে-মজে, অঙ্গহীন হয়ে, পুতুল হয়ে, পাথর হয়ে, না হয় নস্যাৎ হয়ে উড়ে যাবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। আকাশের চাঁদ পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। বৃদ্ধ বট পশ্চিমের ঝড়ে উপড়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হয়ে পড়েছেন। বিশাল শাখাপ্রশাখা মাটির উপর ভেঙ্গেচুরে দুমড়ে মাটির বুকে মুচড়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার পাশেই তাঁর আত্মা আহত হয়ে পড়ে আছে। দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বোধ হয় রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

চলে যাবেন স্বর্গলোকে। আশেপাশে অপ বা উপ দেবতারা বা শিডিউলড্ আর ট্রাইবাল দেবতারা জমায়েত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধর্মরাজ থুখুরে বুড়ো। ষষ্ঠী আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি। মনসা ঠাকরুণ, গাজনের শিব, শিবের সেনাপতি বাণ গোঁসাই, রক্ষেকালী শ্মশানকালী, সুন্দর রায়, খোসপাঁচড়ার দেবতা ঘেঁটু ঠাকুর—ওরফে ঘণ্টাকর্ণ, তার উপর গলায় দড়ে, পুড়েমরা ভূত, ঘাড়ভাঙা ভূত, জলে ডুবে মরা ভূতনী, সাপে কামড়ে মরা ভূত, তেরোস্পর্শে মরা ভূত, শেখ সাহেবদের মামদো, পাদরিদের সাহেব ভূত সব এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াবে না? বটগাছ যে তাদের আশ্রয়দাতা!

বুড়ো বটের আত্মা বলল—এইসব নিয়ে আমাদের সভা-সমিতি প্রায়ই হচ্ছিল। কি করা যায়? কিভাবে বাঁচা যায়? মানুষের ওপর কি করে—টেক্কা-তুরুপ ছাড়া তো পথ নেই! দেখছ তো রাশিয়া আমেরিকার ব্যাপার? এ একটা আকাশযান ছাড়ছে তো ও আর একটা ছাড়ছে। এ যদি শূন্যযানে কুকুর পাঠায় তো ও পাঠায় মানুষ। তখন ও পাঠায় মেয়েছেলে—তারপর এ পাঠায় দুজন। আবার মহাকাশে হেঁটে বেড়ায়। দুটো মহাকাশযানে যানে দেখা হয়। আমেরিকা তাজ্জব করে দিলে। লোক এবার নামাবেই চাঁদের উপর। তাই আমাদের ঠিক হল—আমরা তার আগেই পাঠাব আমাদের প্রতিনিধি। আমাদের যন্ত্রের দরকার নেই। যন্ত্র আমরা বুঝি না। আমরা দেবতা। আমরা উড়ব। তাই ঠিক হয়েছিল আমি উড়ব—ঝড়ের দেবতা রকেটের মতো আমাকে বৃক্ষদেবতাকে আকাশে ছুঁড়ে দেবে আর আমার ডালে ঝোলা হাজারখানেক বাদুড় আর একলক্ষ চামচিকে পাখা ঝাপটাতে থাকবে। আমরা মাধ্যাকর্ষণ পার হয়ে চাঁদে গিয়ে ঝপ করে নেমে গোটা চাঁদকে দখল করে হাঁকব—দেবতালোক জিন্দাবাদ। জয়—দেবতাদের জয়!

ঝড়ও এল। দেখছ কি ঝড়। সে আমাকে তুলেও দিলে—কিন্তু দেবতারা বিজ্ঞান জানে না। বাদুড়ের চামচিকের পাখায় ভর করে শূন্যলোকে উড়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায় না। আমি ধপাস করে পড়ে গেলাম মাটির বুকে। এবং—

মাঝপথেই থেমে গেল বুড়ো বটের আত্মা এবং একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তারপর আবার বললে—ভূত দেবতা ভগবান এসবের কাউকে কিংবা কিছুকে রাখবে না মানুষ।

আমি বললাম—তাতে কি, গাছ তো থাকবে!

গাছ বললে—হ্যাঁ। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—দেবতা হয়ে তো থাকবে না।

—দরকার কি? গাছ গাছ হয়েই থাকুক। মানুষও তো মানুষ হয়েই থাকবে?

গাছ বললে—মানুষদের তো আমরা খুব ভালোবাসি। যখন মানুষেরা ঘর গড়তে জানত না—তখন তো ঝড়ের হাত থেকে জলের হাত থেকে রোদের হাত থেকে আমরাই বাঁচিয়েছি।

বললাম—কে অস্বীকার করছে?

—করছ না, করবে!

—না, মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়।

গাছ বললে—হৃদয়হীনও যেন হয়ো না।

গাছের ওই শেষ কথা। তারপরই পাখি ডাকতে লাগল। পূর্বদিকের আকাশে যেন লালচে আভা ধরেছে। বাসু আমাকে নাড়া দিয়ে ডেকে তুললে। জেগে দেখলাম আমি আমদপুর স্টেশনেই শুয়ে আছি।

ওঃ, তা হলে সারারাত্রি স্বপ্ন দেখেছি!

না—স্বপ্ন ঠিক নয়। কারণ সকালে যখন ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখলাম আগয়ার ব্রিজের পাশে আগয়া নদীর চরের উপর কুলিরা কাটারি দা কুড়ুল নিয়ে গতরাত্রে ঝড়ে উপড়ে পড়া সেই ষষ্ঠীবুড়ি ও ধরমতলার বটগাছটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে লাইন থেকে সরিয়ে ফেলেছে। এখন বাকি অংশটাকে টুকরো টুকরো করবে। দেখলাম লরি দাঁড়িয়ে আছে। গাছ তুলে নিয়ে যাবে। শুনলাম এখানকার স-মিল মানে করাত-কলওয়ালারা গাছটাকে কিনে ফেলেছে। চিরে কেটে টুকরো করে বিক্রি করবে।

আরো দেখলাম—অনেক মজুর চাষি দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছটা গেল, এবার জায়গাটা কেটে জমি করলে কেমন জমি হবে তাই তারা দেখতে এসেছে।

বিকেলবেলা কলকাতা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে আবার এই পথেই ফিরলাম—তখন আগয়ার ধরমতলা বড়তলা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর জমি হবে। মাঠটার দুটো নাম হবে—ধরমতলার মাঠ আর ষষ্ঠীতলার মাঠ।

ভয় ও ভূত

সুকুমার সেন

সত্য ঘটনা। নিজেদের অভিজ্ঞতা। সুতরাং নামধাম ঢাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আর বিমলেন্দু ইস্কুলের ফিফ্‌থ ক্লাসে—এখনকার ক্লাস সিক্সথে তিন-চার দিন আগে-পিছে ভর্তি হয়েছিলুম। ও এসেছিল পাড়া-গাঁ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে শহরের ইস্কুলে পড়তে। আমি তো বর্ধমান শহরেই থাকতুম।

দু-চার মাসের মধ্যেই বিমলেন্দুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় ভাব হয়ে গেল। এ ভাব বরাবর অটুট ছিল। বর্ধমানে দুজনে একই ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করি, একই কলেজ থেকে আই.এ. পাস করি। তার পর কলকাতায় এসে আমাদের কলেজ ভিন্ন হয়। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয় না।

আমি এম. এ. পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে থাকি। বিমলেন্দু এম.এ. পাস করে ভারত গভর্নমেন্টের হায়ার সার্ভিসের পরীক্ষা দেয় ও আয়কর বিভাগে কাজ পায়। প্রথমে কয়েক বছর ও কলকাতাতেই ছিল। যদিও ওর চাকরি বদলির। বিমলেন্দু চাকরি নিলে, আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলুম উপযুক্ত কোনো চাকরির সন্ধান না পেয়ে। আমাদের দুজনের মেলামেশা আগেকার মতোই অক্ষুণ্ণ চলতে লাগল।

যেদিনের কথা বলতে যাচ্ছি তখন বিমলেন্দুর বিয়ে হয়েছে, তবে তখন ওর স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিল। কলকাতায় তখন তার বাসা ছিল বাগবাজার অঞ্চলে। সংসারে তখন বিমলেন্দু ও তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি থাকি গোয়াবাগানে মামার বাড়িতে।

একদিন কথা হল শনিবার সন্ধ্যায় কর্নওয়ালিস থিয়েটারে সিনেমা দেখবার। আমি বিকেলে বিমলেন্দুর বাড়ি যাব। সেখান থেকে ছটার শোয়ে ছবি দেখে বাসায় ফিরব। সেদিন বিকেলের আগেই বিমলেন্দু আমার কাছে এসে হাজির আপিস্-ফেরতা। বললে, ‘‘সন্ধ্যার শোয়ের টিকিট পাইনি তাই রাত্রির শোয়ের টিকিট কিনেছি। সেই কথা তোকে জানাতে এলুম।’’

আমি বললুম, ‘‘এখানে সাপারের যে বন্দোবস্ত তাতে রাত্রির শোতে যেতে অসুবিধা হবে।’’

বিমলেন্দু বললে, ‘‘তার ভাবনা কী? তুই আমার কাছে খাবি। তারপর ছবি দেখে বাড়ি ফিরবি। যা, ভিতরে গিয়ে বলে আয়।’’

আমি মামিমাকে বলে এলুম রাত্রিতে বিমলেন্দুর বাড়িতে খাব। তারপর বিমলেন্দুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

ওর বাড়ির গলিতে ঢুকে মনে হল শনিবারের বিকেলের পক্ষে বড় নির্জন বোধ হচ্ছে। বিমলেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলুম। ও বললে, ‘‘আমার বাসার সামনাসামনি যে ভদ্রলোক থাকতেন তিনি রাত্রিতে মারা গেছেন। তিনি পাড়ার একজন চাঁই ছিলেন।’

তারপর রাত্রি সাড়ে-আটটার সময় খাওয়াদাওয়া করে নটার শো দেখতে গেলুম কর্নওয়ালিস থিয়েটারে। শো ভাঙতে পৌনে বারোটা বেজে গেল।

রাস্তায় নেমে বিমলেন্দু বললে, ‘‘রাস্তা তো খুব ফাঁকা দেখছি। দুজনের তো একলা একলা যেতে হবে দুদিকে। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। ওখানে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় গোয়াবাগানে ফিরবি। ওঁরা তো জানেন যে আমার কাছে এসেছিস। তাই ভাবনাচিন্তা করবেন না।’’

আমি সায় দিলুম। একটা রিকশ করে দুজনে বাগবাজারে ফিরে এলুম।

বিমলেন্দুর বাসায় ওপরে তিনটি ঘর ও ফালি বারান্ডা। একটি ঘর মায়ের, একটি ঘর বিমলেন্দুর বসবার, আর একটি ঘর তার শোবার।

বিমলেন্দু এসেই বললে, ‘‘একটু চা খাওয়া যাক।’’ চা দুধ চিনি জল স্টোভ কেটলি কাপ ডিশ ছাঁকনি, সবই ছিল তার শোবার ঘরে এক পাশে। প্রাইমাস স্টোভ জ্বালিয়ে সে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। চা হল, আমি আধ কাপ খেলুম। তারপর দুজনে শুয়ে পড়লুম। আমাকে ও শোয়ালে খাটের ওপর, আর নিজে সে শুল মেজেতে একটা মাদুর পেতে আর বালিশ, পাশ-বালিশ নিয়ে। এমনি করেই ও শুতে ভালোবাসত।

শুয়ে শুয়ে কিছু কথাবার্তা হতে হতে বিমলেন্দু পড়ল ঘুমিয়ে, আর আমার চোখে

ঘুম আসে না। এটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমিই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি, বিমলেন্দু নয়। ভাবলুম নতুন জায়গা 'ঠাঁই নাড়া' হয়েছে বলে ঘুম আসছে না। যাই হোক, অনেকক্ষণ পরে ছেঁড়া-ছেঁড়া রকম ঘুম এল। কিন্তু হঠাৎ কিছুর শব্দ শুনে তড়াক করে ছেঁড়া ঘুমের স্বপ্নতন্তু ছিঁড়ে গেল। আমি মুহূর্তমধ্যে সজাগ হলুম আর মনে পড়ল সামনের বাড়ির মৃত্যুর কথা। অমনি ভয়ের প্রস্রবণ আমাকে আচ্ছন্ন করলে। আমি অনড় হয়ে কান পেতে আছি সে অস্ফুট শব্দের জন্য। শব্দ শুনলুম, একটুক্ষণ করে বাদ দিয়ে কয়েক বারই শুনলুম। মনে হল শব্দটা মেটালিক, কিন্তু বাসন মাজার শব্দ নয়, টিন কাটার শব্দ নয়, শান দেবার শব্দ নয়। কিসের শব্দ?

ভয়ে অভিভূত হয়ে মনে হল বিমলেন্দুকে জাগিয়ে দিই। কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেলেও আমার সুবিবেচনা একেবারে লোপ পায়নি। একে ওর ঘুম কম, তাতে যদি কাঁচা ঘুমে উঠিয়ে দিই তবে আর তার ঘুম হবে না। তাছাড়া ও যদি আমাকে ভয়কাতুরে বলে উপহাস করে, তা আমি সইতে পারব না।

তখন মনের রাশ জোর করে ধরে ভাবতে লাগলুম, শব্দটা আসছে গলির দিক থেকে নয়, আসছে ভিতরের বারান্ডার দিক থেকে। এই সিদ্ধান্তে ভূতের ভয় এক ডিগরি কমে গেল। বারান্ডার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, এই ঘরেরই কাছে বারান্ডার শেষে করোগেটের পার্টিশন আছে এবং সেই পার্টিশনের গায়ে জলের কল লাগানো আছে। এইটুকু মনে পড়তেই চড়াং করে ভয়ের সমাধান হয়ে গেল। দিনের বেলায় তাপে সিসের নল একটু বেড়ে ওঠে, শেষরাত্রিতে ঠাণ্ডা পড়ায় সে বাড়টুকু কমে যায় এবং সিসের নল সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ করোগেট টিনে একটু ঘষড়ানি হয়। সেই শব্দই আমি শুনেছি। ঠিক হোক চাই নাই হোক, এই ব্যাখ্যা আমার মনে ওঠায় ভয় জল হয়ে গেল। আমি দু-এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালের আগে আর ঘুম ভাঙেনি।

আমার এই অভিজ্ঞতার সারমর্ম হল, ভয় ঠেকালে ভুত ঠেকানো যায়।

তারপর বিমলেন্দুর যে অভিজ্ঞতার কথা বলছি তা ঘটেছিল বছর সাত-আট পরে। বিমলেন্দু তখন বর্ধমানে আয়কর অফিসার। তার উপর বীরভূম ও বাঁকড়ো জেলার ভারও আছে। এসব জেলায় কাজের জন্যে তাকে মাঝে মাঝে ট্যুর করতে হয়। এইরকম এক ট্যুরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

বিমলেন্দু বর্ধমানে আছে, আমি সপ্তাহান্তিকে বর্ধমানে যাই। শনি রবি সোম তিন দিন সেখানে থাকি, বিমলেন্দুর সঙ্গ পাই। দিন বেশ ভালোই কাটে।

এক সপ্তাহে বর্ধমানে গিয়ে শুনলুম, বিমলেন্দু ট্যুরে গেছে। সেবারে দেখা হল না। পরের সপ্তাহে দেখা হল। তার কাছে শুনলুম সেই ট্যুরের এক আশ্চর্য কাহিনী। সে কথা আমি বিমলেন্দুর জবানিতেই লিখছি।

"গিয়েছিলুম বাঁকড়ো জেলার গহনে এক গণ্ডগ্রামে। সে গ্রামে কিছু আড়তদার ব্যবসাদার আছে। ডাকবাংলো আছে। সুতরাং ওখানে গিয়ে তদন্ত করতে অফিসারদের কোনো অসুবিধা হয় না। এই সব বুঝে আমি গেলুম সেখানে এনকোয়ারিতে কাগজপত্র ও সেরেস্তাদারকে সঙ্গে নিয়ে।

"বেলা তিনটে নাগাদ ডাকবাংলোয় পৌঁছলুম। অভ্যর্থনা করতে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা

এসেছিলেন। বাংলোটি মন্দ নয়। বেশ নির্জন, একটু যেন বেশি নির্জন বলে মনে হল। গ্রাম সেখান থেকে অন্তত আধমাইল দূরে। গাঁ আর বাংলোর মধ্যিখানে কোনো বসতি নেই, জঙ্গল আর মাঠ।

''হাতমুখ ধুয়ে ডাকবাংলোর সর্দারকে চা করে আনতে বললুম। সে চা করে এনে দিল। চা খেতে খেতে তাকে নির্দেশ দিলুম রাত্তিরের খাবারের। সর্দার বিনীতভাবে বললে, 'হুজুর, আপনার রাত্তিরের খাবার গাঁয়ে গিয়ে খাবেন। এখানে কেউ রাত্তিরে খাবার খায় না। আমরা সবাই সন্ধের পর এখান থেকে গাঁয়ে চলে যাই। হুজুরও যাবেন।'

''আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার, কী পাগলামি বকছ তুমি?'

''ও বললে, হুজুর সন্ধের পর এখানে ভূতের উপদ্রব হয়, কেউ তিষ্ঠুতে পারে না।''

সর্দারের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে আমি সেরেস্তাদারকে ডাকলুম। তাঁকে সর্দারের কথা বললুম। সেরেস্তাদের ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, ''স্যার, সব কথা সত্যি। এখানকার ভদ্রলোকেরা এসেছেন আপনাকে রাত্রিবেলায় গাঁয়ে থাকবার ও খাবার জন্যে বলতে।'

এই বলে সেরেস্তাদারবাবু জন তিনচার ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। তাঁরাও সকলে নির্বন্ধ করতে লাগলেন সন্ধের পর ডাকবাংলোতে না থাকবার জন্য। আমার রাগ হল। সে রাগ দমন করে আমি বললুম, 'এখান ছেড়ে রাত্রিতে আমি কোথাও যাব না।' সেরেস্তাদারবাবুকে বললুম, 'আপনি সর্দারকে বলুন আমার রাত্তিরের খাবার সন্ধের আগেই যেন তৈরি করে রেখে দিয়ে যায়। যখন ইচ্ছে হবে তখন খাব। আপনিও চলে যেতে পারেন। তবে সকালে যথাসময়ে আসবেন। ঠিক নটার সময় আপিসের কাজ করতে হবে।'

''খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করে আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে সকলে চলে গেলেন। সন্ধের সময় সর্দার আমার খাবার তৈরি করে ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেল। তারপর কেউ কোথাও নেই দেখে আমি বাংলোর দরজায় খিল দিয়ে বই পড়তে বসলুম। সর্দার সব ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। যথাসম্ভব নিরুদ্বেগে রাত কাটল। সূর্য ওঠার আগে বাংলোর বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় পায়চারি করছি এমন সময় সর্দার এসে হাজির। আমাকে সুস্থশরীর দেখে তার যে আনন্দ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলুম। কোনো কথা না বাড়িয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে পার্স বার করে তার থেকে একটা টাকা দিয়ে বললুম, 'দৌড়ে যাও, চায়ের দুধ আনোগে।'

''গাঁয়ের লোক সর্দারের মুখে আমার কিছু হয়নি জেনে খুশি হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। তবে বিকেলেও আমাকে গাঁয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল।

''তিন দিন পুরোদমে সরকারি কাজ চালিয়ে শেষ করলুম। সন্ধেবেলায় সেরেস্তাদারকে বলে দিলুম কাগজপত্র সব ভালো করে গুছিয়ে নিতে। আমরা কাল সকালে নটার আগেই রওনা হব।

''সকালে আটটা নাগাদ গ্রামের লোক আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন। কারো মুখে রা নেই। বুঝলুম আমার ওপর এদের একটু বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছে ভূতের রোজা মনে করে।

''আমি কাউকে কোনো কথা না বলে যখন আমার ঘর থেকে বারান্ডায় বেরিয়ে আসছিলুম, তখন চৌকাট ডিঙোতে ডিঙোতে সামনে গাঁয়ের একজন চাঁইকে দেখে বললুম, 'এই তো চার রাত এখানে একলা কাটিয়ে গেলুম, কই আপনাদের ভূতের টিকিটিও তো দেখা গেল না!'

"এই কথা বলতে বলতে দেখি চৌকাঠের ওপর থেকে ঝুরঝুর করে বালি পড়ছে। আমি একবার ওপরপানে চেয়ে নিয়ে তারপর পা চালিয়ে বারান্ডা পেরিয়ে সটান গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। ও-বিষয়ে এই তোর কাছে প্রথম মুখ খুলছি। তুই কি বলিস?"

আমি বললুম, "কেস দু'তরফেই সমানভাবে লড়া যায়। ঝুরঝুর বালি-পড়া স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে, ভূতের কাজও হতে পারে। তবে বেনিফিট অব ডাউটের খাতিরে ভূতের পক্ষেই রায় দিই।"

আমার অভিজ্ঞতায়—ভয় তাড়িয়ে ভূত ঠেকানো যায়। আমার বন্ধুর অভিজ্ঞতায়—ভয় ঠেকালেও ভূত ঠেকানো যায় না।

সত্য হয়তো দুই অভিজ্ঞতার মাঝামাঝি কিছু। কে জানে!

ভেরনল

মণীন্দ্রলাল বসু

উত্তর-ভারতের নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে নৈনিতালে এসেছি। নভেম্বরের শেষে নৈনিতাল প্রায় জনহীন। আমাদের হোটেলের দোতলায় আমি আর একজন বাঙালি প্রৌঢ় ডাক্তার, দুজন আছি। হোটেলটি পাহাড়ের মাথায় বনের ধারে, নীচে নীলহ্রদ, পাহাড়-ঘেরা, কখনো মরকতমণির মতো ঝকমক করে, কখনো গলিত পোখরাজের মতো। রৌদ্রতপ্ত সুনির্মল, দিন। জ্যোৎস্নাময় সুশীতল পাণ্ডুর রাত্রি, চারিদিকে অপূর্ব নিস্তব্ধতা।

সমস্ত দিন হ্রদটি দর্পণের মতো স্থির ছিল। রঙিন বাংলোর সারি, সবুজ ঘন, নীলাকাশ, মেঘের স্তূপ, তার ওপর নানা রূপ ও বর্ণের প্রতিবিম্ব। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমাকাশে মেঘপুঞ্জে রঙের ঠেলাঠেলি, দিগ্বধূরা হোলিখেলায় মেতে উঠল, হ্রদ সুবর্ণবর্ণ। তারপর পাইন-বনের পিছনে চাঁদ উঠল। পাহাড়ের তলায় ঘন অন্ধকারময় হ্রদ রহস্যময়ী নারীর কালো চোখের মতো।

ডিনার খেয়ে যখন ঘরের সামনে কাচ-ঘেরা বারান্দায় বসলুম, বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিকে সজল অন্ধকার। দেবদারু-বন আন্দোলিত করে ঝোড়ো বাতাস উঠছে ক্ষুব্ধ ক্রন্দনের মতো।

বারান্দায় বসে থাকা গেল না, ঝড়ের জন্য নয়, দাঁতে অসহ্য বেদনা অনুভব করলুম। বাঁ মাড়ির শেষে একটু ব্যথা দুদিন ধরে রয়েছে, সারারাত্রে ঝড়ের মধ্যে ব্যথা অসহ্য মনে হল, দাঁতের স্নায়ুগুলি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। ঘরে ঢুকে দেখলুম এ্যাসপিরিন বা বেদনা-নাশক কোনো ওষুধ সঙ্গে নেই। রাত বারোটা হবে, বাইরে ঝড় উঠেছে—ওষুধের জন্য কোথায় যাওয়া যায়?

মনে পড়ল আমার ঘরের পরে দুটি খালি ঘর, তার পরেরটাতে প্রৌঢ় ডাক্তার সরকার আছেন। তাঁর কাছে নিশ্চয় কোনো ওষুধ পাওয়া যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। অদ্ভুত মানুষ মনে হয়। তিনি সমস্ত পৃথিবী দু'বার পরিভ্রমণ করেছেন। কোনোদিন দেখি বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আকাশে মেঘের লীলা, হ্রদের খেলা দেখছেন, কোনোদিন দেখি মোটা চাবুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন ভীমতালের দিকে। ছ'ফুট লম্বা দীর্ঘদেহ, সুঠাম, দৃঢ়, বৃদ্ধ শালগাছের মতো। সব সময় ছাইরঙের একটা সুট পরে, চোখে কালো কাচের চশমা, রেখাঙ্কিত মুখে আরক্তিম ভাব নাকের ডগায় লালছাপ কাচ-ঢাকা ফ্রেমের নীচে টক্‌টক্‌ করে।

দাঁতের যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠল। ডাক্তারের ঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

করিডরের এক কোণে একটি আলো মৃদু জ্বলছে। ডাক্তারের ঘরের দরজার ওপর তিনটে টোকা দিলুম—ডাক্তার সরকার।

ভেতর হতে উত্তর হল,—আঁত্রে! (দরজা খুলে আসুন)

দরজা ভেজানো ছিল, একটু ঠেলতে খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম, স্প্রিং-গদিওয়ালা রেক্সিন মোড়া লম্বা সেত্তিতে ডাক্তার সরকার অর্ধশয়ানভাবে সামনের জানালার দিকে চেয়ে। জানালার কাচের ওপর বৃষ্টি-ঝড় আছড়ে পড়ছে ক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো। বাইরে ঝঞ্ঝার আর্তনাদ, কিন্তু ঘরের ভেতর অদ্ভুত স্তব্ধতা।

সেত্তির পিছনটা দরজার দিকে, ডাক্তার সরকার আমার প্রবেশ দেখতে পান নি। তিনি বলে উঠলেন, আসুন হের রোজেনবেয়ার্গ, আপনার প্রতীক্ষা করছিলুম।

হের্ রোজেনবেয়ার্গ! এ হোটেলে কোনো জার্মানকে তো কখনো দেখিনি! চেঁচিয়ে বল্লুম, আমি,—কিছু মনে করবেন না—দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা—

চমকে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চশমায় কালো কাচ-ঢাকা চোখ দেখা গেল না, কুঞ্চিত কপালের ওপর কালো সাদা চুলগুলি চক্‌চক্‌ করতে লাগল।

ও, আপনি! কি চাই?

দেখুন দাঁতে বড় ব্যথা, যদি আপনার কাছে কোনো ওষুধ থাকে, আমার এ্যাসপিরিন—

ব্যথা! ভালো। যত ব্যথা পাবেন, জীবনকে তত গভীরভাবে অনুভব করবেন। যার যত বেদনাবোধ, সে তত উচ্চস্তরের জীব।

দেখুন, ডাক্তার যদি দার্শনিক হয়ে ওঠেন রোগীর অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়।

হা হা! ডাক্তার দার্শনিক! কোথায় ব্যথা বলুন?

দাঁতে, এই বাঁ মাড়িতে, স্নায়ুগুলি কে ছিঁড়ে—

থাক, ব্যথার বর্ণনা করতে হবে না, আমি বুঝেছি। বসুন। বসুন ওই সোফায়। কি লিকার আপনি ভালোবাসেন? কুমেল, বেনেডিক্‌টিন—আমার এখানে কয়েকরকম আছে মাত্র।

সামনের ছোট টেবিলে নানা বর্ণ ও আকৃতির বোতল ও ছোট বড় লিকার-গ্লাস।

না, আমি কিছু খাই না।

খান না? হা হা, খেলে দাঁতের ব্যথা হত না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে দেখছি! আচ্ছা দেখি, একটা ওষুধ আছে।

ডাক্তার সরকার লেখবার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি ছোট শিশি বের করলেন। শিশি হতে দুটি চ্যাপ্টা বড়ি এক মাঝারি গ্লাসে রাখলেন, তারপর একটা বড় বোতল হতে সোনালী তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে দিলেন। গ্লাসটা নেড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, খেয়ে ফেলুন। একটু হাল্কা বোর্দো দিলুম, ওতে ওষুধের কাজ ভালোই হবে। আর আমার ঘরে জল নেই, চাকরটা সন্ধ্যা থেকে পলাতক। ভাবুন ওষুধের অনুপান হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের সূর্যালোকপুষ্ট রক্তিম দ্রাক্ষারস!

ব্যথা দূর করবার জন্য তখন কেউ হাতে বিষ দিলেও খেয়ে ফেলতে পারতুম। বড়ি-মিশ্রিত বোর্দো এক চুমুকে খেয়ে ফেল্লুম।

ডাক্তার সরকার আমার মুখোমুখি বসলেন সেত্তিতে হেলান দিয়ে। ছোট গ্লাস হতে একচুমুক সারক্রুজ খেয়ে বল্লেন, কেমন মনে হচ্ছে?

বেদনা কম মনে হচ্ছে।

ব্যস, তাহলেই হল। বেদনা হয়তো আপনার আগেকার মতোই আছে, তবে ওই যে মনে হচ্ছে বেদনা নেই—তাহলেই হল। আসল হচ্ছে মন, আর মন দিয়ে যা অনুভব না করি তাই মিথ্যা। বসুন, গল্প করা যাক। এ ঝড়ের রাতে কি আর এখন ঘুম হবে!

বেশ তো, আপনি একটা গল্প বলুন। আপনার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা, কত দেশ কতরকম মানুষ দেখেছেন, তার ওপর আপনি ডাক্তার, কতরকম রোগী—

ডাক্তারের রোগী দেখা clinical eye দিয়ে দেখা, সত্যিকার দেখা নয়। যে দেখায় বেদনা নেই, হৃদয়ের ব্যথা নেই, আতঙ্ক নেই, সে দেখা সত্যি দেখা নয়।

কিন্তু দেখায় আনন্দও তো থাকতে পারে।

হাঁ, কিন্তু সব গভীর আনন্দানুভূতির সঙ্গে তীব্র বেদনা রয়েছে। শুধু মনের ব্যথা নয়, দেহের ব্যথাকেও যতরকম ভাবে যত নূতন নূতন করে জানতে পারবেন, জীবনকে তত গভীরভাবে জানবেন, প্রাণের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছিবেন। এই দেহ-মনের বেদনার অভিজ্ঞতায় আমাদের সত্তা গড়ে ওঠে, আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়।

আপনার জীবনে বহু অভিজ্ঞতা আছে মনে হয়।

হাঁ, নব নব অনুভূতি লাভের তৃষ্ণা আমাকে সারাজীবন দিশাহারা করেছে। ডাক্তাররূপে আমাকে দেখতে হয়েছে মানুষের দেহ-মনের ভাঙনের রূপ, তারপর বেদনার মূর্তি। সেজন্য প্রকৃতির বা মানবসৃষ্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দেখবার জন্য আমি দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরেছি, দেহের সমস্ত স্নায়ু শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত দিয়ে প্রাণের গতি-উল্লাস আনন্দময় অভিব্যক্তি অনুভব করতে চেয়েছি। এমনি ঝড়ের রাতে আমি সাঁতরে পদ্মা পার হয়েছি, বন্যায় নগর-গ্রাম ভেসে যেতে দেখেছি, কারাকোরাম পর্বতের সতের হাজার ফিট্

উঁচুতে তুষার-নদী পার হয়ে কাশ্মীর হতে খোটান গেছি, মোটরকারে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেছি, উগান্ডার জঙ্গলে সিংহ মেরেছি। কত অপূর্ব বস্তু কত অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে! শ্রীনগরে ডালহ্রদে রঙিন সন্ধ্যা, শীতের সুইজারল্যান্ডে জ্যোৎস্নারাত্রে তুষার-শুভ্রতায় শ্লেজ চালানো, লিডোতে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্রতীরে সূর্যালোক পান, নিউইয়র্কের পঞ্চম এভিনিউর জনতা, জঙ্গলবেষ্টিত এঙ্কোর ভাট, বেলজিয়ামের যুদ্ধ-ট্রেঞ্চ, অন্ধকার রাত্রে তাজমহল, প্রয়াগে কুম্ভমেলা, মিসিসিপির ঘন অরণ্য, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর এরোপ্লেন। এসব অভিজ্ঞতা আমার আত্মাকে মূর্ত করেছে বটে, কিন্তু আমার সত্তার বিকাশ হয়েছে মানব-অন্তরের বেদনাময় অনুভূতিতে।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। ঝোড়ো বাতাসে কাচের জানালা ঝন্ঝন্ করে উঠল। অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে বিদ্যুৎ চমকে গেল। ঘন নীলপর্দা-ঘেরা আলো কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমি ধীরে বল্লুম, আচ্ছা আপনি হের্ রোজেনবেয়ার্গ নামে কার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন?

ডাক্তার সরকার চমকে সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চশমার কাচ চক্‌চক্ করতে লাগল অন্ধকার রাত্রে কালো চোখের মতো। বোতল থেকে একটু সুরা ঢেলে পান করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর আমার দিকে চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, একটা চুরুট ধরান। গল্পটা আপনাকে তাহলে বলি—

ম্যুনসেনে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে আমি কিছুদিন সুইজ্যারল্যান্ডে ডাভোসে এক যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়মে কাজ করি। এমনি নভেম্বর মাসের শেষাশেষি একবার ডাভোস থেকে প্যারিসে আসি। গার-দ্য-লিয়ঁতে যখন নামলুম, রাত্রি এগারটা হবে। কুলিকে জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি, ওভারকোটের ওপর কে থাপ্পড় মারলে—হের ডক্টর!

ফিরে দেখি রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ, আমাদের স্যানাটোরিয়মের একটি রোগী। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে, দেখতে আমার চেয়েও লম্বা, বহুদিন রোগে ভুগে শীর্ণ শুষ্ক মুখ, চোখে একটা তীব্র ক্ষুধিত দৃষ্টি। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির এক হাড়ে যক্ষ্মা, ছ'বছর স্যানাটোরিয়ম বাসের পর প্রায় সেরে গেছে, এখন ক্রাচের সাহায্যে বাঁ পা তুলে খট্‌খট্ করে ঘুরে বেড়ায়। লোকটি জাতিতে সুইস, তার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন নরওয়ে থেকে। জুরিকের এক ধনী মহাজনের একমাত্র সন্তান।

বিস্মিত হয়ে বল্লুম, আপনি এখানে? পরশু আপনার জ্বর হয়েছিল, আপনার তো স্যানাটোরিয়ম হতে বার হওয়া বারণ।

আমি পলাতক, হের ডক্টর। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। আপনি কোন্ হোটেলে যাচ্ছেন?

ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার এক জানা সস্তা হোটেল আছে, সেখানে ঘর রাখতে লিখেছি।

চলুন আপনার সঙ্গেই যাব। একা বড় হোটেলে গিয়ে থাকতে ভালো লাগবে না। ছাত্রদের থাকবার হোটেল তো!

পথে ট্যাক্সিতে রোজেনবেয়ার্গ বল্লেন, তাঁর মাথায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাঁর বিশ্বাস তাঁর মস্তিষ্কে ক্যানসার হচ্ছে। জুরিখে এক ডাক্তার নাকি বলেছেন ছোট একটা

টিউমার হতেও পারে। প্যারিসে বড় ডাক্তার দেখাবার জন্য তিনি স্যানাটোরিয়ম থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, একটা ক্যানসার কোথাও হচ্ছে!

কথাটা আমি বিশ্বাস করলুম না। আমার হোটেলে আমার ঘরের কাছেই রোজেন-বেয়ার্গের জন্য ঘর ঠিক করে দিলুম। শোবার উদ্যোগ করছি, ট্রেনের স্যুট বদলে সাজসজ্জা করে রোজেনবেয়ার্গ আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। বল্লেন,—চলুন একটু বেরোনো যাক।

আমি বড় শ্রান্ত।

ছ'বছর পরে প্যারিসে এলুম, এর মধ্যেই শেষ। Tender is the night–

আপনি ঘুরে আসুন, আমি জামাকাপড় ছেড়ে ফেলেছি।

সেন-নদীর তীরে একবার ঘুরে আসতে না পারলে রাত্রে ঘুম হবে না। আচ্ছা বন্নুই!

বিছানাতে শুয়ে শুনতে লাগলুম, হের রোজেনবেয়ার্গ সরু সিঁড়ির কাঠের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্ শব্দ করে দ্রুত নেমে চলেছেন, প্যারিসের পথে আনন্দলাভের সন্ধানে।

পরদিন সকালে খবর নিয়ে জানলুম, রোজেনবেয়ার্গ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন, রাত তিনটের সময় মত্তাবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন।

এরপর সাতদিন রোজেনবেয়ার্গের সঙ্গে দেখা হয়নি।

রাত্রে পুচিনির টস্কা দেখে অপেরা-প্রাসাদ হতে রাস্তায় বের হয়েছি, ওভারকোটের ওপর এক থাপ্পড় মেরে কে বল্লে—হের্ ডক্টর! পিছন ফিরে দেখি রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ।

হের্ ডক্টর, কেমন লাগলো অপেরা?

চমৎকার।

চলুন, কাছে ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ আমার জানা আছে, চমৎকার মোজেল মদ রাখে, ১৯১৩ সালের যুদ্ধের ঠিক আগের বছরের মোজেল মদ। না এলে আমি সত্যিই দুঃখিত হব।

অপেরার সঙ্গীতলহরী শ্রবণে অন্তর তখনো উল্লসিত। শার্লিয়াপেনের সুরদীপ্ত মহান্ কণ্ঠধ্বনি কানে বাজছে। বল্লুম, চলুন আজ রাত্রে একটু হল্লা করা যাক।

রেস্তোরাঁতে কিছু খেয়ে আমরা অপেরার কাছে এক কাফেতে এসে বসলুম। পথের ফুটপাথের অর্ধেক জুড়ে টেবিল-চেয়ারের সারি, পাশ দিয়ে নানাসজ্জার নরনারী-স্রোত অবিরাম চলেছে।

রোজেনবেয়ার্গ, প্যারিসের জীবন কেমন উপভোগ করছ?

বড় বেদনা, মাথার মধ্যে অসহ্য বেদনা হয়।

পকেট থেকে সে একটি ছোট শিশি বের করে ছোট টেবিলের ওপর রাখলে। কিছুক্ষণ পর শিশি থেকে দুটো বড়ি ব্যর করে কফির সঙ্গে খেয়ে ফেল্লে।

দু'ঘণ্টা অন্তর এই এ্যাস্‌পিরিন খাচ্ছি, না খেলেই যন্ত্রণায় মরে যাব।

কোনো ডাক্তার দেখালে?

দেখালুম বই কি। ডাক্তার লেভি বললেন, মাথায় নয় পেটে, লিভারের কাছে টিউমার মনে হচ্ছে, ক্যানসারের পূর্বলক্ষণ হতে পারে। তবে আমি জানি ক্যানসার, ও ক্যানসার হবেই। ক্যানসারে আমার মা মরেছেন। ওঃ! সে কি অসহ্য যন্ত্রণা।

সহসা সে থামল। দেখলুম জ্বালাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের সুসজ্জিতা বারবিলাসিনীদের দিকে চেয়ে আছে। তিনটি রূপাজীবা চলেছে শিকারের সন্ধানে। রোজেনবেয়ার্গের চেয়ারের পাশে খাড়া করা ক্রাচ দুটির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে তারা চলে গেল। রোজেনবেয়ার্গের শীর্ণ মুখ আরো কালো হয়ে উঠল।

বল্লুম, ডাক্তাররা তো নিশ্চিতরূপে কিছু বলছেন না!

নিশ্চিতভাবে কে কি বলতে পারে? অহর্নিশি এই যে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি—ক্যানসার রোগীকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরতে আমি দেখেছি, তার সব সিম্‌টম্‌ আমি জানি। গারসঁ, আরো দু'গ্লাস। আচ্ছা আপনি ডাক্তার, ক্যানসারের কোনো চিকিৎসা আছে?

এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা নেই, নানা পরীক্ষা চলছে।

শুধু রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মরে!

একদিন তো আমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।

ক্যানসারের রোগী যদি আত্মহত্যা করে, তাতে দোষ কি?

প্রাণ অমূল্য, প্রাণকে আমরা এখনো সৃষ্টি করতে পারি নি, স্বইচ্ছায় তাকে বিনাশ করার অধিকার আছে কি?

শুধু যন্ত্রণাভোগের অধিকার আছে! আমি আত্মহত্যা করতে পারি—আমার মা নেই, বাবা দু'মাস হল মারা গেছেন। কিন্তু এক বুড়ি দিদিমা আছেন, তিনি মনে বড় আঘাত পাবেন। গারসঁ, এই নোটটা ভাঙিয়ে আন দেখি।

কাফের এক খিদমতগার এগিয়ে আমাদের কাছে এল। রোজেনবেয়ার্গ তার বুকের পকেট থেকে এক মোটা মনিব্যাগ বের করলে, নানারঙের নোটে ভরা। নোটের তাড়া থেকে একখানি একহাজার ফ্র্যাঙ্কের নোট বের করে গারসঁর হাতে দিলে। তারপর মনিব্যাগটা খুলেই টেবিলের ওপর রাখলে। শুধু কাফের নয়, রাস্তার লোকেও দেখতে পেলে নোটভরা মনিব্যাগ টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে।

ব্যাগটা তুলে রাখ, রিচার্ড!

হুঁ। এ ব্যাগে মার্ক-ফ্রাঙ্ক-ডলারে ত্রিশ হাজার ফরাসি ফ্র্যাঙ্কের বেশি আছে।

রোজেনবেয়ার্গ কথাগুলো এত উচ্চস্বরে বল্লে যে রাস্তার লোকও শুনতে পেলে। কাফের লোকেরা আমাদের টেবিলের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আস্তে, এত চেঁচামেচি করছ কেন! ব্যাগটা পকেটে রাখ। এত টাকা পকেট নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় এরকম ভাবে ঘোরার মানে কি?

হুঁ, মানে কি? বেশ বলেছ ডক্টর! আচ্ছা তোমাকে ধাঁধা দেওয়া যাচ্ছে, উত্তর দাও। একটা লোক ত্রিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক পকেটে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? হা হা, জীবনটা একটা গোলোক-ধাঁধা নয় কি? একবার প্রবেশ করলে সব সময় তা থেকে বের হবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেখ, এর চেয়ে কম টাকার জন্য প্যারিসের পথে লোক খুন হয়েছে!

বাঃ, বেশ বলেছ! শোন ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল ভালোই হল। আমার যেরকম শরীরের অবস্থা, যে কোনো সময়ে কিছু ঘটতে পারে। আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, দেখ আমি এখন লক্ষপতি, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি এক ক্যানসার রিসার্চ

হাসপাতালে দিয়ে যেতে চাই। আমার একটা উইল আছে, স্যানাটোরিয়ামে আমার ঘরে নয়, এক জায়গায় লুকনো আছে, সেটা তোমায় বলে যেতে চাই—

সহসা রোজেনবেয়ার্গ চুপ করে পথের দিকে চাইলে। আমাদের কাছ দিয়েই একটি যুবক ও যুবতী যাচ্ছিল, যুবকটি কদাকার ভীমপ্রকৃতির দেখতে, প্যারিসের গুণ্ডাদলের মনে হয়, যুবতী কিন্তু পরমাসুন্দরী, সদ্যপ্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মতো স্নিগ্ধ লীলায়িত মূর্তি।

রোজেনবেয়ার্গ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে ডাকলে,—মাদলেন!

মেয়েটি হেসে এগিয়ে এল, আমাদের টেবিলে আমাদের দু'জনের মাঝে চেয়ারে এসে বসল। যুবকটি কিন্তু কোথায় সরে পড়ল।

হ্যালো মাদলেন, কি খাবে?

চল, এক রেস্তোরাঁতে যাওয়া যাক। সন্ধে থেকে খাইনি, বড় খিদে পেয়েছে।

মাদলেনের দুই চোখে কৌতুকময় হাসি। রোজেনবেয়ার্গ তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে বল্লে, আমরা এই খেয়ে এলুম, এই নাও কাল সকালে খেও।

রোজেনবেয়ার্গ আবার ব্যাগ বের করে মাদলেনের হাতে একখানা পাঁচশ' ফ্র্যাঙ্কের নোট দিলে। ব্যাগে নোটের তাড়া রাস্তার লোকসুদ্ধ দেখতে পেল। মাদলেনের নয়ন দু'টি বিদ্যুৎপর্ণা।

আমি বল্লুম, অনেক রাত হয়েছে, এবার যাওয়া যাক!

আমরাও যাব, চলো মাদলেন।

ট্যাক্সিতে মেয়েটি বসল আমাদের দু'জনের মাঝখানে। আমি চুপ করে বসে রইলুম, রোজেনবেয়ার্গ অনর্গল বকে যেতে লাগল।

দেখ ডাক্তার, আজকাল রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না। আচ্ছা কোনো ভালো ঘুমের ওষুধ তোমার জানা আছে? তুমি দিতে চাও না, বুঝতে পারছি!

মেয়েটি হেসে বলে উঠল, আমি জানি।

আবেগের সঙ্গে রোজেনবেয়ার্গ বল্লে, কি?

মেয়েটি উচ্চ হেসে বল্লে, সে বলব না।

তারপর সমস্ত পথ রোজেনবেয়ার্গ আমার সঙ্গে ভেরনলের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে এল,—সে তিন থেকে চার ট্যাবলেট খায়, কটা ট্যাবলেট খেলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা, ডাভোসে কে কবে ভুলে বেশি ভেরনল খেয়ে মরেছে ইত্যাদি।

হোটেলে ঢুকে রোজেনবেয়ার্গকে একটু আড়ালে ডেকে বল্লুম, মেয়েটি কে?

সে অবাক হয়ে বল্লে, কে? আমি কি ওকে জানি? ওকে আমি চিনি না।

বিস্মিত হয়ে বললুম, তাহলে তুমি ওকে জান না! তোমার সঙ্গে এত টাকা রয়েছে, ব্যাগটা না হয়—দেখলুম আমাদের ট্যাক্সির পেছনে আর একটা মোটরকার আসছিল!

রোজেনবেয়ার্গের বিস্তীর্ণ পাণ্ডুর মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল।

হের্ ডক্টর, এই পৃথিবীতে আমরা কে কাকে জানি?

মেয়েটিকে নিয়ে রোজেনবেয়ার্গ তার ঘরে গেল। আমি আমার ঘরে গিয়ে কোচে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লুম। বাইরে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, বাতাস বইছে ক্ষ্যাপা কুকুরের অবিশ্রান্ত আর্তনাদের মতো। সমস্ত হোটেল নিঝুম নিদ্রিত।

এই রাত্রে ঘুমোবার আশা নেই। ফায়ারপ্লেসের উপর অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন ঘড়িটা শূন্যভাবে চেয়ে রইল। মোপাসাঁর একটি গল্পের বই নিয়ে পড়তে বসলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না, জানালায় সার্সির ঝন্ঝন্ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঝড় উঠেছে, তারসঙ্গে মৃদু তুষারপাত।

বাহিরে উন্মত্তা প্রকৃতি, গর্জমান অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি, কিন্তু হোটেল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ।

চমকে উঠলুম, রোজেনবেয়ার্গের ঘরে কি হয়েছে কে জানে? মেয়েটি নিশ্চয়ই কাজ শেষ করে চলে গেছে। পাশে স্নানের ঘরে জলের কল ভালো করে বন্ধ হয় নি, জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়ছে।

মনে হল কে যেন আমায় ডাকছে, ডক্টর হের্ ডক্টর! কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকার করিডর পার হয়ে সে আহ্বান আসছে।

ধীরে উঠে ঘরের দরজা খুললুম, অন্ধকার করিডর, রোজেনবেয়ার্গের ঘরের দরজা ফাঁক করা, সেই ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা পথের তমিস্রপুঞ্জে এসে পড়েছে। আলোর রেখা দেখে মনে সাহস হল।

চকিতপদে করিডর পার হয়ে রোজেনবেয়ার্গের ঘরে প্রবেশ করলুম। স্তব্ধ ঘর, রোজেনবেয়ার্গ বিছানাতে চাদরের ওপর স্থির হয়ে শুয়ে আছে। স্যুট ছেড়ে রাতের পোশাকও পরে নি। অতি স্থির হয়ে শুয়ে, চোখে অচঞ্চল দৃষ্টি। পাশে ছোট টেবিলে ভেরনলের শূন্য শিশি, দুটি খালি বোতল ও খালি গেলাস। মেয়েটি কোথায়ও নেই।

ডাকলুম,—রোজেনবেয়ার্গ! রিচার্ড!

কোনো সাড়া নেই। কোথায় একটা খট্খট্ শব্দ হল। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, তুষারশীতল। হাত ধরে নাড়ী দেখলুম, কোনো স্পন্দন নেই। জামা খুলে বুকের ওপর কান চেপে শুনতে চেষ্টা করলুম, বুকের ধুকধুকানি একটু আছে কিনা। চিরদিনের মতো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেছে। বাহিরে ঝোড়ো বাতাস গর্জন করছে।

বুঝলুম আমার আর কিছু করবার নেই। ধীরে চোখ দুটি বন্ধ করে গায়ের ওপর একটি চাদর ঢাকা দিয়ে দিলুম।

নিজের ঘরে পরিশ্রান্ত হয়ে সোফায় বসতে শীতের রাত্রে গায়ে ঘাম দিল।

আবার মনে হল, কে আমায় ডাকছে, ডক্টর! ডক্টর! হের ডক্টর! অন্ধকার করিডর পার হয়ে কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে সে ডাক আমার সমস্ত ঘরে ধোঁয়ার মতো ভরে তুলেছে। একটা সিগারেট ধরালুম, একটা জানালা খুলে দিলুম, যদি বাহিরের ঝোড়ো বাতাসের গর্জনে ঘরের এই ডাক ডুবে যায়।

আহ্বান অতি মৃদু ছিল, তীব্র উচ্চ হয়ে উঠল। শুধু আমার নাম ডাকা নয়, খট্খট্ শব্দ, সিঁড়ির কাঠের ধাপের ওপর ক্রাচের খট্খট্ শব্দে সুপ্ত হোটেলের স্তব্ধতা কেঁপে উঠছে।

ক্রাচের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সারি পার হয়ে অন্ধকার করিডর অতিক্রম করে আমার ঘরের সম্মুখে এসে থামল, ঘরের দরজার ওপর তিনটে টোকা পড়ল,—হের ডক্টর!

তখন আতঙ্কে মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি আতঙ্ক-রস অনুভব করতে চেষ্টা করছিলুম—রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা দেখতে আমি প্রস্তুত।

বল্লুম,—আঁত্রে!

ধীরে দরজা খুলে গেল। অন্ধকার পটভূমিতে ছবির মতো রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের মূর্তি ফুটে উঠল। মোটা কালো ওভারকোট পরা, মাথায় ধূসর টুপি, দুই বগলে ক্রাচ। মুখের ওপর ঘরের আলো পড়ে কাচের মতো চক্‌চক্ করছে। চোখে ক্ষুধিত তীব্র দৃষ্টি নেই, বড় শ্রান্ত ঝিমনো ভাব।

যেন বেতার-যন্ত্র হতে কথাগুলি কানে এল।—হের্ ডক্টর, আমি বাইরে যাচ্ছি। উইলের কথা বলতে এলুম, উইলটা আছে আমাদের স্যানাটোরিয়ামে, ফ্রাউ মায়ারের ঘরের টেবিলের তৃতীয় ড্রয়ারে। আচ্ছা বন্‌নুই, অনেক দূর যেতে হবে!

মূর্তি মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলুম। খট্‌খট্ শব্দ দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে গা শির্‌শির্ করে উঠল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, নিজের বুকের ধুকধুকানি শুনতে পাচ্ছি।

দু'ঘরের পরে রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ।

সহসা করিডরে কে আলো জ্বাললে, চোখ ঝলসে উঠল। সিঁড়িতে যুবকদলের হাস্য, যুবতীদলের চঞ্চল পদধ্বনি। একদল চৈনিক ছাত্রছাত্রী হাস্যে গল্পে সিঁড়ি মুখর করে উঠছে। রাত দুটোর আগে তারা সাধারণত ফেরে না।

ছাত্রের দল যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। আমিও আমার ঘরের দরজায় চাবি দিলুম। হোটেল আবার সুপ্ত, স্তব্ধ।

ঝড় থেমেছে। নিঃশব্দে শুভ্র তুষারপাত হচ্ছে, যেন কে সোনালিচাঁপা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। খোলা জানালার কাছে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলুম আলোর আশায়।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। আমি নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলুম। বাইরে ঝড়বৃষ্টি থেমেছে, মৃদু জ্যোৎস্নায় আকাশ থমথম করছে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালুম।

ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন,—মিস্টার ঘোষ, আজ রাত্রেও আমার ঘুম হবে না দেখছি। এখন রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না।

কথাগুলি শুনে কোনো অজানা ভয়ে চমকে উঠলুম। এ যেন ডাক্তার সরকারের কণ্ঠস্বর নয়!

দেখুন তো, ওইখানে একটা শিশি আছে, হাঁ—ওই হল্‌দে শিশিটা। আমি আর উঠতে পারছি না। পায়ে কেমন ব্যথা হয়েছে। কয়েকটা ট্যাবলেট শিশি থেকে এই গেলাসে রাখুন।

ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, কটা?

কটা? ও, এই পাঁচ-ছটা! ওতে কিছু হবে না আমার। ওর কমে ঘুম হয় না। আপনি হয়তো ছ'টা খেলে—

মন্ত্রচালিতের মতো ছ'টা ট্যাবলেট গেলাসে ফেলে তার সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে ডাক্তার সরকারকে দিলুম। তিনি এক চুমুকে সবটা খেয়ে বল্লেন,—একটু বসুন।

তারপর চোখ বুজে সেত্তিতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি চুপ্ করে বসে রইলুম। পা যেন নাড়তে পারছি না। ঘরের স্তব্ধতা পাথরের

মতো ভারী। জানালার কাচ ঝকমক করছে অবগুণ্ঠিতা নারীর ভীতিব্যাকুল দৃষ্টির মতো।

কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না। কালের স্রোত যে বয়ে চলেছে, সে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মনে হল খট্‌খট্‌ শব্দ আসছে, কাঠের মেজের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্‌ শব্দ। সে শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার ঘরের পাশ দিয়ে বারান্দা পার হয়ে ঘরের সামনে এসে থামল। দরজার ওপর তিনটে টোকা, টক্‌ টক্‌ টক্‌!

ভয়ে শিউরে উঠলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—ডাক্তার সরকার!

কোনো সাড়া নেই।

প্রাণপণে চেঁচালুম—ডাক্তার সরকার! ডাক্তার!

নিঃসাড়, স্পন্দনহীন দেহ।

ডাক্তার সরকারের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলুম। বরফের মতো কন্‌কনে হাত, নাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল না।

নাকের কাছে হাত রাখলুম, বুকের উপর কান দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলুম, নিশ্চল হৃৎপিণ্ড, দেহে রক্তচলাচল নেই।

ডাক্তার সরকার মৃত? হয়তো ভেরনলের মাত্রা অধিক দিয়েছি। বিবর্ণ মুখ সাদা মুখোসের মতো।

আতঙ্কে বিহ্বল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালুম। দরজার ওধারে রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা, আর এধারে ডাক্তার সরকারের মৃতদেহ!

কালো চশমার কাচের পেছনে চোখ দুটো নড়ে উঠল। শিউরে উঠলুম।

ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন,—কি মিস্টার ঘোষ? আবার দাঁতের ব্যথা হচ্ছে নাকি?

না।

তবে ভয় পেয়েছেন। না, আমি মরি নি। অত সহজে মৃত্যু হয় না।

আমার মনে হচ্ছিল—

হুঁ, সে রাত্রে প্যারিসের হোটেলে কি রকম আতঙ্ক অনুভব করেছিলুম, তার কিছু আভাস পেলেন বোধ হয়!

আপনি চমৎকার অভিনেতা দেখছি!

অভিনয় করতে পারি বলেই এতদিন বেঁচে আছি। আচ্ছা আপনি শুতে যান, আজ রাত্রে আর রোজেনবেয়ার্গ এল না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যান। একটু খেয়ে যান, ভালো ঘুম হবে। শুনুন, গল্পের শেষটুকু আপনাকে বলা হয়নি। সকালে কিন্তু রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ হোটেলের ঘরে পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে সেন-নদীর জলে মৃতদেহ পাওয়া গেল। লোকে বলে গুণ্ডারা রাতারাতি মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছল। কিন্তু আমার থিওরি হচ্ছে, মাদলেন ওকে মারে নি। আপনার কি মনে হয়?

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চলে এলুম। ঘরে এসে খোলা জানালার পাশে বসলুম। হ্রদের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

ভাবতে লাগলুম, ডাক্তার সরকার কি উন্মাদ, না বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ!

কে ?

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১

উড়িষ্যায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমি আর রূপলাল। এদেশে-সেদেশে ঘুরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হলুম।

এক দুপুরবেলায় খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে গেলুম। যাওয়ার সময় পাণ্ডা সাবধান করে দিলে, আমরা যেন সন্ধ্যা হ'বার আগেই ফিরে আসি, কারণ খণ্ডগিরিতে নাকি নরখাদক বাঘের বিষম উপদ্রব হয়েছে। বাঘের কবলে পড়ে একমাসের মধ্যে পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে।

একথা শুনে ভয় পেলুম না, কারণ আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গেল, এবং বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আকাশ কালো করে শুরু হল ঝড় ও বৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডাকবাংলোর ভিতরে আশ্রয় নিলুম।

বিকাল গেল, সন্ধ্যাও উতরে গেল। কিন্তু সে ঝড়বৃষ্টি তবু থামল না।

বাংলোর বেয়ারা এসে বললে, "বাবু, আজ আপনারা এখান থেকে যাবেন কেমন করে?'

রূপলাল বললে, "কেন, যেমন করে এসেছি তেমনি করেই ফিরে যাব, অর্থাৎ দু-পায়ে ভর দিয়ে!"

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বললে, "আজ আর তা পারবেন না। একে এই ঝড়জল, তার ওপরে—শুনেছেন তো?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, বাঘের উপদ্রবের কথা বলছ তো? শুনেছি।"

বেয়ারা বললে, "খালি বাঘ নয়, পেত্নীর ভয়ও আছে।"

রূপলাল বললে, "তাহলে আজ আমরা এই বাংলোতেই রাত কাটাব। জীবনে কখনো পেত্নী দেখি নি, আজ তাকে দেখব। আর যদি পছন্দ হয়, তাহলে পেত্নীটিকে বিয়ে করে দেশে ফিরব।"

বেয়ারা বললে, "বাবু, আপনি জানেন না তাই ঠাট্টা করছেন। বেশ, আপনারা তাহলে আজ এখানে থাকবেন তো?"

আমরা বললুম, "হ্যাঁ।"

বেয়ারা বললে, "তাহলে আপনাদের জন্য রান্নাবান্নার আয়োজন করি গে।"—এই বলে সে চলে গেল।

রাত হল। বৃষ্টি এখনো ঝরছে, ঝড় এখনো গর্জন করছে।

২

রাত্রে খেতে বসেছি, এমন সময় বাংলোর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, এমন স্থানে এই দুর্যোগে দরজা ঠেলে কে?

বেয়ারা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কে?"

বাহির থেকে ভীত-কাতর নারীকণ্ঠে সাড়া এল, "শীগ্‌গির দরজা খুলে দাও। নইলে প্রাণে মারা গেলুম।"

উড়ে বেয়ারাটা সেইখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগল।

আমি বললুম, "অমন করছ কেন? যাও, দরজা খুলে দাও!"

বেয়ারা এক পা-ও নড়লো না, সেইখানে দাঁড়িয়ে তেমনি করেই কাঁপতে লাগল।

রূপলাল তার ভয় দেখে হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বেয়ারা ছুটে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বললে, "পায়ে পড়ি বাবু, দরজা খুলবেন না। ও মানুষ নয়।"

রূপলাল বললে, "বলেছি তো, আমি পেত্নী বিয়ে করতে চাই। ও মানুষ না হলেই আমি বেশি খুশি হব।"

বাহির থেকে আবার আর্তস্বর শোনা গেল, "বাঘ, বাঘ! রক্ষা কর—রক্ষা কর!"

রূপলাল আর বাধা মানলে না, বেয়ারাকে একধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে একটানে সে দরজার খিলটা খুলে দিলে।

একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করলে একটি স্ত্রীমূর্তি। তাকে ভালো করে দেখবার আগেই বাতাসের ঝাপটে ঘরের আলোটা নিভে গেল।

বেয়ারা হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ঝড়বৃষ্টির হুলুস্থূল, সেই পার্বত্য অরণ্যের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, সেই অভাবিত ও অজানা নারীমূর্তির আকস্মিক আবির্ভাব এবং আলোকহীন ঘরের ভিতরে বেয়ারার সেই ক্রন্দনস্বর,—এই সমস্ত মিলে চারিদিকে কেমন একটা ছমছমে অস্বাভাবিক ভাব সৃষ্টি করলে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, "রূপলাল, শীগগির দরজাটা বন্ধ কর! আমি আবার আলোটা জ্বেলে নি!"

রূপলাল দরজায় খিল তুলে দিলে। আমি আলোটা জ্বাললুম।

কৌতূহলী চোখে ফিরে দেখলুম, ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একটি অসীম রূপসী মেয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। তার এলোমেলো চুলগুলো এলিয়ে মুখ কাঁধ ও বুকের উপর এসে পড়েছে এবং তার সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। মেয়েটির বয়স হবে আঠারো কি উনিশ।

ঘরের আর এক দিকে মেঝের উপরে উবু হয়ে বসে, হাতে মুখ ঢেকে উড়ে বেয়ারাটা তখনো ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মেয়েটি প্রথমেই আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "ও লোকটি অমন করে কাঁদচে কেন?

রূপলাল হাসতে হাসতে বললে, "ওর ধারণা আপনি একটি নিখুঁত পেত্নী!"

মেয়েটি চম্‌কে উঠল। তারপর মুখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে বললে, "আমায় কি পেত্নীর মতো দেখতে? কিন্তু সে কথা থাক, বড় বিপদ থেকেই আপনারা আমায় উদ্ধার করলেন।"

তার বিপদের ইতিহাস হচ্ছে এই। সে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আসাতে এতক্ষণ সে একটা গুহার ভিতরেই ঢুকে আত্মরক্ষা করছিল। হয়তো সে রাতটা কাটিয়ে দিত, কিন্তু গুহার কাছেই বাঘের ভীষণ গর্জন শুনে প্রাণের ভয়ে সে এখানে পালিয়ে এসেছে।

রূপলাল নিজের সিল্কের চাদরখানা খুলে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললে, "আপনার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেছে। পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে আপাতত এই চাদরখানা ব্যবহার করতে পারেন।—কিন্তু আজ রাতে খাবেন কি? আমাদের তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে!"

মেয়েটি পাশের ঘরে যেতে যেতে বললে, "এক রাত না খেলে কেউ মরে না।"

৩

আমি ও রূপলাল আলোর শিখাটা খুব কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। বন্দুকটাকেও শুইয়ে রাখলুম ঠিক আমাদের মাঝে।

শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম বনজঙ্গলের উপরে পাহাড়ের বৃষ্টি-বালার অশ্রান্ত নৃত্য-নূপুরধ্বনি।

রূপলাল আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, "আচ্ছা ভাই, ওই মেয়েটির ইতিহাস কি তোমার কাছে একটু উদ্ভট বলে মনে হল না?"

আমি বললুম, "কেন?"

রূপলাল বললে, "ও মেয়েটি কে? ওর কি কোনো অভিভাবক নেই? অত বড় মেয়েকে কেউ কি একলা এই বিদেশে ছেড়ে দেয়? ওর মাথায় সিঁদুর নেই, গায়েও একখানা গয়না নেই। ওর সবই যেন কেমন রহস্যময়!"

আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললুম, "ওই সব বাজে কথা ভেবে তুমি মাথা গরম করতে থাকো, ততক্ষণে আমি একঘুম ঘুমিয়ে নি!"

আমার যখন বেশ তন্দ্রা আসছে তখন শুনলুম, রূপলাল আপন মনে বলছে, "অমন সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তার চোখ দুটো কী তীক্ষ্ণ! ওর চোখ দুটো যেন ওর নিজের চোখ নয়, যেন কোনো হিংস্র জন্তুর চোখ!"

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, হঠাৎ কি একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। তারপর চোখ খুলেই যে দৃশ্য দেখলুম, সারাজীবনে কোনো দিন তা ভুলতে পারব না।

এ-ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজার দিকে পিছন করে মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা বাঘ।

আমার বুকের গতি হঠাৎ যেন থেমে গেল। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে স্তম্ভিত-নেত্রে বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইলুম, সেও তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ইতিমধ্যে অল্পে অল্পে হাত সরিয়ে পাশের বন্দুকটা আমি চেপে ধরলুম।

বাঘটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ল লাফ মারবার জন্য।

চোখের নিমেষে আমিও বন্দুকটা নিয়ে উঠে বসলুম এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম।

একটা উল্টো ডিগবাজি খেয়ে বাঘটা পাশের ঘরে গিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠে বার বার ভীষণ আর্তনাদ। দড়াম্ করে একটা দরজা খোলার শব্দ। দ্রুত পদধ্বনি। তারপরে সব আবার স্তব্ধ।

বন্দুক হাতে করে অভিভূতের মতো বিছানার উপরে বসে রইলুম। রূপলাল জেগে বিছানার উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে উঠল, "কে চেঁচালে অমন করে? কে বন্দুক ছুঁড়লে?"

আমি বললুম, "বাঘ, বাঘ! এখন ও-ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সেই মেয়েটি চিৎকার করছে।"

"সর্বনাশ! বাঘ বোধ হয় তাকেই ধরেছে।"—বলতে বলতে বেগে রূপলাল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমিও বন্দুক আর লণ্ঠনটা নিয়ে তার সঙ্গে ছুটলুম।

পাশের ঘরে কেউ নেই। খালি একটা খোলা দরজা দিয়ে হু-হু করে জোলো হাওয়া আসছে।

রূপলাল বেদনা-বিদীর্ণ স্বরে বললে, "আর কোনো আশা নেই। অভাগী শেষটায় সেই বাঘের কবলেই গিয়ে পড়ল। কিন্তু বাঘ এখানে এল কেমন করে?"

রূপলালের কথার কোনো জবাব দিলুম না। আমি তখন আর একটা ব্যাপার সবিস্ময়ে লক্ষ করছিলুম। ঘরের ভিতর একটা একটানা রক্তের রেখা বাহিরের দিকে সোজা চলে গিয়েছে। পরে পরে একখানা করে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ—মানুষের পা।

সবিস্ময়ে বললুম, "দেখ রূপলাল, দেখ! কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

রূপলাল অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর থেমে থেমে ধীরে ধীরে বললে, "এত রক্ত! কিন্তু একটাও বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? এ পায়ের দাগগুলো দেখে মনে হয়, যেন কোনো মানুষের একখানা পা আহত হয়েছে আর সেই আহত পায়ের রক্ত ছড়াতে ছড়াতে সে এ-ঘর থেকে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। বাঘ যদি সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেত, তাহলে তাকে মুখে টেনে-হিঁচড়েই নিয়ে যেত, আর তাহলে এখানে কখনই এমন পায়ের ছাপ পড়ত না!"

সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা বাইরে বেরিয়ে গেলুম।

এবারে দেখলুম, কাদার উপর দিয়ে একজোড়া মানুষের পায়ের ছাপ বরাবর বনের দিকে চলে গিয়েছে।

রূপলাল মাথা নেড়ে বললে, "তুমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ নিশ্চয়ই। সেই মেয়েটি আবার পালিয়েছে। বাঘ-টাঘ কিছুই এখানে আসেনি।"

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি নিজের চোখে বাঘ দেখেছি, নিজের হাতে গুলি করেছি, আর সে নিশ্চয় আহত হয়েছে।"

রূপলাল বললে, "তোমার গুলি খেয়ে বাঘ কি পাখি হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল? দরজার সামনে এই কাদামাটি, কিন্তু এখানে বাঘের পায়ের দাগ কোথায়? ঘরের ভিতরে মেয়েটি ছিল, কেবল সে-ই যে বেরিয়ে গেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন কাদার উপরে রয়েছে। কোনো বাঘ ঘর থেকে বেরোয় নি। আমার বোধ হয়, তোমার গুলিতে সেই মেয়েটিই আহত হয়ে পালিয়ে গেছে।"

হঠাৎ একটি বিচিত্র সম্ভাবনা আমার মাথার ভিতরে জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি রূপলালকে টানতে টানতে আবার ঘরের ভিতরে এনে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সভয়ে আমি বললুম, "রূপলাল, পৃথিবীর সব দেশের লোকেরই একটা বিশ্বাস আছে, কোনো কোনো বাঘ নাকি আসলে বাঘ নয়! রূপলাল, আজ রাত্রে যে স্ত্রীলোকটা এখানে এসেছিল, সে কে? গুলি করলুম বাঘকে, চিৎকার করলে একটা স্ত্রীলোক—এর মানে কি? সে কে? সে কে?"

রূপলাল অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, "তুমি কি বলতে চাও, তাহলে ওই উড়ে বেয়ারাটার কথাই সত্যি?"

অশরীরিণী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন উই-ধরা ডায়েরিখানি সাবধানে খুলিয়া বরদা বলিল,—অদ্ভুত জিনিস, কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। আমাদের আবদুল্লা কুঁজড়াকে জান তো? সাহেবদের কুঠি থেকে পুরানো বই সেরদরে কিনে বিক্রি করতে আসে? তারি কাছ থেকে এটা কিনেছি। ঝাঁকায় করে এক গাদা বই নিয়ে এসেছিল, বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা বাংলায় লেখা ডায়েরি। নগদ দু-পয়সা খরচ করে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললুম।

অমূল্য দৈবক্রমে আজ ক্লাবে আসে নাই, তাই বাক্‌বিতণ্ডায় বেশি সময় নষ্ট হইল

না। বরদা বলিল,—পড়ি শোনো। বেশি নয়, শেষের কয়েকটা পাতা খালি পড়ে শোনাব। আর যা আছে তা না শুনলেও কোনো ক্ষতি নেই। এ ডায়েরির লেখক কে তা ডায়েরি পড়ে জানা যায় না, তবে তিনি যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন এ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

ল্যাম্পটা উস্কাইয়া দিয়া বরদা পড়িতে আরম্ভ করিল।—৭ ফেব্রুয়ারি। আজ মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে পীর-পাহাড় প্রায় মাইল তিনেক দূরে—শহরের বাহিরে। মুঙ্গের শহরের যতটুকু দেখিলাম, কেবল ধূলা আর পুরাতন সেকেলে বাড়ি। যা হোক, আমাকে শহরের মধ্যে থাকিতে হইবে না, ইহাই রক্ষা। স্টেশন হইতে আসিতে পথে কেল্লার ভিতর দিয়া আসিলাম। কেল্লাটা মন্দ নয়। পুরাতন মীরকাশিমের আমলের কেল্লা, —গড়খাই দিয়া ঘেরা। প্রাকারের ইটপাথর অনেকস্থানে খসিয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ উচ্চ প্রাচীরের উপর জন্মিয়া শুষ্ক গড়খাইয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন এই গড়ের প্রাচীরে সতর্ক সান্ত্রী পাহারা দিত, প্রহরে প্রহরে দুর্গদ্বারে নাকাড়া বাজিত, সন্ধ্যার সময় লোহার তোরণদ্বার ঝনৎকার করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত।—কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না।

পীর-পাহাড়ের বাড়িখানি চমৎকার। এমন বাড়ি যাহার, সে চিরদিন এখানে থাকে না কেন, এই আশ্চর্য! যা হোক, পাহাড়ের উপর নির্জন প্রকাণ্ড বাড়িখানিতে একাকী একমাস থাকিতে পারিব জানিয়া ভারি আনন্দ হইতেছে। বন্ধু কলিকাতায় থাকুন, আমি এই অবসরে তাঁহার বাড়িটি ভোগ করিয়া লই।

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় দেড়মাস ধরিয়া প্রকাণ্ড দায়রা মোকদ্দমা চালাইবার পর সত্যসত্যই বিশ্রাম করিতে হইলে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান আর নাই। আমার শরীর যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শুধু অত্যধিক পরিশ্রম নয়—মানুষের সহিত অবিশ্রাম সংঘর্ষ। যে কোনো মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়া আসিয়াছে তাহার পেট হইতে সত্য কথা টানিয়া বাহির করা এবং যে হাকিম বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে কিরূপ বুকভাঙা ব্যাপার তাহা যিনি এ পেশায় ঢুকিয়াছেন তিনিই জানেন। মানুষ দেখিলে এখন ভয় হয়, কেহ কথা কহিবার উপক্রম করিলেই পলাইতে ইচ্ছা করে। তাই একেবারে নিঃসঙ্গভাবে চলিয়া আসিয়াছি, বামুন-চাকর পর্যন্ত সঙ্গে লই নাই। ইক্‌মিক্ কুকার সঙ্গে আছে, তাহাতেই নিজে রাঁধিয়া খাইব।

কি সুন্দর স্থান! পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর বাড়িটি, চারিদিকের সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন-চারশ' ফুট উচ্চে। ছাদের উপর দাঁড়াইলে দেখা যায়, একদিকে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চর। তাহার উপর এখন সরিষা জন্মিয়াছে—সবুজ জমির উপর হলুদ-বর্ণ ফুলের স্ফুলিঙ্গ। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, অগণ্য অসংখ্য তালগাছের মাথা জাগিয়া আছে, আরো কতপ্রকারের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল, তাহার ভিতর দিয়া গেরিমাটি-ঢাকা পথটি বহু নিম্নে গোলাপি ফিতার মতো পড়িয়া আছে। এ যেন কোন্ স্বর্গলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়িতে একটা মালী ছাড়া আর কেহ নাই। সে-ই বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এবং দু-চারটা মৃতপ্রায় গোলাপগাছে জল দেয়। জল পাহাড়ের উপর পাওয়া যায় না, পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার ধারে একটি কূয়া আছে সেখান হইতে আনিতে হয়। মালীটার সহিত কথা হইয়াছে—আমার জন্য দু-ঘড়া জল রোজ আনিয়া দিবে, তাহাতেই আমার স্নান ও পান দুই কাজই চলিয়া যাইবে।

মালীটাকে বলিয়া দিয়াছি, পারতপক্ষে যেন আমার সম্মুখে না আসে, আমি একলা থাকিতে চাই।

৮ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এত ঘুমাইয়াছি যে জীবনে বোধ হয় এমন ঘুমাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় শুইতে গিয়াছিলাম, যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা সাতটা—ভোরের রৌদ্র খোলা জানালা দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গোছগাছ করিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছি। সঙ্গে কিছু চাল ডাল আলু ইত্যাদি আনিয়াছিলাম—তাহাতে আরো তিন চার দিন চলিবে। ফুরাইয়া গেলে মালীকে দিয়া শহরের বাজার হইতে আনাইয়া লইব। ট্রাঙ্কগুলা খুলিয়া দেখিলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই আছে। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম সাবান তেল আয়না চিরুনি কিছুই ভুল হয় নাই। এক বান্ডিল ধূপের কাঠিও রহিয়াছে দেখিলাম, ভালোই হইল। এখনো অবশ্য একটু শীত আছে, কিন্তু গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে মশার উপদ্রব বাড়িতে পারে। চাকরটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি, কতকগুলা বই ও কাগজ পেনসিল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছে। যদিও এই একমাসের মধ্যে স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তবু হাতের কাছে দু-একখানা থাকা ভালো।

বইগুলা কিন্তু একেবারেই বাজে। পরলোক, ভূতদর্শন, উন্মাদ ও প্রতিভা—এসব বই আমি পড়ি না। চাকরটা বোধ হয় ভাবিয়াছে, আইন ছাড়া অন্য যে-কোনো বই পড়িলেই আমি ভালো থাকিব। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে,—সাধে কি বলে, স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

এখানেও একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে দেখিতেছি। একটা ক্ষুদ্র আলমারিতে গোটাকয়েক পুরাতন উপন্যাস, অধিকাংশরই সম্মুখের ও পশ্চাতের পাতা ছেঁড়া। যা হোক, পড়িবার যদি ইচ্ছা হয়—বইয়ের অভাব হইবে না।

দুপুর বেলাটা ভারি আনন্দে কাটিল। শূন্য বাড়িময় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পাহাড়ের উপর এই বৃহৎ বাড়ি কে তৈয়ার করিয়াছিল—ইহার কোনো ইতিহাস আছে কি? কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাড়ি যে-ই তৈয়ার করুক তাহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়। যে পাহাড়ের উপর বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে একটি উল্টানো বাটির মতো,—কবি হইলে আরো রসাল উপমা দিতে পারিতাম—হয়তো সাদৃশ্যটাও আরো বেশি হইত,—কিন্তু আমার পক্ষে উল্টানো বাটিই যথেষ্ট। সাদা বাড়িখানা তাহার উপর মাথা তুলিয়া আছে। বাড়িখানা যেমন বৃহৎ তেমনি মজবুত—মোটা মোটা দেওয়ালের মাঝখানে বিশাল এক একটা ঘর, নিজের বিশালতার গৌরবে শূন্য আসবাবহীন অবস্থাতেও সর্বদা গম্‌গম্ করিতেছে। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা সমতল স্থান আছে, তাহাতে গোলাপবাগান। গোলাপবাগানের শেষে ফটক, ফটকের বাহিরেই নীচে যাইবার ঢালু পাথরভাঙা পথ বাঁকিয়া বাড়ির কোল দিয়া নামিয়া গিয়াছে। ফটকের সম্মুখে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড কূপ, গভীর হইয়া গিয়াছে, তাহার তল পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। কূপের চারপাশে আগাছা জন্মিয়াছে, একটা শিমুলগাছ তাহার মুখের বিরাট গর্তটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কূপের ভিতর এক খণ্ড পাথর ফেলিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পরে একটা ফাঁপা আওয়াজ আসিল। কূপটা নিশ্চয় শুষ্ক।

সন্ধ্যার সময় কূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দূরে

দূরে দু-একটা প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপরে এখনো বেশ আলো আছে। পশ্চিম দিকটা গৈরিক ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে ভারি চমৎকার। এই বাড়িতে আমার দুই দিন কাটিল।

হঠাৎ কাঁধের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করিয়া দেখি, এক ঝলক রক্ত সেখানে পড়িয়াছে। কিন্তু তখনি বুঝিতে পারিলাম, রক্ত নয়—ফুল। শিমুলগাছটায় দু'চারটা ফুল ধরিয়াছিল, ইতিপূর্বে লক্ষ করি নাই।

ফুলটি হাতে লইয়া আসিলাম। মনে হইল, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফুল দিয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি। আজ শরীরটা ভালো ঠেকিতেছে না; বোধ হয় একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন উত্তাপ অনুভব করিতেছি। মোকদ্দমা লইয়া যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কুফল এখনো শরীরে লাগিয়া আছে, অকারণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া উঠে। আজ উপবাস করিয়াছি, আশা করি কাল শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া যাইবে।

১০ ফেব্রুয়ারি। প্রাচীন গ্রীসে সংস্কার ছিল, প্রত্যেক গাছ লতা নদী পাহাড়ের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞানশাসিত যুগে কথাটা হাস্যকর হইলেও উপদেবতা-অধিষ্ঠিত গাছপালার কথা কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না। সাঁওতালদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কার আছে শুনিয়াছি। যাহারা বনেজঙ্গলে বাস করে তাহাদের মধ্যে এইপ্রকার বিশ্বাস হয়তো স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই থাকুক, দেবতা সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা সভ্য হইয়া ইট-পাথরের মন্দিরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহারা বনের মানুষ তাহারা গাছপালা নদীনালাতেই দেবতার আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাবে সেইখানেই দেবতার জন্ম। মানুষ সহজ অবস্থায় ভূত প্রেত উপদেবতা, এমন কি দেবতা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না, ও-সব বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমতো মস্তিষ্কের ব্যাধি থাকা চাই। কিন্তু সে যাহাই হোক, উপদেবতার কথা কল্পনা করিতে বেশ লাগে। আমার ঐ শিমুলগাছটায় যদি একটা দেবতা থাকিত তাহাকে দেখিতে কেমন হইত? কিংবা অতদূর যাইবার প্রয়োজন কি এবং পাহাড়টারও তো একটা দেবতা থাকা উচিত—তিনিই বা কিরূপ দেখিতে শুনিতে? তিনি যদি হঠাৎ একদিন আমাকে দেখা দেন তবে কেমন হয়?

১১ ফেব্রুয়ারি। দিনের বেলাটা পাহাড়ের উপরেই এধার-ওধার ঘুরিয়া এবং রান্নাবান্নার কাজে বেশ একরকম কাটিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত এই তিন চার ঘণ্টা সময় যেন কিছুতেই কাটিয়ে চায় না। এখন কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে, সূর্যাস্তের পরই চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া যায়। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যায়, কেবল আকাশের তারাগুলা যেন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি ইক্‌মিক কুকারে রান্না চড়াইয়া দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া থাকি। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না—আনাচে-কানাচে অন্ধকার থাকিয়া যায়।

প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি একা

১২ ফেব্রুয়ারি। মনটা অকারণে বড় অস্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কেবলি

মনে হইতেছে যেন কাহার অদৃশ্য চক্ষু আমাকে অনুসরণ করিতেছে, বার বার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখিতেছি। অথচ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। স্নায়বিক উত্তেজনা—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় অস্থির বোধ হইতেছে,—নার্ভের কোনো ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভালো হইত।

১৩ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার স্নায়ুগুলা এখনো ধাতস্থ হয় নাই—কিংবা—

না, না, ও সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার সর্বাঙ্গে অতি লঘু স্পর্শে হাত বুলাইয়া দিতেছে। কি অপূর্ব রোমাঞ্চকর সে স্পর্শ তাহা বলিতে পারি না। মুখের উপর হইতে আঙুল চালাইয়া পায়ের পাতা পর্যন্ত লইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘর অন্ধকার ছিল। এই শারীরিক সুখস্পর্শের মোহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিয়া, ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল কে যেন নিঃশব্দে শয্যার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে ঘুমের আবেশ একেবারে ছুটিয়া গিয়াছিল। ভাবিলাম,—চোর নয় তো? কিন্তু চোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কেন? তা ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—কে? কোনো সাড়া নাই। গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বালিশের পাশে দেশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরে কেহ নাই, দরজা পূর্ববৎ বন্ধ। ভাবিলাম, ঘুমাইয়া নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিয়াছি। এমন অনেক সময় হয়, ঘুম ভাঙিয়াছে মনে হইলেও ঘুম সত্যই ভাঙে না—নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে মনটা অর্ধচেতন অবস্থায় থাকে।

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম; খোলা বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম এক-আকাশ নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। ঘরের বন্ধ বায়ু হইতে বাহিরে আসিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বাড়ির চারিদিকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করিবার পর একটু গা-শীত-শীত করিতে লাগিল, আবার ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইলাম। আলোটা নিভাইলাম না, কমাইয়া দিয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলাম।

এটা কি সত্যই স্বপ্ন?—রাত্রে আর ভালো ঘুম হইল না।

১৪ ফেব্রুয়ারি। কাল আর কোনো স্বপ্ন দেখি নাই। আধ-আশা আধ-আশঙ্কা লইয়া শুইতে গিয়াছিলাম। হয়তো আজ আবার স্বপ্ন দেখিব, কিন্তু কিছুই দেখি নাই। আজ শরীর বেশ ভালো বোধ হইতেছে।

চাল ডাল কেরোসিন তৈল ইত্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল, মালীকে দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া লইয়াছি। মালীটা জাতে গোয়ালা হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক। সেই যে তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম, তারপর হইতে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার কাছে আসে না। কখন জল দিয়া যায় আমি জানিতেও পারি না। আমিও আসিয়া অবধি পাহাড় হইতে নীচে নামি নাই, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এ-কয়দিন হয় নাই বলিলেই চলে। নীচে রাস্তা দিয়া মানুষ চলাচল করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এতদূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই।

আজ বাড়িতে চিঠি দিয়াছি। লিখিয়াছি, বেশ ভালো আছি। কিন্তু তাহাদের চিঠিপত্র দিতে বারণ করিয়া দিয়াছি। আমার এই বিজনবাসের মাধুর্য চিঠিপত্রের দ্বারাও খণ্ডিত হয়,

ইহা আমার ইচ্ছা নয়। বাহিরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে-না-ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখিতে চাই না।

১৫ ফেব্রুয়ারি। আজ আবার মনটা অস্থির হইয়াছে। কি যেন হইয়াছে, অথচ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরীর তো বেশ ভালোই আছে। তবে এমন হইতেছে কেন?

কাল ভাবিতেছি একবার শহরটা দেখিয়া আসিব। শুনিয়াছি নবাবী আমলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

কাছেই কোথায় নাকি সীতাকুণ্ড নামে গরমজলের একটা প্রস্রবণ আছে, বন্ধু বলিয়া দিয়াছিলেন, সেটা দেখা চাই। অতএব সেটাও দেখিতে হইবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে আবার সেইরূপ ঘটিয়াছে। স্বপ্ন নয়—এ স্বপ্ন নয়! স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে আমার পাশে বসিয়া অতি কোমল হস্তে ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া নিস্পন্দবক্ষে শুইয়া রহিলাম। বালিশের তলায় ঘড়িটা টিক্-টিক্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম, সুতরাং এ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা হইতেই পারে না।

অদৃশ্য হাতটা কতবার আমার আপাদমস্তক বুলাইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। একবার হাতখানা যখন আমার বুকের কাছে আসিয়াছে তখন হাত বাড়াইয়া আমি সেটা ধরিতে গেলাম। মনে হইল আমার মুঠির মধ্যে হাতটা গলিয়া মিলাইয়া গেল। হাত-বুলানোও বন্ধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, এখনো যায় নাই। আমি চোখ চাহিয়া শুইয়া রহিলাম—সেও দাঁড়াইয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—চোখ খুলিয়া থাকা বা বুজিয়া থাকার কোনো প্রভেদ নাই। উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম কোনো শব্দ হয় কিনা। দরজায় কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে—তাহারই শব্দ শুনিতেছি। আর কোনো শব্দ নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিলাম, সে আস্তে চলিয়া গেল। আজ আর আসিবে না। ঘুমাইয়া পড়িলে হয়তো থাকিত। আমি যখনই ঘুমাই, তখনি কি সে আমার সুপ্ত শরীরের উপর পাহারা দেয়?

কিন্তু আশ্চর্য, আজ আমার একটুও ভয় করিল না কেন?

১৭ ফেব্রুয়ারি। আবার শিমুলগাছ রক্তরাঙা ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে পাতা নাই, কেবলই ফুল।

সেদিন যে আমার কাঁধের উপর এক ঝলক রক্তের মতো ফুল পড়িয়াছিল—সে কি স্বাভাবিক? এত স্থান থাকিতে আমার কাঁধের উপরই বা পড়িল কেন? তবে কি কোনো অদৃশ্য হস্ত গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আমার গায়ে ফেলিয়াছিল? কে সে? বৃক্ষদেবতা, না আমারই মতো মানুষের দেহ-বিমুক্ত আত্মা? তাই কি? একটা দেহহীন আত্মা—সে আমাকে পাইয়া খুশী হইয়াছে তাহাই কি আকারে ইঙ্গিতে জানাইতে চায়? সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায়? তাই কি সেদিন ফুল দিয়া আমার সম্বর্ধনা করিয়াছিল?

তবে কি সত্যই প্রেতযোনি আছে? দেহমুক্ত অশরীরী আত্মা? বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু there are more things in heaven and earth–

একটা বিষয়ে ভারি আশ্চর্য লাগিতেছে, ভয় করে না কেন? এই নির্জন স্থানে একলা আছি, এ অবস্থায় ভয় হওয়াই তো স্বাভাবিক।

১৮ ফেব্রুয়ারি। আনমনে দিন কাটিয়া গেল। শূন্য বাড়িময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পশ্চিমী হাওয়া দিতেছে—খুব ধূলা উড়িতেছে। গঙ্গার চরের দিকটা বালিতে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

আজ কিছু ঘটে নাই। মনটা উদাস বোধ হইতেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি। দিনটা যেন রাত্রির প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কিছু অনুভব করি না কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পশ্চিম আকাশে সরু একটি চাঁদ দেখা দিয়াছে—যেন অসীম শূন্যে অপার্থিব একটু হাসি। অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্ত গেল, তখন আবার নীরন্ধ্র অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিয়া লইল।

ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়া অন্যমনে বসিয়াছিলাম। আলোটা সম্মুখের ভাঙা টেবিলে বসানো ছিল। অদূরে কতকগুলো ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছিলাম, তাহারই সুগন্ধ ধূমে ঘরটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

আর তো যা-হোক একটা কিছু না পড়িয়া থাকা যায় না। বসিয়া বসিয়া সহসা কি মনে হইল, বাক্স হইতে সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

গল্প—নেহাত গল্প। সত্য অনুভূতির ছায়া মাত্র, এ সব কাহিনীতে নাই। আমি যেমন করিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছি, চোখে না দেখিয়াও সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়াছি—সেরূপভাবে আর কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?

ইহারা লিখিতেছে, চোখে দেখিয়াছে। চোখে দেখা কি যায়? যে আমার কাছে আসে সে কেমন দেখিতে? আমারই মতো কি তার হস্ত পদ অবয়ব আছে? মানুষের চেহারা, না অন্য কিছু?

বই হইতে চোখ তুলিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ঘটিল। ধূপের কাঠিগুলি হইতে যে ক্ষীণ ধূমরেখা উঠিতেছিল তাহা শূন্যে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে যেন একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য কাচের শিশিতে রঙিন জল ঢালিলে যেমন তাহা শিশির আকারটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আমার মনে হইল ঐ ধোঁয়া যেন কোনো অদৃশ্য আধারে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আকারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ধূসর রঙের একটি বস্ত্রের আভাস দেখা দিল। বস্ত্রের ভিতর মানুষের দেহ ঢাকা রহিয়াছে, বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তাহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ধূমকুণ্ডলী মূর্তি গড়িয়া চলিল। আবছায়া মূর্তির ভিতর দিয়া ওপারের দেয়াল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তবু তাহার ডৌল হইতে বেশ বুঝা যায় যে একটা মানুষের চেহারা। ধূম পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমে মূর্তির গলা পর্যন্ত পৌঁছিল। এইবার তাহার মুখ দেখিতে পাইব। কি রকম সে মুখ? বিকট? ভয়ানক? কিন্তু ঠিক এই সময় সহসা সব ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঐ ধূমমূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। মুখ দেখা হইল না।

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যদি আবার দেখিতে পাই। কিন্তু আর সে মূর্তি গড়িয়া উঠিল না।

২০ ফেব্রুয়ারি। সে আছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমার উষ্ণ

মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। দিনের বেলা সে কোথায় থাকে জানি না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই কি মিথ্যা? বাতাস দেখিতে পাই না, বাতাস কি মিথ্যা? শুনিয়াছি একপ্রকার গ্যাস আছে যাহা গন্ধহীন ও অদৃশ্য, অথচ তাহা আঘ্রাণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। সে গ্যাস কি মিথ্যা?

না, আছে। আমার মন জানিয়াছে সে আছে।

২১ ফেব্রুয়ারি। কে সে? তাহার স্পর্শ আমি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না কেন? ছুঁইতে গেলেই সে মিলাইয়া যায় কেন? সে দেখা দিতে চেষ্টা করে জানি, কিন্তু দেখা দিতে পারে না কেন? রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া কি ইহাদের দেখা যায় না?

আমি এখন শয়নের পূর্বে ডায়েরি লিখিতেছি, আর সে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার লেখা পড়িতেছে—আমি জানি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইলে তাহাকে দেখিতে পাইব না—সে মিলাইয়া যাইবে।

কেন এমন হয়? তাহাকে কি দেখিতে পাইব না? দেখিবার কি দুর্দম আগ্রহ যে প্রাণে জাগিয়াছে তাহা কি বলিব! তাহার এই দেহহীন অদৃশ্যতাকে যদি কোনোরকমে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতাম। কোনো কি উপায় নাই?

২২ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে সে আসে নাই। সমস্ত রাত্রি তার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তবু সে আসিল না। কেন আসিল না? তবে কি আর আসিবে না?

নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। আমার প্রতি রজনীর সহচর সহসা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর যদি না আসে?

২৩ ফেব্রুয়ারি। জানিয়াছি—জানিয়াছি! সে নারী।

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার, যেন ধারণা করিতে পারিতেছি না। আজ সকালে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, একগাছি দীর্ঘ কালো চুল আমার চিরুনিতে জড়ানো রহিয়াছে। এ চুল আমার চিরুনিতে কোথা হইতে আসিল? বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি এ তাহার চুল! সে নারী! সে নারী!

কখন তুমি আমার চিরুনিতে কেশপ্রসাধন করিয়া এই অভিজ্ঞানখানি রাখিয়া গিয়াছ? কি সুন্দর তোমার চুল! তুমি আমায় ভালোবাস তাই বুঝি আমার চিরুনিতে কেশপ্রসাধন করিয়াছিলে? আমার আরসীতে মুখ দেখিয়াছিলে কি? কেমন সে মুখ? তাহার প্রতিবিম্ব কেন আরসীতে রাখিয়া যাও নাই? তাহা হইলে তো আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

ওগো রহস্যময়ী, দেখা দাও! এই সুন্দর সুকোমল চুলগাছি যে তরুণ তনুর শোভাবর্ধন করিয়াছিল, সেই দেহখানি আমাকে একবার দেখাও। আমি যে তোমায় ভালোবাসি। তুমি নারী তাহা জানিবার পূর্ব হইতেই যে তোমায় ভালোবাসি।

কেমন তোমার রূপ? যে শিমুলফুল দিয়া প্রথম আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে, তাহারই মতো দিক্-আলো-করা রূপ কি তোমার? তাই কি নিজের রূপের প্রতিচ্ছবিটি সেদিন আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে? অধর কি তোমার অমনই রক্তিমবর্ণ, পায়ের আলতা কি উহারই রঙে রাঙা?

কেমন করিয়া কোন্ ভঙ্গিতে বসিয়া তুমি আমার চিরুনি দিয়া চুল বাঁধিয়াছিলে? কেমন সে কবরীবন্ধ? একটি রঙরাঙা শিমুলফুল কি সেই কবরীতে পরিয়াছিলে?

আমার এই ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কখনো আমি নারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি নাই। আজ তোমাকে না দেখিয়াই তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়াছি। ওগো অশরীরিণী, একবার রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

২৪ ফেব্রুয়ারি। তাহার প্রেমের মোহে আমি ডুবিয়া আছি। আহার-নিদ্রায় আমার প্রয়োজন কি! আমার মনে হইতেছে এই অপরূপ ভালোবাসা আমাকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, আমার অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা জীর্ণ করিয়া জঠরস্থ অম্লরসের মতো আমাকে পরিপাক করিয়া ফেলিতেছে। এমন না হইলে ভালোবাসা?

২৫ ফেব্রুয়ারি। আজ সকালে হঠাৎ মালীটার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। মানুষের মুখ আমি দেখিতে চাই না।

সমস্ত দিন কিছু আহার করি নাই। ভালো লাগে না—আহারে রুচি নাই—তা ছাড়া রান্নার হাঙ্গামা অসহ্য।

গরম পড়িয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাল সারারাত্রি জাগিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে কাল আমার পাশে আসিয়া শুইয়াছিল। স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহার অস্পষ্ট মধুর দেহ-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখিলাম শূন্য—কিছু নাই। জানি সে আমার চোখে দেখা দিবার জন্য, আমার বাহুতে ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া আছে, কিন্তু পারিতেছে না। তাহার এই ব্যর্থ আকুলতা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

মধ্যরাত্র হইতে প্রভাত পর্যন্ত খোলা আকাশের তলায় পায়চারি করিয়াছি, সেও আমার পাশে পাশে বেড়াইয়াছে। তাহাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কি করিলে তাহার দেখা পাইব। সে উত্তর দেয় নাই—কিংবা তাহার উত্তর আমার কানে পৌঁছায় নাই।

সকাল হইতেই চলিয়া গেল। মনে হইল, ঐ রক্তরাঙা শিমুলগাছটার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চর্মচক্ষে তাহাকে দেখিতে পাওয়া কি সম্ভব নয়?

২৬ ফেব্রুয়ারি। না, রক্তমাংসের শরীরে তাহাকে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী। স্থূল মর্ত্যলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড়দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি। আহার নাই, নিদ্রা নাই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখিলাম। এ কি সত্যিই আমি—না আর কেহ?

আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হোক চাই। স্থূল শরীরে যদি না পাই—তবে—

২৮ ফেব্রুয়ারি। হাঁ, সেই ভালো। আর পারি না।

শিমুলগাছের ডালটা কূপের মুখে ঝুঁকিয়া আছে, তাহাতে একটা দড়ি টাঙাইয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তাহার আসিবার সময় হইবে—তখন—

সখি, আর দেরী নাই। আজ ফাগুনের সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিবে, তুমি কবরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিও। তোমার রক্তরাঙা ফুলের থালা সাজাইয়া রাখিও। আমি আসিব। তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিব। আজ আমাদের পরিপূর্ণ মিলনরাত্রি—

বরদা আস্তে আস্তে ডায়েরি বন্ধ করিয়া বলিল,—এখানেই লেখা শেষ।

"—সাথে সাথে ঘুরবে"

প্রমথনাথ বিশী

অল্পদিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়িতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল।

প্রথমে মারা গেল বাড়ির একটি ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, সে শয্যাগ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না। মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি আরো আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতের তারে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছিল, কেউ জানিত না। বাড়ির একটি বয়স্ক বালক সুইচ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিল না, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ির একটি চাকরের। অনেকদিনের পুরানো চাকর, আমাদের পরিবারের অঙ্গীভূতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল, ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। আমরা বলিলাম, লোকটির তো হার্টফেল করিয়া মরিবার বয়স হয় নাই। ডাক্তার বলিল, আর সবেরই বয়স আছে, মরিবার বয়স নাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া এমন আর কে বলিতে পারিত।

তিনচার মাসের মধ্যে এই চারিটি মৃত্যু বাড়িতে ঘটিল। পরিবারের বালকবালিকা হইতে বয়স্কগণ অবধি সকলেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু শোক যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন, সংসার তাহার প্রাত্যহিক দাবী ছাড়ে না। সেই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া শক্ত থাকিতে হইল। শোক করিবার অবকাশ আমার ছিল না।

সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিতান্ত অভ্যাসের তাগিদেই আপনার চিহ্নিত পথে চলিতে লাগিল। সকাল হয়, চাকর বাজারে যায়, যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ে, অফিসগামীরা অফিসে যায়।—এইভাবে সবই চলিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে আনন্দ নাই, জীবনে উৎসাহ নাই, এমন কি সবাই যেন স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ অপরের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে সাহস করে না, কি জানি দুই দৃষ্টির ঠোকাঠুকিতে সুপ্ত শোকের আগুন যদি জ্বলিয়া ওঠে!

আরো একটা ভীষণতর সম্ভাবনা ছিল। এবার কার পালা?—এই আশঙ্কা প্রত্যেকের মনেই গুপ্ত ছিল। হঠাৎ যদি চোখে চোখে ঠেকিয়া প্রশ্নরূপে ঝলকিয়া ওঠে, তাই সকলে পরস্পরের চোখ এড়াইয়া চলিত। আর এতবড় বাড়িটা কেমন যেন অদ্ভুতরকম নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে যে কথাবার্তা বলিত না, কিম্বা বিশেষ করিয়া ধীরপদেই চলিত এমন বলি না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ মনে হইত যেন অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, মনে হইত সিঁড়ির উপরে কে যেন অদৃশ্য গদি পাতিয়া রাখিয়াছে—নতুবা ওঠা-নামার শব্দ এত ক্ষীণ কেন?

এই সময় একদিন একজন পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হইল। হঠাৎ রাত্রিবেলা তাহার আর্তস্বর শুনিয়া সকলে নিচের তলায় ছুটিয়া গেলাম, কি ব্যাপার! দেখিলাম যে লোকটা জাগিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। "কি হয়েছে রে?" সে কেবল একটি কথা বলিল, 'দেও!" এই বলিয়া সে জানালার বাহিরের বকুলগাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম যে, বাহিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে বকুলগাছটা একটা সুবৃহৎ তোড়া-বাঁধা অন্ধকারের মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে দেও অর্থাৎ ভূতটুত কিছু নয়, হঠাৎ ওই গাছটা দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে চায় না। সে বলে, দেও একটা নয়, দুইটা। একটা লেড়কা, আর একটা আওরৎ জানলার দিকে মুখ করিয়া ওই গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমি বলিলাম—তাহারা দেও নয়, সত্যকার মানুষ।

সে মানিবে কেন? পাছে আরো কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাহাকে উপরতলায় লইয়া গিয়া আমার ঘরের বারান্দায় শুইতে বলিলাম। ভোরবেলা উঠিয়া সে একটা পশ্চিমা ধরনের সেলাম করিয়া বিদায় লইয়া গেল। বলিল যে, এ বাড়িতে দেও আছে।

এই ঘটনায় সকলের মনে শোকের সহিত ভয়ের যোগ হইল। আমি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, বেটার পলাইবার ইচ্ছা ছিল, তাই ভূতের একটা অবতারণা করিল। কিন্তু মুশকিল এই যে, কেহ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক অবধি করে না, করিলে আমার যুক্তির স্বপক্ষে দু'চার কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকে। বেশ বুঝিতে পারি, সকলেই মনের ভিতরে শোক ও ভয়কে একশয্যায় সযত্নে লালন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, সকলের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইবার মুখে, অতঃপর দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িবে। তখন আমি একদিন প্রস্তাব করিলাম যে, কিছুদিনের জন্য সকলে একবার শিমুলতলা ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। কেউ উৎসাহ প্রকাশ না করিলেও আপত্তি করিল না। শিমুলতলায় আমাদের একটি বাড়ি ছিল। কয়েকদিন পরে আমি সকলকে লইয়া গিয়া শিমুলতলায় রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতার বাড়িতে আমি একা থাকিলাম, আর থাকিল একটা নূতন চাকর। সে পূর্বেতিহাসের কিছুই জানিত না।

শিমুলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অসুখে পড়িলাম। অসুখ এমন কিছু নয়। প্রথমটা কিছুদিন সর্দিজ্বর না ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া চালাইলাম। কিন্তু আট দশ দিন পরেও শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে ডাক্তারকে কল দিলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোনো বিশেষ রোগের লক্ষণ মিলিতেছে না, 'নার্ভাস শক' বলিয়া মনে হইতেছে। নার্ভাস শক ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দেহের

স্নায়ুপুঞ্জের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়াছে, তাই তাহারা সাময়িকভাবে বিকল হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। তারপরে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, কোনো ভয় নাই—কিছুদিন শুইয়া থাকুন, সব সারিয়া যাইবে। ডাক্তার বিদায় হইলে ভাবিলাম, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়,—এ কয় মাস আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। মৃত্যুশোকে আর সকলে যখন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আমার বিশ্রামের সময় ছিল না, এমন কি একটু নিরিবিলি বসিয়া একবার যে অশ্রুপাত করিব, সে অবসরটুকুও পাই নাই। বুঝিলাম যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তখন প্রকাশের সময় ছিল না, এখন অবসর পাইয়া স্নায়ুপুঞ্জ এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারে বলিয়াছে, কোনো ঔষধের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ এ রোগের কোনো ঔষধ নাই, শুইয়া থাকাই একমাত্র চিকিৎসা। তাই শুইয়া থাকিলাম, অবশ্য উঠিবার শক্তি ছিল না—ইচ্ছাও বড় ছিল না।

সারাদিন একাকী শুইয়া থাকি, সারাদিন এবং সারারাত। চাকরটা নিয়মিত সময়ে আসিয়া খাদ্য ও পথ্য দিয়া যায়, অন্য সময়ে তাহার বড় দেখা পাই না, তবে পদশব্দে ও গার্হস্থ্য কাজের টুকটাক আওয়াজে বুঝিতে পারি যে, লোকটা নিচের তলাতেই আছে। আমাদের বাড়িটা নিতান্ত ছোট নয়, তিনতলা, চকমিলানো ধরনের সেকেলে বাড়ি। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারী অনেকগুলি কক্ষ বাড়িটিতে। এখন দু'তিনটি ছাড়া সব তালাবন্ধ, সকলে থাকিবার সময়েও সবগুলি খুলিবার প্রয়োজন হয় না।

দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে এক দিকে আমার শয্যা। শুইয়া থাকিলে বাহিরের পথের লোক-চলাচলের কতক চোখে পড়ে, রাত্রিবেলায় গ্যাসের আলো কতক ঘরে আসিয়া ঢোকে আর বসন্ত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূর্বের জানালা দিয়া হু-হু করিয়া বাতাস প্রবেশ করে। অনেকগুলি বালিশ মাথায় দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া পড়িয়া থাকি। ক্লান্তি যতই বাড়ে—একটি করিয়া বালিশ সরাইয়া ফেলি, শেষ একটি বালিশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন বিছানার উপর গড়াইতে থাকি,—গড়াইতে গড়াইতে কখন ঘুমাইয়া পড়ি। এইভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়। আর দিন? দিনের বেলায় জাগিয়া ভাবিয়া এবং লঘুধরনের বই পড়িতে চেষ্টা করিয়া কাটাই, পথের আনাগোনা দেখি আর জানালা দিয়া বকুলগাছটার পাতায় আলোর চিকিমিকি দেখি ও পাখিগুলোর কিচিমিচি শুনি। মাঝে মাঝে চাকরটা আসিয়া পথ্য খাদ্য ও ডাকের চিঠি দিয়া যায়।

সেদিনটার কথা কিম্বা আরো সঠিকভাবে বলা উচিত—সে রাতটার কথা, কখনো কি ভুলিতে পারিব! আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া সকল কথাই বলিতে পারিতেছি। সে দিনের অভিজ্ঞতাকে এখন অপরের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কখনো ভাবি নাই 'তাহার' হাত হইতে মুক্তি পাইব। অনেকে আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়াছে, ওটা নার্ভাস শকের প্রতিক্রিয়া, আসলে কিছুই নয়।

নার্ভাস শক—ডাক্তার এই যে কথাটা বলিয়াছিল লোকে তাহার বেশি আর অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু আমি তো জানি, আমার অভিজ্ঞতায় 'তাহার' প্রভাব কতখানি সত্য—কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। লোকে যখন নার্ভাস শক বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, আমি তর্ক করি না, চুপ করিয়া থাকি, কিম্বা বড় দুঃখে হাসি আর ভাবি—একজনের অভিজ্ঞতা অপর একজনকে বুঝানো কত কষ্ট।

সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাকে 'তাহার' আবির্ভাবের সূত্রপাত বলিয়া তখন বুঝিতে

পারি নাই, আদ্যন্ত ইতিহাস মিলাইয়া লইয়া আজ বুঝিতেছি এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পরেও শিহরিয়া উঠিতেছি, ভাবিতেছি,—মৃত্যুর কত নিকটেই না গিয়া পড়িয়াছিলাম!

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া জানালার দিকে নজর পড়িবামাত্র বুকের রক্ত একবারের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিয়া যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। দেখিলাম জানালার ঠিক বাহিরেই অতিকায় একটি মস্তক। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম চোখের পাতা খোলা। গায়ে চিমটি কাটিয়া দেখিলাম—লাগিতেছে। সন্দেহমাত্র আর রহিল না যে আমি জাগ্রত। ভয়ে চিৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম—স্বর বাহির হইল না। ঘরের আলো জ্বালিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু উঠিতে পারিলাম না—এ যেন অপরের শরীর। কালো প্রকাণ্ড মস্তক! নাক-চোখ-মুখগুলো দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু মস্তক যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওদিকে চাহিয়া থাকা কঠিন, না থাকা আরো কঠিন। সেই শীতের রাত্রে কপালে ঘাম গড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বন্ধ হইবার মুখে—ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটরগাড়ি পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাতি হইতে এক ঝলক আলো মুণ্ডটার উপর পড়িল। মুণ্ড কোথায়? সেই ঝাঁকড়া বকুলগাছটা যে! আবার বুকের রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হইল। মনে মনে হাসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে এ কেমন ভ্রান্তি! যে বকুলগাছটাকে অন্তত ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি, তাহাকে কেন হঠাৎ অতিকায় মস্তক বলিয়া মনে হইল? তখনি আবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল,—নার্ভাস শক। পুস্তকে পড়িয়াছি বটে যে, নার্ভাস শকের ফলে কত সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাই হোক গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, জল খাইবার জন্য উঠিলাম। টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। জল খাইল কে? আমিই কি আগে আর একবার উঠিয়া জল পান করিয়াছি? কই, মনে তো পড়ে না! চাকরটার উপরে রাগ হইল, ব্যাটা ফাঁকি দিতে শুরু করিয়াছে। জল পান আর হইল না, ঘরে আর জল ছিল না। শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া অনেকে শুধাইয়াছে—কিছু দেখিয়াছ কি? স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু বা কাহাকেও দেখি নাই। লোকে হাসে, তাহাদের নার্ভাস শকের থিওরিটা আরো পাকা হয়। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, কিছু না দেখার চেয়ে কিছু দেখা অনেক ভালো। অশরীরীর সহিত বোঝাপড়া চলে—কিন্তু অশরীরীর সহিত তেমন হইবার নয় বলিয়াই তাহা ভয়ঙ্কর। এখন হইতে আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় শত্রুকে 'অশরীরী' বলিয়া উল্লেখ করিব।

পরদিন রাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি দেড়টা। তখনি বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, সেই কালো মাথাটা নাই তো? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম বকুলগাছটার পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। স্বস্তি বোধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভীরুতার প্রতি একপ্রকার ধিক্কার বোধ হইল। তৃষ্ণা পাইয়াছিল—জল পান করিবার জন্য উঠিলাম, গেলাসের ঢাকনা তুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। কাল বকুলগাছটাকে কালো মাথা কল্পনা করিবার ফলে মনে হইয়াছিল যে, অশরীরী জল পান করিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ের সেই পরিপ্রেক্ষিত ছিল না, মনে হইল চাকরটাই ফাঁকি দিয়াছে। শাসন করিয়া দিবার অজুহাতে (আসল কথা নিজের ভয়টাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করিবার আশায়) অত রাত্রেই ডাকাডাকি করিয়া চাকরটাকে জাগাইলাম। সে আসিয়া

শপথ করিয়া বলিল যে, গেলাসে জল দিয়া একটা পিরিচ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি যখন জল খাইতে যাই, তখন সেই গেলাস পিরিচে ঢাকাই ছিল বটে। আমার ভুল হইয়াছে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। বিছানায় আসিয়া শুইলাম, কিন্তু চিন্তা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। জল খাইল কে! আমিই ঘুমের ঘোরে উঠিয়া জল পান করিয়াছি,—এমন অসম্ভব না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব মনে হইল না। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সঙ্কল্প করিলাম,—কাল হইতে ঘুমাইবার আগে প্রচুর জল পান করিয়া লইব, যাহাতে মাঝরাতে জাগিয়া উঠিয়া এরূপ অদ্ভুত সমস্যায় না পড়িতে হয়।

দিনের বেলা আর-পাঁচটা চিন্তায় এসব বিষয় মনে পড়িত না। কিম্বা মনে পড়িলেও হাস্যকরভাবে তুচ্ছ বোধ হইত। সেদিন শুইবার আগে প্রচুর জল খাইয়া লইলাম। রাতে আর জাগিতে হইল না। ভোরবেলা চাকরে চা আনিল। আগের দিন তাড়া খাইয়াছিল—আজ ঘরে ঢুকিয়াই গেলাসটার দিকে তাকাইল, আমিও তাকাইলাম—গেলাস খালি। যে পিরিচখানা দিয়া সে জল ঢাকিত, সেখানা পাশে পড়িয়া আছে, গেলাস একখানা বই দিয়া ঢাকা। বইখানা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম— Poe-র Mystery and IMagination-এর গল্প। চমকিয়া উঠিলাম—এই বই তো নীচের লাইব্রেরি ঘরে ছিল—এখানে আনিল কে? আর গেলাসই বা খালি করিল কে? চাকরকে আর কি বলিব, নিজের চিন্তাসূত্রে কেবল নিজেই জড়িত হইতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, রাতের বেলায় কেহ আমার ঘরে ঢোকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতাম—এমন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি স্বহস্তে ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ভোরবেলা উঠিয়া স্বহস্তে বন্ধ দরজা খুলি। কিন্তু এসব বিষয় বুঝিবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার একটি পিস্তল ছিল, বাক্সের মধ্যে থাকিত, এতদিন পরে সেটা বাহির করিয়া বালিশের তলায় রাখিলাম।

একবার মনে হইত নির্জন বাড়ির নিঃসঙ্গতা পরিহার করিয়া লোকজনের সঙ্গে মিশিলে হয়তো অশীরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, অন্যত্র যাইবার শক্তি ছিল না। তাছাড়া আমি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলাম না বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা স্বল্প। যে কয়েকজন আছে, সবাই কাজের লোক, কে আসিয়া সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করিবে? কাজেই সারাদিন একাকী থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্রমে অশরীরীর প্রভাব দিনের বেলাতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইত পাশের ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কথা বলিতেছে কিম্বা খুব মৃদু পদসঞ্চারে চলাফেরা করিতেছে। নিশ্চয় জানিতাম কেহ নাই, তবু একবার দেখিয়া আসিতাম। রেলের এঞ্জিন বাষ্প ছাড়িলে যেমন একপ্রকার ঝঞ্ঝনা শব্দ হয়, কানের ভিতর সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইতাম। আরো একটা ব্যাপার। মনে হইল সহসা আমার শ্রবণশক্তি যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বরগ্রামের মাঝখানের অংশটুকুই সাধারণ কর্ণ ধরিতে পারে, খুব নীচু বা খুব উঁচুর দিকে শুনিতে পায় না। আমার শ্রবণশক্তির সীমানা যেন অনন্তবিস্তৃত হইয়াছে। আমি যেন কলিকাতার বাড়িটিতে বসিয়াই পাড়ার দূরবর্তী বাড়িগুলিতে কে কি বলিতেছে তাহারও অনেক কথা শুনিতাম। একদিন শিমুলতলার পত্র পাইলাম। তাহারা লিখিয়াছে যে, সকলে একদিন ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে লিখিলাম যে, এ আমার অগোচর নয়। আরো লিখিলাম যে, ডাকবাংলার হাতার মধ্যে একটা গাছের ওপরে

ঘুঘু ডাকিতেছিল, তোমরা শুনিয়াছিলে কি? সকলে আমার উত্তরকে কবিত্ব মনে করিয়া লিখিল, ঘুঘুর ডাক যদি স্বকর্ণে শুনিতে চাও, তবে এখানে চলিয়া এসো না কেন!

ঘুঘুর ডাক শুনিবার জন্য নয়, সে তো কলিকাতায় বসিয়াই আমি শুনিতে পারি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গিয়া পড়িলে অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, এই আশায় চাকরের উপর বাড়ি জিম্মা রাখিয়া আমি শিমুলতলায় রওনা হইয়া গেলাম। সকলে আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—এ কী, দুই মাসে যে ছয় মাসের রোগী বনিয়া গিয়াছ,—ব্যাপার কী?

কেহ বলিল,—শরীর অর্ধেক হইয়াছে।

কেহ বলিল,—মুখ ফ্যাকাসে হইয়াছে।

কেহ বলিল,—কতকাল চুল কাটো নাই?

কেহ বা বলিল,—কেবল চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সকলে সমস্বরে বলিল,—এখানে কিছুদিন থাকো, সব সারিয়া যাইবে।

শিমুলতলায় একটা পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের বাড়ি। বাড়ির বারান্দায় বসিলে মনে হয়, থিয়েটারের গ্যালারির উচ্চতম সিটে উপবিষ্ট।—সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোটবড় বাড়ি, বাগান, বাগানে শীতের মরসুমী ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ, তখন ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। এক দিকে শীর্ণ নদী। এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম। উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত ঘেরিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন। সারাদিন বারান্দায় বসিয়া থিয়েটারের দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখিতাম। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্তিমান চঞ্চলতার মতো রেলগাড়ি মাঝে মাঝে বেগে চলিয়া যাইত—গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম। এখানে আসিয়া আর একটি আবিষ্কার করিলাম। একদিন সকালে আমরা তিনজনে দূরপাল্লার ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। অনেক দূর গিয়া চায়ের তৃষ্ণা পাইল। একটা থলিতে স্টোভ চা চিনি কেটলি প্রভৃতি ছিল। কেবল দুধের অভাব। মাঠের মধ্যে দুধ পাইবার আশা নাই দেখিয়া নিবৃত্ত হইতে যাইতেছি, আমি বলিয়া উঠিলাম,—ওই দেখো, দূরে মাঠের মধ্যে গোটাকয়েক গরু ও রাখাল দেখা যাইতেছে—ওখানে গেলে দুধ মিলিতে পারে।

সকলে ভালো করিয়া দেখিল,—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

আমি বলিলাম,—তোমরা কেন দেখিতে পাইতেছ না? ওই তো স্পষ্ট!

তাহারা বলিল,—চায়ের তৃষ্ণায় মরিতেছি, এখন ঠাট্টা ভালো লাগে না।

আর একজন বলিল,—লোকে মাঠের মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখে, তুমি যে গো-তৃষ্ণিকা দেখিতে লাগিলে!

তৃতীয়জন বলিল, তুমি কি চোখে দূরবীন লাগাইয়াছ নাকি?

আমি বলিলাম,—অবিশ্বাসে কাজ কি! আমাদের তো যাইতেই হইবে—চলো ওই দিকেই যাই না!

সকলে নির্দিষ্ট দিকে চলিলাম। প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিবার পরে সত্যই সকলে সেই গরুর পাল দেখিতে পাইল।

আমার সঙ্গীদের একজন বলিল,—আশ্চর্য, তুমি একক্রোশ দূর হইতে দেখিলে কিরূপে? তাই তোমার চোখ এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল!

আর একজন বলিল্,—আন্দাজে ঢিল লাগিয়াছে। মাঠে গরু চরিবে এ আর বিচিত্র কি!

আর একজন বলিল,—এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়।

সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করিলাম যে, শ্রবণশক্তির মতো আমার দৃষ্টির সীমাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এখানে আসিয়া অশরীরীর প্রভাব সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

বলিব আর কি, বলিবার আছেই বা কি, আর বলিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? ভাবিতাম, অশরীরী এমন করিয়া আমার কান ও চোখের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে কেন? অশরীরীর প্রভাবের সহিত যে এই শক্তিবৃদ্ধি জড়িত সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না।

এখানে কাহারও কোনো কাজকর্ম ছিল না। বাড়ির টানা বারান্দায় বসিয়া সকলে তাসপাশা খেলিত ও হল্লা করিত। আমি তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া পাহাড়ের উপরে একটি ছাল ওঠা অর্জুন গাছের তলায় গিয়া বসিতাম। এখানে বসিলে দিগন্তের পাহাড়ের অর্ধচন্দ্র ও অরণ্যরেখা দেখিতে পাইতাম। উপত্যকার সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতাম। বনের সমস্ত গাছপালাগুলো স্পষ্ট দেখিতে পাই কিনা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বনটার দিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। কি আশ্চর্য, আমার চোখে বন আর গাছপালার ঘনীভূত সমষ্টি নয়! প্রত্যেকটি গাছ, তাহার শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব লইয়া স্বতন্ত্রভাবে যেন দেখিতে পাইতেছি। নিজের শক্তিতে নিজেই ভীত হইলাম। যেন চোখ দুটি ও কান দুটি কোনো এক যাদুকরের—আমি হতবুদ্ধি দর্শক মাত্র।

রাতের বেলার উপসর্গ আরো বিচিত্র। বুঝিলাম, অশরীরী ক্রমেই আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে, অবশেষে শেষ গ্রাসে দেহটাকে হয়তো আত্মসাৎ করিয়া বায়ুরূপে বায়ুতে মিলিয়া যাইবে। রাতের বেলাতেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাসপাশা ও গানবাজনা চলিত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

এই ঘরটির একটি দেয়ালে বিহারের পূর্বতন এক ইংরেজ গভর্নরের একখানি ছবি টাঙানো ছিল। এক সময়ে সখ করিয়া টাঙানো হইয়াছিল, এখন খুলিয়া ফেলিলেও চলিত, কিন্তু নিতান্ত অবহেলাতেই খোলা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইল, ছবিখানি খুলিয়া ফেলি, কিন্তু ততখানি উদ্যম হইল না। একবার ভাবিলাম, খুলিয়া না ফেলিয়া ঘুরাইয়া দিই। গভর্নর বিমুখ হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক, তাহাও হইয়া উঠিল না। রাত্রে ঘুমাইলাম কোনো বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভোরবেলা উঠিয়া ছবিখানার দিকে চাহিতেই দেখিলাম, সেখানা ঘুরানো অবস্থায় আছে। চমকিয়া উঠিলাম, এ কাজ করিল কে? আমার মনের বাসনা জানিল কে? ঘরেই বা ঢুকিল কে? ঘরের দরজা তো এখনো বন্ধ! আমিই স্বপ্নে উঠিয়া এ কাজ করিয়াছি? বিশ্বাস হইল না। প্রত্যয় হইল যে, এ সেই অশরীরীর কাজ। ছবিখানা সোজা করিয়া দিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কাহাকেও আর বলিলাম না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিত না, ভাবিত—আমি একপ্রকার নূতন ধাপ্পা দিতেছি। আমি সারাদিন আর সকলের হইতে দূরে সেই অর্জুন গাছটার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। মন্দ লাগিত না, —মানুষের সঙ্গ আমার বিষাক্ত লাগিত।

এই সময়ে আর একটি নূতন ভাব আমাকে পাইয়া বসিল। আমার মরিতে ইচ্ছা করিত, জীবনের আসক্তি আমাকে একেবারে ত্যাগ করিল। আমার কেবলই মনে হইত, এই যে আমার চক্ষুকর্ণের শক্তির বৃদ্ধি, মৃত্যুর পরে মানুষ যে অসীম শক্তি পাইতে পারে, এ কেবল তাহারই পূর্বাভাস। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটার কথা মনে পড়িয়া যাইত, সেটাকে হাতছাড়া করি নাই, সঙ্গে আনিয়াছি। আরো একটা কারণে মরিতে ইচ্ছা করিত। মনে হইত—একমাত্র এই উপায়েই অশরীরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, মনে হইত—নিজেও অশরীরী হইয়া একবার শত্রুটার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া না লই কেন!

রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে কাহার পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইত। বিদ্যুতের টর্চবাতি টিপিতাম, কেহ কোথাও নাই। হঠাৎ চোখে পড়িত, দেয়ালের ছবিখানাকে কে যেন ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

এমনি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বাড়ির সকলের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, দোষটা সম্পূর্ণই আমার। আমি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে চুনার রওনা হইলাম। গাড়িতে উঠিবার সময়ে স্পষ্ট বুঝিলাম অশরীরী আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সেই গাড়িতেই সে উঠিল।

কামরাটিতে আর একজন মাত্র ছিল। একটি বার্থে তাহার শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? স্নানের ঘরে আলো দেখিয়া বুঝিলাম আমার সহযাত্রী সেখানে। আমি একাকী আমার বার্থে বসিয়া রহিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসাতে শুইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙিল মোকামা জংসন ছাড়াইয়াছি। পাশের বেঞ্চিতে সহযাত্রীর শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়! ভাবিলাম এখনো কি স্নানের ঘরেই আছে? তাহাই সম্ভব—আলো জ্বলিতেছে। ভাবিলাম লোকটা দীর্ঘকাল সেখানে কি করিতেছে? দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম যে, ভিতরে কে যেন গুনগুন্ করিয়া গান করিতেছে,—আর দরজায় ঘষা কাচের উপরে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতোও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম মানুষ ভিতরে আছে এবং সে আমার সহযাত্রী ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? কৌতূহল বাড়িল। দরজায় টোকা মারিলাম, ভিতরে কে—বলিয়া চিৎকার করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কোনো সাড়াশব্দ পাইলাম না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করিলাম। দরজার ভিতরদিকের ছিটকিনি খট্ করিয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিল না। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে প্রাণপণবলে দরজা ঠেলিয়া আছে। দরজা খুলিয়া কোনো লোককে বিব্রত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। একবার সাড়া দিলেই আমি নিরস্ত হইতাম। কিন্তু সাড়া না পাওয়াতে এবং দরজার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার রোখ চড়িয়া গেল। আমি দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, অবশেষে সেই উদ্যমে কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময়ে ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামিল। একজন যাত্রী উঠিল। সে আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল, কি, খুলতে পারছেন না?

এই বলিয়া সে দরজায় হাত দিতেই অনায়াসে খুলিয়া গেল। ভিতরে না আছে লোক, না আছে আলো। আমি বিদ্যুতের টর্চ লইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, কোনো লোক যে আজ সারাদিনের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহার চিহ্ন অবধি নাই। তখনি মনে হইল, একি সেই অশরীরীর কাণ্ড? ওই শয্যার মালিক কি সেই অশরীরী? আমি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটির

সঙ্গে গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু বুকের ভিতরের কাঁপুনি কিছুতেই থামিল না। চুনারে নামিবার সময় অবধি বিছানার মালিকের দেখা পাইলাম না।

চুনারে পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। স্টেশনে নামিয়া একজন ওই-দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম। তাহার কাছে সন্ধান লইয়া একখানা এক্কা গাড়িতে চড়িয়া গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একজন কেয়ারটেকার দারোয়ান ছিল। তাহাকে শুধাইলাম, এ বাড়িতে থাকিতে পারা যাইবে কিনা এবং কিরূপ ভাড়া লাগিবে।

দারোয়ানজী বলিল—আপনার যতদিন খুশি থাকুন, খুশি হইয়া যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

আহারের ব্যবস্থার কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, —'বর্তন-উর্তন' তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে, আর রসুই করিবার জন্য একটা লোকও সে ঠিক করিয়া দিতে পারে।' 'লেকিন মছলি উছলি' চলিবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে মছলি খাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তখন দারোয়ানজী সোৎসাহে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে লাগিয়া গেল।

বাড়িটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন, আগেই বলিয়াছি। আধুনিক কৃপণ কল্পনার যুগে এত বড় অনাবশ্যকের আকাশ-ভরা বাড়ি কেহ তৈয়ারি করে না। বাড়ির ঠিক সম্মুখেই গঙ্গা। এখন বসন্তকালে বাড়ির কাছে অনেকটা চর পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নদীর বিস্তৃতি অল্প নয়। গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত টানা বারান্দা। আমার ব্যবহারের জন্য দুটি ঘর পাইলাম, একটি বসিবার অপরটি শুইবার। ঘরে পুরু গদিওয়ালা খানকতক চেয়ার ও টেবিল। আর শয়নঘরে একখানা মস্ত পালঙ্ক, পাশে একটা চেয়ার, টেবিল, আলনা। আর আছে ঘরের দেয়ালে মানুষপ্রমাণ পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা আয়না।

আহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। রাত্রে অল্প কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকদিন পরে এই আমার বিঘ্নহীন সুনিদ্রা হইল। ভোরবেলা উঠিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম—তবে বোধ হয় অশরীরীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম! আজ তিনচার মাসের মধ্যে নির্বিঘ্ন নিদ্রার আরাম আমি পাই নাই, শরীর ভাঙিয়া পড়িবার মতো, মৃত্যু-ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। যেটুকু ঘুম হইত, তাহা যেন ওই অশরীরীর নেপথ্য বিধানের সুবিধার জন্যই হইত। নিদ্রার অবসরে হয় গেলাসের জল ফুরাইত, নয় ছবিখানি ঘুরিয়া যাইত। ঘুম এবং ঘুম না হওয়া দুই-ই আমার পক্ষে সমান আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গতরাত্রের নিশ্চিন্ত ঘুমে তাই প্রফুল্ল বোধ করিলাম।

ভিখু নামে এক ছোকরা ভৃত্যকে দারোয়ানজী ঠিক করিয়া দিয়াছিল। সে কাজকর্ম সব জানে। চা জলখাবার ডালভাত তরকারি রুটি পুরি যাহা প্রয়োজন সমস্ত সময়মতো করিয়া আনিত। ঘর ঝাড়ু দিত, বিছানা পাতিয়া দিত। কোনো বিষয়ে আমার ভাবিবার আবশ্যক ছিল না। আমি সারাদিন বসিয়া গড়াইয়া বেড়াইয়া কাটাইয়া দিতাম।

চুনার প্রবাসের দ্বিতীয় দিন বিকালে আমি গঙ্গার তীর বরাবর বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া প্রাচীন বয়সের ঝাউগাছে ঘেরা একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাইলাম। অনেকগুলি মুসলমানের কবর। কবরগুলি এখনো সুরক্ষিত। পাশেই ছোট

একখানা খাপরার ঘরে একজন মুসলমান বাস করে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এই কবরগুলি রক্ষা ও মেরামত করিবার জন্য একটি জায়গীর আছে—সে তার মালিক বা জিম্মাদার। তাহার মুখেই শুনিলাম যে, বহুকাল আগে এখানে হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে শেরশাহের জব্বর লড়াই হইয়াছিল। অনেক মোগল-পাঠান মরিয়াছিল। হুমায়ুন বাদশাহী লাভ করিবার পরে এখানকার কবরগুলির খবরদারির জন্য জায়গীর দান করেন। সেই জায়গীরের ধারা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

ইতিহাসে শেরশাহ ও হুমায়ুনের লড়াইয়ের কথা পড়িয়াছি বটে। আর ওই যে অদূরে গিরিচূড়ায় চুনার-গড় তাহাও সুবিদিত। গিরিচূড়াবলম্বী সেই গড়ের ছায়াতে চিরনিদ্রিত এই কবরগুলির উপরে প্রাচীনকাল যেন সযত্নে অঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। সমুখে গঙ্গা, পিছনে স্তম্ভিত চুনার-গড়—আর চারদিকে শ্মশানের ধূমের মতো ধূসর ঝাউ গাছ, ইতিহাসের দীর্ঘনিশ্বাস যেন তাহাদের শাখায় শাখায় নিরন্তর শাসিত হইতেছে। স্থানটি আমার মনকে বড়ই টানিল, আমি সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ এরকম বসিয়াছিলাম জানি না—যখন হুঁশ হইল, দেখিলাম গঙ্গার ওপারে তৃতীয়ার অস্তমান চন্দ্রকলা গাছের আড়াল দিয়া হুমায়ুনের গুপ্তচরের মতো এপারের পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ করিতেছে। আমি উঠিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। সমুদ্রের জোয়ারের গর্জনের মতো ওই ঝাউয়ের একটানা হু-হু শব্দ কান ভরিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে আমার নূতন জুতাজোড়া পাইলাম না, সন্দেহ হইল—এ ভিখুর কাজ। তাহাকে ডাকিলাম, শুনিলাম সে বাজারে গিয়াছে। অগত্যা আর একজোড়া জুতা পরিয়া বাহির হইলাম। সেই ঝাউ-ঘেরা গোরস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া এক জায়গায় বসিলাম। এমন সময়ে গোরস্থানের রক্ষক সেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শুধাইলাম, খবর কি? সে বলিল,—বাবুজী, কাল অনেক রাত্রে দুই বাবু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ বোধ হয় একজোড়া জুতা ফেলিয়া গিয়াছেন!

তারপরে নিবেদন করিল, আমি যেন খোঁজ করিয়া জুতাজোড়া মালিককে দিই। আমি তাহাকে জুতা আনিতে বলিলাম। লোকটা জুতা আনিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি, এ যে আমার জুতা!

আমার বিস্ময় তাহার কাছে প্রকাশ না করিয়া বলিলাম,—কি রকম লোক, আর একবার বলো তো!

সে বলিল,—বাবুজী, আমি অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়াছি—কি রকম লোক কেমন করিয়া বলিব? তবে দুইজন লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

তাহার কথায় আমার বিস্ময় বাড়িয়া ত্রাসে পরিণত হইল। আমি খোঁজ করিয়া মালিককে দিব জানাইয়া জুতাজোড়া একটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া ভাবিলাম, এ কেমন হইল? আমিই কি রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম? স্বপ্নে বা নিশিতে পাইলে লোকে এমন বেড়াইয়া থাকে শুনিয়াছি।—তবে কি আমারও সেই রোগ হইল? কিন্তু সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? সেই অশরীরী নয় তো? তবে কি সেই অজ্ঞেয় সত্তা অশরীরী নয়? নতুবা কবররক্ষক তাহাকে দেখিল কিভাবে? অজ্ঞাতসারে

ঘুমের ঘোরে আমি কি তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছি নাকি? এই কথা মনে হইবামাত্র সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—দেহের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প হইল, আজ হইতে রাত্রে আর ঘুমাইলে চলিবে না। স্থির করিলাম দিনের বেলা ঘুমাইয়া লইয়া রাতটা জাগিয়া কাটাইব।

রাত্রিটা জাগিবার সঙ্কল্প করিলাম, হঠাৎ বোধ হয় একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, —দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে?—বলিয়া চিৎকার করিলাম। আর কোনো সাড়া নাই। আবার জাগিবার চেষ্টা চলিল—বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—আবার দরজা নাড়ার শব্দ!

বুঝিলাম এ সেই অশরীরীর ক্রিয়া। বুঝিলাম অশরীরী আজও তাহার ভ্রমণসঙ্গীর সন্ধানে আসিয়াছে। কাজেই এবারে আর সাড়া দিলাম না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনিভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাতটা কাটিয়া গেল।

তারপরে প্রতি রাত্রে এমনিধারা চলিতে লাগিল। জাগরণে ও তন্দ্রায় আমার চোখে মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে—যেমনি একটু তন্দ্রা আসে, অমনি দরজা নাড়ার শব্দ, নতুবা বাহিরে পদধ্বনি শুনিতে পাই। একদিন হঠাৎ পিঠের উপরে কাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ঘর নির্জন, কেহ কোথাও নাই।

কয়েকদিন এমনি চলিলে আমার শরীর আরো ভাঙিয়া পড়িল। ভাবিলাম এরকম চলিতে থাকিলে এই বিদেশেই মরিতে হইবে। আমার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল, এ যাত্রা আমাকে মরিতেই হইবে।—ভাবিলাম মরিতেই হয় তো কলিকাতা ফিরিয়া মরিব—বিদেশে বিভুঁয়ে মরিব কেন? এতক্ষণ বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এবারে কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল—আয়নার মধ্যে যেন কাহার ছায়া! আবার তাকাইলাম—শূন্য আয়না ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই।

একবার মনে হইল আমার ছায়া—পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার ছায়া হইতেই পারে না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া সেখানকার ছায়া আয়নায় পৌঁছায় না। তবে কী দেখিলাম? বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কোনো দুর্জ্ঞেয় সত্তার ষড়যন্ত্রের শিকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছি, দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, মনে হওয়া বা অনুমান করা নয় যে আয়নার উপরে ছায়া—শুধু এক বিদ্যুৎঝলকের জন্য, শুধু জলে দাগ কাটার মতো, কিন্তু সত্যই যে দেখিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনি মনে পড়িল—ঘর তো অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই, তবে ছায়া পড়িবে কি উপায়ে? বিদ্যুতের টর্চ টিপিলাম। শূন্য ঘর। ঘরের সেই সুবৃহৎ শূন্যতাকে একটা বিরাট হাঁ-র মতো মনে হইল।

অবশেষে কিভাবে আমার ত্রাস যে রোখে পরিণত হইল সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। তবে আমার ধারণা এই যে, কোনো একটা মনোভাব চরমে পৌঁছিলে তাহা অপর একটা মনোভাবে পরিণত হয়। মানুষের মনের সব ভাবগুলার মধ্যে গোপন চলাচলের একটা পথ আছে বলিয়াই এমন বোধ করি সম্ভব হয়।

আমার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল যে মরিতেই যখন হইবে, মরিতেই যখন বসিয়াছি, —অশরীরীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মরিব। আর কিছু না পারি তাহাকে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া মরিব। মৃত্যু যখন আমার আসন্ন, মনে হইল—এইভাবে

মরিলেই আমার মরা সার্থক হইবে। আমি স্থির করিলাম যে, আর দুই-এক রাত্রি অশরীরীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের শেষ চেষ্টা করিব। পারি তো উত্তম, না পারি তো নিজের প্রাণ নিজের হাতে লইব, অশরীরীর শিকারে পরিণত হইব না। এখন হইতে গুলিভরা পিস্তলটা সর্বদা পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

সেদিন রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইবে যখন ভাবিয়াছিলাম, তখন সে জানিত যে সেই রাত্রিই আমার মোহমুক্তির রাত্রি হইবে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়াছিলাম—বলা বাহুল্য—একাকী। রাত্রি ঘন অন্ধকার। দূরাগত ঝাউগাছের হু-হু শব্দ পরলোকের তীরভূমি হইতে বাহিত দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শ্রুত হইতেছিল। সমুখে গঙ্গা—সেখানে অন্ধকার কিছু ফিকা, নতুবা বুঝিবার আর কোনো উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন শিস্ দিতেছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম—আজ আমার মনে আর ভয় ছিল না। অশরীরীকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা সম্ভব হইলে অবশ্যই করিতাম, কিন্তু মনের ওই অবস্থাতেও বুঝিয়াছিলাম যে তাহা সম্ভব নয়, তাই নিজেই মরিব। অশরীরীর উপস্থিতিতে নিজের হাতেই মরিব, তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইবে, সে হতাশ হইবে। সে কি আনন্দ! ঐ এক আনন্দই তখন জীবনে অবশিষ্ট ছিল। উৎকট উল্লাসে হাসিয়া উঠিলাম। অনেকদিন হাসি নাই, এত উচ্চস্বরে কখনো হাসি নাই। নিজের হাসিতে নিজে চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সেই ছায়া, ঈষদালোকিত কক্ষের আয়নার উপরে সেই ছায়া—শুধু এক পলকের জন্য। পিস্তল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দরজাটা খোলা ছিল, বন্ধ করিয়া আসিলাম। তখন আমার মুখ দরজার দিকে। আমার ঠিক পিছনে দেয়ালের গায়ে আয়না। পিছনে সেই শিস দিবার শব্দ। পিছন ফিরিবামাত্র ছায়াশরীরী অশরীরী—মনে হইল সে যেন আর আয়নার উপরে নাই। আমার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিবার আগেই পিস্তল তুলিয়া নিজের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম, কেবল তড়িদ্‌বেগে মনে হইল, আমার ঠিক পিছনে সে যখন রহিয়াছে, সেও মরিবে। এক গুলিতে শিকার ও শিকারীর দুইজনেরই জীবনাবসান!

বোধ হয় হাত একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। শূন্যঘরে পিস্তলের শব্দ মাথা কুটিতে লাগিল। পিছন হইতে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর হাসির খন্‌খন্ শুষ্ক আওয়াজ কানে আসিল, মনে হইল অশরীরী আমার ব্যর্থ চেষ্টাকে ধিক্কার দিয়া হাসিতেছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ। ঘরের মেজে কাঁপিতেছে, ছাদ ঘুরিতেছে, সমস্ত অন্ধকার।

পরদিন যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যার উপরে শায়িত, ভিখু মাথায় বাতাস করিতেছে। পায়ের কাছে দারোয়নজী গম্ভীরমুখে দণ্ডায়মান। শিমুলতলার ঠিকানায় একটা তার করিতে বলিয়া আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল, দেখিলাম যে আমার পরিবারের জনাতিনেক কাছে বসিয়া আছে। তাহাদের বলিলাম, আজই আমাকে এখান হইতে লইয়া চল।

পরদিন প্রাতে শিমুলতলায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই ঘটনার পরে পাঁচ-সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। অশরীরীর স্মৃতি আমার মনে ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া বলি, এই রহস্যের উত্তর আজও পাই নাই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুরাতন উত্তরই

পাইয়াছি—নার্ভাস শক। মনস্তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা সাব্‌জেকটিভ রিঅ্যাকশন। বন্ধুরা বলে—আমি ধাপ্পা দিতেছি। কিন্তু আমি জানি, মর্মান্তিকভাবে জানি, সমস্তই নিদারুণ সত্য। কেমন করিয়া না-জানি অশরীরীর মোহময় খোলসের মধ্যে আমি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই রাত্রের পিস্তলের গুলি সেই মোহ ভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অশরীরীর নিজের ব্যর্থতায় আত্মধিকারের অট্টহাস্য করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বন্ধুরা বলে, ওসব তোমার কবিত্ব। যাহাকে ধিক্কারের অট্টহাস্য বলিতেছ বস্তুত তাহা পিস্তলের গুলি লাগিয়া সেই বৃহৎ আয়নাখানা ভাঙিবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বুঝাইতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি।

নমস্কার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন বেকার বসে থাকবার পর চাকরি পেলাম। কিন্তু চাকরি যেখানে পেলাম—সে এক ভীষণ জায়গা। সহজে সেখানে বড় একটা কেউ যায় না। আমার আগে যাঁরা গেছেন, সকলেই মরেছেন এবং সে এক আশ্চর্য মৃত্যু! রোগ নেই, ব্যাধি নেই, সারাদিন কাজকর্ম করে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়েছেন, সকালে দেখা গেল তিনি আর উঠছেন না—বিছানাতেই মরে পড়ে আছেন, মুখের চেহারা হয়ে গেছে কিম্ভূতকিমাকার বিশ্রী। মনে হয়, যেন মরবার সময় ভয় পেয়েছিলেন। কিসের ভয়? সে-সব তখন কে আর বলবে!

আমার কিন্তু ভয় বলে কোনো বস্তু ছেলেবেলা থেকেই নেই, তাই একটুখানি ভরসা হল। ভাবলাম—চোর-ডাকাত যদি খুন করে দিয়ে যায়, সে এক আলাদা কথা, তাছাড়া আর কিছুর ভয় আমি করি না।

যাই হোক মরি মরব, অর্থাভাবে দিনে দিনে তিলে তিলে মরার চেয়ে সে বরং ঢের ভালো।

চাকরি নিলাম। জায়গাটা বেশি দূরে নয়। বাংলাদেশের মধ্যেই। বড় একটা স্টেশনে গাড়ি বদল করে ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনে চড়লাম। কথা ছিল, লাইন যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানেই আমার কাজের জায়গা।

সন্ধ্যার একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠেছে। শরৎকালের নীল নির্মল আকাশ। শুভ্র

সুন্দর জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত ছোট ছোট গ্রাম, সবুজ ধানের মাঠ আর গাছপালার মাঝখান দিয়ে ছোট লাইনের ছোট্ট ট্রেনখানি আমাদের এগিয়ে চলেছে। দূরে দূরে একটি করে স্টেশন। টিম্ টিম্ করে দু-একটি কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। দু-একজন লোক নামছে, দু-একজন উঠছে। লোকজনের কোলাহল নেই, গোলমাল নেই। দু-একটি ছোটখাটো কথা, ইঞ্জিনের সাঁই-সাঁই শব্দ আর গার্ডসাহেবের হুইসল্।

জানলায় হাত রেখে বাইরের পানে তাকিয়েছিলাম। ট্রেনের যাত্রী নিয়ে গ্রামের পথে কোথাও-বা একটি গরুর গাড়ি চলেছে, কোথাও-বা আঁকা-বাঁকা ছোট একটি শুক্‌নো নদীর সাদা বালি চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। দূরের অস্পষ্ট গ্রাম ধোঁয়ার মতো কুয়াশায় ঢেকে গেছে। লাইনের ধারে ধারে শুভ্র সুন্দর কাশের গুচ্ছ বাতাসে দুলছে। মাঝে মাঝে দূরের গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

গাড়ি আমাদের কখনো দাঁড়াচ্ছে, কখনো চলছে।

মাঝে কোনো সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্‌ল—চেয়ে দেখি, আমার কামরা একেবারে ফাঁকা। যাঁরা ছিলেন, কখন যে তাঁরা নেমে গেছেন, কিছু বুঝতেই পারি নি। পেছনে পায়ের শব্দ হতেই ফিরে দেখলাম—আপাদমস্তক সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কালোমতো প্রকাণ্ড লম্বা এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কেন আসছেন, বুঝলাম না; সে-রকম লম্বা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

কাছে আসতেই আমি তাঁর মুখের পানে তাকালাম। কালো কিম্ভূতকিমাকার সে এক অদ্ভুত মুখ! মানুষের মুখ বলে মনে হয় না। ঠিক যেন ছাগলের মতো। এক-একটা পাঁঠার যেমন দাড়ি থাকে তেমনি দাড়ি, গোঁফগুলি একটি একটি করে গোনা যায়। আর সেই মুখের ওপর অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল গোল-গোল সাদা দুটো চোখ।

চোখে আমার ঘুমের ঘোর যদি বা একটুখানি ছিল, লোকটাকে আমার সুমুখের বেঞ্চে বসতে দেখে সেটুকুও উড়ে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শেষে তিনিই আমায় দয়া করে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাওয়া হবে?"

গলার আওয়াজও তেমনি। মনে হল যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে কথা বেরোচ্ছে।

বললাম, "শালবুনি।"

তিনি বললেন, "চলুন, আমিও যাব।"

বাধিত হলাম। চাকরির জায়গায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই এই! জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি শালবুনিতেই থাকেন?"

ঘাড় নেড়ে জানালেন, না।

কোথায় থাকা হয়, সেকথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হল না। বললাম, "সিম্‌সন্ কোম্পানির যে লোহার কারখানা তৈরি হচ্ছে, স্টেশন থেকে সেটা কতদূর মশাই?"

"কাছেই।"

শুনে আশ্বস্ত হলাম। বললাম, "আচ্ছা বলতে পারেন মশাই, শুনছি নাকি তিন-চারজন লোক সেখানে মারা গেছে! কেন মারা গেছে, জানেন আপনি?"

তিনি তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কোনো জবাব পেলাম না।

সর্বনাশ! তবে কি এইখান থেকেই সঙ্গ নিলেন নাকি? শালবুনি স্টেশন আর কত দূরে, সেই কথাই ভাবতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল। ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, ‘‘কারখানায় চাকরি নিয়ে এলেন বুঝি?’’

বললাম, ‘‘কি আর করি মশাই, পেটের দায়ে—দু'-তিনটি ছেলেমেয়ে—’’

তিনি বললেন, ‘‘যদি মারা যান?’’

সেকথা নিজেও কতবার ভেবেছি, কিন্তু তাঁর থেকে হঠাৎ এই কথাটা শোনবামাত্র বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধক্ করে উঠল। বললাম, ‘‘তাহলে না খেতে পেয়ে সবাই মারা যাবে।’’

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘ছেলেমেয়ে ক'টি?’’

বললাম, ‘‘তিনটি। দুটি ছেলে একটি মেয়ে।’’

‘‘সংসারে আর কে আছে?’’

‘‘বুড়ো বাবা, মা, পিসি, মাসি, ভাগ্নী,—পোষ্যের আর অন্ত নেই মশাই।’’

‘‘হুঁ’’ বলে তিনি একবার বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখলেন। দেখেই বললেন, ‘‘বুড়ো মা-বাপকে খেতে দেওয়া ভালো। আজকাল অনেকে দেয় না। আমিও বুড়ো হয়েছিলাম মশাই, কিন্তু এমনি পাজি ছেলে—’’

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘‘স্টেশন এসে গেছে।’’

গাড়ি কিন্তু তখনো থামেনি। তাঁর জীবনের গল্পটা শোনবার কৌতূহল ছিল। বললাম, ‘‘বসুন না। গাড়ি তো আর এগোবে না।’’

এই বলে পকেট থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাইটা বের করে বললাম, ‘‘খান।’’

ভাবলাম, তাতেও যদি বসে তাঁর জীবনের গল্পটা বলেন। কিন্তু বিড়ি দেশলাই তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন মাত্র, দেশলাইও জ্বাললেন না, বিড়িও খেলেন না। গাড়ি আমাদের স্টেশনে পৌঁছে গেল এবং পৌঁছবামাত্র দরজা খুলে তিনি নেমে পড়লেন। যাবার সময় একটা নমস্কার করে বিদায় নেওয়া দূরে থাক্, আমার দেশলাইটাও ফিরিয়ে দেবার সময় তাঁর আর হল না।

তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। তিনি ঠিক কোন্ দিকে যান, দেখবার উদ্দেশ্যও যে ছিল না তা নয়, অবশ্য আমার অন্য প্রয়োজনও ছিল। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে কারখানা থেকে লোক আসবার কথা। কিন্তু অবাক কাণ্ড দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি গাড়ি তখনো ঠিক প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছয় নি, তখনো গাড়িখানা ধীরে ধীরে চলছে।

লোকটি কি তবে টিকিট করে নি? তাই টিকিট দেবার ভয়ে তাড়াতাড়ি নেবে গেল? কিন্তু অত বড় লম্বা চেহারা, সহজে তো চোখের আড়াল হবার জো নেই! জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ঠিক দিনের মতো স্পষ্ট পরিষ্কার, অথচ এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে কোনোদিকেই তাঁকে দেখতে পেলাম না। মানুষ বলে মনে মনে যদিই বা একটুখানি সন্দেহ হয়েছিল, সেটুকুও এবার ঘুচে গেল। মানুষ কি কখনো এত সহজে চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। একে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন জায়গা, তায় আবার পৌঁছতে না পৌঁছতেই এই অভিজ্ঞতা! পেটের দায়ে চাকরি করতে এসে কি যে অদৃষ্টে আছে, কে জানে!

কারখানা থেকে দুজন গুর্খা চাপরাসী এসেছে, আর একজন বাঙালি ভদ্রলোক। গাড়ি থেকে আমার জিনিসপত্র তারাই নামালে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিক চেয়ে দেখলাম। যতদূরে দৃষ্টি যায়—শুধু শালের জঙ্গল। ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়ও দেখলাম।

ট্রেনের লাইন এইখানে শেষ হয়েছে। গাড়িতে ওঠবার সময় লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম,—ট্রেনখানার দু-দিকে দুটো ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা সামনে, একটা পিছনে। এইবার পিছনের ইঞ্জিনটা পিছু হাঁটতে শুরু করলে। গাড়িটা যেদিক থেকে এসেছিল, হুস্ হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার সেইদিকে চলে গেল।

চারিদিক নির্জন। মাঝখানে ইস্পাতের ঝক্‌ঝকে লাইন চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। এপাশে ছোট্ট একটি স্টেশন, আর ওপাশে আমাদের কারখানা। কারখানা গড়ে উঠতে তখনো অনেক দেরি। প্রকাণ্ড বড় বড় লোহার যন্ত্রপাতি এসে পৌঁচেছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানান রকমের লোহা-লক্কড় ইতস্তত ছড়ানো, আর তারই একপাশে আমাদের থাকবার জন্য টিনের ছোট ছোট কয়েকটি অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়েছে।

শুনলাম নাকি ওই টিনের ঘরেই আমার আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জীবনলীলার অবসান হয়ে গেছে। তবু সে-রাত্রির মতো আমাকে সেইখানেই থাকতে হল।

বাঙালি ছোক্‌রাটি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার জন্য সে রান্না করে রেখেছিল। ঠিক হল—নিজের হাতে রান্না আমায় কোনোদিনই করতে হবে না, সে-ই রোজ আমার রান্না করে দেবে।

সেদিন রাত্রে তাকে আর আমার কাছ ছেড়ে যেতে দিলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর সে আমারই কাছে ছোট একটি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে রইল। কাছাকাছি কোনো একটা গ্রামে তার বাড়ি। নাম—যতীন।

প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি ব্রাহ্মণ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

যতীন বললে, "ব্যস্ তাহলে আর আপনার ভয় নেই।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, ব্যাপার কি বলো দেখি যতীন?"

যতীন বললে, "যারা মরেছে, তাদের ভূতে মেরেছে কিনা। গেছো ভূতে। ভূত কখনো বামনকে মারে না। ওরা বামুন কেউ ছিল না।"

বললাম, "বামুনকে মারবে না, তা তুমি কেমন করে জানলে যতীন?"

যতীন একটুখানি হাসল। হেসে বললে, "পৈতে ছুঁয়ে একবার যদি গায়ত্রী জপ করে দেন তো ভূতের বাবার সাধ্য নেই যে আপনার কাছে এগোয়। তা নইলে ওদের তিন-তিনটেকে মেরে ফেললে, আর আমাকে মারতে পারত না?"

ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। কিছুই বুঝবার উপায় নেই। রাত্রে ভালো ঘুমও হল না। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। পূবদিকে সবুজ বনের মাথার উপর আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছে। জায়গাটি বড় চমৎকার।

আমায় বাইরে আসতে দেখেই গুর্খা চাপ্‌রাসী দু-জন সেলাম করে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলে, কাজ আরম্ভ হবে কিনা এবং তা যদি হয়, তাহলে ওরা আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক ডাকতে যাবে।

বললাম, "যাও, তোমরা লোক নিয়ে এসো। কাজ আরম্ভ হবে।"

এখন আমাদের কাজ শুধু জঙ্গলের গাছ কাটা। কোম্পানি তার জন্যে আমার সঙ্গে দিয়েছে একশটাকা। তাছাড়া টাকার দরকার হলেই হয় হেড্‌-অফিসে জানাতে হবে, আর না হয় এখানকার জংসন স্টেশনে কোম্পানির যে চুনের কারখানা আছে, সেখানে জানালেই তারা তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দেবে। আমার ওপর হুকুম—এক মাসের মধ্যে অন্তত হাজার বিঘে জমি সাফ করে ফেলা চাই।

চাপরাসীদের বলে দিলাম, "লোক তোমরা যত বেশি পারো নিয়ে এসো।"

তারা লোক আনতে চলে গেল।

ভাবলাম, আমার একমাত্র প্রতিবেশী স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা করে আসি। কিন্তু এত সকালে ভদ্রলোক ঘুম থেকে উঠেছেন কিনা কে জানে। একটু পরেই যাওয়া যাবে ভেবে পায়ে-চলা যে সরু পথটি জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে, সেই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

দু-পাশে শাল আর মহুয়ার ছোট-বড় নানা রকমের গাছ সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি, শাখায়-প্রশাখায় চিকন কচি লতায়-পল্লবে ক্রমশ তারা এমনিভাবে ঘন সন্ধিবদ্ধ যে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। যেদিকে তাকাই—শুধু গাছ আর পাতা, পাতা আর গাছ। মৃদুমন্দ বাতাসে পাতাগুলি ঝির্‌ঝির্‌ করে কাঁপছে। নানা রকমের অসংখ্য পাখি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও হয়তো কোনো বুনো গাছে বুনো ফুল ফুটেছে, তারই মিষ্টি সুগন্ধে বাতাস যেন ভরে আছে।

চিত্রবিচিত্রিত চমৎকার একটি প্রজাপতি উড়তে উড়তে হঠাৎ আমার হাতে এসে বসল। ইচ্ছে করলেই তাকে আমি ধরতে পারতাম, কিন্তু ধরলাম না। হাতটি আমার চোখের কাছে এনে যেই তাকে আমি ভালো করে দেখতে গেলাম, রঙিন পাখা উড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সে আমার হাতের উপর থেকে উড়ে পালাল।

ছায়াশীতল স্নিগ্ধ সেই অরণ্যের মাঝখান দিয়ে মনের আনন্দে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলাম, পেছনে হঠাৎ একটা ট্রেনের শব্দে যেন আমার চৈতন্য হল। এবার ফিরতে হবে।

ফেরার পথে যতই আমি সেই সতেজ সবুজ গাছগুলির পানে তাকাই, ততই আমার মনে হতে থাকে—আমি যেন ওদের পরম শত্রু। কতকাল ধরে এরা এইখানে এই ধরিত্রী-মাতার বুকের উপর সযত্নপালিত সন্তানের মতো ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, বিশ্বের বিস্ময় প্রাণবন্ত এইসব বিশাল মহীরূহ,—আমি এসেছি তাদের সমূলে উৎপাটিত করে সবংশে নিধন করে দিতে। নিবিড় ঘন অরণ্যানীর নয়নমনোহর এই স্নিগ্ধ শ্যাম রূপ আমায় নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে হবে, তার পরিবর্তে বসবে এখানে এক বিরাট কারখানা! লোহার আর ইস্পাত, ইঞ্জিন আর আগুন। আমার আগে যাঁরা এলেন, নিজের জীবন দিয়ে তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন কিনা, তাই বা কে জানে!

ট্রেন এসেছে, আবার চলেও গেছে। স্টেশন-মাস্টার বসে বসে একটা মোটা খাতায় কি যেন লিখছিলেন। মোটা-সোটা, বেঁটে-খাটো মানুষটি। পরিচয় হতেই মুখখানি তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খাতা বন্ধ করে তিনি গল্প জুড়ে দিলেন।

বললাম, "কাজ করুন।"

তিনি বললেন, "ধ্যুৎ তেরি কাজ! মানুষের মুখ দেখতে পাই না মশাই। দুটো কথা বলে যে সুখ হবে, তা এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে তারও উপায় নেই। দিন না মশাই চট্‌পট্ ওই গাছগুলোকে কেটে উড়িয়ে! তবু একটা কারখানা-টারখানা হবে, শহর বসবে, বাজার বসবে, লোকজন তবু দেখতে পাব!"

বললাম, "কিন্তু ওই গাছ কাটতে গিয়েই শুনেছি, আমার আগে তিন-তিনজন—"

কথাটাকে তিনি শেষ করতে দিলেন না, টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আরে দূর দূর! আমি ও-সব বিশ্বাস করি না মশাই, ভূত না ছাই! ভূত না হয় মেরেই দিয়ে গেল, কিন্তু টাকাকড়িগুলো গেল কোথায়? সেগুলোও কি ভূতে নিয়ে গেল নাকি?

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না, তাই তাঁকে আর একবার ভালো করে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, তাঁর বিশ্বাস, ভূতে তাদের মারে নি, মেরেছে মানুষে। কুলি-বিদেয় করবার টাকাকড়ি তাদের কাছেই থাকত, সেই টাকার লোভে কেউ তাদের মেরে ফেলেছে।

তিনি বললেন, "আমার কিন্তু মশাই ওই গুর্খা চাপরাসী দুটোকে বিশ্বাস হয় না। বললে কথা শোনে না, ব্যাটারা যেন নবাবপুত্তুর!"

বললাম, "কি জানি মশাই, কি করবে তাই ভাবছি।"

মাস্টার-মশাই-এর টেলিগ্রাফ এসেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টেলিগ্রাফের কলটার কাছে গিয়ে টক্‌টক্ করে কলটা বারকতক বাজিয়ে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর আমাকে বললেন, "আপনার আগে যে লোকটা এসেছিল, তাকেও বলেছিলাম, কিন্তু সে হিন্দুস্থানী—বাঙালির কথা শুনলে না। ভাবলে, আমি বুঝি ওর টাকাগুলো বাগাবার মতলবে আছি!"

কাজ শেষ করে তিনি আবার আমার কাছে এসে বসলেন। বললেন, "টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখবেন না দাদা। আমি ভালো কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, শুনুন।"

বলে তিনি স্টেশন-ঘরের দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটি লোহার আয়রন সেফ্ দেখিয়ে বললেন, "ওইখানে রাখতে পারেন। পরের টাকা ওখানে রাখতে অবশ্য আমি দিতাম না। কিন্তু আপনি একে বাঙালি, তায় ব্রাহ্মণ। তাই বলছি, একবার রেখে দেখুন দেখি—কি হয়! রাত দশটায় আমার শেষ ট্রেনখানা পার করে দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে যাই, সেই সময় চাবি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাব। আপনি ইচ্ছে করলে রাত্রে এখানে শুয়েও থাকতে পারেন। বেশ করে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে এই টেবিলের ওপর তোফা আরাম করে নাক ডাকবেন মশাই। টাকা থাকবে ওই আয়রন-চেস্টের মধ্যে, দেখুন তো দেখি ভূতে কেমন করে মারে!"

পরামর্শ মন্দ নয়।

খাবার যোগাড় করবার জন্যে যতীন আমার কাছে টাকা চাইতে এল, টাকা দিয়ে বললাম, "রাত্রে আমি এইখানে থাকব যতীন।"

যতীন হেসে বললে, "বুঝতে পেরেছি, বাবু ভয় পেয়েছেন। তা আপনার ভয় কি বাবু, আপনি বেরাহ্মণ মানুষ—আমি তো তখন আপনাকে বলেই দিলাম।"

গুর্খা চাপরাসী দুজন বেশ কাজের লোক। গাছ কাটবার জন্যে প্রায় পঞ্চাশজন কুলি তারা ধরে নিয়ে এল। একশ' টাকা আর কতক্ষণ! দিনের শেষে কুলিদের মজুরি দিতে গিয়ে দেখি—অনেকখানি জায়গা তারা পরিষ্কার করে ফেলেছে।

রামলাল গুর্খা বললে, ''বাবু, হেট্-আপিস্‌সে বহুট্ রুপেয়া মাঙ্গায় লেন।''

জিজ্ঞাসা করলাম, ''কাজ কি তাহলে এতদিন হয় নি রামলাল?''

রামলাল বললে, ''ঠোড়া ঠোড়া হয়েছে বাবু।''

শিউশরণ বলে রামলালের সঙ্গীটি পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, ''উ বাবুলোক বহুট্ রুপেয়া চুরি কোরেসে বাবু।''

তা হয়তো হবে। কিন্তু সে টাকা তাদের কাজে লাগে নি। টাকা তো যমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোয় না!

যাই হোক্—সেইদিনই হেড্-আপিসে তার করে দিলাম—একসঙ্গে মোটারকমের কিছু টাকা আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, নইলে কাজের ভারি অসুবিধা হবে।

কিন্তু টাকা আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আমার আগে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও হয়তো এমনি করে টাকা নিয়েছেন, কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোয় নি, অথচ টাকার হিসেব না দিয়েই তাঁরা মরে গেছেন। এমনি করে কোম্পানির অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে। তাই টাকা না এসে কলকাতার হেড্-আপিস থেকে এলেন একজন ইন্সপেক্টর।

কাজ দেখে তিনি খুশি হলেন। অসংখ্য গাছ তখন আমি কাটিয়ে স্তূপাকার করে ফেলেছি। বনের শ্যামলশ্রী একেবারে নির্মমভাবে নষ্ট করে দিয়ে অনেকখানি জায়গা তখন ফাঁকা করে দিয়েছি। কিন্তু কুলিরা বেতন পায় নি প্রায় হপ্তাখানেকের, তারা আমায় তখন ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি ইন্স্‌পেক্টরকে সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, ''টাকা আপনি গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন, নইলে কাজ হয়তো আমায় বন্ধ করে দিতে হবে।''

ইন্স্‌পেক্টর বললেন, ''টাকা আপনার পরশু পৌঁছে যাবে। এখন এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফুরিয়ে যাবার আগেই জানাবেন।''

তাঁকে আমি ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে এলাম। শিউশরণ আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ফেরবার পথে শিউশরণ বললে, ''আরো বেশি টাকা মাঙ্গায় লেন বাবু, এক হাজার টাকা আর ক'দিন!''

বললাম, ''ফুরোলেই আবার পাঠাবে। টাকার জন্য ভাবনা কি!''

যতীনকে প্রায়ই বলতাম, ''কই যতীন, মরলাম না তো! বড় বড় গাছগুলো তো প্রায় সবই কেটে ফেললাম!''

যতীন হেসে জবাব দিত, ''আমি তো বাবু আগেই সে-কথা বলে দিয়েছি। বামুনের কোনো ভয় নেই।''

বলতাম, ''ঠিক বলেছ। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করি নি, এখন দেখছি, সেই কথাই সত্যি।''

যতীন বলত, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ও-সব অনেক জানা আছে।''

রাত্রে সেদিন খেতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, ''ভূত তুমি নিজে কোনোদিন দেখেছ যতীন?''

যতীন বললে, ''তা আজ্ঞে দেখেছি বই-কি।''

এই বলে সে তার ভূত-দেখার গল্প আরম্ভ করলে। এমন গল্প যে, সে আর সহজে

থামতে চায় না। এদিকে রাত্রির শেষ-গাড়ি তখন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটা ছেড়ে গেলেই স্টেশন-মাস্টার বাসায় চলে যাবেন। তার আগেই আমার সেখানে যাওয়া দরকার। কারণ রাত্রে আমার শোবার বন্দোবস্ত সেইখানেই। কাজেই বাধ্য হয়ে যতীনকে বললাম, "বাকিটা কাল শুনব যতীন, আজ থাক্।"

কিন্তু এমনি তার গল্প বলবার সখ যে, সে শেষ-পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গল্পটা তার বলতে বলতে এল।

গাড়ি চলে গেছে। মাস্টার-মশাই তখনো বসে আছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "বসে আছেন যে এখনো?"

বললেন, "আসুন, আপনারই জন্যে বসে আছি।"

বললাম, "এবার আপনি যেতে পারেন।"

তিনি বললেন, "যাব কি মশাই, জংসন থেকে টেলিফোন্ এল, আপনার এক হাজার টাকা নিয়ে লোক আসছে।"

"কেমন করে আসবে? গাড়ি তো চলে গেল?"

তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "এ কি আর আপনার-আমার কাজ মশাই, অতবড় সায়েব-কোম্পানির কাজ,—খাতির কত! জংসন থেকে একখানা পাইলট্ ইঞ্জিন দিয়েছে, তাইতেই লোক আপনার এল বলে!"

যতীন বললে, "তাহলে এই অবসরে গল্পটা আমার শেষ করে নিই বাবু, শুনুন।"

বলে সে তার গল্প শেষ করতে বসল।

গল্প শেষ হতে না হতেই হুস্ হুস্ করে ইঞ্জিন এসে দাঁড়াল। ইঞ্জিন থেকে নামল এক সাহেব। এক হাজার টাকা—অন্য কারো হাতে পাঠাতে হয়তো বিশ্বাস হয় নি, তাই চুনের কারখানার ছোট-সাহেব নিজে এসেছেন।

টাকা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিয়ে তিনি আবার সেই ইঞ্জিনেই ফিরে গেলেন।

টাকাগুলি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে চাবি যেখানে থাকে সেইখানে রেখে মাস্টারমশাই বললেন, "আসি তবে, নমস্কার।"

বললাম, "আসুন।"

যতীন বললে, "আমিও তাহলে আসি বাবু। আপনি শুয়ে পড়ুন।"

বললাম, "যাও।"

বলেই দরজা-জানালা বন্ধ করছিলাম, যতীন ফিরে এল। বললে, "অত অত টাকা এল, আপনি একা থাকবেন বাবু, গুর্খা দুটোকে পাঠিয়ে দেব?"

ঘাড় নেড়ে বললাম, "না।"

দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকলে দম আমার বন্ধ হয়ে আসে। সেদিনও তাই একটা জানালা আমি খুলে রাখলাম। কিন্তু রেলস্টেশনের জানালা, বিরাট জানালা। তা খুলে রাখা মানে সবই খোলা। ইচ্ছে করলে ও-পাশ থেকে টপ্‌কে যে-কেউ এসে ঘরে ঢুকতে পারে। আসুক না! এসেই বা কি করবে? টাকা আছে লোহার সিন্দুকে। সিন্দুক একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা। আর ভূত যদি আসে, তাদের তো শুনেছি সর্বত্রই অবাধ গতি। তাদের কাছে খোলাই বা কি, আর বন্ধই বা কি! তারা অবশ্য

টাকা নিতে আসে না। তাছাড়া এলে এতদিন আসত। এখনো যখন আসে নি, তখন সম্ভবত আর আসবে না।

এমনি সব নানান্ কথা ভাবছি, আর সেই খোলা জানালার পানে তাকিয়ে আছি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দিনের মতো পরিষ্কার জ্যোৎস্নার ছটা জানালার পথে ঘরে এসে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ পরে জানি না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল, কাপড় দিয়ে কে যেন আমার মুখখানা চেপে ধরেছে।

ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি, সত্যিই তাই। হাত তুলতে গিয়ে দেখি, হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা, পায়ের অবস্থাও তাই। ঘুমের ঘোরে কখন যে এমন করে আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, কিছুই বুঝতে পারি নি। কথা কইবার উপায় নেই। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ চোখ দুটো খোলা। জানালার পথে যে জ্যোৎস্নার আলো ঘরে এসে পড়েছে, তাতে শুধু সেই জায়গাটিই দেখা যায়।

যে-লোকটা আমার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সজোরে বেঁধে ফেলেছে তাকে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু চেনবার উপায় নেই। মুখ খুলতে পারছি না, তবু কোনোরকমে অস্পষ্টভাবে গোঁ গোঁ করে বললাম, "টাকা নিয়ে যাও, কিন্তু আমায় তোমরা মেরে ফেলো না বাবা।"

ওদিকে আমার মাথার পেছনে দেওয়ালের গায়ে সিন্দুক খোলার শব্দ পেলাম। কি আর করি, মড়ার মতো চুপ করে পড়ে আছি। মৃত্যু অনিবার্য। এতক্ষণে বুঝলাম, আমার আগে যারা গেছে, তারাও ঠিক এমনি করেই গেছে।

বুকের ভেতরটা ধকধক করছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সে যে কি ভীষণ অবস্থা, তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। চোখের সুমুখে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটির কচি মুখ ভেসে উঠল, আমার স্ত্রীর কথা মনে হল। হায় হায়, কেন আমি তাদের ছেড়ে এখানে এলাম!

চোখ দিয়ে আমার দর্দর্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।—হে ভগবান, এরা যেন আমায় প্রাণে না মারে। বেঁচে যদি থাকি তো কালই আমি এ-চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। টাকাগুলো মাথার কাছে ঝন্ঝন্ করে উঠল। থলেটা তাহলে ওরা বের করেছে!

এমন সময় মনে হল, যেন জানালার পথে আর-একটা লোক ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু যেন মনে হল আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা প্রকাণ্ড লম্বা সেই লোকটা—যাকে আমি প্রথম দিনে ট্রেনে দেখেছিলাম।

গলাটা তখন কে যেন আমার দু-হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। এইবার মৃত্যু। অনুরোধ করবার শক্তি নেই। মুখের কাপড় তখনো তেমনি বাঁধা।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! মরতে মরতে আমি যেন বেঁচে গেলাম। আমার গলা ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে সে কার সঙ্গে যেন হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে।

তারপরেই ভীষণ শব্দ। তারপরেই চিৎকার। মানুষ মরবার সময় যেভাবে চিৎকার করে, এও যেন ঠিক তেমনি। কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারলাম, এ আমার গুর্খা চাপরাসী, রামলাল।

মারামারি কিন্তু তখনো থামে নি। টাকার থলেটা মনে হল একবার ঝন্‌ঝন্‌ করে মেঝেতে পড়ে গেল। তারপর কে জানলা টপ্‌কে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু আর একজন। বাইরেও শব্দ হতে লাগল। নিরুপায় অসহায় অবস্থায় আমি শুধু মড়ার মতো সেখানেই চুপ করে পড়ে রইলাম। খানিক পরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কি যে হল, কিছুই ভালো বুঝতে পারলাম না। তখনো বুকের ভেতরটা আমার কেমন যেন করছে। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে, সে-কথাই ভাবছি।

এমন সময় ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ করতে করতে ঘরের বাইরে একখানা ইঞ্জিন এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। বন্ধ দরজায় ঘা পড়তে লাগল। কিন্তু কে খুলবে? আমার তো ওঠবার উপায় নেই। মুখখানা টেনে বাঁধা। কথাও বলতে পারছি নে।

পায়ের শব্দ ঘুরে একদিকের খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। একজন সাহেব জানালা টপ্‌কে ঘরে ঢুকে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে আলো জ্বালা হল। জংসন থেকে তাঁরা ইঞ্জিনে চড়ে চারজন এসেছেন। কোয়ার্টার থেকে স্টেশন-মাস্টার এলেন।

ঘরের মেজে রক্তে ভেসে গেছে। গুর্খা চাপরাসী রামলাল মেজের উপর মরে পড়ে আছে। তারই কোমরের ভোজালি তারই গলায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লোহার সিন্দুক খোলা। কিন্তু টাকার থলে মেজের উপর পড়ে রয়েছে।

ব্যাপারটা কিছুই ভালো বোঝবার উপায় নেই। কে যে আমায় মেরে ফেলে টাকা নিয়ে উধাও হবে ভেবেছিল, আর কে-ই বা আমায় বাঁচিয়ে রামলালকে মেরে গেল, কে জানে!

সাহেবদের জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা খবর পেলেন কেমন করে?"

যিনি এখানে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন, "জংসনে ইঞ্জিন আমাদের পৌঁছবামাত্র এখান থেকে টেলিফোন গেল,—ডাকাত পড়েছে, জলদি আসুন।"

এখান থেকে টেলিফোন করবে কে? স্টেশন-মাস্টার ফোনের কাছে উঠে গিয়ে ফোনটা হাত দিয়ে তুলে আমাদের দেখালেন, ফোনের কনেক্‌সান তিনি কেটে দিয়েই বাসায় গিয়েছিলেন।

অবাক হয়ে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার মনে হল, ঝগড়াটা বাইরে পর্যন্ত গড়িয়েছিল—বাইরে বেরিয়ে একবার দেখা যাক।

সবাই মিলে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। জ্যোৎস্নার আলো তখন ম্লান হয়ে এলেও দেখা গেল, দূরে প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ-সীমানায় সাদামতো কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।

কাছে গিয়ে দেখি, শিউশরণ! আমাদের দেখে সে শুধু কাঁদতে থাকে। মুখে কোনো কথা বলে না।

শেষে অনেক কষ্টে মেরে মেরে তাকে কথা বলানো হল। সাহেবের লাথি খেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে সব কথাই বলে ফেললে।

আমায় মেরে ফেলে সে আর রামলাল দু-জনেই এসেছিল টাকা চুরি করতে। যে তিনজন মরেছে, তারাও তাদেরই হাতে মরেছে। কিন্তু এবার তার ফল হল বিপরীত। মাঝখান থেকে কে একটা লোক এসে রামলালকে তো মেরেই ফেললে, আর তার হাত থেকে টাকার থলেটা কেড়ে নিয়ে পা দুটো তার উল্‌টো দিকে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

বুঝলাম, সেই ভাঙা পা নিয়ে অতি কষ্টে বুকে হেঁটে শিউশরণ পালাবার চেষ্টা করছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘লোকটা দেখতে কি রকম বল্ দেখি?’’

শিউশরণ বললে, ‘‘সে মানুষ নয় বাবু, তার গায়ে বহুৎ জোর। ইয়া লম্বা তালগাছের মতো, আর ছাগলের মতো মুখ।’’

আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মাথাটা তখন আমার কেমন যেন ঘুরছিল বলে সেইখানেই বসে পড়লাম। মনে হল—রামলাল যখন আমার গলাটা চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার উদ্যোগ করেছিল, তাকে তখন আমি জানালা টপ্‌কে ঘরে ঢুকতে দেখেছি।

মনে মনে এই ভাবছি, এমনি সময় টুপ্ করে আমার পায়ের কাছে কি যেন একটা পড়ল। তুলে দেখি...একটা দেশলায়ের বাক্স। এইটেই সেদিন আমি তাকে ট্রেনের কামরায় দিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরত দিতে সে ভুলেছিল।

এদিক-ওদিক বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে কাউকেই আমি দেখতে পেলাম না। সমস্ত শরীর তখন আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কে সে?

যে-ই হও, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তোমায় নমস্কার।

চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালির যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোঁসাই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙালি মুসলমান, আর চেলারা—গোঁসাই, মুখুজ্জে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুক চুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না, আজ বললেন, ‘অত ডরাচ্ছিস কেন?’

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, ‘ওটা খাবার কী প্রয়োজন? আপনি তো কখনো খান নি, এতদিন বার্লিনে থেকেও। আমারই বা কী দরকার?’

চাচা বললেন, 'ওর বাপ খেত, ঠাকুরদা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায় এ দেশে না এসেও। ও হল পাইকারি মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মতো পেঁচী মাতাল নয়। আর আমি কখনো খাই নি তোকে কে বললে?'

আড্ডা একসঙ্গে বললে, 'সে কী চাচা?'

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজিতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে, তবে ভাগ্যিস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ। আসন জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন, 'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, 'এই নিয়ে আঠারটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি না কমতি?'

ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ফ্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, 'আহা কৈসন্ সুন্দরী, রূপসিনী নন্দিনী নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুজ্জে বললে, 'চোপ্—।'

চাচা বললেন, 'ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদূখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মতো রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোঁসাই বললেন, 'কিংবা দুই-ই। উদূখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন্ ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস। ভর গ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, "ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রংটিকে ফের একটু বাদামির আমেজ লাগিয়ে আসবে।"

আমি বললুম, "অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ? রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনো গতিকে রংটা একটু 'ভদ্রস্থ' করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ-মার্কা করব? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সয়ে নিতে পার, কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?"

ব্রাখেল বললে, "না হয় একটু বাঁদর-নাচই দেখালে।"

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রাখেল আমার যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললেন, 'অজ পাড়াগাঁ ইস্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে ছোটবাবু,

মালবাবু—অবশ্য দ্যাশের মতো খালি গায়ে আলপাকার ওপর ব্রেসট্ কোট পরা নয়, টিকিট-বাবু, দু-চারজন তামাশা দেখনেওলা, পুরো পাক্কা এসেশন বললেই হয়। ওই অজ স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

স্টেশনমাস্টার বললে, "বাইরে গাড়ি তৈরি, এই দিকে আসতে আজ্ঞা হোক্।"

বুঝলুম, ফন্ ব্রাখেলরা শুধু বড়লোক নয়, বোধ হয় এ-অঞ্চলের জমিদার।

বাইরে এসে দেখি, প্রাচীন ফিটেন গাড়ি, কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্নিং স্যুট, মাথায় চোঙার মতো অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিন্ডেনবুর্গি গোঁফ, এডওয়ার্ডি দাড়ি, আর চোখ দুটো এবং নাকের ডগাটি সুজ্জি রায়ের চোখের মতো লাল জবাকুসুমসঙ্কাশং।

কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল; দাড়ি-গোঁপের ছাঁকনি দিয়ে যা বেরোল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ" বলে যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণ ভরে অভিসম্পাত করলুম, এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু-দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারি কায়দায় গটগট করে গিয়ে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হান্টারওয়ালী ফিয়ারলেস নাদিয়ার মতো ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশনমাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে এক কাসল্। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ দুর্গ যেন সবকটা মিলিয়ে লাবড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, "ওই আকাশে চড়তে হবে?"

কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, "ইয়াঃ মাইন হের!" দেমাকের ঠ্যালায় তার গোঁফের ডগা দুটো আরো আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, 'এক মিনিটে পৌঁছে যাব স্যার্।' আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাট্টুর মতো কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লাম্বী চালে। রাস্তাটা অজগরের মতো পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাস্‌ল্‌টায় ফণা মেলেছে; কিন্তু ফণার কথা থাক, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে যেখানে দাঁড়ালো তার ওপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—'

মৌলা শুধাল, 'ভিলিকিনি মানে?'

চাচা বললেন, 'ও ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি—সেই ভিলিকিনি থেকে ফন্ ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।'

তারপর আমাকে বললে, ''ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরি হয়ে নাও।''

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মতো পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট, কিন্তু একটা নেভি-ব্লু স্যুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রং তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোনো রং নেবে যেন মনঃস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাতমুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুমটার ফেন্সি জিনিসপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক্ করে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ''এ কী? ডিনার-জ্যাকেট পর নি?''

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ''ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান।''

ফন্ ব্রাখেল বললে, ''উঁহু, সেটি হচ্ছে না। এ বাড়িতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মতো সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার উপায় নেই।'' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, ''তা তুমি এক কাজ কর। দাদার কাবার্ড ভর্তি ডিনার-জ্যাকেট, শার্ট, বো—তারই এক প্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম; এই কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।''

আমি বললুম, ''তওবা, তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পৌঁছে তোমার ডিনার গাউনের মতো টেল করবে।''

বললে, ''না, না, না। সবাই কি আমার মতো দিক-ধেড়েঙ্গে। তুমি চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নাও, আমি চললুম।''

চাচা বললেন, 'কী আর করি, খুললুম কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট পাতলুন ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ ভর্তি শার্ট, কলার, বো, হীরে-বসানো স্লিভ-লিন্‌ক্‌স, আরো কত কী!

'মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মতো।

'তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, এ বেশের সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভালো। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মতো তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।''

চাচার ন্যাওটা ভক্ত গোসাঁই বললে, 'চাচা, এ আপনার একটা মস্ত দোষ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশি হয়ে বললেন, 'হেঁ-হেঁ, তুই তো বললি, কিন্তু এই পুলিনটা ভাবে সেই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাক গে, ইভনিং-ড্রেসে কালা কেষ্ট সেজে আমি তো শিস্ দিতে দিতে নামলুম নীচের তলায়—'

পুলিন শুধালে, 'স্যার, আপনাকে তো কখনো শিস্ দিতে শুনি নি, আপনি কি আদপেই শিস্ দিতে পারেন?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজেই জানি নে, আমি শিস্ দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যান্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ইভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, না হলে আমি শিস্ দিতে যাব কেন? শিস্ কি দিয়েছিলুম আমি, শিস্ দিয়েছিল বকাটে সুটটা। তা সে কথা থাক।'

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘন্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

কাস্‌লের ব্যানকুয়েট-হল আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে। তার আর বিচিত্র কী এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপঢং দেখা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু বাস্তবে দেখলুম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাতওলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজি আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল্ দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বি অন্ দি সেফ সাইড।

ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল কোন্ শতাব্দীর জানি নে কিন্তু হল্‌এ ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্যি, এঁদের রুচি আছে কোনো সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্যপ্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনে দুজনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইন্ডার (ভারতীয়) দেখছেন, কালো ইভনিং-ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোসাঁইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো।'

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকালে ঠিক বুঝতেই পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয়নি! কই, আমি তো একদম রেডিমেডের মতো করে বেঁধেছি, এমন কি হালফ্যাশানের মাফিক তিন ডিগ্রি ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ইভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাশ করা চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মতো দেখাচ্ছিল?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, "পাপা, এই হচ্ছে আমার ইন্ডার কাফে!'

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেকহ্যান্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, "প্ফুই—ছিঃ, ও-রকম বলতে নেই।"

আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, "আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।"

বলেই মনে হল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয়নি।

পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারি খুশ। বললেন,"ডাঙ্কে—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।"

পালিশ-আয়নার মতো টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হালকা চাকতির উপর প্লেট পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দু'দিকে সারি বাঁধা অন্তত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগি খেতে হয়, কোন্‌টা দিয়ে রোস্ট আর কোন্‌টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ?

আসল খাবার পূর্বের চাট—'অর দ্য অভ্‌রে'র নাম দিয়েছি আমি চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুঞ্চার ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বাটলার দু হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুখাল, শেরি? পোর্ট? ভেরমুট? কিংবা হুইস্কি সোডা?

আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "নো, বিয়ার!"

বলেই জিভ কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনো খাই নি, তার উপরে আমি ভালো করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্য। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা!

ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতর অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম, একটুখানি ঠোঁট ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।'

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, 'এক ধাক্কায় এক বোতল? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, 'কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা? ওরকম ইভনিং-ড্রেস পরে ব্যানকুয়েটে হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপে বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেসটা।'

গোসাঁই মর্মাহত হয়ে বললে, 'চাচা!'

চাচা বললেন, 'অপরাধ নিস নি গোঁসাই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এট্টুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পয়লা গুরু ছিলেন এক ভশ্চায, তিনি শ'কার ব'-কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক্!'

তখনো খেয়েছি মাত্র আড়াই চাক্তি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পদ্মার বালুচর। সেই শুধু-পেটে বিয়ার দু মিনিট জিরিয়েই চচ্চড় করে চড়ে উঠল মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে।

এমন সময় ফের ফন ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, "বার্লিনে কী রকম পড়াশোনা হচ্ছে?'

বুঝলুম, এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ হুঁ করে

গেলেই চলে কিন্তু আমি বললুম, "পড়াশোনা? তার আমি কী জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হই হই করে ইয়ার-বকশীদের সঙ্গে।"

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে স্ট্যাটস্ বিবলিওটেকে, স্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কী? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?—পিপের ছ্যাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরুচ্ছিল, ইঁদুর চুক চুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা, লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলছে, "ওই ড্যাম ক্যাটটা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়ব।"

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিন-চার পদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন রোস্ট টার্কিতে পৌঁছেছি, তখন দেখি অতি ধোপদুরস্ত ইভনিং-ড্রেস পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, "জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইন্ডার।" বড় নার্ভাস ধরনের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শুধু ইয়ে—" তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি শুধু রোস্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরিতে আসি।"

তারপর আমি কী বকর-বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার, কখনো বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, "গুস্টাফ, আরো বিয়ার নিয়ে এস।"

এ কী অভদ্রতা! কিন্তু কারো মুখে এতটুকু চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়তো লক্ষ্য করি নি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি লিকার সিগার এল। আমি অভদ্রতার চূড়ান্তে পৌঁছে বললুম, "নো লিকার, বিয়ার প্লিজ!"

বাবা হেসে বললেন, "আমাদের বিয়ার তোমার ভালো লাগাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়ার্ড খেললে হয় না? তুমি খেলো?"

বললুম, "আলবত!" অথচ আমি জীবনে বিলিয়ার্ড খেলেছি মাত্র দু'দিন, কলকাতার ওয়াই.এম.সি.এ-তে। এখানকার বিলিয়ার্ড টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশি শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন, "গুড বাই, তোমরা খেলোগে।"

ক্লারাও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে "গুড নাইট" বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নীচে বিরাট জলসাঘর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়ার্ড-টেবিল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে সারি সারি বিয়ারের পিপে। এত বিয়ার খায় কে? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম, "নো শ্যাম্পেন।" আবার চলল বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, "এ আবার কী কিউ দিলে?"

মার্কারের মুখে কোনো অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল না। বরঞ্চ যেন খুশি হয়েই আলমারি

খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ির মতো সেটা হাতে ব্যালান্স্ করে বললুম, "এইটেই তো, বাবা, বেশ; তবে পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিলে কেন?"

আমার বেয়াদবি তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনো ঠিক ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খোলায়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবিশ্যি আমি করি নি; কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভালো। আর প্রতিবারেই আমি লিড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ ও রকম লিড পায় না।

রাত ক'টা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনো ছটা কখনো নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভভ ভালো লিডের লাকে।

হের ফন ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, "তোমার লাক বড় ভালো।"

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, "লাক, না কচুর ডিম! নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক্ দ্যাট্!"

ব্রাখেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমিও অষ্টমে উঠে আরো কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্কার ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি আরো চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, 'তোমার মূলোর দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তেরোটায় কেউ মুলো কিনতে আসবে না।" অথচ বেচারী বুড়ো থুত্থুড়ো, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিৎকার-চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনো পরিপাটি ইভনিং-ড্রেস।

আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, "সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম।" তারপর ক্লারার বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্ফ্গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না।"

আমি বললুম, "হুঁ হুঁ হুঁ।"

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কী স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যিকার।'

'নিত্যিকার' বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে তো ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, 'হানস্ পনেরো মার্ক ভলফ্গাঙ দুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনি মনে পড়ল, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়, এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজিতে আবার হারলুম,

এবার গেল আরো কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোনো রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেন্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হত, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরো শ'দুই মার্ক জিতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলছে পাইকারি হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে এক ঝলক বিয়ার বেরিয়ে এল, কোনো গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারি নে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বলেন, "হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন,—হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—"

আবার লাক্! এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ। বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গুড ড্যাম্ লাকের দোহাই।

টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, "তার মানে? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? ইউ অ্যান্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম, ড্যাম্—"

বাপ-জ্যাঠা কী বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই! কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না, আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত কটুকাটব্য।

এমন সময় দেখি, ক্লারা।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, 'ছোটলোক', 'মিন', এইসব অশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, "অত চটছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন।"

বেরুবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, "সরি, সরি, প্লিজ প্লিজ। আমাদের দোষ হয়েছে।"

তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, 'ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনো শুনি নি।'

চাচা বললেন, 'যা বলেছ! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে! ইভনিং-কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি! ছি-ছি, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

আর এদেশে সবাই ভাবে ইন্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র!

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগল। শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভালো, কারণ ভোরের আলো তখন জানলা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাব কী করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো!

তা হলে পালাই।

অতি ধীরে ধীরে কোনো প্রকারের শব্দটি না করে সুটকেসটি ওখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট। মাইলখানেক এসে ফিরে তাকালুম; নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি।

চোরের মতো গাড়িতে ঢুকে সোজা বার্লিন।'

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা?'

চাচা বললেন, 'আরে শোনই না শেষ অবধি'।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা। হায়, হায়, আমি ল্যান্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা-গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা।

শেষটায় মর মর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম।

ক্লারা বললে, ''অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ও তো মাতলামো না, পাগলামো। কিংবা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।

''তুমি যখন দাদার স্যুট পরে ডিনারে এলে তখনি তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি টেরচা করে বাঁধা বো দেখে। তার পর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোনো মদ খেত না; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মতো বকতে, ''লেখাপড়ার সময় কোথায়? আমি তো করি হই হই'' আমি জানতুম একদম বাজে কথা; কিন্তু দাদা হই হই করত আর বলতেও কসুর করত না।''

''শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালোবাসা ছিল অগাধ।

"তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।"

''কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; বাবা-জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তারা তোমার ব্যবহারে কিছুমাত্র আশ্চর্য কিংবা দুঃখিত হন নি।"

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস্‌ দিয়েছিল স্যুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

চাচা বললেন, হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।'

কলকাতার গলিতে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুপুররাত্রে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিন ক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়া পোড়ানো কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে দু'পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্ট্রিক আর গ্যাস লাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নেই বললেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল।

বিশ্বনাথ বলে—"না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরুনো নিরাপদ না।"

আমরা হেসে উঠলে বলে, "না হে না, চৌরঙ্গী, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গী নয়। শোন তাহলে—

"সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরির জন্যে বই কিনতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাত্রের ট্রেনে বাড়ি চলে আসব। কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ থিয়েটার না দেখে কেমন করে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেল্লাম। সঙ্গে বিছানাপত্রের বা তোরঙ্গ-বাক্সের ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটি সুটকেস, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হত।

কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হল, ভাবলাম একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। স্কুলে আমার সঙ্গেই পড়াশুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা এক সঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশিদিন অবশ্য কলেজে থাকেনি। অত্যন্ত খেয়ালী ছেলে—কোনো কাজে বেশিদিন লেগে থাকবার মতো ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ুউড়ু ভাব। বাড়ি থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। বড় হয়েও তার সে স্বভাব কাটেনি। কথা নেই, বার্তা নেই—হঠাৎ একদিন হয়তো আমরা শুনলাম অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়তো দু'মাস তার দেখা নেই। আমরা

কোনোরকমে প্রক্সি দিয়ে হয়তো সেবার তার কলেজের খাতায় কামাই-এর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম, কিন্তু এমন করে কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে এক্‌জামিনেশনের সময়ে দেখা গেল অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কম দিন এসেছে যে তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে আর মিশুক ছিল যে আমরা সবাই তাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্তিই হল। বল্লে, "তবে আর কি? ভাই, বর্মাটা একবার ঘুরে আসি।"

তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই। আমাদের চেয়ে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড় এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকত। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশা আর মিটতে চাইত না। যেসব দেশ সে এখনো দেখেনি তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে আমাদেরও কখনো কখনো মোহ ধরে যেত—কেমন যেন মনে হত এই ছোট্ট শহরের ছোট্ট জানা কটি রাস্তায় দুবেলা যাওয়া-আসায় জীবনের কোনো সার্থকতাই নেই,—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কূল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বড় করে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

কিন্তু আমাদের এ ক্ষণিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত, কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস-তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশের একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে, অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে সে কলকাতায় এই ঠিকানায় আপাতত আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়তো যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হল।

বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু গলিটা মনে ছিল। ভাবলাম কলেজ স্ট্রিট থেকে বেশি দূর হবে না। ট্রেনেরও এখন দেরি আছে। একবার দেখা করেই যাই, যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর একটা গলিরাস্তায় ঢুকে একজনাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশি নয়। বড়জোর আটটা হবে। কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূর হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক আর যাই হোক, কলকাতার পথ তো বটে। অথচ এই আটটা রাত্রে সেখানে একটি জনপ্রাণী নেই।

ভেবেছিলাম খানিকদূর গিয়ে আবার কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু লোক কোথায়? তা ছাড়া গলিটাও ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হল, হয়তো ভুলপথে এসেছি। কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে, আমায় ভুল পথ দেখিয়ে তার লাভ কি? নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি এমন লাখ পঞ্চাশ টাকা আছে যে চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোশাক দেখে বড়লোক বলে ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে?

আরো খানিকটা এমনি করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জন, বাতিগুলোও কি এ পথের মিটমিটে হতে হয়! একে গ্যাস-পোস্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে, তার ওপর কি

কারণে জানি না আলো তাদের এত ক্ষীণ যে রাস্তা আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে এইটুকু বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস্ কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা আছে কে জানত। দুপাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরি। কোনোরকমে হাড়-বেরুনো ইট-কাঠের জীর্ণ দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোনো বাড়িতে একটা আলো, না জন-মানুষের একটু শব্দ। সে রাস্তার পাশে সারের পর সার পোড়ো বাড়ির মতো সব খাঁ-খাঁ করছে।

ক্রমশ মনে হল একটা কেমন যেন ভ্যাপ্সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস যেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস যেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটায় ঠিক সেই রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল, কিছু দূর গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে। কিন্তু জনমানুষহীন জীর্ণ বাড়ির সারের ভেতর ডাইনে-বাঁয়ে কোথাও কোনো পথ নেই।

সামনের পথও খানিক দূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে পথে ঢুকেছি, গলিটার ওই একটি মাত্রই তাহলে বেরুবার রাস্তা! আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল পথ দেখাল কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল, তারই কটা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হল, এ গলি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই, কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গা-টা কেমন ছম্‌ছম্ করছিল।

সবে তো প্রথম রাত। কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখন লোকজনে গাড়িঘোড়ায় মানুষের শব্দে গম্‌গম্ করছে। অথচ এই পথটা কেমন করে এখন নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল! মনে হল, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়েনি, কেউ যেন জানে না। আমিই যেন প্রথম সে শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙলাম। খট্‌খট্ খট্—আমার নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নেই। সে শব্দ অদ্ভুত ভাবে নির্জন অন্ধকার বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই কটা রাস্তার বাতি দপ্‌দপ্ করে নিভে গেল। ভ্যাপ্সা গন্ধটা ক্রমশ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। না, এ গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ করে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিকদূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকেও গলির পথ যে বন্ধ। কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি, এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। এ গলি দিয়ে এগুবার সময়ে আশ-পাশে কোনো পথই দেখতে পাইনি। তা হলে গলির দু'মুখ বন্ধ কেমন করে হয়?

ভাবলাম, হয়তো আরো একটা পথ ছিল। যাবার সময় আমার দৃষ্টি কোনোরকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময় ভুল করে সেইটিতেই ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ। কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন করে? আমি অন্যমনস্ক হয়ে তো ছিলাম না। আগাগোড়াই তো সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়িতে যদি একটা আলো দেখা যেত! না হয় ডেকেই জিজ্ঞাসা করতাম!

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরুতে হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তেই কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা করে দিয়েছে।

এবারও যখন দেখলাম গলির মুখ বন্ধ, তখন সত্যই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোক। ফাঁকা আকাশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি। শহরে এলে অমনিই আমাদের হাঁপ ধরে। তার উপর এই ভ্যাপসা গন্ধভরা অন্ধকার গলি— চারিদিক থেকে সে যেন আমাকে জেলখানার মতো বন্দী করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাব তারও জো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যত এই অদ্ভুত ব্যাপার ভাবছিলাম, মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। স্যুটকেসটা বইয়ের ভাবে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনি করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই তো বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। দূরে একটা মিটমিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না? তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম—এই তো আমাদের অবিনাশ! এতক্ষণের ভয়-ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চমকে তাকাল। বল্লাম, "কী আশ্চর্য, তোর খোঁজ করতেই এই এক ঘণ্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে! বাবা, কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস্ তুই! ঢুকে আর বেরুনো যায় না!"

অবিনাশ একটু হেসে বল্লে, "এসেছিস্ তাহলে ঠিক!"

বল্লাম, "এসেছি আর কই, তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ি কি খুঁজে বার করতে পারতাম!"

সেকথার কোনো উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বল্লে, "আমায় তা হলে তোর মনে আছে ভাই!"

"মনে থাকবে না কেন রে?"

"না ভাই, মনে থাকে না। অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে তার ভেতরই আমরা বেঁচে থাকি।"

আমি হেসে বল্লাম—"ছিলি তো ভূপর্যটক, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে? যাক, এখন তোর বাড়ি চল দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।"

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বল্লে, "আমার বাড়ি! আচ্ছা চল। আমার চিঠি পেয়েছিলি?"

"হ্যাঁ, সে তো তিন মাসে আগে!"

"তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আবার! তা হলে ফির্‌লি কবে?"

অন্যমনস্কভাবে অবিনাশ বল্লে—"এই আজ।"

"এই আজ? এবারে গেছলি কোথায়?"

"বলছি চল।"

সেই নির্জন গলি দিয়েই তখন আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল—"এবারে ভাই গেছলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরানো। নোনাজল লেগে লেগে তার গায়ের রং চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরানো। চিমনিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয়, বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন একটা ভবঘুরে রুক্ষুরুক্ষু ভাব। সেইটিই তার সৌন্দর্য। তার ওপর শুনলাম যে এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে—তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাস আর জঙ্গলের মসলাগাছের গন্ধ। তার উপর গভীর বনের মাঝে তার বোরাবুদর।

একেবারে মেতে উঠলাম, যেমন করেই হোক যেতেই হবে জাহাজে। জাহাজের ভাড়া দেবার মতো পয়সা নেই। অনেক কষ্টে জাহাজের হেড-খালাসীকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে ছোট তেরপল-ঢাকা বোট টাঙ্গানো থাকে। ঠিক হল তারই একটির ভেতর আমি থাকব। কেউ তাহলে টের পাবে না। খালাসী কোন্ এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমায় খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভিতরে গিয়ে হেড্-খালাসীর নির্দেশমতো লুকিয়ে রইলাম। ভোর হবার আগে জাহাজ ছেড়ে দিল।

তারপর কদিন কি অদ্ভুত ভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি, তেরপল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর রাতে যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে কখন ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যান আর ওপরে হাল ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিঙ ধরে দাঁড়াই।

এমনি করে কদিন বাদে জাভায় এসে পৌঁছোলাম। আগে ঠিক ছিল, সবাই নেমে গেলে কোন এক সময় হেড্-খালাসী আমার নামার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার আগের রাত্রে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে তা হবার উপায় নেই। এখানে মাল নামানো হলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই ডকে রং করবার জন্যে পাঠানো হবে ঠিক আছে, সুতরাং সেভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায়? খালাসী বল্লে, উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়াবার সময়ে সেই কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি তাহলেই হয়। তাতেই রাজি হলাম!

জাহাজ জেটিতে লাগবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাকনি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠে বাঁধাই ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উল্টোদিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ। কেউ দেখতেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাডেলের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল, কি ভীষণ তার টান! প্রাণপণেও আর সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘূর্ণ্যমান ভয়ঙ্কর প্যাডেলে ধাক্কা খেয়ে তলার দিকে তলিয়ে গেলাম।"

আমি শিউরে উঠে বল্লাম—"তারপর?"

"তারপর সেই প্যাডেলের ঘা! কি ভয়ঙ্কর লেগেছে দেখবি?"

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনো জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামা তুলে দেখালে।

একি! জামার নিচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, শূন্য! ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই; ওধারে গ্যাসপোস্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম, সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য শূন্য সব শূন্য।

অস্ফুট চিৎকার করে সুটকেস হাতে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম, কিন্তু কোথায় যাব? যেদিকে যাই, নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চিৎকার করে একটা পোড়োবাড়ির দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরে দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত সে আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। কিন্তু কারুর সাড়া নেই। অন্ধকার। গলি মনে হল আমার চারিধারে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভ্যাপসা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি কে একজন আমায় বলছে,—"উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা স্টেশন হ্যায়।"

শিয়ালদা স্টেশন্! অবাক হয়ে দেখি, আমি আমার সুটকেস সমেত একটা রিকশ'য় বসে আছি। সামনে শিয়ালদা স্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কখন কেমন করে যে আমি রিকশ'য় উঠেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি—অবিনাশ দু'মাস আগে জাভার বন্দরে অমনি করে মারা গেছল।

অবর্তমান বনফুল

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে করে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনো এ কার্য করেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধু-ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউগাছের ঝোপ, এক ধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চলে এসেছি, তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধরে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি-আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার—ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে, আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিযাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথমে যখন পৌঁছলাম, তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখি! ধু-ধু করছে বালির চড়া, আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখি কোথায়! বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয়, চখার শব্দটা ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে, কোথাও কাছে-পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চকাই বটে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম, দম্পতির একটিকে কোনো শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন! এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব, আর অমনি—কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে হলে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম, কিন্তু উল্টো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে, আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ও-ধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছুদূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইলখানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব, আর অমনি—কাঁআঁ।

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে, সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম, একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়লো না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল, অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যার কাছে-পিঠে কোনো আড়াল-আবডাল নেই—চতুর্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভালো জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে-ঝোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধ ঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না বালির স্তর দিয়ে কোনোরকম স্পন্দনই গিয়ে পৌঁছল তার কাছে, তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরো চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখিটা ও-পারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিই নি—ও-ও আমাকে দেয় নি। এখন দুজনে দু'পারে। চুপ করে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল, সূর্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী

রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনো পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হল, কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনো চোখে পড়ে নি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হল, আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনো সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টিমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্তপ্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষার-পর্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম, তা হলে আর কি হল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে।

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না, যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জন-রোদনের অবাঙমুখ বেদন মূর্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতি বাঘ গণ্ডার কিছুই মারি নি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণত রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনোরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

আরো খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার করে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম, ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বরাবর হয়েছে, এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাই নি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসে ছিলাম।

চতুর্দিকে ধু-ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায়

ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোনো কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাই নি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে?

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেন নি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন, আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।

পরিচয় দিলাম।

ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি, একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়ে নি আমার। ছোট্ট কুটিরটি যেন ছবির মতন, সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, চতুর্দিকে রজনীগন্ধার গাছ, অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্ধ্বমুখ বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্চি-গোছের কি একটা পাততে লাগলেন।

বসুন।

বসে দেখলাম শতরঞ্চি নয়—গালিচা। খুব দামি নরম গালিচা। তিনিও এক প্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য, আমার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। তবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হল।

সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরেছি, কিন্তু আপনার দেখা পাই নি কেন ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হল, চোখ দুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

একটা গল্প শুনুন তা হলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন?

না।

শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল, দুজনেই জমিদার, একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।

সুর-খোর?

হ্যাঁ, ও-রকম সুর-পাগল লোক ও-অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গান-বাজনা শিখেছিলুম। বাংলা দেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন, যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনো

ব্যর্থমনোরথ হতে হয় নি তাঁর কাছে, গাড়িতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনি যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিজ্ঞেস করি, তা হলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন? তিনি বলে দিলেন সুদখোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি স্টেশনে নেবে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে। ডানকুনি স্টেশনে যখন নাবলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। স্টেশনে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সুদখোর রামপ্রতাপ ও-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি, চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হল যেন শেষও নেই।

কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল—সাদা ধবধব করছে, মনে হল যেন মর্মর পাথর দিয়ে তৈরি। মিনার, মিনারেট গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের দু'পাশে দেখি দু'জন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে, দুজনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে বসে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোনো উত্তরই দিল না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে; প্রকাণ্ড কাছারি-বাড়িতে বসে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুনছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে, সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি, সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হল না কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছা রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম, কিছুদূরে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে, বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা, আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়া ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জোৎস্নায় চকমক করছে। বাগানে ছোট্ট একটি গেট, গেটের দু'ধারে উর্দী-চাপরাস-পরা দু'জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন করে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল, ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দু'জন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলে না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম, হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারী কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে যে সে আলাপ চলেছে, তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, একছড়া মুক্তোর

মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন? কুটিরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই তিনি বেরিয়ে এলেন একছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখি নি কখনো।

তারপর?

আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি, রাজবাড়ি কাছারি-চৌতারা লোকজন—কোথাও কিছু নেই, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি!

একা! কি রকম?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ির পথ সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বকশিশ দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই।

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গান শুনবেন?

যদি আপনার অসুবিধে না হয়—

অসুবিধে আবার কি? সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনবাস করছি—

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট একটা তানপুরা বার করে বললেন, বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনো শুনি নি। যা নিজে আমি কখনো আয়ত্ত করতে পারি নি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলুম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাও জানি না। ঘুম ভাঙল যখন তখন দেখি, আমি সেই ধু-ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে বেড়াচ্ছে, মরে নি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম। শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে! জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর?

তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল, কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিক দেখিলাম, কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাসীকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কোথাকার লোক? চাপরাসী উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোনো লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায় না।—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

দুই বন্ধু

বুদ্ধদেব বসু

না, ঘুম পাচ্ছে—বর্বর ঘুম। হাত শিথিল, কলম চলে না, মন ঝাপসা। তার মন যেন গোধূলি, সেখানে কোনো রেখা নেই, সব থমথমে, মস্ত কালো থমথমে মেঘের মতো ঝুলে আছে—ঘুম। যেমন সন্ধ্যায় মশা, পোকা, বাদুড় ছিটকে ছিটকে উড়ে বেড়ায়, তেমনি তার মনের মধ্যে ধূসরভাবে নড়ে বেড়াচ্ছে কবিদের নাম, কবিতার লাইন, পড়ার স্মৃতি—এতদিন ধরে যা-কিছু পড়েছে, শুনেছে, ভেবেছে, তার চাপা, একটানা, অর্থহীন—ঝিঁঝির মতো আওয়াজ। অসম্ভব তাদের এখন স্পষ্ট করে তোলা। অসম্ভব কোনো-এক লক্ষ্যের দিকে চিন্তার সিঁড়ি গড়ে তোলা ঘুম। ঘুমোতেই হবে। আর পরীক্ষা তো এসে গেলো।

খাতা বন্ধ করে উঠতে যাবে, এমন সময় ঘুমের চেয়েও ভারি চাপে তার শরীর অবশ হয়ে এল। ঘরে আর-একজন আছে, আর-একজন এসেছে। দরজার ধার থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে, খুব আস্তে, যেন অতি কষ্টে, আর একেবারে, একেবারে নিঃশব্দে। সুকুমারের ঘুম ছুটে গেল মুহূর্তে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ফিরে এল; যদিও একটু আঙুল নাড়ার ক্ষমতাও সে খুঁজে পেলো না নিজের মধ্যে, বিদ্যুৎবেগে সে অনেক কিছুই দেখে ফেললো। লোকটি চোর নয়, গুণ্ডা নয়—দেখেই বোঝা যায়। পায়ে কার্পেটের চটি, ধবধবে কোঁচানো ধুতি পরনে, গিলে-করা মিহি পাঞ্জাবি, আর পাঞ্জাবির ওপরে এক অতি ম্লান যুবকের মুখ বসানো। দেখে ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু সেটাই সবচেয়ে ভয়ের। লোকটি এমন সুসজ্জিত ধীর নিঃশব্দ আর পরিপাটি যে সত্যি সে কোনো 'লোক' কিনা সেটাই সন্দেহ করা যায়। যেন পুতুল, যেন যন্ত্র, কোনো জাদুকর চালাচ্ছে।

মেঝের কয়েক গজ পার হতে যতটুকু সময় লাগলো এই অতিথির, সুকুমারের সেটা মনে হল অনন্তকাল। সে চ্যাঁচাতে চাইলো, গলা বন্ধ; উঠতে চাইলো, পায়ে যেন শেকল

বাঁধা। অবশেষে দেখতে পেলো তার টেবিলের পাশের ইজিচেয়ারটিতে 'লোকটি' বসে আছে। এত হালকা হয়ে বসেছে, এত কম জায়গা নিয়ে, যেন তার শরীরের কোনো ওজন নেই। আর কী ফ্যাকাশে তার মুখ।

ক্ষীণ আওয়াজ শুনলো, 'ভয় পেলে নাকি?'

সুকুমার কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হল, কিন্তু জবাব জোটাতে পারলো না। তার জিভ তখনো কাঠ।

'ভয় নেই। নির্জনে থাকি আমরা, একটু কথা বলতে এলাম।'

'আমরা' শুনেই সুকুমার ব্যাপারটা বুঝে ফেললো। স্বপ্ন দেখছে? না সত্যি? ঘুমিয়ে আছে? না জেগে? সত্যি ভয় পাবার কিছু নেই? না, ভয় কিসের। কী করতে পারে আমাকে ঐ...ঐ!

'কথা বলতে এলাম। কিন্তু আসা কি সহজ? অনেক, অনেক, অনেক চেষ্টায়—তুমি কলেজে পড়ো?'

'তা পড়ি বলা যায়।' এতক্ষণে আওয়াজ ফিরে পেলো সুকুমার।

'বলা যায়, মানে? হয় পড়ো, নয় পড়ো না—এর মাঝামাঝি কিছু তো নেই।'

'আমি এবার এম.এ. পরীক্ষা দিচ্ছি।'

'ও, এম.এ. দিচ্ছো। কোন্ সাবজেক্টে?'

'বিষয়টার নাম কম্প্যারেটিভ লিট্‌রেচার।'

'কী বললে? কম্-প্যা-রে-টিভ...সে আবার কী?'

'নতুন হয়েছে।'

'তা ব্যাপারটা কী? কী পড়তে হয়?'

'এই—সাহিত্য আর কি...নানা দেশের সাহিত্য, বলতে পারো বিশ্বসাহিত্য।' সুকুমার থামলো, কিন্তু নিজের নতুন জ্ঞানের একটু নমুনা দেবার লোভ সামলাতে পারলো না শেষ পর্যন্ত—'নানা দেশের সাহিত্য না পড়লে তো কোনো দেশের সাহিত্যই বোঝা যায় না।'

'নানা দেশের সাহিত্য? অনেক অলৌকিক গল্প পড়ো তাহলে?'

'অলৌকিক মানে?'

'মানে—দেহ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মা কোথায় যায়, কী করে, এই সব কথা। মানে—আমি এখন যে-অবস্থায় আছি, সেই অবস্থার বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা। এ সব পড়ো না?'

সুকুমার স্থির চোখে তাকালো এই অদ্ভুত আগন্তুকের দিকে। না, আমরা যাকে শরীর বলি তার কোনো চিহ্ন নেই, ফাঁপা একটা আকৃতি শুধু, যেন কাগজে তৈরি, নাক-চোখ-মুখ সবই আছে, কাপড়চোপড়ও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ও-সবের পেছনে কোনো বাস্তব নেই যেন, এক ঝাপটা হাওয়া এলেই ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে। বেচারার জন্য কষ্ট হল সুকুমারের—কষ্ট হল এ-কথা ভেবে যে একে এক পেয়ালা চা খাইয়েও সুখী করা যাবে না—খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম, জ্ঞান—কিছুরই আর প্রয়োজন নেই এর।

'জবাব দিচ্ছো না যে?'

'ও—হ্যাঁ। তা পড়েছি বইকি কিছু-কিছু।'

'হ্যামলেট?'

'ও আর কে না পড়েছে।' একটু ঠাট্টার হাসি ফুটলো সুকুমারের ঠোঁটে। 'আমি দশ বছর বয়সে প্রথম পড়েছিলাম।'

'দান্তে?'

'পড়েছি।'

'কী মনে হয়েছে তোমার?'

'কোন্ বিষয়ে?'

'দান্তের পাপীদের বিষয়ে। কখনো কি মনে হয়েছে যে সব ধাপ্পা বুজরুকি, ওপর-চালাকি?'

'মানে?'

'যারা দেহ থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের আবার শারীরিক শাস্তি দেবে কেমন করে? তাদের কি মাথা আছে যে মাথা ফাটিয়ে দেবে? চোখ আছে যে পাতার ফাঁকে পোকা ঢুকিয়ে দেবে? নাক আছে যে যন্ত্রণা দেবে দুর্গন্ধ ছিটিয়ে? নাকি মাংসপেশী আছে যে আগুনের হ্রদে ডুবিয়ে রাখবে? কাকে খাওয়াবে ডালকুত্তা দিয়ে? কাকে ভাজবে গরম তেলে? কার গলা থেকে বের করবে আর্তনাদ? সে তো অনেক আগেই ভস্ম হয়ে গেছে, বা মিশে গেছে মাটির তলায়, মাটির মধ্যে। এ-সব কথা ভেবেছ কখনো?'

'এ তো তুমি গীতা বলছো। নতুন কিছু না।'

'গীতা? ঐ আর-একটি অতিকায় ধাপ্পা, বিরাট বুজরুকি। দেহের খাঁচা থেকে বেরুনোমাত্র, আত্মাটি টুপ করে পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, এত বড় মিথ্যে আর কিছু নেই। যত বই পৃথিবীতে লেখা হয়েছে সব মিথ্যে। কেন জানো?'

'বোধহয় এইজন্য যে শুধু জীবিতেরাই বই লেখে, আর না মরা পর্যন্ত পুরো সত্য জানা যায় না।'

'ব্রাভো! ঠিক বলেছো। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।'

'ধন্যবাদ।—যদিও জানি না আমার পরীক্ষক মশায়েরও তা-ই মত হবে কিনা। একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কে? কোনো আত্মা? প্রেত? বিশ্রী বাংলায় যাকে ভূত বলে, তা-ই? আমাকে বলছো, গীতা ভুল, দান্তে ভুল। সত্য কথাটা তাহলে কী?'

'দ্যাখো ছোকরা, অতিচালাকি কোরো না—পরীক্ষায় ফল ভালো হবে না তাতে। যেটুকু জানো তার বাইরে ছায়া মাড়াবে না।'

'আমি প্রতিবাদ করছি। তুমিও আমার পরীক্ষক নও, আর আমিও কিছু অতিচালাকি করিনি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি তোমার কাছে। নচিকেতা যেমন যমের কাছে—তেমনি।'

'সেটি হচ্ছে না।' একটা হাসির মতো আওয়াজ শুনলো সুকুমার। 'আমরা মরে গিয়ে যা জেনেছি তুমি ভাবছ বেঁচে থেকেই তা জেনে নেবে? না হে না, সে-আশা নেই।'

'তা বেশ। আমার জ্ঞানের স্পৃহা এত প্রবল নয় যে, তার জন্য ছটফটিয়ে এই দেহ থেকে বেরিয়ে যাব। নশ্বর দেহের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে নেহাত মন্দ লাগছে না আপাতত।'

'স্বার্থপর! নিষ্ঠুর! জীবিতেরা সকলেই তা-ই। যারা মরে গেছে, কে আর ভাবে তাদের কথা?'

'যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন। দান্তে ভেবেছিলেন। কবিরা অনেকেই ভেবেছিলেন।'

'তোমার বই-পড়া জঞ্জাল ভুলে যাও। আমার কথা শোনো। জানো, আমি ডাক্তারি পড়তুম?'

'আচ্ছা! আমিও একবার ভর্তি হয়েছিলাম মেডিকেল কলেজে।'

'মড়া কাটার ভয়ে পালিয়েছিলে তো?'

'কিছু আগেই পালিয়েছিলুম। শুরু করার আগেই।'

'কত ছেলেকে ভয় পেতে দেখেছি। কেউ অপারেশন-থিয়েটারেই বমি করে ফেলেছে। কেউ বাড়ি ফিরে ঘেন্নায় ভাত খেতে পারেনি। রাত্রে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ-কেউ। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই ভালো লাগত।'

'ভালো-মন্দ তো বাইরে কিছু নেই; সবই আমাদের মনে।'

'দ্যাখো ছোকরা, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। কত বয়স তোমার, শুনি? কুড়ি? একুশ? আমারও তা-ই ছিলো—কিছু বেশি—সেই সময়ে। কিন্তু সে কতদিন আগে, জানো? তোমাদের হিসেবে পঞ্চাশ বছর। তাহলে আমার বয়স কত হল ভেবে দ্যাখো।'

সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'পঁচাত্তর?'

'তাও বলতে পারো, অনন্তকাল বললেও ভুল হয় না। এই অনন্তকালের মধ্যে কখনো কি তার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

'কার কথা বলছো?'

'আঃ—বাধা দিয়ো না বার-বার। আমাকে বলতে দাও।'

সুকুমার বুঝলো ইনি আত্মজীবনীর একটি অংশ তাকে শোনাতে চান। সকলেই তা-ই চায়, সকলেই ভাবে তার জীবনের সুখ-দুঃখ শুনতে অন্যদেরও গরজ খুব। ম'রে গিয়েও এ রোগ মরে না।

'বলছিলাম আমার ভালো লাগত ডাক্তারি পড়া। ভালো লাগত মড়া কাটতে—ঐ ফোলা, শক্ত, ঠাণ্ডা মৃতদেহগুলোর পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জা যখন চোখের সামনে দেখতে পেতাম, নিজেকে আমার মস্ত একজন কেউ-কেটা মনে হত। ভালোবাসতাম মুমূর্ষুর পাশে পাহারা দিতে, তাদের নাভিশ্বাসের যন্ত্রণা লক্ষ্য করতে—আর কয়েক ঘণ্টা, কয়েক মিনিটের মধ্যে এরা আর মানুষ থাকবে না, একটা জিনিসে পরিণত হবে, নেহাত জড়পদার্থ, যার পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে জ্ঞানী হওয়া যায়।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করলো, 'গর্ব হত আমার, উঁচুদরের জীব বলে মনে হত নিজেকে—কেন জানো? আর-কোনো কারণে নয়, শুধু বেঁচে আছি বলেই। এরা মরে যাচ্ছে, মরে গেছে—আর আমি বেঁচে আছি। একটি সপ্রাণ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শরীর আছে আমার। নিতে পারি খাদ্যের স্বাদ, সূর্যের স্বাদ, শরতের শিউলির গন্ধ, ভোরবেলার ভৈরবীর সুর। পারি সাঁতার কাটতে, আড্ডা দিতে, ঘুমের অলস বিছানায় জেগে উঠতে।...আর এখন, এই তুমি চোখের সামনে যা দেখছ, তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে হাত চালিয়ে দিতে পারো। এই ধুতি-পাঞ্জাবি, কার্পেটের চটি, সিঁথি-কাটা চুল, নাকের তলায় পাতলা সরু গোঁফ—এ সব কিছু না, কিছুই না—হাওয়া, মায়া। অনেক—অনেক—অনেক কষ্টে এটুকু মাত্র জোটাতে পারি এখন। সেই তখন আমি যা ছিলাম তার একটা স্মৃতি মাত্র, ছায়া মাত্র,

ভান মাত্র। যদি আমাকে ধরতে যাও মুঠোর মধ্যে, হাওয়া ছাড়া আর-কিছু পাবে না। দ্যাখো—দ্যাখো একবার হাত দিয়ে।'

'মাপ করো, তোমাকে স্পর্শ করতে লুব্ধ হচ্ছি না আমি। কিন্তু সবই যদি মায়া, তাহলে তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কেমন করে?'

'ঐ শুনতে পাওয়াটাও মায়া।' এই জ্ঞানগর্ভ ঘোষণার পরেই আগন্তুক আমাকে আলগোছে জিগেস করলো, 'তোমার কোনো বন্ধু আছে কি?'

'বন্ধু? অনেক আছে।'

'অনেক না—একজন, এক বন্ধু, অনন্য বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। সবসময় থাকো যার সঙ্গে—কাজে, খেলায়, দুঃখে, আনন্দে, চিন্তায়। যাকে একবেলা না দেখলে নিজের অস্তিত্ব অর্থহীন মনে হয়।'

'এমন বন্ধুতা হয় নাকি কখনো—মধ্যযুগের কাহিনীতে ছাড়া?'

'হয় না? আমি বলছি, হয়। আমার ছিলো তেমনি এক বন্ধু। তার নাম ছিলো বিনয়েন্দ্র। আমার সহপাঠী, আমার প্রতিযোগী, আমার চিরসঙ্গী। কলেজে যতগুলো পরীক্ষা হয়—আর জানো তো, মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার চাপ অনেক বেশি। কোনোবার সে ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড—আর কোনোবার আমি ফার্স্ট, সে সেকেন্ড। এর কোনো নড়চড় হয়নি কখনো। ক্লাসে আমরা পাশাপাশি বসি, হাসপাতালে কাজ করি একসঙ্গে, একসঙ্গে বেড়াই, ছুটির দিনে একসঙ্গে যাই চন্দননগরের বাগানে, মাছ ধরি, খিচুড়ি রাঁধি, শীতের বিকেলে গাছের তলায় বসে বসে ওথেলো কিংবা ম্যাকবেথ আওড়াই।

'একটা বিষয়ে শুধু তফাত ছিলো ওর সঙ্গে আমার: বিনয়ের হৃদয় ছিলো মেয়েদের মতো কোমল, আর আমি ছিলাম কোনো-কোনো বিষয়ে পাথরে গড়া। কষ্ট, আর্তনাদ, মৃত্যু—এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আমার পক্ষে ছিলো কৌতূহলের বা গবেষণার বিষয়, কিন্তু রোগীর যন্ত্রণা দেখে বিনয়ের চোখে জল আসে, মৃত্যুর দৃশ্যে মুখ করুণ হয়ে যায়। এ-নিয়ে আমি অনেক ঠাট্টা করেছি তাকে।

'আর একটা বিষয়ে তফাত ছিল।

'আমি, শ্রীশিবশঙ্কর চৌধুরী, কলকাতার বনেদী বাড়ির দুলাল, আর বিনয় ছিল গরিবের ছেলে। জোড়াবাগানে তিন-পুরুষের বাড়ি আমাদের, তার দেউড়িতে দারোয়ান, আস্তাবলে জুড়িগাড়ি। আর বিনয় বীরভূম জেলার বিধবা মায়ের ছেলে, থাকে বউবাজারের মেস্-এ। তার পড়া-খরচ চালাতে লাটে উঠেছে দেশের ছিটেফোঁটা জমিজমা, মা-র দু-চারটি গয়না গলে যাচ্ছে। এ-সব কথা তারই কাছে শুনতাম, কিছুই সে লুকোত না আমার কাছে, তাহলে কি আর বন্ধুতা হয়?

'খুব বেশিদিন মানুষের সংসারে আমি ছিলাম না। কিন্তু যদি একশো বছর বেঁচে থাকার মতো ভাগ্য আমার হত, তাহলেও আমি জানি, বিনয়ের মতো নির্মল চরিত্রের মানুষ আর একটিও দেখতাম না। এমন সহজভাবে, চেষ্টাহীনভাবে, অনলসভাবে ভালো ছিলো বিনয়! তার উচ্চাশায় লুব্ধতা নেই, আত্মসম্মানে দম্ভ নেই, তার স্বাবলম্বিতা ভালোবাসাকে অপমান করে না। আমি পারি এক পলকে তার সব অভাব মিটিয়ে দিতে, পারি তাকে আমারই বাড়িতে আমারই মতো আরামে রাখতে, আর—কী বোকা আমি! —প্রথম-প্রথম ও-রকম কথা বলেছি তাকে, কান পাতেনি বলে অভিমান করেছি।

'শেষে একদিন বললো, "আমি যদি তোমাদের বাড়িতে থাকি, তাহলে তুমি তোমার বাড়ির কাছে ছোট হয়ে যাবে। আর তুমি যাতে ছোট হয়ে যাবে তেমন কাজ তুমি বললেও আমি করতে পারি না।" হাসিমুখে বলেছে কথাটা, অথচ গম্ভীরভাবেই। গম্ভীর হলে কালো দেখায় না তাকে, হাসলে হালকা মনে হয় না। প্রায় সব কথাতেই সায় দেয়, আর যখন 'না' বলে তাও যেন পালকের মতো নরম, তবু গলার সুরে বুঝিয়ে দেয় যে 'না' মানে সত্যি 'না'। এমনি মানুষ ছিল বিনয়, আমার বন্ধু সে।

'প্রায় সে আসে আমাদের বাড়িতে। মা যখন আমাদের দু-জনকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ান খুব আনন্দ করেই খায় ও; ষষ্ঠীতে আর পুজোর সময় মা যে কাপড় দেন নেয় মাথা পেতে তা; কিন্তু এটুকুর বেশি যদি আর-কিছু করতে চেয়েছি তার জন্য, তাহলে নিজের ভুলের জন্য নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়েছে। আর সত্যিও—তার জন্য কিছু 'করা'র প্রশ্ন যেন অবান্তর, নিজের মধ্যে এমন সম্পূর্ণ, এমন আত্মস্থ ও অনাবিল ছেলে বিনয়। দরকার-মতো আমার বই নিয়ে পড়তে তার কুণ্ঠা নেই, কিন্তু আমার কোনো শৌখিন জামা একদিনও পরাতে পারিনি তাকে। কম খরচে পরিচ্ছন্ন থাকার উপায় সে জানে, ভালো পুরোনো বই সস্তায় যোগাড় করতে সে ওস্তাদ। তার কখনো অসুখ করলেও আমার একটা সুযোগ হত, কিন্তু তার ছিপছিপে মজবুত শরীরে সর্দিরও প্রবেশের অধিকার ছিলো না। বরং আমারই নিউমোনিয়ার সময় রাত জেগে শুশ্রূষা করেছিলো সে।

'অতএব আমার দিক থেকেই চেষ্টা করলাম তার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে। মেডিকেল কলেজে বাবুগিরিটাই রেওয়াজ ছিল তখন, ছেলেরা সবাই সেন্ট মাখে, ডবল আস্তিনের বিলেতি কামিজ গায়ে দেয়, শীতকালে পশমী কোট, রেশমী মাফলার, ব্লেজার পরে টেনিস খেলতে যায়। ক্রমে বিলাসিতা কমিয়ে আনলাম। বাড়ির গাড়ি পারতপক্ষে চড়ি না, বিনয়ের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বেড়াই, দূরে যেতে হলে ভাড়া-গাড়ি নিই। রাত্রে মাঝে মাঝে বিনয়ের মেস্-এ খেয়ে বাড়ি ফিরি, কখনো বা রাত্তির দুটো অবধি তার তক্তায় বসে ফিজিওলজির মর্মোদ্ধার করি। এমন আস্তে আস্তে, স্বাভাবিকভাবে অভ্যেসগুলো বদলেছিলাম যে বাড়ির কেউ তা লক্ষ্য করতে পারেনি। বিনয় হয়তো বুঝেছিলো, কিন্তু আমাকে বুঝতে দেয়নি যে সে বুঝেছে। সবই সহজভাবে নিয়েছে সে. আর আমিও তাই সহজ হতে পেরেছি। এমনি করে ছ'বছর কাটলো, কাছে এল ফাইনাল পরীক্ষা।

'কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ও'ব্রায়েন। নিম্নতম জমাদার থেকে উচ্চতম প্রোফেসর পর্যন্ত সবাই তাঁর নাম দিয়েছিলো পাগলা সাহেব।

'এই ও'ব্রায়েন আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার তিন মাস আসে এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিলেন। জানালেন, এই পরীক্ষায় যে ছাত্র ফার্স্ট হবে তাকে তিনি নিজে স্কলারশিপ দিয়ে চার বছরের জন্য এডিনবরায় পাঠাবেন, আর সেখানে পড়াশুনো ভালো করলে আরো এক বছর জার্মানিতে। শোনা গেল, পরের বছর তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন—আর ফিরবেন না, যাবার আগে ভারতের জন্য এটুকু তিনি করতে চান।

'খবরটা বেরোনোমাত্র সারা কলেজে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেলো; কে পাবে এই স্কলারশিপ? বিনয়েন্দ্র না শিবশঙ্কর? তৃতীয় নাম ভুলেও উচ্চারিত হয় না, কিন্তু দু-জনের মধ্যে একজনের বিষয়ে কখনোই নিশ্চিন্ত হতে পারে না কেউ। দেখা গেলো, ঘোড়দৌড়ের মতো উত্তেজনা, ভারি মজা। কেউ এসে আমাকে বলে—আমাকে ডুবিয়ো না শঙ্কর, পঞ্চাশ

টাকা দিয়ে বাজি রেখেছি ভূতনাথের সঙ্গে। আর অন্য কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—বিনয়, ঠিক আছ তো? দেবেনের রূপোর ছড়িটা জিতিয়ে দেবে তো আমাকে?

'কিন্তু যে দু'জনকে নিয়ে এত কথা তাদের ওপর এর ফল কিছুই বোঝা গেল না। যেমন আগে ছিলো এখনো তেমনি রইলো আমাদের বন্ধুতা। বন্ধু, অবিচ্ছেদ্য, নিরন্তর।—কিন্তু মনে মনে এ নিয়ে যে আমি ভাবিনি তাও নয়।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার আরম্ভ করলো : 'শোনো এবার মন দিয়ে, বিনয়ের আর আমার কথাবার্তাগুলো। বন্ধুর কথাগুলো অবশ্য আমিই শোনাব তোমাকে।

'একদিন আমি তাকে বললাম—ও'ব্রায়েন এই এক মজার ফন্দি করেছে, তোমার আমার ছাড়াছাড়ি ঘটাবার।

—বিনয় বললো, সে আর ক-দিনের জন্য!

—পাঁচ বছর, কম কী? ততদিনে কত-কিছু বদলে যেতে পারে।

—তুমি কি বিলেতে যেতে চাও না?

—চাই না তা নয়, কিন্তু এখনই চাই না।

—বিলেতে তো যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারলে মন্দ কী।

—যেতেই হবে কেন?

—বিলেতে না গিয়ে কেউ তো বড় হয়নি, আমাদের দেশে।

—কেন, বিদ্যাসাগর? বঙ্কিমচন্দ্র?

—তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা সরস্বতীর বরপুত্র, আর আমরা হিপক্রেটিস-এর বংশধর। ভালো ডাক্তার হতে হলে বিলেতে যাওয়াই চাই।

—তা তুমি যা-ই বলো এই মেডিকেল কলেজের ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আর একটা কথা মনে এনেও মুখে বললাম না, বিনয়কে ছেড়ে অত দূর দেশে যেতে হবে সে কথা ভাবতে ভালো লাগে না আমার।

আগন্তুক বলতে লাগলো, আমি পরীক্ষার জন্য তৈরিও হচ্ছি আর এই কথাটা নিয়ে তোলপাড়ও করছি মনে মনে। শেষে একদিন লজ্জা কাটিয়ে বললাম—বিনয়, আমি যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে বিলেতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

হয়তো একটু অভিমানের সুর ছিলো আমার কথায়। বিনয় যদিও মুখে কিছু বলেনি, আমি বুঝেছিলাম যে এ-বিষয়ে তার মনের ভাব ঠিক আমার মতো নয়। বিলেতে সে যেতে চায়। বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া, বিধবা মাকে ছেড়ে যাওয়া—এ সব কষ্ট সেখানে বড় হয়ে ওঠে না তার কাছে। সেটাই ঠিক, সেটাই স্বাভাবিক, আমার এই দুর্বলতাটাই দোষের—সব বুঝেও মনে মনে আমি ঈষৎ ব্যথিত হই।

বিনয় বললো—এ সব ভেবে এখন সময় নষ্ট করা কি ভালো? পরীক্ষা এসে গেছে। মনকে তৈরি করে ফ্যালো বিলেতে যাবার জন্য, আর ঠেসে পড়ো। আর-কিছু ভাবতে হবে না।

—আমি বললাম—বিনয়, আমার একটা প্রস্তাব আছে।

—বলো।

—আমি যদি স্কলারশিপ পাই, তুমিও আমারই সঙ্গে একই জাহাজে বিলেতে যাবে? এডিনবরায়? খরচ আমি যে করে হয় দেব।

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—তা হতে পারে না।

—কেন পারে না? আমি চাইলেই বাবা আমাকে ধার দেবেন।

—তিনি হয়তো দান দিতেও পারেন। কিন্তু—

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। সে-চোখ কালো আর গভীর আর শান্ত। আমার মনের কথাটা গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল এতক্ষণে—এত কম ভালোবাসো আমাকে।

—এত বেশি ভালোবাসি তোমাকে।...থাক, এ নিয়ে আর—

একটু চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম—আমি এ-বছর পরীক্ষা দেব না, বিনয়।

আমার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বিনয় বললো—কী বোকার মতো কথা বলছ তুমি!

জানতাম না, তখন কী সর্বনাশের বীজ আমি বপন করেছিলাম।

পুজোর ছুটিতে বিনয় মা-র কাছে গেলো, আমি বাড়ির হট্টগোল এড়াবার জন্য বই-খাতা নিয়ে চন্দননগরের বাগানে আশ্রয় নিলাম। স্থির করলাম, একেবারে কালীপুজো কাটিয়ে ফিরব, কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর আগেই বাড়ির ব্যাপারে একদিন আসতে হল। বিকেলবেলা কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি, বিনয় সেখানে বসে আছে।

তাকে দেখে আমার বুকের ওপর হাতুড়ি পড়লো। কথা ছিলো, লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন সে দেশ থেকে ফিরবে। চন্দননগর স্টেশনে নেমে সোজা আসবে আমার কাছে, কালীপুজো পর্যন্ত সেখানেই থাকব আমরা, তারপর একসঙ্গে ফিরব কলকাতায়।

বিনয় খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিলো, আমাকে দেখতে পায়নি। আমি নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে খুব আস্তে পিঠের ওপর হাত রাখলাম। হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু আমার মনে হল, মুখ তুলে আমাকে দেখে মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো সে। জিগেস করলাম—কী ব্যাপার, কখন এলে? চন্দননগরে যাওনি যে?

বিনয় বললো—সঙ্গে আমার এক খুড়ো এলেন, তিনি আগে কখনো কলকাতায় আসেননি। প্রথমে তাঁকে নিয়ে মেস-এ তুলতে হল। কাল কালীঘাট দেখিয়ে পরশু সকালে হাওড়ায় তাঁকে ট্রেনে তুলে দেব, আর আমিও সেই ট্রেনে—

—আসছ তো বাগানে?

—হ্যাঁ, আসব।

দু-জনে ফিরে এলাম লাইব্রেরিতে। বিনয়ের পাশের জায়গা খালি ছিলো না, আমি একই টেবিলে একটু দূরে বসলাম। আমার সামনে অ্যানেস্থেটিক্স-এর বই, কিন্তু আমার চোখ বারে-বারে বিনয়ের মুখের ওপর পড়ছে, আর বারে-বারে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ এক বিষাদ নেমেছে আমার মনের ওপর; কেন এই বিষাদ, তাও জানি না। দেখছিলাম, বিনয় তার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে খাতায়।

আমার কিছু পড়া হল না; শুধু সামনে বই খুলে বসে থাকলাম, বিনয়ের পড়া শেষ হবার অপেক্ষায়। প্রায় দু-ঘণ্টা পরে বই বন্ধ করলো বিনয়। যেন হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারা করল। একসঙ্গে বেরোলাম দু-জনে, কিন্তু—আশ্চর্যের বিষয়—দু-জনেই চুপ।

বাইরে তখন কার্তিকের সন্ধ্যা, আকাশে রং নেই, বাতাস শিরশিরে ঠাণ্ডা। কলেজের গেট পর্যন্ত এসে আমি দাঁড়ালাম। জিগেস করলাম—কোথায় যাবে এখন?

—মেস-এ ফিরব।

—আমাকে একবার যেতে হবে দিদির বাড়ি। আটটা নাগাদ ফিরব। এসো তখন।

—আজ তো পারব না।

—তবে কাল সকালে?

—কাল খুড়োকে নিয়ে ব্যস্ত থাকব। পরশু সকালে আটটা-কুড়িতে সিউড়ির গাড়ি। তুমি কি—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ঐ একই ট্রেনে যাব। কিন্তু কাল কি সারাদিনই তুমি খুড়োকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? না-হয় আমিও বেরোব তোমার সঙ্গে—কী বলো?

বিনয় চোখ নামিয়ে নিলো। আর তার সেই ভঙ্গিটা ছুরির মতো বিঁধলো আমাকে। মনের কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারলাম না; তার হাত চেপে ধরে বলে উঠলাম—বিনয়, তোমার কি হয়েছে?

—কিছু তো হয়নি। বিনয় হাসলো, কিন্তু সে-হাসিও ম্লান।

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কোনো অসুখ?

—অসুখ কেন করবে?

—দেশের বাড়িতে কোনো বিপদ?

—কিছু না।

—তাহলে তুমি মনে মনে ভাবছো? বিনয় চুপ।

—বলো! আমাকে বলো! বলতেই হবে আমাকে।

বিনয় আস্তে আস্তে আমার হাত ছাড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বললো—তোমার কথাই ভাবছি, কত ভাগ্যে তোমার মতো বন্ধু পাওয়া যায়।

এ-কথা শুনে আমি গলে জল হয়ে গেলাম।

এবারে সে বললো—চলো আমাকে এগিয়ে দেবে একটু।

হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট আলোচনা হল তার সঙ্গে। এবার দেশে গিয়ে তার মনে হয়েছে—আগেও হয়নি তা নয়—যে ডাক্তারি পেশা সবচেয়ে যেখানে সার্থক হতে পারে সে হল বাংলা দেশের গ্রাম। কলকাতা শহরে—যেখানে বড় ডাক্তার অনেকেই আছেন—সেখানে আর-একজন বড় ডাক্তার হয়ে বসাটা তার পক্ষে কি এতই জরুরি, যখন তারই গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে ম্যালেরিয়ায়, ডিসেন্ট্রিতে, কুসংস্কারে, অশিক্ষায়? তার তো মনে হচ্ছে ওখানেই তার স্থান—যদি পারে মানুষগুলোকে বাঁচাতে—শুধু স্বাস্থ্য দিয়ে নয়, জ্ঞান দিয়েও।

বিনয়ের কথা শুনে আমার হাসি পেলো।

—বিলেত থেকে ফিরে পাড়াগাঁয়ে মন টিকবে কি তোমার?

ততক্ষণে তার মেস্-এর দরজায় এসে পড়েছি আমরা। আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব না দিয়ে বললো—তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে হাওড়ায়?

—সে তো হচ্ছে, কিন্তু কালও এসো একবার। যে-কোনো সময়ে।

আমি হালকা মনে দিদির বাড়ি গেলাম, কিন্তু পরের দিন সত্যি যখন সারাদিনেও

বিনয় একবার এল না, রাত্রে আবার মেঘ করে এল আমার মনে। ওর কিছু হয়েছে, যা লুকিয়ে রাখছে আমার কাছ থেকে? কেমন যেন আনমনা আনমনা? তা নয় তো কী। আগের দিনের সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠল আমার মনে; লাইব্রেরিতে আমাকে দেখে চমকে ওঠা, পড়তে পড়তে একবারও না তাকানো, আমার কথার উত্তরে চোখ নামিয়ে নেয়া। না, না, এটা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, নিশ্চয়ই কোনো গোপন দুশ্চিন্তায় সে কষ্ট পাচ্ছে। কী? ওর অসুখ? ওর মা-র? জমিদারের খাজনা বাকি পড়েছে? বসতবাড়ি নিয়ে টানাটানি? নাকি কোনো বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে গোপনে? যদি কিছু হয়ে থাকে আমাকে বলছে না কেন? আমাকে বলতে পারে না এমন কিছু আছে নাকি ওর? নাকি সবই আমার কল্পনা?

এই সব ভাবতে ভাবতে অনেক রাত্রে ঘুম এলো। আ—সেই ঘুমিয়ে পড়ার সুখ! ভাবনাগুলো যেন পরস্পর গলে যায়, শান্তি নামে কালো হয়ে।—কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়লে না তো? শুনছো?

সুকুমার সাড়া দিল, শুনছি। তারপর?

আগন্তুক আবার বলতে লাগল, পরের দিন হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, থার্ড ক্লাস কামরা, ছুটির পরে বেজায় ভিড় হয়েছে। বিনয়ের আধ-বুড়ো খুড়োকে কোনোরকমে বসিয়ে আমরা দু-জনে দরজার ধারে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাওয়া যাবে।

ভিড়, গোলমাল, ট্রেনের শব্দে কথা বলার সুবিধে নেই, কিন্তু চলতি ট্রেনে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে আমার। ওকে দেখতেই ভালো লাগছে। আজ সকালে ওর মুখে কোনো মালিন্য নেই, চোখ উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে হাসি। একের পর এক সরে যাওয়া টেলিগ্রাফের তারগুলো দেখতে দেখতে আমার কালকের সব দুর্ভাবনা যেন বাষ্পের মতো মিলিয়ে গেলো।

লিলুয়ার পরে ট্রেন যখন বেশ স্পিড দিয়েছে, বিনয় তখন বললো—দরজাটা খটখট করছে কেন? ভালো বন্ধ নেই?

আমি উদাসভাবে বললাম—ঠিকই আছে।

—নাঃ, ঠিক মনে হচ্ছে না। একটু সরো তো। বাইরে হাত বাড়িয়ে হুড়কোটা আঁট করতে গেলো বিনয়, আর হঠাৎ আমি কানের মধ্যে শোঁ-শোঁ হাওয়ার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার জোরালো হাত জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

—আঃ! ও-রকম করে দাঁড়াতে হয় কখনো? তুমি কী!

আমি তাকিয়ে দেখলাম বিনয়ের মুখে আর রং নেই, ঠোঁট কাঁপছে, আর গাড়ির খোলা দরজাটা ঠকাশ-ঠকাশ করছে হাওয়ায়।

—ও-রকম দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে হয় কখনো! ধমক দিয়ে উঠলো বিনয়—সরো! সরে দাঁড়াও!

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভালো করে এঁটে দিলো দরজাটা। বাকি পথ দরজাটা আগলে রইলো যেন—যাতে আমি কাছে ঘেঁষতে না পারি। তার অতি-সাবধানতায় আমার হাসি পেলো।

চন্দননগরে চমৎকার কাটলো দিনগুলি, একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলো আগন্তুক। 'একসঙ্গে পড়া, খাওয়া, বেড়ানো, একই সময়ে ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠা। বাগানে স্থলপদ্ম, নদীতে ভরা জল, বাঁধানো বটতলায় ছায়া, বিকেলে মাঝে মাঝে ব্যাডমিন্টন। যেমন ছ-বছর ধরে হয়েছে, তেমনি করেই পরস্পরের সাহায্যে হু-হু করে এগিয়ে গেলো আমাদের পরীক্ষার পড়া।

তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন কেমন হয়ে যায় বিনয়। পড়া বন্ধ করে উঠে গিয়ে পাইচারি করে বাগানে, বটতলায় চুপচাপ বসে থাকে, নয়ত দূরে ঘোষালের ঘাটে চলে যায়—আমি তাকে খুঁজে বের করি।

—কী হয়েছে তোমার? বলো না, কী হয়েছে?

বিনয়ের সেই এক উত্তর—কিছু তো হয়নি। যত চেষ্টা করি, কিছুতেই সেই পর্দা সরে না। পর্দা নয়, দেয়াল। আর সেই দেয়ালে মাথা ফাটাতে ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু পরের দিন সে যখন আবার হাসে, সব ভুলে যাই।

সারাদিন ধরে পড়ে বিকেলের দিকে মাথা যেন ঝিমঝিম করে, মাঝে মাঝে নদীতে বেড়াতে যাই। বাবা একটা বিলিতি শ্যালপ আনিয়েছিলেন, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বাইতে আরাম। একদিন সূর্যাস্তের সময় চলেছি দু-জনে; নদীর জলে সোনা, মস্ত উঁচু আকাশ, জগৎ জুড়ে শান্তি। খেয়াল ছিলো না, কত দূরে চলে এসেছি। বিনয় মনে করিয়ে দিলো—এবার ফেরো, শঙ্কর। অনেকখানি এসে পড়েছি আমরা আজকে।

আমি বললাম—এবার তুমি বাইবে।

বিনয় দাঁড় হাতে নিলো, আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারা-ফোটা আকাশের তলায় ঠাণ্ডা বাতাসে, জলের ছলছল শব্দে, আমার মনে ঘুমের মতো আবেশ নামলো। হঠাৎ কী-রকম একটা শব্দে চমকে উঠে বসলাম। অন্ধকার, দূরে মিটমিট করছে আলো, কালো আকাশে ভরে ঝকঝকে তারা। আর শোঁ-শোঁ একটা শব্দ। আর সেই শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বিনয়ের বড়-বড় ভারি নিঃশ্বাস।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—বিনয়!

—কিছু ভয় নেই। দাঁড় ধরো ওদিকে।

—আমাকে আগে ডাকলে না কেন? এসে গেলো যে! বলতে বলতে হালকা শ্যালপ দুলে উঠল, গর্জনে ভরে গেলো আমার কান। চারদিকে জল—অন্ধকার—নিঃশ্বাস নেই—তারপর দুখানা সবল হাত বেষ্টন করলো আমাকে, পাটাতনে শুয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

ফিরে এলাম যখন, তখন রাত প্রায় ন-টা; রামরতন লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে কিছু লক্ষ্য করার আগেই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে নিলাম দুজনে। গরম-গরম লুচি আর মাংস খাবার পরে দেহের তেজ ফিরে এল। হেসে বললাম—খুব একটা অ্যাডভেঞ্চার হল আজ।

—হুঁ।

—আমারই ভুল। আমারই জানা উচিত ছিলো আজ অমাবস্যা, বান আসবে।

—এখন ভালো বোধ করছ তো?

—আমার কিছুই হয়নি। জানো তো, এই বানের ওপর দিয়ে কতবার সাঁতরে গেছি

আমি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলেই—আর একেবারে হঠাৎ—। তোমারই কত কষ্ট হল। কতক্ষণ একলা উজান বাইলে।

বিনয় খুব নিচু গলায় বললো—আজ আর কথা না। ঘুমিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি।

এর পর যে-ক'দিন বাগানে ছিলাম, বিনয় আনন্দে উৎসাহে সাহচর্যে একেবারে ভরে রাখলো আমাকে। কালীপুজোর দিন কলকাতায় ফিরে এলাম দুজনে।

আর এক মাস—আর কুড়ি দিন—পনেরো দিন—এমনি করে করে সেই সোমবার, যার পরের সোমবার পরীক্ষা আরম্ভ।

শেষ সপ্তাহটি একসঙ্গে রাত জেগেছি আমরা—ঠিক তুমি যেমন এখন রাত জেগে পড়ছো। মা আর-একটা খাট আনিয়ে দিয়েছেন আমার ঘরে, দেয়াল ঘেঁষে কঙ্কাল, কাচের আলমারিতে মড়ার খুলি, হাড়ের টুকরো, টেবিলে মোটা মোটা বই-খাতা, অঙ্কের আর ল্যাটিন ভাষার হিজিবিজি। বারান্দায় রামরতন শোয়, তোলা উনুনে কাঠকয়লা জ্বলে, আমাদের দরকারমতো গরম চা তৈরি করে এনে দেয়।

শুক্রবার রাত্রে আমি বললাম—বিনয়, আমার মনে হচ্ছে, তুমি আর আমি ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হব। ডবল খরচ হবে ও-ব্রায়েন সাহেবের।

বিনয়ের মুখে ছায়া পড়লো। ভুরু কুঁচকে বললো, তা কি আর হবে। দু-চার নম্বরের হলেও তফাত থাকবেই।

—আর সে-তফাত তোমার দিকেই থাকবে। আমি হাসলাম। বিনয় বইয়ের ওপর চোখ নামিয়ে নিল।

সে-রাত্রে বারোটায় যখন আমাদের জন্য চা এল, বিনয় পকেট থেকে একটি পুরিয়া বের করে তাতে একরকম সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে নিলো। বললো—ঘুম তাড়াবার ওষুধ।

—তোমারও তাহলে ঘুম পায়?

—আজ পাচ্ছে।

—ঘুমের আর দোষ কী! ও-রকম রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে—সত্যি! থাক আজ, বরং ঘুমোই এসো।

—কিন্তু এখন তো আর চার ঘণ্টার মধ্যে ঘুম পাবে না আমার।

—তাহলে আমাকেও একটু দাও ওষুধটা।

—নেবে? বিনয় পকেটে হাত দিলো। হঠাৎ কেমন সাদা দেখালো তাকে। পকেট থেকে যখন হাত বের করলো, আমার মনে হল তার আঙুল কাঁপছে।

তার সাদা গুঁড়ো আমার চায়ে মিলিয়ে গেলো, আস্তে আস্তে দুজনে চা শেষ করলাম। টেবিলের দু-দিকে বসে আছি দুজনে, মাঝখানে প্যাথলজির বই খোলা। সে পড়ে যাচ্ছে, বুঝিয়ে বলছে, আমি শুনছি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে আমাকে, আমি ঠিক-ঠিক জবাব দিয়ে যাচ্ছি। আবার খানিক পরে আমি জেরা করছি তাকে। এমনি চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় বইয়ের পাতা ঝাপসা হয়ে এল আমার চোখে, আর সেই মুহূর্তে মনে হল বিনয়ের আর বইতে মন নেই, সে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আস্তে আস্তে তার মুখটা বিকট হয়ে উঠল—চোখ গর্ত, গালে মাংস নেই, মাথার চাঁদি উঠে গেছে—ঠোঁট, নাক, দাঁতের বদলে সারা মুখ জুড়ে এক নিঃশব্দ বিদ্রূপ। প্রায় একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ছিলো আমার স্নায়ুতে, কিন্তু তখনি পা-টা মেঝেতে ঠুকে গেলো, চমকে জেগে উঠলাম।

—তোমার ওষুধে তেমন কাজ হল না, বিনয়। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখেও উঠলাম।
—কী স্বপ্ন দেখলে?
—ঐ কাঠের আলমারির কঙ্কালটা আমাকে তাড়া করেছে। আমি হাসলাম। ছ-বছর ডাক্তারি পড়ার পর এখন যদি ভূতের ভয় ধরে—
—তোমাকে অল্প দিয়েছিলাম। আচ্ছা, কাল হেভি ডোজ আনব।
—তা-ই এনো। কিন্তু রোববারে আর রাত জাগব না কিন্তু।
—না, রোববারে আর না! অদ্ভুত মোটা শোনালো বিনয়ের গলা।
শনিবার। স্তব্ধ রাত, সারা বাড়ি ঘুমন্ত, সে আর আমি ছাড়া কেউ কোথাও জেগে নেই। দুজনের এক জ্ঞান, এক ধ্যান, এক লক্ষ্য। শুধু বন্ধু নয়, সত্যি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছি দুজনে। কী আনন্দ, এমনি একজনকে আমার জীবনে আমি পেয়েছি! কী আনন্দ, এমনি কোনো কঠিন কাজের মধ্যে দিয়ে কারো সঙ্গে মিলতে পারা! পড়া, পরীক্ষা, সব ছাপিয়ে এই ভাবনাই বড় হয়ে উঠল আমার মনে—আমার মন যেন হিমালয়ের চূড়াকে স্পর্শ করলো, ছড়িয়ে পড়লো তারায়-তারায়। হঠাৎ আমি তার কব্জিতে হাত রাখলাম। যেন ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠল যে।
—কী হল?
—আমারও বোধহয় ঘুম পাচ্ছে।
—আমি বলতে চাচ্ছিলাম—আজ আর পড়া থাক।
—এই তো হয়ে যাবে। আর-একটু।
—আমার ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে এসো রবিবাবুর কবিতা পড়ি। ছাতে গিয়ে বসবে?
—না। বরং চা হোক।
জল চাপানোই ছিল, বিনয় দুটি ভরা পেয়ালা নিয়ে এল টেবিলে। পকেট থেকে দুটি পুরিয়া বের করে আলোর কাছে দেখলো একবার, নিজেরটিতে সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে বললো—আজ আরো কড়া করেছি। তোমাকে দেব?
—দাও।
অন্য পুরিয়াটি আমার পেয়ালায় ঢেলে দিয়ে, সেই পেয়ালাটার দিকেই তাকিয়ে রইলো বিনয়। আমি হাত বাড়ালাম কিন্তু পেয়ালাটা ছুঁতে পারলাম না, এক কঠিন আঘাত অবশ করে দিলো আমাকে। টকটকে লাল বিনয়ের মুখ, পেশীগুলো বিকৃত, আগুনের মতো নিঃশ্বাস। তাকে মুচড়ে দিয়ে একটা বোবা, ভোঁতা, পাশবিক আওয়াজ বেরিয়ে এল, আমার পেয়ালাটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেললো।
সে দাঁড়িয়েই ছিলো, আমার সময়ের কোনো জ্ঞান ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের মতো পড়ে যেতে দেখলাম তাকে, চেয়ার উল্টে গেলো, টেবিল কেঁপে উঠল, কপাল ফেটে রক্ত বেরোলো তার।
তখন আমার চিৎকারে সারা বাড়ির ঘুম ভাঙলো।
এল বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, আমাদের অতি প্রিয় মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সাড়া পড়ে গেলো।...পুলিশও এল। আমাকে নিয়ে গেলো হাজতে।

মর্গের রিপোর্ট : বিষপ্রয়োগে মৃত্যু। আর পুলিশের হাতে তার পকেটে পাওয়া চিঠি : ''যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে, আমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাসি, সে এখন আমার সফলতার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং একমাত্র অন্তরায়ও সে। তাকে সরাতে পারলে আমার পথ পরিষ্কার। তাই এই রকম একটা ষড়যন্ত্র করলাম গোপনে গোপনে। ভাবলাম : তাহলে আর দশ বছরের মধ্যে আমি নীলরতনের দু-নম্বর হতে পারি, কুড়ি বছরের মধ্যে আর-একজন নীলরতন ডাক্তার। হতে পারি নয়, হবই। সে ছাড়া আমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তাকে আমি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি—একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার। ট্রেন থেকে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম, নিজের দুর্বলতার জন্য পারিনি। জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলাম, নিজের দুর্বলতার জন্য পারিনি। তৃতীয়বার চায়ে বিষ মিশিয়ে—সেখানেও নিজের দুর্বলতা বাধা দিলো। মনের মধ্যে এই পাপ নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না, তার জন্য নিজের তৈরি বিষেই নিজের প্রাণ সংহার করছি। তার ভালো হোক।''

কোর্টে দাঁড়িয়ে আমি বললাম যে চিঠির কথা সত্য নয়, আমাকে বাঁচাবার জন্য সে ও-রকম লিখেছিলো। আসলে আমিই তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলাম। আমি কোনো করুণা প্রার্থনা করি না, আমাকে যথোচিত শাস্তি দেয়া হোক। এখন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

বাবা বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার লাগালেন, কোর্টে লোক ধরে না, সারা মেডিকেল কলেজ ভেঙে পড়ে। ছ-মাস পরে আমি বেকসুর খালাস পেলাম : যথেষ্ট প্রমাণ কোনোদিকেই ছিল না, কিন্তু আমার বয়স দেখে জুরিদের দয়া হল।

উৎসব পড়ে গেলো আমি যেদিন বাড়ি ফিরলাম। তার পরের দিনই বুক চাপড়ে কান্না। অবশ্য সে-কান্না আমি কানে শুনিনি, কেননা তার আগের রাত্রে একখানা ধুতির সাহায্যে আমার দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলাম।

আগন্তুকের অদ্ভুত কাহিনীটি শোনার পর সুকুমার জিগেস করলো, 'চিঠিটা বিনয় কখন লিখেছিলো?'

কিন্তু সামনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না। সুকুমার আবার বললো, 'নিশ্চয়ই আগেই এনেছিলো পকেটে?' কিন্তু কী করে আগে থেকেই জানলো কে মরবে, বা দুজনের মধ্যে একজনও মরবে কিনা? বলেই ভাবলো, কাকে বলছি কথাটা? কে এই বিনয়? আর এই শিবশঙ্করই বা কে? আবার ভাবলো, মিছিমিছি দুটো জীবন নষ্ট হল। দুটো ভালো জীবন। কিন্তু তাও তো দরকার। সব যদি ঠিকমতো চলবে তাহলে সাহিত্য হবে কেমন করে? ভাগ্যিস মানুষ ভুল করে।

আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো সুকুমার। চোখ ডুবে গেলো অন্ধকারে, কানে এল বৃষ্টির শব্দ, পাতার শব্দ। আরাম। ঘন, কালো, গভীর হয়ে ঘুম নামলো তার চৈতন্যের ওপর। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভাবলো, এই পরীক্ষা ব্যাপারটা কিন্তু বড় বাজে।

রক্তের ফোঁটা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অনিমেষ। মুহূর্তে রেলিংটা ধরে ফেলে সামলাল নিজেকে।

নিজের দিকে তাকাল। কই কিছুই পড়ে-টড়ে নেই তো! কলার খোসা, আমের চোকলা, নারকেলের ছোবড়া—কিছু নেই তো! জলও তো নেই এক ফোঁটা। শুকনো খটখটে সিঁড়ি। জুতোর তলাটাও দেখল একবার। সেখানেও কিছু লেগে নেই।

মনে মনে হাসল অনিমেষ। খুব তাড়াতাড়ি করছিল বলেই হয়তো পা বেচাল হয়ে পড়েছিল। ছন্দ রাখতে পারেনি ঠিকমতো।

চক্ষের পলকে কী দুর্ঘটনাই না হতে পারত। ভাঙতে পারত হাড়গোড়, মাথা, মেরুদণ্ড। এতক্ষণে তাহলে রেল স্টেশনের পথে না হয়ে হাসপাতালের পথে। ট্যাক্সিতে না হয়ে এ্যাম্বুলেন্সে। সত্যি, এক চুলের ফারাক একটা সূতোর এদিক-ওদিক।

এত তাড়াহুড়োর কোনো মানে হয় না। অনিমেষের এখন বয়স হয়েছে। তার ধীর-স্থির হওয়া উচিত।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ঠিক সময়ে, সমর্থ হাতে রেলিংটা ধরে ফেলতে পারল। ঠিক অত দূরে রেলিং, পড়বার সময় হাতের হিসেব থাকল কী করে? মনে হল কে যেন হাতের কাছে রেলিংটা এগিয়ে এনে দিয়েছে।

কিছু বলেনি, তবু ট্যাক্সিটাও ছুটেছে প্রাণপণ। যেন ড্রাইভারেরও ভীষণ তাড়া। কিন্তু বেগে ছুটলেই আগে পৌঁছুনো যায় না সব সময়।

মনে হচ্ছিল, ট্যাক্সিটাই অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে। হয় কাউকে চাপা দেবে নয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে কোনো গাড়ির উপর, নয়ত কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ। অত শত না হয়, নির্ঘাৎ জ্যাম হবে রাস্তায়। ট্যাক্সিটা পৌঁছুতে পারবে না। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

যেন এত সুখ সহ্য করবার নয়। ভাগ্য ঠিক বাদ সাধবে। বাগড়া দেবে। না, হন্তদন্ত ট্যাক্সি শেষে পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। ট্রেনটা ছাড়েনি। কামরার খোলা দরজার উপর অনীতা দাঁড়িয়ে।

'বাবাঃ আসতে পারলে!' অনিতা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

‘কত বাধা, কত বিপদ—’

‘বাঃ, আর বাধা-বিপদ কোথায়! সব তো খোলসা হয়ে গিয়েছে!’ অনীতা নির্মুক্ত মনে হাসল : ‘এখন তো ফাঁকা মাঠ।’

‘যাকে বলে, লাইন ক্লিয়ার।’ অনিমেষও হাসল স্বচ্ছন্দে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা হুইসল দিয়ে উঠল।

অনিমেষ বুঝি উঠতে যাচ্ছিল, অনীতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, ‘আর উঠে কি হবে?

না, ওটা অন্য প্ল্যাটফর্মের ইঞ্জিন।

‘যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!’ বললে অনিমেষ।

‘তোমার সবতাতেই ভয়।’ একটু-বা ব্যঙ্গ মেশাল অনীতা।

‘না, ভয় আর কোথায়?’ কামরাতে উঠল অনিমেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সামান্য কয়েক মিনিট বাকি আছে। বললে, ‘কিছুক্ষণ বাকি।’

‘কিন্তু কতক্ষণ?’

‘ধরো এক বছর।’ কথাটাকে অন্য অর্থে নিয়ে গেল অনিমেষ।

‘না না, অতদিন কেন? এ কি আমরা ডিভোর্সের পর বিয়ে করতে যাচ্ছি যে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে!’

‘না, তা নয়, তবে’—অনিমেষ আমতা-আমতা করতে লাগল।

‘তবে-টবে নয়।’ অনীতা অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—‘শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গিয়েছে, এখন আর তোমার দ্বিধা কী?

‘তবু লোকে বলে, এক বছর অপেক্ষা করা ভালো।’

‘ছাই বলে, কেউ বলে না। আমি কত বছর অপেক্ষা করে আছি বলো তো!’ কণ্ঠস্বরে অভিমান আনল অনীতা : ‘আরি আমি দেরি করতে প্রস্তুত নই।”

‘কিন্তু চলেছ তো কলকাতার বাইরে।’

‘কী করব! হঠাৎ বদলি করে দিল! তাতে কী হয়েছে, তুমি দিনক্ষণ ঠিক করে চিঠি লিখলেই আমি ঝপ করে চলে আসব।’ লঘুভার হাসল অনীতা : বিয়ে করতে আর হাঙ্গামা কী!’

‘শুনছি আমাকেও নাকি বাইরে ঠেলে দেবে।’

‘দিক না। তাহলে মফঃস্বলে যাব। আর যদি না দেয়, কলকাতায়ই থাকো, চলে আসব এখানে। মোট কথা, চোখে তীক্ষ্ণ আকুতি নিয়ে তাকাল অনীতা : ‘শুভস্য শীঘ্রম্।’

‘লোকে কী বলবে!’

‘লোকের কথা ছেড়ে দাও।’

‘লোকে বলবে বউ মারা যাবার এক মাস পরেই বিয়ে করল।’

‘এক বছর পরে করলেও বলবে।’ একটু-বা তপ্ত হল অনীতা : ‘লোকের হাতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভার নেই। লোকে কী জানে আমার তপস্যার কথা!’

‘তপস্যা?’

‘হ্যাঁ, প্রতীক্ষা আর প্রার্থনাই তপস্যা।’ অনীতা ঘড়ির দিকে তাকাল : ‘তোমার বিয়ের প্রায় দু’বছর পর আমাদের দেখা। তুমি আমাকে বললে, তুমি আমার পরম হয়ে এলে তো

প্রথম হয়ে এলে না কেন? সেই থেকেই প্রার্থনা করছি, প্রতীক্ষা করে আছি, কবে সে চরম দিন আসবে, কবে পথ পরিষ্কার হবে। তিন বছরের পর সেই সুযোগ আজ এল। এই তিন বছর সমানে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছি আমাদের স্বাধীনতা।'

অর্থাৎ গত তিন বছর ধরেই অনীতা সুরভির মৃত্যুকামনা করে এসেছে।

বুকের মধ্যে একটা ঘা মারার শব্দ শুনল অনিমেষ। সে শব্দ কি তারও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি!

না, তা কি করে হয়! সুরভি বেঁচেছিল বলেই তো অনীতার প্রতি তার আকর্ষণ এত জ্বলন্ত ছিল জীবন্ত ছিল। সুরভি আজ বেঁচে নেই, তাই কি অনীতাও আজ স্তিমিত, নিষ্প্রভ?

'এ কী, ট্রেন ছাড়ছে না কেন?' সময় কখন হয়ে গেছে, তবু ছাড়বার নাম নেই। ছাড়বার ঘণ্টা পড়লেই তো অনিমেষ নেমে যেতে পারে। রুমাল নেড়ে দিতে পারে বিদায়।

কি একটা গোলমালে ট্রেনটা থেমে আছে, ছাড়ছে না। দীর্ঘতর হচ্ছে এই নিষ্ফল সান্নিধ্য।

সব ট্রেনই ছাড়ে, ছেড়ে যায়, শেষ পর্যন্ত অনীতাটারও ছাড়ল।

নামতে গিয়ে অনিমেষ আবার পড়ল নাকি পা হড়কে? না, সে অত অপোগণ্ড নয়। তার পায়ের নিচে মোলায়েম প্ল্যাটফর্ম কে ঠিক পৌঁছে দিয়েছে।

মফঃস্বলে বদলি হয়ে এসেছে অনিমেষ।

ভালোই হয়েছে। বদল হয়েছে পরিবেশের। মেঝেতে পায়ে-পায়ে আলতার দাগ ফেলা নেই, নেই আর স্মৃতির রক্তাক্ত কন্টক।

ছোট ছাতওলা বাড়ি, উপরে দুখানা মোটে ঘর। একটা শোবার আরেকটা বসবার। নিচে বাবুর্চি-চাকর। এর চেয়ে আরো ছোট হলে চলে কি করে? তবু অনিমেষের যেন কি রকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এদিক-ওদিক প্রতিবেশীদের বাড়িঘরগুলি কেমন দূর-দূর মনে হয়। মনে হয় বাড়িটাকে ঘিরে যেন অনেক গাছপালা, অনেক হাওয়া, অনেক অন্ধকার। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ অনেক পর-পর শোনা যায়, ফিরিওয়ালারা এদিকে কম আসে। অথচ নদী কত দূরে, মধ্যরাত্রে একটু হাওয়া উঠলেই শোনা যায় গোঙানি।

কাজে-কর্মে লোকজন আসে কিন্তু তাদেরও আসার মানেই হচ্ছে চলে যাওয়া। সমস্ত ভিতর-বার আশ-পাশ একটা শূন্যতার শ্বাস দিয়ে ভরা।

না, আসুক অনীতা। ঘরদোর ভরে তুলুক।

আশ্চর্য সেই রকমই চিঠি লিখেছে অনীতা। এই মফঃস্বল শহরেই সে একটা উচ্চতর চাকরির জন্যে আবেদন করেছে। কদিন পরেই ইনটারভিউ।

হ্যাঁ, কোথায় আর উঠবে, অনিমেষেরই অতিথি হবে অনীতা।

চিঠি লিখে বারণ করল অনিমেষ। তুমি এস, থাকো, চাকরি করো কিন্তু আমার বাড়িতে উঠো না। অন্তত এখন নয়, একেবারে আজকেই নয়। জানোই তো, আমার বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই। তোমার অসুবিধে হবে। তা ছাড়া আমি দুর্বার একা।

আগে অধিষ্ঠিত হও, পরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাল্টা জবাব দিল অনীতা। প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে। লিখলে, আমি একজন সম্ভ্রান্ত,

পদস্থ শিক্ষিকা, একটা চাকরির সম্পর্কেই তোমার কাছে একদিনের সাময়িক আশ্রয় চাইছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর, নিজেকে অত দুর্বার বলে স্পর্ধা করো না। ভাববে আমার প্রতিরোধও দুঃসাধ্য। অন্তত যতক্ষণ আমি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ শিক্ষিকা।

না, তুমি এস। ঝগড়াঝাঁটির কী দরকার! তুমি এলে কত গল্প করা যাবে। কত হাসা যাবে মন খুলে। স্তব্ধতাকেও কত মনে হবে রমণীয়।

আজ সন্ধের ট্রেনে আসবে অনীতা। শুধু রাতটুকু থাকবে। কাল সকালে ইন্টারভিউ দিয়েই দুপুরের ট্রেনে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়।

সকাল থেকেই মেঘ-মেঘ বৃষ্টি-বৃষ্টি। দুপুরে ঘনঘোর করে বর্ষা নেমেছে। সন্ধের দিকে তোড়টা কমলেও হাওয়াটা পড়েনি। চলেছে জোলো হাওয়ার ঝাপটা।

স্টেশনে এসে অনিমেষ শুনল গাড়ি তিন ঘণ্টার উপর লেট।

ভীষণ দমে গেল শুনে। বাইরে দুর্যোগ থাকলেও অন্তরে বুঝি একটা আগুনের ভাণ্ড ছিল। সেটা নিবে গেল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে।

রাস্তায় জনমানব নেই। দোকানপাট বন্ধ। শুধু একলা এক পথহারা হাওয়া এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাইকেল রিকসা করে বাড়ি ফিরল অনিমেষ।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখল, এ কী! তার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা তালাবন্ধ। হাওয়ার দাপটে দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো। তবে কি ঘর বন্ধ করে বেরুবার আগে ভুলে সুইচটা অন করি রেখেছিল? তাই হবে, নইলে আলো জ্বলে কী করে? পথে আসতে দেখছিল, স্টেশনেও তাই, ঝড়ের উৎপাতে সারা শহরের কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে, কারেন্ট হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বারান্দার সুইচটা টিপল, আলো জ্বলল না। হয়তো বারান্দার বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই ঘরে আর আলো নেই।

মুখস্থ জায়গায় হাত রেখে সুইচ পেল অনিমেষ। সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। না, আসে নি কারেন্ট। কিংবা এসে এখন আবার অফ হয়েছে।

হাতের টর্চ টিপল অনিমেষ। মনে হল ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন নড়ছে-চড়ছে, ঘোরাঘুরি করছে! অন্ধকার কোথায়! একটা লোক।

'কে?' ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল অনিমেষ।

দরজা খোলা পেয়ে লোকটা পালিয়ে গেল বুঝি! অনিমেষ প্রবল শক্তিতে দরজা বন্ধ করল। প্রায়ই কারেন্ট বন্ধ হয় বলে ক্যান্ডেল আর দেশলাই হাতের কাছে মজুত রাখে। তাই জ্বালাল এখন। হোক মৃদু, একটা স্থির অবিচ্ছিন্ন আলো দরকার।

কই, লোকটা যায় নি তো! খাটের বাজু ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে!

'এ কে?' একটা বোবা আতঙ্ক অনিমেষের গলা টিপে ধরল। 'এ যে সুরভি!'

পরনে কস্তাপাড় শাড়ি, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, খালি পায়ে টুকটুকে আলতা, ঠোঁট দুখানি চুনে-খয়েরে রঙিন করা—সুরভি ডান হাতের তর্জনী তার ঠোঁটের উপর রাখল। যেন ইঙ্গিত করল, অনিমেষ যেন না চেঁচায়, না কথা বলে।

তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে দেয়ালের দিকে সরে গেল সুরভি। সরে গেল

যেখানে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। একটা তারিখের উপর আঙুল রাখল। দুই চোখে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা পুরে তাকাল অনিমেষের দিকে।

সেই চিহ্নিত তারিখে টর্চের আলো ফেলল অনিমেষ। দেখল, আঙুলের ডগায় করে এক ফোঁটা রক্তের দাগ রেখেছে তারিখে।

কোন্ তারিখ? এ তো আজকের তারিখ। বাংলা আঠাশে আষাঢ়। বেস্পতিবার।

আঠাশে আষাঢ় কী? আঠাশে আষাঢ় অনিমেষ-সুরভির বিয়ের দিন। একদম ভুলে গিয়েছিল। আর আর বছর সুরভিই মনে করিয়ে দিত, এবারও তেমনি মনে করিয়ে দিতে এসেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে সুরভি। কেমন মজা। যেতে না যেতেই মুছে দিয়েছ মন থেকে। মুছে দিয়েছ দেয়াল থেকে। ঘুরে ঘুরে চারদিকের দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগল। আমার একটা ছবিও কোথাও রাখ নি।

'সুরভি:' তাকে ব্যাকুল হাতে ধরতে গেল অনিমেষ।

হা-হা-হা করে একটা বাতাস ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বন্ধ দরজা-জানলা ঝরঝর ঝরঝর করে উঠল। সিঁড়ি শোনা গেল নেমে যাবার পায়ের শব্দ। শুধু যেন সুরভি একা নয়, তার সঙ্গে আছে আরো অনেকে। একসঙ্গে নেমে যাচ্ছে। কেবল নেমে যাচ্ছে। ভারী পায়ে ক্লান্ত পায়ে নেমে যাচ্ছে।

ভয়ে আপাদমস্তক ঘেমে উঠল অনিমেষ।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। মনে হল এ আলো নয়, কে যেন সহসা হেসে উঠেছে খিলখিল করে।

তাড়াতাড়ি অল্প-স্বল্প খেয়ে শুয়ে পড়ল অনিমেষ। টর্চ, ছাতি, ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে চাকরকে পাঠালো স্টেশনে। যত টাকা লাগুক যেন রিক্সা ঠিক রাখে। যত দেরিই হোক, ঠিকমতো আসতে পারে যেন অনীতা।

ঘড়িতে রাত বেশি হয় নি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্ত রাত। গাছগাছালির মধ্যে বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন রুদ্ধশ্বাস কবরের স্তূপ। কেবল বাতাসের হা-হা, ডালপালার কাতরতা।

বিছানায় জেগে বই পড়ছে অনিমেষ। জাগ্রত সমর্থ বন্ধুর মতো আলোটা রয়েছে চোখের উপর।

খট-খট খট-খট। দরজায় কে আঙুলের শব্দ করল।

চমকে উঠল অনিমেষ। নিশ্চয় মানুষ। অন্য কেউ হলে আলো নিবে যেত, হাওয়া উঠে দরজা-জানলা কাঁপাত, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হত, নয়ত কুকুর কোথাও কাঁদত মরাকান্না। মানুষ বলেই বারান্দার আলোটাও নেবে নি।

ভয়ের জন্যে লজ্জা হতে লাগল অনিমেষের। বালিশের নিচে হাত দিয়ে রিভলবারটা একবার অনুভব করল।

ধীরে ধীরে খুলে দিল দরজা।

'এ কী! তুমি—অনীতা?'

'উঃ, কী ভীষণ লেট তোমাদের গাড়ি। আর তারপর কী জঘন্য বৃষ্টি!'

'তোমার জন্যে স্টেশনে চাকর পাঠিয়েছিলাম, সে কোথায়?'

'কই কারু সঙ্গে দেখা হয় নি তো। একাই চলে এলাম।' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনীতা।

'তোমার মালপত্র কোথায়?'

'সব স্টেশনে পড়ে আছে। শোনো, আমি ভীষণ ক্লান্ত। এক গ্লাস জল খাব।'

টেবিলের উপর ঢাকা গ্লাসে জল ছিল, তাই ঢক ঢক করে খেয়ে নিল অনীতা। বললে, 'শোবার জায়গা করেছ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'আমি যাই, শুয়ে পড়ি গে। দাঁড়াতে পারছি না।' ম্লানরেখায় হাসল অনীতা : 'নিদারুণ ঘুম পেয়েছে।'

'বাঃ, সে কী! খাবে না?'

'না, পথে অনেক খাওয়া হয়েছে। আচ্ছা আসি।' পাশের ঘরে গিয়ে দ্রুত হাতে দরজায় খিল চাপাল অনীতা।

তবু দরজায় মুখ রেখে বলল অনিমেষ, 'ঘরের আলোটা জ্বেলে রেখো। আর দেখো, নতুন জায়গায় যেন ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে আমাকে ডেকো।'

অনীতার যেন আর কিছুতে ভয় নেই, তার বুঝি অনিমেষকেই ভয়।

কেন, কেন দুজনে আজ ঝড়ের রাতে একসঙ্গে একঘরে থাকবে না? থাকলে জীবন্ত লোকের সংস্পর্শে পরস্পরের আর ভয় থাকত না। আর যে ভয়ের কথা অনীতা ভেবেছে সে যে কত অবাস্তব গায়ের উত্তাপে বুঝিয়ে দিত।

তখন কত রাত কে জানে? দু'ঘরের মাঝের দরজায় টুক করে একটা শব্দ হল। সে শব্দ স্পষ্ট চিনল অনিমেষ। সে খিল খোলার শব্দ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিছানায় বসে রইল অনিমেষ।

কই অনীতা এল না এ ঘরে।

না, অনিমেষকেই ডাকছে অনীতা। এক নিঃসঙ্গতা ডাকছে এক নিঃসঙ্গতাকে। এক ভয় আরেক ভয়কে।

পা টিপে টিপে অনিমেষই উঠে গেল। খোলা দরজায় ঠেলা দিয়ে ঢুকল ওঘরে।

দেখল, আলোতে দেখল, একি, অনীতা কোথায়? তার বদলে খাটে পাতা বিছানায়, বিলোল ভঙ্গিতে সুরভি শুয়ে আছে!

'অনীতা, অনীতা কোথায়?' চিৎকার করে উঠল অনিমেষ। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

পরদিন সকালে হাসপাতালে অনিমেষের জ্ঞান হল। একটু সুস্থ হলে শুনল গতরাত্রে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে অনীতা মারা গেছে আর ক্যালেন্ডারের তারিখে যে রক্তবিন্দুটা দেখেছিল সেটা আসলে লালকালির চিহ্ন, মরবার অনেক আগেই তারিখটা দাগিয়ে রেখেছিল সুরভি।

ডাক্তারের সাহস

প্রবোধকুমার সান্যাল

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুয়েক গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার থেকে মোটর-বাসে যাওয়া যায়—আগে যেতে হোত হেঁটে কিংবা 'শেয়ারের' গাড়িতে। শেয়ারের গাড়ি ছাড়ত কোম্পানির বাগানের মোড় থেকে, এক-একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দু'ধারে তখন কল-কারখানা, মুটে-মজুর, দোকান-বাজার, পাট আর ভূষিমালের আড়ৎ—এইসবের ভীড় ছিল বেশি। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলো দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে সোরগোল, হই-চই, গরুরগাড়ির দল, জন-মজুরের হল্লা, মালগাড়ির আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত লেগে থাকত। কিন্তু সন্ধে হলেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই, পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না। মাঝে মাঝে এক-আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চলে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেকদিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টিমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন, আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ি অনেকদিন থেকে পড়ে ছিল, এবং সেই বাড়ির ধার দিয়ে সন্ধ্যার পর হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিত মনে করতেন না। বাড়িটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার-বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্যও নেই—কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে। কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্থবির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ বাদুড় আর চামচিকের বাসা, শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি। শুধু তাই নয়। লোকের বিশ্বাস এ বাড়িতে নাকি কোনো কোনো গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ির অন্দর-মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও-পাড়ার লোক বেশি মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হলে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুয্যেদের জামাই এ-সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তী-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছেন। এ-পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোকরাদের দলে তাঁর নাম-ডাক খুব। একদিন ভূতের বাড়ির আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন—যদি একটা রাত আমি ও-বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে?

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে,—একটা রাত? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু? দু'ঘণ্টার বেশি যদি আপনি থাকতে পারেন, তবে কি বলেছি!

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন—কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে—বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

—আচ্ছা সেই ভালো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন—অল্প বয়সে আমরাও জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও-বাড়িতে যেয়ো না, বাবা। একটা ভালোমন্দ ঘটলে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন—আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ, আমাদের ভূতের ভয়।

—আমাদের কথা তবে শুনবে না?

—আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ির সকলে কান্নাকাটি করে অস্থির। এমন সর্বনেশে ডাকাত-জামাই তাদের না হোলেই ভালো ছিল। ডাক্তার বললেন—আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ি বললেন—বাঁচলে তো সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক্ বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি আছে—তাঁর ভয় কি? সকলের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সে-দিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোটপ্যান্ট পরে বন্দুক হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা করে হেসে বললেন—রেডি!

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সোরগোল করে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়িটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে দেখে এল। শীতের দিন, সুতরাং বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও দিয়ে আসা হল। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলের ওপর; একটা জলের কুঁজো আর কাচের গেলাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডের একটা উজ্জ্বল আলো। টমী—চিরবিশ্বস্ত টমী ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে একসঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ির ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনো দিকে তাকাতে সাহস করলে না—পাছে কিছু বিভীষিকা তাদের চোখে পড়ে যায়। ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে রইলেন, এবং তাঁর ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা-জানালা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ করে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারদিক নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তা-ঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্ম-কোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলে কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিঃশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখন ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্বলতা। মনে হল, ঘড়িটায় যেন আরো একটু আস্তে শব্দ হোলে ভালো হয়। ওটা ভয়ানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর বসে ডাক্তার একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। দেওয়ালগুলো জীর্ণ, তার গায়ে নানারকম আঁজিবুঁজি কাটা—অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের মতো।

খুট্ খুট্—

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকালেন। না, কেউ নয়,—বাতাসের শব্দ। না, বাতাসের নয়—বোধহয় কোনো পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন দিকে? জানালায় না দরজায়?

খট্ খট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমী মুখ তুলে তাকালো। একবার সে একটু গোঁ গোঁ করে উঠল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয়—বাতাস। পুরানো দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈকি। টমী তার প্রভুর কোলের কাছে আবার মুখ নীচু করে পড়ে রইল। ডাক্তার হাত বুলিয়ে দেখলেন, তাঁর বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্তৃত্ব তিনি হারিয়ে ফেলছেন। তবু অনেক চেষ্টায় তিনি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেও কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মতো প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ও কি? দেওয়ালের সেই আঁজিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নড়ছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু করে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেওয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবার হাত বাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা তো তাঁর কাছে নেই? কে নিলে? ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরেছে! স্বর নেই,

চিৎকার নেই, নিঃশ্বাস নেই। তিনি নড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্ভব হল না, খাটের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, কাচের গেলাসটা দুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছেন। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলো আর্তনাদ করে উঠল।

খট্ খট্ খট্—

কিসের শব্দ? কই টমী তো আর গোঁ গোঁ করে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমীর গায়ে একটা চিমটি কাটলেন; এত জোরে যে, টমীর গায়ের মাংস খানিকটা তাঁর আঙুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই, টমী তো জাগলো না? তবে? তবে? বেঁচে আছে তো? টমী বেঁচে নেই, তার নিঃশ্বাস পড়ছে না, তার সর্বশরীরে একবিন্দু প্রাণ নেই—মরে সে কাঠের মতো পড়ে রয়েছে। এ-পাশে বন্দুক নেই, ও-পাশে টমী নেই।

ঘড়িটায় আর টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে। কে দিলে থামিয়ে? টেবিল্‌টা এইবার নড়ে উঠল, পায়া চারটে ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমী, টমী? টমী বেঁচে নেই—বাঁ-হাতের কাছে তার মৃতদেহ অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাচের গেলাসটা উড়ছে, টেবিল্‌টা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা-জানালাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কারা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়—এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারদিকে ছুটছে। কে তাঁকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছেন না, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিঃশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিঃশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। তিনি কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলেও পারলেন না। গলা তাঁর বন্ধ, হাত-পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তাঁর মাথার দিকে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চিৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে—তাঁকে নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে। টমী, টমী? টমী মরে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমীর মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমী নখর বিস্তার করে তাঁর দিকে মুখব্যাদান করে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমী-দানব হেসে উঠল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে। মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো—আরো উঁচুতে দানবের দেশে তাঁকে নিয়ে যাবে, ভূত-প্রেতের রহস্যরাজ্যে ঊর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খসে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিকে

পড়ে যাচ্ছেন, হয়তো কোনো মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল,—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে। চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে! সর্বশরীর তাঁর তখনো কাঁপছে। ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল, কুঁজো ও গেলাস, তাঁর বন্দুক আর টমী। গলার আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন—যাই হে, দাঁড়াও!

হলুদপোড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সে-বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে-পরে গাঁয়ে দু'দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল-সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করেছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্তঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে, তখন বাড়ির পিছনে ডোবার

ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানাজনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি—'

চশমার কাচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে। গাঁয়ে সে-ই একমাত্র ডাক্তার পাশ-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এস্‌সি. পাস করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু-বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার-আনা আট-আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপনমনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমার, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা-আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু-জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধহয় সেই খাতিরেই কৈলাশ ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু-জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছিবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বউকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরো অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভরসাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষতক্। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলোচুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন রও! এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ করো, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়েপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক।

এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল-ভরা পরম উপভোগ্য শিহরন।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি-দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, একসময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরন বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।'

'চাটুয্যেবাড়ির শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল, শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট্ করে!'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করেছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি! ওষুধ দিয়ে বউমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস!'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যেবাড়ির শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে

বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে-মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে?

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ়-সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে-নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোন্‌দিক থেকে কিভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরানো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোনো বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, ‘আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—’

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, ‘চুপ্! যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপর্দার!’

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল, মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরো স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল : কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষ মোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তাঁর বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত, স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়তে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তাঁর বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। একমাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে-পায়ে না ধরাই ভালো। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হই-চই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তাহলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীর বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল, ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মতো কি যেন একটা নড়াচড়া করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উঠিপড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোন্‌খানে?'

বাঁশঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি, মাস্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তিপিসি বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেয়ো না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশপাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু-ধারের বাঁশঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি-ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা, তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু-প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোনোকিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু-তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরো কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভরসন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো! বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো! কি হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদে শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

লাল চুল

মনোজ বসু

ছ'মাস ধরিয়া বিয়ের দিন সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনেরো বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল—কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড় জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস; চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে

আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ-তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্রোশ হইতে কয়েকশত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাঙ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জলজঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে; জমিদারের ছেলে ঐ একটি মাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়ি শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকারের চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন।—ঐ তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবই—বার বার এই রকম গোছগাছ করে শেষকালে যে—না-হয় তুমি সেই বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল...

কিন্তু অতবড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। শহরের প্রান্তসীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদারবাবু এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েকদিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইটকাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতালায় দরদালানে সত্তর আশীজন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গরুরগাড়ি বোঝাই আরো অনেক আত্মীয়কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে আটটায়।

রানি বলিল—মাসিমা, হিরণের বিয়ের বেলায় আপনি বড় অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু!

মিনুর মা হাসিলেন।

—না, সে হবে না, মাসিমা। আমরা সমস্ত রাত বাসর জাগব, কোনো কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয়ত বলুন, এক্ষুনি ফের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসি।

রসুইঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গণ্ডগোল। বেড়ার ওপর কে জ্বলন্ত কাঠ ঠেস দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুনঠাকুরের; তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণসন্তান দিব্য করিতেছিল—বিনা অপরাধে তাহার গুরুদণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিনদিনের মধ্যে সে কলিকা একেবারে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল—খবর কি? খবর কি?

শীতল কহিল—খবর ভালো। বর, বরযাত্রী সব ওঁদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজানো হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল—একশ বরকন্দাজ গাঙের ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যায় না! আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আট-দশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার

ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল—যাওয়া ভাই অনর্থক। ছাত থেকে কিচ্ছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখমুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে; ঠাট্টাতামাসা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ; তার মধ্যে যুক্তি-বিবেচনার কথা কে শুনিবে?

রানি সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল—ঐ, ঐ—বর—দেখ—

—মরবি যে এক্ষুনি পড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয়নি, দেখেছিস্? বলিয়া আর একটি মেয়ে রানিকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল—কই? ও রানি, বর দেখলি কোন্ দিকে।

—গলায় ফুলের মালা—ঐ যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি রকম সেজদি!

সেজদি বলিল—মালা না তোর মুণ্ডু! ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুত্থুড়ে মাগো, তিনকালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণে কোনকালে আসনে গিয়ে বসেছে—

ছাতের উপর হইতে বরাসন পর্যন্ত নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা। নিরু বলিল—বলেছি তো অনর্থক! তার চেয়ে নীচে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল্!

—চল্, চল্।

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলো আলো, ঢাকের বাজনা...। সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ, উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

—ঘুমিয়ে কে রে? মিনু? ওমা মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই, পালিয়ে এসে চিলেকোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রানি হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল—আহা, সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নীচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—গিন্নীপনা রাখ্ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রানি?

বিশেষ করিয়া রানিকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রানি মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া বলিতে লাগিল—মিনু ভাই, জাগো—আজকে ঘুমোতে আছে? উঠে বর দেখতে এস। তারপর মিনুর এলোচুলে হাত পড়িতে যেন শিহরিয়া উঠিল—দেখেছ? সন্ধ্যাবেলায় আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী! শুয়ে শুয়ে চুল শুকোনো হচ্ছে! ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম? নীচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা, নন্দরানি, শুভা ওদের সব গলা।

—চল্—চল্—

—চুল বাঁধতে হবে—ওঠ্ মিনু, শীগগির উঠে আয়—বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে এক টান দিয়া রানি ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রানিরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই।

ঘুমচোখে ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে; ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো, ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।...সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে...। হঠাৎ নিচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হই-হই পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।—জল, জল... মোটর আনো, ভিড় করবেন না মশাই, সরুন—ফাঁক করে দিন...আহা-হা কি করো, মোটরে তোল শীগগির। গামছা কাঁধে কোন্ দিক হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

জজবাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুনচৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পুবদিকে ছোট লাল চাদরের নীচে চারিটা কলাগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশে রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মতো খোলা চুলের রাশি, এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা—বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বলিতেছে। বাড়ির মধ্যে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল—ওমা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমাণিক রাজরানি মা! নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন—হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ যে—

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহগনি-পালিশ খাট কজনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মধ্যে কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মতো স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দুটি দৃষ্টি, মৃত্যুর সেই স্তিমিত চোখ দুটির দিকে নিষ্পলক চাহিয়া চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মতো আর্তনাদ করে উঠলেন—একবার ভালো করে চা দিকি...চোখ তুলে চা—ও কী,...

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বার বার বলিতে লাগিলেন—ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ দিয়েছি—কোনো সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথাও কয়নি। ও খুকি, আর বকব না—চোখ তুলে চা একবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমরা? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও!

সাড়ে আটটায় লগ্ন ছিল—বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, যেন শুভলগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ...ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুঁড়িয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পালাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল; সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মতো সে বলিয়া উঠিল—চালাও এক্ষুনি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ, একবোঝা কোট-কামিজ, তার উপর শৌখিন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত স্তূপাকার করিতে লাগিল। তবু কি অসহ্য গরম! বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়?

—যেখানে খুশি! ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীরবেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মতো বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখে আঁধাররাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরো আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণুধর শিহরিয়া উঠিল, এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দু'ধারের বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ, ছোট শহর ইতিমধ্যেই নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে আম-কাঁঠালের বড় বড় বাগিচা। সহসা কোথায় কোন্ দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল, অতি মৃদু অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলো কণ্ঠস্বর—বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো—

আশেপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়িগুলির ছাদের উপর, আমবাগিচার এখানে সেখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ে নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহল-ভরা-চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে, সত্যই একটা বউমানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদীর সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যে সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা, মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল; সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত হয়তো গাড়ির গদীতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে; চারিদিকে নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লীকিশোরীর এইদিনকার সকল

সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোনোদিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদিযুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী মৃতরূপা তার বধূ। লাল বেনারসীতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার স্থান হইয়াছে সীমাহীন আশ্রয়হীন বিপুল শূন্যতায়—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকী ছিটকাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুলভরা মাথাটি—মাথার চারিপাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলোচুল উড়ে,—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল!

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিকপরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীর অনেকে মেল ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—যাহারা খুব নিকটআত্মীয়—বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মতো শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন—কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তাও নয়। ভারী ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজবাবুর বাড়িতে বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল—বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম—

—বলে যাওয়া উচিত ছিল—বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন।

ছেলে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—তোমার খাওয়া হয়নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল, মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্টগন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধো-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মতো ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে; কোণের দিকে দলিলপত্র-ভরা সেকেলে বড় ছাপ বাক্সের আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় চোখদুটি অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহতভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিনভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।...

বাহিরের বৈঠকখানার কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—পোড়াকপালী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল!

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নেই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল—বুদ্ধিশ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাকাদেখা দেখতে গিয়ে আপনি বল্লেন, আমার মা নেই, একজন মাকে খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন হেসে ঘাড় নীচু করে রইল—

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—থামো শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দুজনে চুপচাপ। আলো জ্বালিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; জীবনকালের মধ্যে কোনোদিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানালা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জানালা খোলা, শেষরাতে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিস্তারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি অন্যায় হইয়া যাইতেছে...হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল...কে আসিয়া কতবার ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনো বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে; তাহার তন্দ্রা-বিবশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক্-ঠক্-ঠক্—

খিল-আঁটা কাঠের কপাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আবদারের কথা কহিলে, একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিস্-ফিস্ করিয়া বধূ বলিতেছে—দুয়ার খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনার দরকার; কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজি নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোরগোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িতেছে—বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসে। আমবাগানের ডালে ডালে সদ্য ঘুম ভাঙা পাখির কলরব...ও ঘর হইতে কে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে...। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধামতো একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন—

বেণু গিয়া কহিল—সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও—

—বাড়ি যাওয়া হবে না?

—না—বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল—কবে যাওয়া হবে? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কি ছিল, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন—শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে তো বলা যাচ্ছে না।

অনতিপরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আরপারে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বুনিয়াদী গৃহস্থঘরের মেয়ে; কিন্তু ইদানীং কৌলীন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল—কশাই তোমরা সব!

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে-তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল—ভয় নেই ভাই, ও কিছু হবে না। ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো? কাকার যেমন কাণ্ড—

একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হন-হন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে দিল—পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—পাকাপাকি করে এলে কি রকম? এই ঘণ্টা দুই তিন আগে বেরুলে—কোনো খবরাখবর দেওয়া নেই, এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল?

শীতল সগর্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটি থাবা মারিয়া কহিল—এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয়বাবু, চল্লিশ বছরের পেশা এই আমার। কিছুতেই রাজী হয় না—হেনো-তেনো কত কি আপত্তি! ফুসমন্ত্রে সমস্ত করে এলাম। বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল—আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধর পরিহাস করিতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ সুরে বলিতে লাগিল—তাই কখনো হয় ছোটবাবু, লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো মেয়ে...ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন—কালকের ও মেয়ে এর দাসীবাঁদীর যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমার যা বলার বলে দিয়েছি শীতল, তুমি বাবাকে আমার হয়ে বলো—

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন—শুনলাম, বিয়েয় তুমি অনিচ্ছুক?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন—তাহলে আমায় আত্মহত্যা করতে বল?

কোনো প্রকারে মরিয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল—কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার কি রকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছুদিন সময় দিন আমায়—বলিতে বলিতে তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল। এক মুহূর্ত সামলাইয়া লইয়া বলিল—মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে—

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন—আর এদিকের সর্বনাশটা ভাব একবার! বাড়িসুদ্ধ কুটুম্ব গিস্‌গিস্ করছে—সতের গ্রাম নেমন্তন্ন। বউ দেখবে বলে হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদীর বিয়ে—আর চৌধুরীদের সেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরীদের সেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরী না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খটখট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চকণ্ঠে এক হাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতিগোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল—মেয়ের কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে?...

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না বেণুধর—বউ না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ তো, মাঝে এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভালো হয়ে যাবে।...

বারোয়ারির মাঠে যাত্রা আসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা শুরু। বেণুধর সমবয়সী জন দুই তিনকে পাকড়াইয়া বলিল—চল যাই।

বিজয় বলিল—আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিসপত্তোর বাঁধাছাঁদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

—কেন?

—গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে, বউভাতের তারিখ দুটোদিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমি যাও বিজয়।

—গাড়ি সেই কোন্ রাতে—আমরা থাকব বড় জোর একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা—চল চল—বেণুধর ছাড়িল না। সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—বিয়ে পরশুদিন ঠিক হল?

—হ্যাঁ—

—পরশু রাত্রে?

—তাছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল—রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, ঐ অপঘাতে মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে—

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল—মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছিনে—এত সাধ-আহ্লাদ ভালোবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে পুরিয়ে চলে যাবে। সে কি হতে পারে? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল—তুমি এসব কথা বলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

—ভয় করে? তবে বলব না। বলিয়া বেণু টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল—কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয়নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল!

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশি হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনী ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুদ্ধ তাহার অনেক ডাল ভাঙিয়া লইল। বলিল—খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেব—

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—ফুলশয্যার দেরী আছে হে—

—কোথায়? বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল—এ পক্ষের দিন রয়েছে তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যের দিন করেছে কবে?

বিজয় রীতিমতো রাগিয়া উঠিল—ফের ঐ কথা? এ পক্ষ—ও পক্ষ—বিয়ে তোমার কটা হয়েছে শুনি?

—আপাতত একটা; কাল যেটা হয়ে গেল—আর একটার আশায় আছি। বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল—ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্লভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল; কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোনো বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা, কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া জোরে জোরে পায়চারি করিতে লাগিল। খণ্ড চাঁদ ক্রমশ আমবাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।...আবার সে ঘরে ঢুকিল। বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কে যেন কোথায় পালাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খস্ খস্ করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নতুন কোরা কাপড় পরিয়া খস্ খস্ করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আঙটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দুটোদিন সময়ের মধ্যেই তাহার মন আশ্চর্যরকম ভালো হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা দেখিয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মতো নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার

উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুনকাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মতো খিলান করা সেকেলে ছাত, তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বই পড়িতে লাগিল...একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—জানালার মধ্যে দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মতো পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভালো করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষকালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানালার খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেওয়ালের ওপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা করা তালের গাছ...একটা মুখের আধখানা...ঝুঁটিওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে...ঝুলকালি ও মাকড়সাজালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক আটক হইয়া রহিয়াছে...

চোখ বুজিয়া দেখিতে লাগিল—

অনেকদূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ের মতো মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কি সংকেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপজঙ্গল আনাচকানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই রাত্রে আঙিনার ধূলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

—ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরানি মা—

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট ঘুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নতুন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।...

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবিখানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানালায় মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ভয়ার্ত চাপা গলায় ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ মা ও চেনা-জানা সকল আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্ধ দেরী করিল না; দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড় বহিতে শুরু হইয়াছে। সন সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক খাইয়া যাইতেছে।

—এসো—

—উঁহু—

—এসো—

—না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নির্নিরীক্ষে অন্ধকারের মধ্যে পলায়নপরার পিছনে পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায়; তবু সে যুক্তকরে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল—মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না; আমি যাব না কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি। মেঘভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পরে মধ্য আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝনঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালোবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোকবাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দুটি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপ্ত মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মতো বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

চেতলার কাছে

লীলা মজুমদার

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা ইত্যাদি যতই পবিত্র স্থান হোক না কেন, ও-সব জায়গা মোটেই ভালো না। আর লোকের মুখে মুখে কী সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখাজোখা নেই, তাছাড়া মশা-মাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুরঝুরে ঘর বাড়ি। তায় আবার সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। একফালি উঠোনের মধ্যে এই বড় বড় সব গাছ,—তালগাছ, আমগাছ,

বটগাছ—তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে, যে কোনো বাড়ি থেকে যে কোনো বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ দেখা আর কী করে বন্ধ করে, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোর ছ্যাঁচড় খুনে জানতে পারবে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে। নেইও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরেদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড় কাকা ওখানকার থানার মেজ দারোগা। তাছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব্ জন্মায়নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে বড় কাকা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল, তাহলে ওঁর হেড আপিসে উন্নতি হয় কি করে? অবিশ্যি ও সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং আরো ভয়ের জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধ্যে হতেই যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপরহাতে এক-গোছা সঙ্কটতারিণী মাদুলি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিশে আর কী-ই বা করতে পারে।

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিনদিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনিনি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে।

কী বড় বড় সবুজ রঙের চিংড়ি মাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিলেকোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ।"

বটু তো চটে কাঁই, কী ভালো ভালো চিংড়ি মাছ! ছোট ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "ব্যাস্ মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল! আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অতবড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে দাম পরে নেবে।"

বটু বললে, "আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে..."

কাষ্ঠ হেসে ছোট ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন! তাছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে..." এই বলে ছোট ঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটুও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না?"

আমি বললাম, "যাঃ! ভূতের হাঁটু উল্টোদিকে থাকে, আর ওদের ছায়া পড়ে না।"

ছোট ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ আসেনি বাবা, ছায়া দেখবে কী করে? সে যাই হোক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাসনি। জায়গাটা ভালো নয়।"

গিজগিজে সব বাড়ি, বটগাছতলায় যেতে হলে সারকাস্ করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লটঘটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ্ করে কী একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল। তুলে

দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচ্‌কে লোকটা মিটমিট করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলায় বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে? কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সবকটা চিংড়িমাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ নাও হয়, তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট ঠাকুমা সাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্যিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।"

আর কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছেদ্দা করিসনে বাছা। উনি আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বোনাশ করবেন। খুশি রাখলে আমাদের জন্য না করতে পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে বছরে বছরে পাশ করে যাচ্ছিস, সেটা কী করে সম্ভব সে কথা কখনো ভেবেছিস? হুঁঃ!" এই বলে ছোট ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আর তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদী—"

আর বলা হল না, কারণ সেই সময় বড় কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, "এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। গোলাবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।"

তাই শুনে বড়কাকি এমনি চমকে গেলেন যে, রাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, "কিন্তু—কিন্তু—"

বড় কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

বটার কাছে শুনলাম যে বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। ওটা নাকি চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়িগঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইনী জিনিস বস্তা বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুতঠাকুর সেজে। এটা ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন? দিয়েছে নালিশ করে। বড় কাকা বলেছিলেন, "লোকটাকে ধরা যায় না। ফুস-ফাস করে এখান দিয়ে ওখান গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে ষড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কীরকম মিচ্‌কে মতো, মোটা মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল!"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড় কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট ঠাকুমা তাঁর গলায় হল্‌দে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যস্‌,

আর ভয় নেই। সেখনে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস্‌নে যেন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা!" বড় কাকা চলে গেলে বললেন, "কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁঃ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়িগঙ্গায় জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, "এ গোলাবাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল; লেখাপড়া শেখেনি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ ধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। দুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসান বেচেবুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ি মা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিলেন যে ব্যাটা সে সব খুঁজেই পায়নি। এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড় কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করেনি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, সুঁট্‌কো, কালো, বড় বড় কান, চাকর চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়িগঙ্গায় মাছ ধরত—কে? কে ওখানে?"

খচমচ করে তালগাছ থেকে আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "চা-চা গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে!"

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেত্‌লিতে একটু চা আর একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয়নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্‌কে মুখে যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি?"

জিব কেটে বলল, "অ্যাঁ ছি ছি! ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—"

বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। খাক্‌ না বেচারী।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, "বড়কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্য রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?"

ফিক্‌ করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "দুবেলা নৈবিদ্যি পাই, আবার কষ্ট কিসের? ঐ এল বলে! আমি উঠি! বলেই হাওয়া।

নীচে বড় কাকাদের রাগ-রাগ গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতকারীটারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে আদ্যিকালের তালগাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। পোকা ধরা, পুরনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার। তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভর্তি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পরদিন বড় কাকা বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকরুণ তাহলে বাউন্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।"

ছোট ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, ''কত বাঁচিয়েছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।'' ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড় কাকা তো অবাক!

একরাত্রির অতিথি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগে চুপ করেছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ—এমন কি ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ঐটেই পেশা। ওর বউ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না—ছোট জামাইটা জুয়াড়ি, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলেবয়সে একবার ও কলকাতা গিয়েছিল কিন্তু অত হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায় নি—আবার একবার যাবে মা কালীকে দর্শন করতে, ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে কেবলমাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন থামে তখনি শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং শহরে যাবার বাস যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই বুঝেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে তা কল্পনা করে নি। বাস তো নেই-ই, আশেপাশে কোথাও মানববসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকা এসে যেখানটায় ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচা মতো একটা আছে, জাহাজঘাটা হলে অনায়াসে জেটি বলা যেত। সেই মাচাতে নেমে অসহায় ভাবে অনিমেষ একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। নিচে ময়ুরাক্ষীর কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটু প্রাণস্পন্দন বোঝা যেত—এত মন্থর তার স্রোত, এত নিস্তরঙ্গ—যে মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ি ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তার সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটুখানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না, কিন্তু

তারই অসংখ্য শাখাপল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল করে রেখেছে। একটা আলোর রেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

ওপারেই যদি এই হয় তো, এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এপারে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলাও কোনো গ্রাম ওর চোখে পড়ে নি। বাসটা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবাই ভগীরথপুর চলে যায়। সেদিন অন্তত এমন কেউ ছিল না যে এপারে কোথাও যাবে। আসার সময়ও দুদিকে আম গাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল—বেশ মনে আছে। হয়তো ছিল কোথাও ঘরবাড়ি, কিন্তু তা ওর চোখে পড়ে নি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকো আছে, চওড়া ভেলার মতো প্রকাণ্ড বস্তু—কিন্তু শেষ বাস চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাড়ি চলে গেছে নৌকোটা ওপারে বেঁধে রেখে।

'বাবু ভাড়াটা?'—তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

'ভাড়াটা কিরে! এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব? তুই তো এক ঘণ্টার রাস্তা সাত ঘণ্টায় এনে আমাকে এই বিপদে ফেললি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথাও একটু আশ্রয় পাই কিনা, এপারে এই জঙ্গলে শেষে কি বাঘের পেটে প্রাণ দেব! চল্, ওপারে নিয়ে চল—'

'উটি লারলম্ আজ্ঞা!'

'সে কি! কেন রে? কী হয়েছে?'

তার উত্তরে মাঝি যা বলল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকো গেলে খেয়ার ইজারাদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিশ ধরিয়ে দেয়। সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক করে বোঝাল। ওপারে তাকে ধরবার জন্য ইজারাদার যদি বসে থাকত তো অনিমেষ তাকেই ডাকত; শুধু ইজারাদার কেন, জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোনোমতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক্—তাতে যদি কেউ তাকে ধরে তো অনিমেষ তার দায়ী—ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর, 'উটি লারলম্ আজ্ঞা!'

অনিমেষ তখন রাগ করে বলল, 'তবে তুইও থাক্, আমি তোর নৌকোতেই রাত কাটাই।'

'আজ্ঞা, উটিও লারলম্!' শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'টাকাটি ছুঁড়ে দ্যান্ কেনে—বাড়ি চলে যাই।'

'তবে টাকাও পাবি না যা!' রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি-সত্যিই একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা এক টাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

'যা বেটা যা। পথে ডুবে মরিস তো ঠিক হয়।' মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যস, এরপর সব পরিষ্কার। ওপারে ঘন বনের নিবিড় তমিস্রা, সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য যেন জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চারপাশ ঘিরেও দৈত্যের মতো

কতকগুলি গাছপালা, ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন, এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল করে রেখেছে। ব্যস্ এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরো ভয়ঙ্কর।

স্যুটকেসটা মাচার উপর পেতে সেখানেই জেঁকে বসল অনিমেষ। বাঘ ভাল্লুক যদি সত্যিই আসে তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর্‌খর্ ঝটপট শব্দ করে কী একটা পাখি উড়ে বসল মাথার ওপরে। ভয় পেয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। কাছেই কোথায় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কী একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য, শব্দ, তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজী খায়। ঐটুকু আওয়াজ—কিন্তু অনিমেষের মনে হল যেন বন্দুকের শব্দ উঠল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে ধরে হাতঘড়িটা দেখল—মাত্র রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। এখনো দীর্ঘসময় তাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোনো গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা এখনো—

আচ্ছা, হাঁটলে কেমন হয়? বাসের রাসাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর গ্রাম একটা পাওয়া যায় না কাছাকাছির মধ্যে?

কিন্তু সেখানে যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায়? ডাকাত বলে মনে করে? তাছাড়া দু'দিকে যা ঘন ঘন বন, যদি বাঘ আসে? মুর্শিদাবাদ জেলায় এসব অঞ্চলে প্রায়ই বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ-এগারো ঘণ্টা সময়—একরকম করে কেটেই যাবে।

'ও মশাই, শুনছেন? বাস মিস্ করেছেন বুঝি? কোথাও আশ্রয় পান নি?'

অস্ফুট একটা শব্দ করে চম্‌কে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁতকে ওঠে বলাই ঠিক। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—কৈ একটুও তো টের পায় নি! সামান্য কুটো নড়ার শব্দের দিকেও তো সে কান পেতে ছিল!

কয়েক মুহূর্ত যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, ঘাড় ফেরাতেও সাহস হয় না। কথাগুলো যে বলেছে সে একেবারে ওর পিছনে এসেই দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এইভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন করে আগন্তুকটিও চুপ করে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটি মানুষ, খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙাও বলা চলে না। উস্‌কো-খুসকো এক মাথা চুল ও ঘন দাড়িগোঁফ। ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা হয়—এমনি দাড়ি, খোঁচাখোঁচা। একখানা খাটো আধময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিঃশব্দে শুধুমাত্র চাউনির দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে।...

'বলছিলুম যে, আপনি বোধহয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না? তাহলে বরং চলুন না-হয় আমার কুটিরেই—কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।'

হায়রে! আগুল্ফলম্বিত-কুন্তলা বনমালা-শোভিতা কপালকুণ্ডলারা শুধু উপন্যাসেই দেখা দেয়!

যাক্ গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুটতে নেই! এ লোকটাকে দেখেই যেন পাগল বলে মনে হয়—শেষ পর্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আরো বিপদে পড়বে!

'কী বলেন? যাবেন নাকি?'

'আ-আপনি এখানে—মানে—' আমতা আমতা করে অনিমেষ।

'আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে!'

লোকটা আঙুল দিয়ে দেখায়।

সত্যিই তো, এই তো, বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর—ও অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, 'ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পান নি। আমিও বাড়ি ছিলুম না, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।'

'এখানে বাঘের ভয় নেই?'

'আছে বৈকি। তবে আমার অত ভয় নেই।...মরবার ভয় করি না। করে লাভই বা কি বলুন, মরতে তো একদিন হবেই।'

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে তো মনে হয় না!

'চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্তা হবে'খন।' লোকটা তাড়া লাগায়।

'চলুন' বলে স্যুটকেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—পাশাপাশি দুখানা ছোট ঘর, সামনে এক ফালি দাওয়া। ভেতরদিকে আরো কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না। দাওয়া বেশ ঝকঝকে করে নিকানো, পরিচ্ছন্ন। লোকটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে 'দাঁড়ান আলো জ্বালি' বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে ভেতরে ঢুকল। তালাচাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বলল, 'আসুন—ভেতরে আসুন।'

ঘরে আসবাবপত্র বেশি ছিল না। একটি তক্তপোশের ওপর একটা মাদুর বিছানো, —শয্যা বলতে এই। একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। একপাশে একটি দড়ি টাঙানো, তাতে খান-দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটা কাঁসার ঘটি এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

'বসুন, বসুন। ঐ চৌকিটের ওপরই বসুন।'

তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুইহাত ঘষে কেন এক রকমের বিচিত্র হাসি হেসে বললে, 'ভালো বিছানা আমার নেই। ঐ স্যুটকেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে।...আর খাবারও তো কিছু দিতে পারব না। ঘরে আমার কিছুই নেই।...আপনি মদ খান?'

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করবার ভঙ্গিতে।

'না-না। রক্ষে করুন। কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের।'

'ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ-ভাল্লুকের হাত থেকে তো বাঁচলেন অন্তত।—তা আশ্রয় ভালোই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন?'

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চক্‌চক্ করে।

অনিমেষের যেন ভালো লাগে না ওর ভাবভঙ্গি। আবারও সেই সন্দেহটা মনে জাগে—পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল নাকি?

'আপনি এখানে কি করেন?'

'আপাতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন, আমি আসি। মুখহাত ধোবেন নাকি?'

ধুতে পারলে ভালোই হত, কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না। সে বললে, 'না—দরকার নেই।'

লোকটি বেরিয়ে গেল। অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভালো বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন? ঘরে কোনোরকম কিছু খাবার নেই তো ও নিজে খায় কি? চোরডাকাত নয় তো? লোকজনকে ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন—ব্যাগে ওর খানকতক পুরোনো কাপড়জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা-ছয়েক আছে। কিন্তু একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে...এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে, টাকা না পেলে আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। তা-ছাড়া মেরে ফেলে তো দেখবে কী আছে না আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটা লোককে খুন করার পর পেয়েছিল মাত্র একটি আধলা!

কখন গৃহস্বামী আবার নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, অনিমেষ টেরও পায় নি। যদিও খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে। আশ্চর্য!

লোকটি বলল, 'এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি? যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি। কতদিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাই নি! বলেন তো দুটো কথা কয়ে বাঁচি।...এখানে তেমন লোকজন তো নেই, আসেও না কেউ—'

অনিমেষ আবারও পূর্ব প্রশ্নের জের টানল, 'তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন?'

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে, তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তের সেই বিজলী প্রকাশ!

'ভয় নেই—আমি চোর-ডাকাতও নই, পাগলও নই। ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই। থাকারও দরকার হয় না আমার। কেন জানেন?'

তারপর যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, 'আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।'

'সন্ন্যাসী?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, 'না—সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।'

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতেই বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে বললে, 'তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনো বলি নি, বলবার সুযোগও পাই নি বিশেষ। এই অঞ্চলেরই লোক আমি, বুঝলেন? ছেলেবেলা থেকেই নানা বইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐদিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হত আমিও ঐসব

সাধনা করে সিদ্ধ হব, তারপর প্রাণভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য ভোগ করব—আর আমাকে পায় কে! হায় রে, তখন কি আর জানতুম যে ভোগের উদ্দেশ্যে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি তো দূরের কথা, সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে!'

এই পর্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণে অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গি আর কথাবার্তায় সত্য কথা বলছে বলে মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

'বাড়ি আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ি সেই পাঁচথুপির কাছে। এখানে কেন এলুম? বলছি দাঁড়ান।...বলেছি আপনাকে, ছেলেবেলা থেকেই ঐদিকে ঝোঁক গিয়েছিল। ইস্কুলের পড়া হল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব পাকা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কৈ? দু-একটা সন্ন্যাসী যা হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব বাজে—কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোব কি করে?...মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল—জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমি বকুনিও খেয়েছি ঢের কাজকর্ম কিছু করি না বলে, কিন্তু সে সব গায়ে মাখি নি।

'তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ততই ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষমেষ আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে বাড়ি থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না।...এ-তীর্থ ও-তীর্থ করে অনেক দেশই ঘুরলুম। ভালো চাকরি বা ভালো বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম, সংসার—বুঝলেন মশাই, মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে—যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারল না। কিন্তু আসল যা উদ্দেশ্য তাও কিছু হল না। এমনি ভাবে যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি তখন একদিন—বাড়ি ফেরার পথে বলতে গেলে—বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনলুম, উলঙ্গ থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচা মাংস, পাতালতা এমন কি বিষ্ঠা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।'

'খোঁজ করে করে গেলুম। প্রথম তো দেখাই পাওয়া যায় না। শেষে তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাগলের মতো ভাবভঙ্গি—কিন্তু পাগল নন। একদিন আমার চোখের সামনেই—দু'দিক থেকে দু'দল ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে আসছে দেখে, আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন, কেউ আর খুঁজেই পেল না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজছিলুম, এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।'

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, 'তারপর?'

'লোক তো পেলুম—তাকে ধরি কী করে? কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্নাকাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে—বললে, ভালো চাস্ তো এসব মতলব ছাড়! সাধনা করবি তুই, ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে? তোর কাজ নয়—বুঝলি, মরবি একেবারে। তা ছাড়া ভোগ করবার জন্যে এসব কাজ যে করতে আসে তার একূল ওকূল দুকূল যায়। রামকৃষ্ণ

পরমহংসের গল্প পড়িস নি? মাকে বলেছিল, মা অষ্ট সিদ্ধাই দে—হৃদে বলছে চাইতে। মা বললেন, কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐদিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে তো সেই মারে! বুঝলি—এমনি তুচ্ছ শুধু নয়, ছোট জিনিস ওসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে-থা কর। নিজে-নিজেই ভগবানকে ডাক্‌, নয়তো কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস। অনেক কাকুতি-মিনতি করলুম, বাবার আর দয়া হল না। আমি কিন্তু মশাই হাল ছাড়লুম না। আমার তখন জেদ চেপে গেছে কি না।...ঐখানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়ে দেয়ে—আর গোপনে ওঁর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিস পাই—বুঝলেন না? এতদিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি! আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি। তারপর হল কি মশাই, আরো দু-একজনকে সাধক আর ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি তো ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এড়াবে কি করে?...পরপর কদিন ওঁদের চক্র বসল। তাও দেখলুম।—মনে হল যে, আর কি, সব শিখে গেছি...ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ি ফিরলুম না, নির্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে এই রকম খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লুম। পথে নলহাটিতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে নিলুম।

'ও মশাই, এলুম তো এখানে, কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন থেকে বিঘ্ন। উপকরণ জোটে তো দিন পাই না, দিন পাই তো উপকরণ নেই—শেষে অনেক কৌশল করে অনেক নিচে নেমে যদি বা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবারে অমাবস্যার রাত পেয়ে যেমন আসন করে বসেছি—কী বিঘ্ন! ধ্যানে মন দেব কি, কিছুতে মনই স্থির করতে পারি না...এখন এটা বাসের রাস্তা হয়ে শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে, আগে এখানটাতেই শ্মশান ছিল, এখন যেখানে ঘর দেখছেন, এই যেখানে আমরা বসে আছি, এইখানেই সেদিন আসন করে বসেছিলুম—'

নিজের অজ্ঞাতেই অনিমেষ যেন একটু সরে বসে। তারপর বলে, 'আচ্ছা বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি তো এ রকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধুই পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও তো সে রকম শুনেছিলেন নিশ্চয়, তবে ভয় পেলেন কেন?

হাসল লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষি করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষেরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, 'জানে তো সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হলে বুঝতেন!...শুনবেন কেমন?...মড়ার বুকের ওপর বসেছি আসন করে, মড়ার খুলিতে করে মদ খাচ্ছি—মনে ভয়ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল।। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সে সব শুনে। না, না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হল ফিসফিস কথার শব্দ, খিলখিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেইটাই বাড়তে লাগল। মনে হল দশজন, বিশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চারপাশে যদি লক্ষলোকের ফিসফিস কথারই শব্দ হতে থাকে তো তেমন হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের খিলখিল হাসি। তবু আমি স্থির হয়ে আসনেই বসে রইলুম—নড়লুম না। যদিও কাজে আর মন দিতে পারলুম না, এটাও ঠিক। তার পর মশাই—স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলো উঠছে। কতকাল

থেকে মরেছে সব—কত হাজার হাজার বছর ধরে। এক এক জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল, কেউ বা ঠ্যাঙাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায়-দড়ির মড়া। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে—তেমনি কন্ধকাটা কিংবা হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ, চোখের দৃষ্টিতে আগুন। তারা সবাই আমার দিকে আঙুল তুলে শাসাতে লাগল, পাপিষ্ঠ, তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস? চলে যা, দূর হয়ে যা! জানিস না, এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি? মনে পাপ নিয়ে তুই এসেছিস শ্মশান জাগাতে! চলে যা! তার মধ্যে একজনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে—তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে।...সেটাই সবচেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই এক শব্দ, দূর হ! দূর হ! ভয় পেলুম খুব, তবু এও জানি, একবার ভয় পেলেই গেল—চিরকালের মতো। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাব না, যাব না। উঠব না আমি। ব্যস্—আর যায় কোথা, সেই কঙ্কালটা আরো এগিয়ে এসে তার সেই অস্থিময় আঙুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরলো। ওঃ, সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী! কত চেষ্টা করলুম মুক্ত হবার, কিন্তু সে বজ্রকঠিন মুষ্ঠি খোলে কার সাধ্য! দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা—মনে হল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে।...আকুলিবিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে—সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে তবু এক বিন্দু বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না। বরং আরো চেপে বসতে লাগল সেই সাঁড়াশীর মতো আঙুলগুলো—।...'

'তারপর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

'তারপর?' আবার সেই হাসি, 'তারপর আর কি, মুক্তি! সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই। কাজ নেই, কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারি নে।।...সবচেয়ে কষ্ট হয়, কথা কইবার লোক নেই বলেই—'

'—কি—কিন্তু...' কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের যেন গলা কেঁপে যায়, 'আপনি মুক্তি পেলেন কি করে?'

'তা আমিও জানি না। এক সময় দেখলুম যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব আশ্রয় অর্থাৎ কিনা দেহটার পাশে। যারা এসেছিল তাদেরও তো কাজ শেষ, তারাও সব যে-যার মিলিয়ে গেছে। এককথায় সব কিছুর শান্তি।'

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরি লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, 'তার—তার মানে কি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মা-মারা গেলেন? আ-আপনি কি মড়া?'

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্তনাদের মতো চিৎকারে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন সে করছে কাকে? কেউ তো নেই! শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকি জিনিসগুলো ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উবু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে?

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠতে লাগল কিন্তু উত্তর দেবে কে! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, তাহলে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি! ও লোকটা মানুষ নয়—অশরীরী, বিদেহী আত্মা! খাবার কিছু লাগে না ওর—বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞান-পড়া ছেলে। এসব মিথ্যা—কল্পনা, আত্ম-সম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করবে না এ কথা যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখেছে!

আচ্ছা, পিছনে ছায়া পড়েছিল কি ওর? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যিই কি—? না লোকটা তার সঙ্গে তামাশা করেছে? আগে যা ভেবেছিল তাই? ডাকাত বা ঠাঙাড়ে জাতীয়—ভয় দেখিয়ে গেল, এর পর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে!

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হলে আলোয় থাকবে কি করে?...বদমাইশ! আরো বেশি ভয় দেখাবার জন্যে ম্যাজিকওয়ালাদের মতো চোখের নিমেষে সরে গেছে।

দোরটা বন্ধ করে দেবে নাকি?

দেওয়াই উচিত।

পালাবে?

কোথায় যাবে এই অন্ধকারে! আরো তো ওদের কবলে গিয়েই পড়তে হবে। সে দেখতে পাবে না ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকা মন্দ নয়—যা হবার হবে, আলো তো থাকবে এখানে। লোকগুলোকে চোখে দেখা যাবে!

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কোনোমতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিলে। ভাগ্যিস ভেতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখেশুনে ভালো করে বন্ধ করল। যাক্, নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ কী?

হঠাৎ আলো নিভে গেল যে! মুহূর্তের মধ্যে, কোনোরকম নোটিশ না দিয়েই—ঘরটা তার চারপাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না? কিন্তু তাহলে তো একটু একটু করে ম্লান হয়ে আসবে—

তবে—ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল—তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে? সেই লোকটাই কি? হয়তো তক্তপোশের নিচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেইখানেই লুকিয়ে ছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। নিশ্চয়ই তাই।

কী সর্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হল! ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটেতে দেশলাই পর্যন্ত নেই। যতদূর মনে পড়ে ব্যাগও নেই। ব্যাগটাই বা কোথায়? চৌকিটা যে ঠিক কোন্ দিকে, তাও তো মনে পড়ছে না!

উঃ—কী বদমাইশ লোকটা!

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়তো বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেষ বলে উঠল, 'কে? কে ওখানে? আলো জ্বালো বলছি শিগগির, নইলে ভালো হবে না, দেখিয়ে দেব মজা! কি, জ্বাললে না?'

নিস্তব্ধ চারিদিকে। কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়ে না। রহস্যময় সুগভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানলা ছিল? তাও তো মনে পড়ছে না ছাই!

জানলা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও জানলা কোন্ দিকে মনে পড়ল না। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই তো দেওয়াল, হাতড়ে দেখতে দোষ কি?

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে, আচ্ছা বোকা তো সে! দোরটাই তো রয়েছে, খুলে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়! ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভাল, তারার আলো আছে। ব্যাগটা? থাকগে, প্রাণ তো বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এইমাত্র, সেইদিকেই হাত বাড়াল। কৈ সে দরজা? অথচ—ও তো সবে বন্ধ করে এপাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে!

তবে কি ও দিক্‌ভুল করেছে? এদিকে দরজা ছিল না?

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এইটুকু তো ঘর, দেওয়াল পেলে, দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে! কিন্তু উপায়ই বা কি? এদের কবলে যখন এসে পড়েছেই—

মরীয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়।...এক দুই...একি, যে যে কুড়ি পা হয়ে গেল! ঘরটা যতদূর আন্দাজ হয়, দশ-বারো ফুটের বেশি হবে না লম্বায়। নেহাতই ছোট্ট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনেরো ফুট!

আরো দু পা...আরো দশ—আরো কুড়ি।

একি সে মাঠে চলেছে নাকি?

কী রকম হল? চল্লিশ পা চলার মতো ঘর তো নয়! কোনাকুনি হাঁটছে? তাতেই বা এতদূর হবে কেমন করে? তবু আরো কয়েক পা যায় সে। হয়তো চলতে চলতে তখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরো খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময়, অন্ধকার, অনন্ত শূন্যতা। বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা—তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয় নি এবার তাই হল, পা দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে।...একেবারে যেন ভেঙে এল। অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হল? কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে?

তবে কি সে লোকটা অশরীরী—সত্যি-সত্যিই? সে কি তাহলে কোনো প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে?

বিহ্বল হয়ে ভাবে অনিমেষ কি করবে, কিন্তু কোনো পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না? হ্যাঁ, ঐ তো কত লোকের পায়ের আওয়াজ! অন্তত আটদশ জনের কম নয়। কিংবা আরো বেশি। এই বাড়ির কাছেই আসছে, ঐ তো দাওয়ায় উঠল।

'ও মশাই, শুনছেন? ও মশাই—'

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। টাক্‌রা শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি সেই ডাকাতের দল হয়? তা হোক্, তবু তো তারা মানুষ। ভরসা হল একটু অনিমেষের। তাহলে অন্তত এটা প্রেতের মায়া নয়। আঃ—বাঁচা গেল!

হ্যাঁ—ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইবে কেন? বহুলোক যেন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। আরো লোক বাড়ছে। আরো বহু পায়ের শব্দ, অসংখ্য, অগণিত ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ—

এ কি—ওরা কি ঘরে ঢুকেছে নাকি?

কেমন করে ঢুকল?

ওর যে চারিদিকে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে! ওরই চারপাশে, খুব কাছে! খিল খিল করে চাপা হাসির শব্দ—অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফ নেমে যায় যেন দেহের মধ্যে। হাত-পায়ে আর কোনো সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিস তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করে নি। মস্তিষ্ক শুদ্ধ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে...

চিৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কৈ?

কিন্তু কিছু তো একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ, নিঃশ্বাস ওর সর্বাঙ্গে...

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেও তো এমনি ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তারপর? তারপর? সেই মৃতের পুনরুত্থান, সেই কঙ্কালের অভিযান!

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোনো দোষ করে নি। সে তো সাধনা করতে আসে নি শবের বুকের ওপর চড়ে?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল তারই আশেপাশে কোথাও। তীক্ষ্ণ চড়া গলার সে হাসি, মনে হল যেন তার পাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারিদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই এক হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তাকে ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ণ, একটা উপহাসের হাসি—সে হাসির জাল যেন তাকে চারিদিক থেকে বেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই—

প্রাণপণ চেষ্টায় মরীয়ার মতো চিৎকার করে উঠল একবার অনিমেষ, 'হে ভগবান, এ কী করলে!'

সত্যিই তো। ভগবানের কথা তো তার মনে ছিল না। তাঁকে তো সে ডাকে নি।

'হে ভগবান, হে হরি, বাঁচাও—হে রামচন্দ্র!' আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি? হ্যাঁ আছে। পৈতেটা কোথায়?...

সুগভীর ক্লান্তি আর অসহ তন্দ্রায় চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে তার।

ঘুম যখন ভাঙল অনিমেষের, তখনো সকাল হয় নি কিন্তু ফরসা হয়েছে একটু। খানিকটা সময় লাগল তার সবটা মনে করতে, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভালো করে চেয়ে দেখল যে সে বাস দাঁড়াবারই ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে ঘুমিয়েছে কখন—সুটকেসটা খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় পড়ে আছে।...আরে—সে ঘর! সে ঘরটা কোথায় গেল? যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কোনো ঘরের চিহ্নমাত্রও তো নেই! সে কি বাস থেকে নেমে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল? তাই হবে হয়তো। হয়তো সবটাই ওর স্বপ্ন।...

সে উঠে নদীতে গেল মুখ-হাত ধুতে।

নিজে বুঝে নিন

আশাপূর্ণা দেবী

রাত নাগাদ বারোটা।

ভুরসুট পরগণার প্রতাপপুরের বড়কর্তা জগদীশপ্রতাপ তাঁর কলকাতার বাড়ির তিনতলায় নিজের শোবার ঘরে একা একা বসে জোর আলো জ্বালিয়ে দুখানা মোটা খাতা সামনে বিছিয়ে হিসেবপত্র দেখছিলেন।

যদিও জমিদারীর বারোটা বেজে গ্যাছে কবেই। এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না; তবু 'বড়কর্তা' নামটির মায়া ছাড়তে পারেননি জগদীশপ্রতাপ। এখনো প্রতাপপুরের কেউ 'বড়কর্তা' না বললে মনে মনে যথেষ্ট চটেন।

চটবার কারণও বিদ্যমান আছে বৈকি। ওই প্রতাপপুর তো তাঁরই ঠাকুর্দার বাবা নরসিংহপ্রতাপের খাস 'পত্তন'। তাঁর নামেই প্রতাপপুর। তিনি নাকি দাবি করতেন তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যর জ্ঞাতিগুষ্টির।

তা যাকগে। কে কী না দাবি করছে!

তবে বোলবোলাও একখানা ছিল বৈকি। জগদীশপ্রতাপের বাবার আমলেও ছিল কিঞ্চিৎ।

জগদীশ অবশ্য তাঁর বাপের ঠাকুর্দা মহামান্য নৃসিংহপ্রতাপকে জ্ঞানে তেমন ভালো করে দেখেননি। আবছা মনে পড়ে, দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি খুব ভোরবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম করছেন। মন্তর পড়ছেন গমগমে গলায়।

এছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

যা কিছু শোনা বাবার কাছে।

শুনতে পেয়েছেন সেই নৃসিংহপ্রতাপের জন্মদিনটি আর তাঁর জন্মদিনটি এক।

নৃসিংহপ্রতাপের সেদিন সত্তর বছরের জন্মতিথি।

সকালবেলা ঠাকুরমন্দিরে ভোগ পুজো সব দেওয়া হয়ে গ্যাছে। নৃসিংহপ্রতাপ তেলবাটা মাথায় ঘষে দীঘিতে চান করে এসেছেন এবং এসে খিড়কির পুকুরে একটি জিওলমাছ ছেড়ে দিয়ে নিজের দীর্ঘায়ু নিজেই কামনা করে পুজোপাঠ করেছেন। তখনো না সাড়া না শব্দ।

দুপুরে যখন রুপোর থালা-বাসনে সত্তর প্রকার ব্যঞ্জন সাজিয়ে প্লাস বৃহৎ একটি রুইমাছের মুড়ো আর বড় জামবাটির একবাটি পরমান্ন নিয়ে যুঁইফুলের মতো ফুরফুরে চামরমণি চালের ভাতটির সামনে খেতে বসেছেন আর গালচের আসনে ধারেকাছে মস্ত একটা পিলসুজের ওপর প্রকাণ্ড একখানা পেতলের প্রদীপ পেটভর্তি খাঁটি গাওয়া ঘি নিয়ে দপদপ করে জ্বলছে।

আগের আমলে এটাই ছিল জন্মদিনের শুভকাজের অঙ্গ। কেক কাটাকাটির তো চলন ছিল না। আর বয়েস গুনে জ্বেলে দেওয়া মোমবাতির সারি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ারও পাট ছিল না। সেকালে লোকে বাতি নিভে যাওয়াটাই অলক্ষণ কুলক্ষণ মনে করত। তাই প্রদীপে পেটভর্তি তেল, মোটা করে সলতে।

আর খানদানি বাড়িতে প্রদীপের পেট ভরানো হত তেলের বদলে ঘিয়ে আর প্রথম অন্নটি মুখে দেওয়া মাত্তর ভোঁ ভোঁ করে তিনবার শাঁখে ফুঁ দেওয়া।

তা সে সব পর্ব মিটেছে।

তোয়াজ করে খেয়ে চলেছেন নৃসিংহ। সত্তরটি পদ, সুযোগমতো একবারও অন্তত মুখে ঠেকাতে হবে। তো ঠ্যাকাতে ঠ্যাকাতে যখন চাটনিতে এসে ঠেকেছেন, তখন আবার তিনবার ভোঁ ভোঁ শঙ্খধ্বনি।

কী হল? আবার শাঁখ?

জিগ্যেস করতে না করতেই, ট্যাঁ ট্যাঁ কান্নার শব্দ। সদ্যোজাত শিশুর গগনবিদারী পরিত্রাহি শব্দ।

ওটা আবার কী? কাঁদে কে?

বুড়ি পিসি কাছে বসে পাখা নাড়ছিল। বলল,—ঘরে নতুন মানুষ এল। তোর ব্যাটার ঘরে নাতি জন্মালো।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? তার মানে নৃসিংহপ্রতাপের প্রপৌত্র এল। তো আসবার কথা ছিল বুঝি?

—কথা ছিল বৈকি। তো দু-দশদিন বাদে আসার কথা। আচমকা আজই তোর জন্মদিনে হানকান করে ভূমিষ্ঠ হয়ে বসলো।

নৃসিংহ ক্ষীরের বাটিতে গোঁফ ডুবিয়ে মুচকে হেসে বললেন,—'হুঁ। ব্যাটা খুব ধড়িবাজ হবে মনে হচ্ছে। ওরে কে আছিস, এই প্রদীপটায় আরো ঘি ঢেলে দিয়ে যা।

শুধু ঘি না, একেবারে খাঁটি গব্যঘৃত।

তো সেই প্রদীপ ঘি খেয়ে খেয়ে একনাগাড়ে জ্বলতে থাকল। ছ-দিন ছ-রাত। ষেটেরা পুজোর পরদিন সকালে তার ছুটি। রাতে বিধাতাপুরুষ কপালে লেখন দিয়ে যাবার কাজ সেটা অবধি।

বিধাতাপুরুষ কী লিখে গেলেন কে জানে! তবে সেই জগদীশের কাছে খাঁটি গব্যঘৃত এখন স্বপ্নের বস্তু।

সাবেকী মানটির ঠাটবাট রেখে চলেছেন এখনো। ভাতের পাতে ঘি, দুধ, দই, চাটনি, পাতিলেবু কম্পালসারি।

গাওয়া ঘি বলে দেশ থেকে ঘি আনান বেশি দাম দিয়ে। তো সেই খাঁটি ঘিয়ের আড়াইভাগ বনস্পতি। আর বাকি দেড়ভাগ ভঁয়সা।

তা হলে কী হবে, দেশের ঘি বলে ওতেই আত্মপ্রসাদ জগদীশপ্রতাপের।

'প্রতাপের' বালাই নেই কোথাও, তবু প্রতাপপুরের অহঙ্কার।

ওই যে নৃসিংহপ্রতাপের সঙ্গে জন্মদিনের মিল, তাই তাঁর সঙ্গে যেন কেমন একাত্ম অনুভব করেন। আবার বাপের মুখে শুনেছেন, চেহারাতেও নাকি মিল।

তবে?

হলেও অবস্থান্তর, মনেপ্রাণে জগদীশ প্রতাপপুরের বড়কর্তা। চালচলনে তদুপযুক্ত ছাপ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

এই যে রাতদুপুরে খাতাপত্তর নিয়ে হিসেবে বসেছেন, তো টেবিল-চেয়ারের বালাই আছে নাকি? শোবার ঘরের মস্ত পালঙ্কটাকেই 'কাছারিঘরের ফরাস' মনে করে তার মাঝখানে জোড়াসনে বসে সামনে খুলে রাখা জাবদা খাতা দুটো থেকে কীসব মেলামিলি করছেন।

আগে আগে ভারী কাচের দোয়াতদানি সামনে বসিয়ে কলমে কালি ডুবিয়ে লিখতেন। ছেলে বলে বলে ফাউন্টেন পেন ধরিয়েছিল। সম্প্রতি আবার 'আরো সুবিধে' দেখিয়ে নাতি ডটপেন ধরিয়েছে।

তা দেখছেন ব্যাপারটা মন্দ নয়। বেশ সুবিধের। কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধে বাড়ছে বৈকি! তবে অসুবিধেও যে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, একথা জগদীশপ্রতাপ জোরগলায় ঘোষণা না করে ছাড়েন না।

এখন আর ছেলে তর্কে নামে না। তর্কটা নাতির সঙ্গে চলে। পাল্লাটা কোন্‌দিকে ভারী, ডটপেনের না খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের—এ তর্কের মীমাংসা হয় না।

রোজই হিসেব চলে।

টেবিলে খাওয়া আরামের না মাটিতে বসে খাওয়ার। প্যান্ট-পায়জামা সুবিধের, না লম্বা কোঁচা ধুতির!

নাতির প্রশ্নে দাদুর জবাব,—পেন্টুল পাজামা তো তোদের একালে জমিদারেও পরে, জমাদারেও পরে। কিন্তু লম্বা কোঁচা? কই দেখা দিকি কোনো জমাদারের...টেবিলে খাওয়া? যেন অফিস কাছারিতে কাজ করতে বসা। মাটিতে আসন পেতে ছড়িয়ে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা, হিসেব করে দ্যাখ।

তা সে যাক।

এখন জগদীশ যে হিসেব নিয়ে বসেছেন, সেটি বেশ জটিল।

প্রতাপপুরের 'বাবুদের বাড়িটি' মানে নৃসিংহপ্রতাপের বানানো সেই প্রাসাদটির এখন এমন জরাজীর্ণ অবস্থা ঘটেছে যে, মেরামতি করে একটু ভদ্রস্থ করতে হলেও লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। আসবে কোথা থেকে সে টাকা? আর সারিয়ে তুলেই বা কী হবে? কে বাস করতে যাবে সেই ভুরসুট পরগণায় প্রতাপপুরে?

ছেলের মতে বেচে দাও। বরং ঘরে কিছু আসবে। মরা হাতি লাখ টাকা—ওই ভাঙা বাড়িরও এখন অনেক দাম পাওয়া যাবে।

—ভিটে আবার বেচব কী?

বলে প্রথমে খুব রাগারাগি করেছিলেন জগদীশপ্রতাপ। ক্রমশ যুক্তিতর্কে নিমরাজী! কিন্তু মুশ্‌কিল এই—নয় নয় করেও সেখানে এখনো অনেক আসবাবপত্তর। যাওয়াও হয় সেখানে। অন্তত জগদীশ তো যান।

সবাই যে 'বড়কর্তা' বলে ছুটে আসে, এ আহ্লাদ গৌরব কি দার্জিলিং, কাশ্মীর, নৈনিতাল পাহাড়ে গেলে হবে?

তা সেসব যখন চুকেবুকে যাচ্ছে, জিনিসগুলোর কী হবে? ছেলে আর বৌমা বলল—এখানে কাজে লাগার মতো যা কিছু আছে নিয়ে আসুন। বাকি বিলিয়ে দিয়ে আসুন।

কিন্তু এখানে কাজে লাগবার মতো অনেক কিছুই তো একে একে আনা হয়েছে। আর কী আনা হবে? ঘরে ঘরে যে বৃহৎ বৃহৎ পালঙ্ক বসানো আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে কাঁঠালকাঠের সিন্দুকগুলো আছে এখানে সেখানে, বৈঠকখানা বাড়িতে যে ঝাড়লণ্ঠনটা ঝুলছে—সেগুলো বিলোতে চাইলেই বা নেবে কে? কার ঘরে এত জায়গা আছে?

তাছাড়া আর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে, যেটা নিয়েই এখন সমস্যা আর হিসেবনিকেশ। জগদীশের ঠাকুমা একদা বড়লোকের গিন্নির দেমাকে আবদার করেছিলেন, তাঁর 'লক্ষ্মীর ঘরটি'র অর্থাৎ পুজোর ঘরটির পুরো মেজেটা টাকা গেঁথে গেঁথে বাঁধিয়ে দিতে হবে। যেমন সব কাশী-বৃন্দাবনের মন্দিরে দেখে এসেছেন।

যে কথা সেই কাজ।

আনানো হল বস্তাভর্তি চকচকে আসলি চাঁদির টাকা। কোনোটায় মহারানীর মুখ, কোনোটায় তাঁর ন্যাড়ামাথা ছেলের মুখ। তা সেটি গুছিয়ে সাজিয়ে গাঁথতে মিস্ত্রিরাই পারবে। ডাকা হল হিন্দু রাজমিস্ত্রি মুকুন্দকে। ঠাকুরঘর বলে কথা! চিরকেলে রাজমিস্ত্রি রসিদ আর আবদুল হেসে হেসে বলল,—বাড়িখানা কিন্তু আমরাই বানিয়েছিলুম মা-ঠাকরুন। আপনার ওই লক্ষ্মীর ঘরটিও।

তা হোক। এখন ঘরে উঁচু তাকে লক্ষ্মীর পট। নতুন ধানের হাঁড়ি। সেসব থাকবে। শুধু মেজেটা খোঁড়াখুঁড়ি। তারপর টাকা গেঁথে গেঁথে মেজে বানিয়ে ফেলা।

এখন জগদীশ মহা ফাঁপরে পড়েছেন ওই মেজেটার হিসেব নিয়ে। ক-হাত বাই ক-হাত ঘর! তার মেজেটা জুড়ে যে টাকা পোঁতা হয়েছে সে কত টাকা!

পুরনো তস্য পুরনো সব খাতাপত্তর থেকে মজুর মিস্ত্রিদের দৈনিক 'রোজ'-এর হিসেব।

মুকুন্দর 'রোজ' ছ'আনা, তার মজুরের রোজ দু'আনা। কিন্তু ক'দিন লাগল আর কতগুলো টাকা পুঁতল তার হিসেব পাচ্ছেন না কোথাও। তাই রাত জেগে সেই আদ্যিকালের খেরো বাঁধানো খাতা নিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজছেন।

ছেলে বলল,—অত হিসেবের কী আছে?

যখন খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগবে, তখন কেউ পাহারা দিতে উপস্থিত থাকবে। যত যা ওঠে।

তবে সত্যি টাকার এখন অনেক দাম। ষোলো আনার টাকা এখন অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।

কিন্তু কে বসে পাহারা দেবে?

ছেলে বলে,—আপনার ঠাকুমার আবদারকেও বলিহারি যাই বাবা! ঘরের মেজেয় টাকা গেঁথে বাহার করে দিতে হবে? তিনি টাকা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটা-চলা করবেন! অথচ টাকা নাকি মা-লক্ষ্মী, পা ঠেকে গেলে নমস্কার করতে হয়!

ছেলের বউ বলল,—সেকালের জমিদার-গিন্নিদের অহঙ্কারই ছিল আলাদা। সত্যি, টাকা মাড়ানো উচিত?

জগদীশ বললেন,—এ প্রশ্ন আমিও করেছিলাম বাবাকে। বাবা বলেছিলেন, দেবমন্দিরে তো থাকে, এ তো ওঁর পুজোর ঘর লক্ষ্মীর মন্দির।

এখন পরের জেনারেশান বুঝুক ঠ্যালা।

বাড়ি বেচে দেব চুকে যাবে। তা নয় তার মেজে খোঁড়াও, টাকা ওপড়াও। তো গুনে দেখেছেন কখনো কত টাকা গাঁথা আছে?

ওরে বাবা! কে আবার কবে গুনে দেখতে গ্যাছে?

কিন্তু এখন ভাবছেন জগদীশ, গোনা থাকলে ল্যাঠা মিটে যেত। খোঁড়াখুঁড়ির মিস্ত্রিকে কড়া করে বলে দেওয়া যেত, দ্যাখো বাপু, এই আছে, একটুও যেন এদিক ওদিক না হয়।

সে শাসানির উপায় নেই।

তবু এই সত্তর বছরের জগদীশ এই রাত বারোটায়, বাড়ির সবাই যখন ঘুমে কাদা, আর রাস্তা নিঃঝুম, তখন পালঙ্কের ওপর বাবু গেড়ে বসে সামনে খেরোর খাতা খুলে সেকালের নায়েব গোমস্তাদের 'অনিন্দনীয়' ছাঁদের হাতের লেখা সব হিসেবপত্তর তন্ন তন্ন করে দেখছেন, যদি কোথাও লেখা থাকে কত টাকা পোঁতা হয়েছিল।

হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়ে গেল। আর চোখ যেন সেখানেই ফ্রিজ হয়ে গেল।

'কলিকাতার ট্যাকশাল হইতে আনয়ন করা হইল দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা। ও...সের গিনি।'

কত সের? বোঝবার উপায় নেই। ঠিক সেইখানটাই পোকায় খেয়েছে।

দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা!...এত সের গিনি!

হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে গেল জগদীশপ্রতাপের। কর্তারা সব যা ইচ্ছে করে গ্যাছেন। আর পরের জেনারেশানের ভাগ্যে শুধু ডুগডুগি।

টাকার হিসেব, গিনির হিসেব সংখ্যা দিয়ে নয় মণ সের দিয়ে। সাপের পা দেখেছিলেন সব।

টাকা থাকলেই এইভাবে নয়ছয় করতে হবে?

রাগের চোটে জগদীশপ্রতাপের মনে পড়ল না, চিরকালের পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল থেকে তাই হয়ে আসছে। টাকা থাকলেই নয়ছয়। শুধু 'নয়ছয়ের' রীতি-পদ্ধতিটাই স্থান কাল পাত্রের হিসেবে আলাদা হয়।

নবাব বাদশারা তাঁদের জুতোয় হীরে মুক্তো সেঁটে বাহার করতেন। খানদানি বাবুরা পোষা বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। আর বড়মানুষের গিন্নিরা শখ হলে তাঁর দাঁড়ের ময়নাপাখি, টিয়াপাখির দাঁড়টাকে সোনা দিয়ে গড়িয়ে নিতেন।

তা শুধু সে যুগে কেন, এ যুগেও কি টাকা নয়ছয়ের কোনো হিসেব আছে? হুঁ! এ যুগে অত সোনারুপোয় বাহার না দিক, শখের খাতিরে লাখ লাখ টাকা আকাশেই উড়িয়ে দেয়, বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কে ভাবতে যাচ্ছে দেশের কত লোক খেতে পাচ্ছে না!

রাগটা একটু প্রশমিত হলে জগদীশপ্রতাপ ভাবলেন, তা তো হল, রুপোর টাকা

ঠাকুরঘরের মেজেয় আর দেওয়ালের খানিকটা পর্যন্ত যে গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা তো চাক্ষুষই দেখেছি। তবে টাকাগুলোর ওজন যে দেড় মণ তা কে ভাবতে গ্যাছে?

বেশ মনে পড়ে, ছেলেবেলায় জগদীশ আর তাঁর পিঠোপিঠি দিদি ঠাকুরঘরে গেলেই গুনতে বসতেন, কতগুলো টাকা মহারানী-মার্কা, কতগুলো ন্যাড়ামাথা রাজা-মার্কা।

কিন্তু গিনি?

গিনি তো কোথাও সাঁটা থাকতে দেখেননি।

অথচ খাতায় পষ্ট করে গিনির হিসেব লেখা রয়েছে। গিনি...সের। লক্ষ্মীছাড়া কাগুজে পোকারা কেটে খাবার আর জায়গা পায়নি! ওই 'কত' সের তার সংখ্যাটি হাপিস করে দিয়েছে!

তা দিক, ছিল তো কিছু। দশ সের পাঁচ সের এক সের আধ সের যা হোক। কিন্তু কোথায় তারা?

মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে খাতাটা আরো তন্ন তন্ন করে দেখছেন, হঠাৎ যেন সামনে একটা ছায়া পড়ল।

কে?

চমকে উঠলেন জগদীশ।

—কে? কে? কে রে ব্যাটা!

ব্যাপারটা কী? যতই রোগা সিড়েঙ্গে আর তোবড়ানো চেহারা থোক, রাত বারোটায় বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কীভাবে?

তবে কি আজ জগদীশ দরজায় খিল লাগাতে ভুলে গেছলেন? কিন্তু এমন ভুল তো হয় না জগদীশের।

গিন্নি চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ার পর থেকে তো একাই থাকতে হয়। কাজেই বেশ জম্পেশ করেই সব বন্ধ করে তবে শোন।

ওঃ! দৈবাৎ একদিন হয়তো ভুলে গেছেন, আর অমনি ব্যাটা চোর এসে সেঁধিয়েছে? কোথায় ওৎ পেতে বসে থাকে?

যাক, সাবধানতার ঘাটতি নেই জগদীশের। কারণ এই ঘরেই লোহার সিন্দুক। এখন সব ব্যাঙ্কের ভল্টে।

সংসারের সব গয়নাপত্তর আর দরকারি কাগজপত্তর ভল্টে রেখে আসার ফ্যাসান হয়েছে। জগদীশ এ ফ্যাসানের গাড্ডায় পড়তে রাজি নয়। ছেলে বউ যত বলে বলুক।

চোখের সামনে না থাকলে জিনিসটা ক্রমেই ছায়া-ছায়া হয়ে যাবে না? একবার খুলে দেখবার ইচ্ছে হলে দেখতে পাবেন?

কেন, মজবুত সিন্দুকের অভাব আছে বাজারে?

আর তোমার গিয়ে ব্যাঙ্কেই বা কী নিরাপদ? রাতদিনই তো 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি'! ব্যাঙ্ক লুঠ!

জগদীশের মাথার শিয়রে লোহার সিন্দুক, মাথার বালিশের তলায় রিভলবার।

এর থেকে বুকের বল আর কিসে?

'কে?' বলে উঠেই জগদীশ হাত বাড়িয়ে মাথার বালিশের তলায় হাত চালিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের মূর্তিটা বলে উঠল, উঁ-হু-হু, দোহাই বড়কত্তা, অমন কাজটা করবেন না! ওতে আপনার লোকসান বৈ লাভ হবে না!

বড়কর্তা!

তার মানে চেনা চোর?

অর্থাৎ প্রতাপপুরের জানিত?

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—হুঁ, তা সত্যি। তোর মতন একটা ছুঁচোকে মেরে গুলিটাই লোকসান। তো কে তুই?

আজ্ঞে কেউ না।

কেউ না? বটে? তামাসা? তবে তো দেখছি মরণের কাল ঘনিয়ে এসেছে তোর। ইষ্টনাম স্মরণ কর ব্যাটা। এই চালালাম হাত বালিশের তলায়।

আজ্ঞে বড়কর্তামশাই, আমাদের মতো নিকৃষ্ট জনের আবার ইষ্টোনাম! আর বাঁচাই বা কী, মরাই বা কী!

—হুঁ। খুব কথা জানিস দেখছি। তো বড়কর্তা বললি কোন্ সুবাদে?

—শৈশবাবধি শুনে আসছি, ওই সুবাদে।

—বুঝেছি। প্রাতাপপুরের 'মাল'। তো বাঘের ঘরে ঘোগ? বড়কর্তার ঘরে এসে সেঁধিয়েছিস চুরি করতে?

—আ ছি ছি! অমন কথা বলবেন না কর্তা। আপনার ঘরে সেঁদুব চুরির মতলবে?

—বটে? তা মাঝরাত্তিরে দোরটা একটু খোলা পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে এসেছ কীসের মতলবে যাদু? কর্তার পা টিপে দিতে? না পাকাচুল তুলে দিতে?

—হিসেবের খাতার পাতা পোকায় কেটেছে দেখে চিন্তা করছিলেন, তাই ভাবলুম...

জগদীশ সোজা হয়ে চড়া গলায় বলে ওঠেন,—বলি তুই লোকটা কে? নাম কী?

—আজ্ঞে জ্ঞানাবধি তো দেখে আসছি, সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে।

—বটে, নাম জানো না? সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে? সেটাই জানো? পাজি বদমাস। একটা কথার সিধে জবাব দিতে জানো না? বলি প্রতাপপুরে তো মেলাই বৈকুণ্ঠ, টাকাওলা বৈকুণ্ঠ, খোঁড়া বৈকুণ্ঠ, কুমীর-খাওয়া বৈকুণ্ঠ...

—আজ্ঞে ওনারা তো সব সজ্জন। এ হতভাগা হচ্ছে মুকুন্দ মিস্ত্রির ব্যাটা, মিস্ত্রি বৈকুণ্ঠ। এখন অবশ্য পাবলিকে বলে...

—অ্যাঁ, কী বললি?

স্প্রিঙের পুতুলের মতো ছিটকে খাড়া হয়ে বসলেন জগদীশ।

—চালাকি খেলতে আসার আর জায়গা পাওনি ব্যাটা! রাগের মাথায় আপন খুড়োর মাথাটা থান ইঁটের ঘায়ে গুঁড়ো করার দায়ে তার না ফাঁসি হয়েছে! আর তুমি ব্যাটা...

লোকটা অকুতোভয়ে বলে,—আজ্ঞে ফাঁসি হয় নাই, একথা তো বলি নাই। সেই তরেই তো বলতে যাচ্ছিলুম, এখন পাবলিকে নামটা উচ্চারণ করতে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠ'। আমার ঘরখানাকে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠর বাড়ি'।

—'ওঃ! তা ফাঁসির ফাঁস আলগা করে ফেলে জেলখানা থেকে পালিয়েছিলি তাহলে? বদলে আর একটা নকল বৈকুণ্ঠ ফাঁসিতে ঝুলল?

—আ ছি ছি!—শিউরে উঠল লোকটা।

—ওকথা বলবেন না কর্তা। প্রাণে বড় দাগা পাব। তবে হ্যাঁ, ঘটছে এমন ঘটনা রাতদিনই। জেলখানার মধ্যে কতজনই যে অপরের নামে 'প্রক্সি' দিয়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে,

পাথর ভাঙছে, তার সীমেসংখ্যা নাই। আর ফাঁসি? তাও মাঝে মধ্যে দু-একটা প্রক্সি চলে বৈকি! তা ওসব হল গে পয়সাওলা লোকদের কারবার। হতভাগা বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রির বলে পান্তোর ওপর নুন জুটত না, সে কিনতে যাবে ফাঁসি খাবার মানুষ! ছ্যা!

—থাম বদমাস! কেবল প্যাঁচানো কথা!

জগদীশ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠে রিভলবারটা টেনে বের করে বাগিয়ে ধরে বললেন,—সিধে জবাব দে। বলি ফাঁসিটা শেষতক হয়েছিল, না রদ হয়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে গরিবগুর্বোর কী আর শাস্তি রদ হয় বড়কর্তা? সেও বড় মানুষদের ঘটনা!

—ফের? বললাম না, সিধে জবাব দিবি! বলি ফাঁসিটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হয়েছিল?

—ওই তো রাজমিস্ত্রি বৈকুণ্ঠের।

—তাহলে তুই কে?

—ওই তো বললুম, আজ্ঞে 'কেউ' বললে ওই বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রি, আবার 'কেউ না' বললেও চুকে যায়।

—আবার!

জোরে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলেন জগদীশপ্রতাপ, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। তার সঙ্গে জগদীশ-এর ছেলে অমিতপ্রতাপের উদ্বিগ্ন গলার স্বর,—বাবা, দরজাটা একটু খুলুন তো!

জগদীশ একটু হতচকিত হলেন। তাহলে তো ঘরের দরজা বন্ধই আছে। ভুলে খুলে রাখিনি। তবে? ওই পাজিটা অথবা পাগলটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মাথায় খেলে গেল, তার মানে ব্যাটা আগেই কোনো ফাঁকে ঢুকে পড়ে খাটের নীচে-টিচে লুকিয়ে ছিল। জগদীশ যখন খাওয়া-দাওয়া করছিলেন, তখন তো আর দরজায় তালা লাগিয়ে যাননি। এবার থেকে তাই করতে হবে দেখছি।

তা এসব তো মুহূর্তের চিন্তা।

খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে দরজাটা সাবধানে খুলতে গেলেন, পাছে বৈকুণ্ঠবাবাজী ফস্ করে বেরিয়ে সটকান দেন।

কিন্তু এ আবার কী, কোন্ ফঁকে ফট্ করে কোথায় গা-ঢাকা দিল?

কোথায় আর, সেই খাটের নীচেই! আচ্ছা থাকো বাবাজী, দ্যাখো তোমার কী হয়!

দরজাটা খুলেই নিজেই প্রশ্ন করলেন,—কী হল?

ছেলে বলল,—আমাদের আবার কী হবে? আপনার কী হল তাই জানতে এলাম। মনে হল হঠাৎ যেন কাউকে ধমকে উঠলেন!

জগদীশ মনে মনে হাসলেন, বাবুর কান মাঝরাতেও খাড়া!

—ও হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম বটে।

—এত রাত্তিরে—বন্ধ ঘরের মধ্যে কাকে?

খাটের নীচের দিকে একটু অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একটু মজা করার গলায় বললেন,—'কাউকে' বললে কাউকে, আবার কাউকে নয় বললে নয়!

ছেলের পিছু পিছু বউমাও চলে এসেছে। দুজনে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করে বলল,—মানে?

—মানে এক ব্যাটা ছুঁচো এসে জ্বালাচ্ছিল...

বউমা ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলল,—এই ওপরের ঘরে ছুঁচো!

—সেই তো...

ছেলে চমকে উঠে বলল,—বাবা, আপনার রিভলবারটা খাটের ওপর পড়ে আছে কেন?

—ওই তো...

জগদীশ অম্লান গলায় বলেন,—ভেবেছিলাম, জ্বালাচ্ছে নিকেশে করে দিই। তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করল না।

কী কাণ্ড! ঘরের মধ্যে ছুঁচো!

তো সেটাকে তো তাড়াতে হবে।

ছেলে ফটাফট ঘরের আর দুটো আলো জ্বেলে দিয়ে আলনায় ঝোলানো জগদীশের শৌখিন ছড়িটা নিয়ে খটাখট খটাখট তাড়া লাগিয়ে ঘর তোলপাড় করে তুলল।

খাটের নীচেটায়?

তা দেখল বৈকি। টর্চ জ্বেলে হেঁট হয়ে।

ইত্যবসরে নাতিও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

—কী হয়েছে দাদু? এত রাত্তিরে সবাই হট্টগোল করছ কেন?

দাদু অপ্রতিভাবে বলেন,—কিছু না দাদু, ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচো ঢুকে পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতেই—কিন্তু কোন্ ফাঁকে সে হাপিস হয়ে গেল। অবশ্য ছুঁচো, 'চোর বললে চোর'।

—চোর, অ্যাঁ! কই? কোথা দিয়ে পালাল?

জগদীশের চিন্তার সুর,—তাই তো ভাবছি।

—বাবা!

অমিতপ্রতাপ বলল,—আপনি রাত অবধি জেগে জেগে ওইসব পচা পচা ভুতুড়ে খাতাগুলো দেখতে বসবেন না। খাতাগুলো দেখলেই তো আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ছেলের কথা শেষ হতে না হতেই বউমা বলে উঠলেন,—আর রাতের খাওয়াটা একটু হালকা হলে ভালো হয়। আপনাদের প্রতাপপুরের পাঠানো ক্ষীরের সঙ্গে খাজা কাঁঠাল পাকা আম আর তার সঙ্গে খাস্তা লুচি চটকে মেখে—ওঃ! আমার তো দেখেই পেটব্যথা করে, খাবার কথা ভাবতেই পারি না।

—হা-হা-হা!

জগদীশপ্রতাপ এই মাঝ-রাত্তিরেই ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

—তা পারবে কোথা থেকে?—জন্মাবধি তো ভয়ে ভয়ে না খেয়ে খেয়ে নাড়ি মরা! আমার ঠাকুর্দা একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন, বুঝলে? একাসনে বসে এককুড়ি বড় সাইজের ল্যাংড়া আম। আর একটা ছাগলও একা সাবাড় করতে পারতেন। আমার ঠাকুমাটিও কম যেতেন না। বলতেন, আমের সময় আবার দু-বেলা ভাত খেয়ে মরি কেন?...তাই তাঁর রাতে ভাতের পাট থাকত না। দাসীরা কেউ একজন এক ঝুড়ি আম, এক গামলা জল আর

একখানা বঁটি নিয়ে বসত। আর ঠাকুমা বসতেন একখানা খালি থালা আর এক কাঁসি ভর্তি মাছের ঝাল নিয়ে। একটির পর একটি আম ছাড়িয়ে পাতে দিয়ে চলেছে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন। গোনাগুণতির ধার ধারতেন না। তার সঙ্গে ওই সর্ষেলঙ্কায় গরগরে মাছের তেলঝালের টাকনা। নিজের গাছের আম, পুকুরের মাছ, গোনাগুণতি কীসের?

নমস্য মহিলা!

বউমা বললেন—তা না হলে আর অমন সব প্ল্যান মাথায় আসে? টাকা পুঁতে পুঁতে ঠাকুরঘরের মেজে বাঁধাব! 'মোজাইক' কোথায় লাগে? এ একেবারে বাহারের চূড়ান্ত!

জগদীশ আবার হেসে উঠলেন।

—তা যা বলেছ বউমা। এই তো হিসেবের খাতায় সেই টাকার ওজন দেখে চক্ষু-চড়কগাছ।...কলিকাতার ট্যাকশাল হইতে দেড়মণ রৌপ্যমুদ্রা আনয়ন করা হইল।

—দেড়মণ রৌপ্যমুদ্রা! শুনে মাথা ঘুরছে বাবা। শুতে যাচ্ছি।

বউমা নেমে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নাতিও। শোনা গেল প্রশ্ন করছে,—'মণ' কী মামণি?

অমিতপ্রতাপ বলল,—রিভলবারটা আমায় দিন তো।

—কেন? তুমি আবার কী করবে?

—থাক না আমার কাছে। আপনি ঘুমের ঘোরে কী করতে কী করে বসবেন, বলা যায়!

—হা-হা-হা। ভাবছিস বাবাটার মাথার গোলমাল হয়েছে? নারে বাবা না। এখন পরামর্শ দে দিকি, বাড়িখানা হাতছাড়া করার আগে ওই দেড়মণ রৌপ্যমুদ্রা উপড়ে নেওয়া যাবে কীভাবে?

—কাল দিনের বেলা ভাবা যাবে বাবা। এখন শুয়ে পড়ুন।

আবার ফটাফট জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে ছেলে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ তাড়াতাড়ি দরজায় খিল ছিটকিনি দুটো লাগিয়ে, ঘুরে এসে আবার খাটের ওপর বসতেই যেন খিক খিক করে একটা হাসির শব্দ পেলেন।

—কে? কে? অ্যাঁ!

—খুব বেপোটে পড়ে গেছলেন বড়কর্তা, কী বলেন? ছেলে বউমা নাতি পর্যন্ত ছুঁচো খুঁজতে হাল্লাক!

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—তোর রকমসকম দেখে তো তোকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না বাপু?

—আজ্ঞে আপনি হচ্ছেন বিবেচক্‌খোণ বেক্তি।

—ফাঁসি খেয়ে মরে অপদেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি?

—আহা বড় ভালো নামটি তো দিলেন কর্তা। অপোদেব্‌তা। বাড়তি একটা 'অপো' থাকলেও দেব্‌তার দরে চলে এলুম তালে?

—হুঁ। তো হঠাৎ আমার এখানে কেন বাপু? মতলবটা কী?

জগদীশ রিভলবারটা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে খাতার বোঝা বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বাবুগেড়ে গুছিয়ে বসে বললেন,—শুনি তোর মতলব?

—কোনো কুমতলোব নাই বড়কর্তা। সাত পুরুষে আপনাদের খেয়ে মানুষ। ওই যে আপনার ঠাকুরমার টাকা পোঁতা ঘর, ও ঘর তো আমারই বট্‌ঠাকুর্দা বানিয়েছিল।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? কে সে? নামটা কী?

—আজ্ঞে বাবার জ্যাঠা। নাম ছিল পাতকীচরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মিস্ত্রিদের মধ্যে খুব নামডাক ছিল। দেবমন্দিরের কাজকম্মো তো অহিন্দু মিস্ত্রি দিয়ে চলত না।

—বটে নাকি? খুব যে ভাঁওতা দিচ্ছিস! ঘরবাড়ি মঠমন্দির পুজোর দালান এসব কারা বানায়? আমি তো বরাবর দেখছি রসিদ মিস্ত্রি আর তার ছেলে বাহার মিস্ত্রি...

—বড়কর্তা, সে সব হল গে পুজোপাঠ আরম্ভ হবার আগে। আরম্ভ হয়ে যাবার পর কোনো কাম পড়লেই ডাক পড়ত এই আমাদের।

—বুঝলুম। তো তোর বাবার জ্যাঠাকে তুই দেখেছিস?

—দেখেছি। একশোর কাছে বয়েস হয়েছিল। নামিয়ে বসিতে দিতে হত। আমারে খুব ভালোবাসত। যত গপ্পো আমার সঙ্গে।

—হুঁ, শৈসব থেকে এঁচোড়ে পাকা! তো খাতায় হিসেব দেখছি, রুপোর টাকা, ওজন দেড়মণ—তা থেকে কতটি সরিয়েছিল ঠাকুর্দা, সে গপ্পো কখনো করেছিল তোর কাছে?

সিড়েঙ্গে বৈকুণ্ঠ সড়াৎ করে একদম সোজা।

—ছি ছি! অমন পাপকথা মুখে আনবেন না হুজুর। এ কী বৈঠকখানা ঘরের কাজ-কাম? যে তা থেকে কিছু মারবে? ঠাকুরঘর বলে কথা!

—ওঃ, ধর্মজ্ঞানী পুরুষ! তো বল দিকিনি গিনির হিসেবটা কী? সেও নিশ্চয় তোর বড় ঠাকুর্দা...

থামতে হল।

আবার দরজায় ধাক্কা।

—বাবা! দরজাটা আর একবার খুলুন তো।

জগদীশ গলা নামিয়ে বললেন,—আজ আর হল না। এখন যা। কাল আবার আসিস।

উঠে দরজা খুললেন জগদীশ।

—কী? আবার কী হল?

—কী হল সেটাই তো জানতে এসেছি।

ছেলের স্বর বেজায় বিরক্ত উত্তেজিত।

—মনে হচ্ছে আপনমনে কথা বলে যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি তখন থেকে।

জগদীশ আত্মস্থ।

বললেন,—কইছি তাই নাকি?

—মাঝরাত্তিরে একা একা কথা বলবেন মানে? ঠিক আছে, আমি এ ঘরে শুই।

—মাথা খারাপ? তুই আবার কী করতে শুতে আসবি?

—তো আপনি যদি...

—আরে বাবা, কিছু না কিছু না। আমার মেজ মামা বলত, রাত্তিরে যদি ঘুম না আসে তো খবরদার ঘুমের ওষুধ খেতে যাবি না। একমনে ধারাপাতে পড়া 'কড়াকিয়া', 'গণ্ডাকিয়া', 'কাঠাকিয়া' আউড়ে যাবি। দেখবি ঘুম 'বাপ বাপ' করে আসতে পথ পাবে না! যা যা, শুতে যা। আর কথা-টথা শুনতে পাবি না।

ছেলেকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, কাল আবার আসতে বললাম, আসবে তো? এলে খুব ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হবে।

কিন্তু আচ্ছা, ভূত-টুত বলে তো মনে হচ্ছে না। কই কথা বলতে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল না। ভয়-ভয় ভাবও করছিল না। অথচ ঢোকা বেরোনোও তো টের পাওয়া গেল না। একা আমার বুড়ো চোখ নয়, আরো তিন জোড়া চোখ তল্লাস করেছে ঘর।

আমাদের প্রতাপপুরে ছেলেবেলায় দেখেছি গোষ্ঠ তেলির ঠাকুমা একটা বিদ্যে জানত—ধুনোপড়া।

চোরের নাকি গোষ্ঠর কাছ থেকে ওই ধুনোপড়া শিখে নিয়ে চুরি করতে বেরোত।

না এল তো চুকেই যাবে। না এলে বোঝাই যাবে চোর-জোচ্চোর। আর একে...

ঘুমটা সবে এসেছে, কানের কাছে মাছির পাখা নাড়ার মতো ফিসফিশ শনশন শব্দ।

—বড়কর্তা! ঘুমালেন নাকি?

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন জগদীশপ্রতাপ।

নাইলনের মশারি। মশারির মধ্যে থেকেই দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি।

—একী, অ্যাঁ। আবার এক্ষুনি এলে যে? বলে দিলাম না কাল আসতে?

বললেন অবশ্য খুব চাপা গলায়।

—আমাদের আবার কালাকাল। কীবা রাত্রি কীবা দিন। ...ওই গিনিগুলোর হদিস জানতে বট্‌ঠাকুর্দার সন্ধানে ঘুরপাক খেলুম কে জানে কতক্ষণ! তারপর মনে হল 'কাল'কে এসে গেছে। কিন্তু এসে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল বড়কর্তা।

—কেন, হঠাৎ খারাপ কেন?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের বড় সন্দ বাতিক। এখনো ভাবতেছিলেন ব্যাটা বৈকুণ্ঠ ভূত না চোর।

—বটে! আমি কী ভাবছিলাম তা টের পেলি কী করে?

—সেই তো। ওই রোগেই তো সুখ-শান্তি গ্যাছে। না বলতেই সব বুঝে ফেলি।

—দ্যাখ্ বাপু, ভূতে বিশ্বাস অবিশ্বাস্ সবটাই মনুষ্য-জন্মের একটা রোগ। তুই যখন বেঁচেছিলি, সহজে ভূত বিশ্বাস করতিস?

—বেঁচে? হতভাগা বৈকুণ্ঠ আবার বেঁচেছিল কবে বড়কর্তা? মরেই তো থাকত!

—নাঃ, সোজা করে কথা বলার ধাতই নেই তোর। তা তোর বটঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হল?

—হওয়া খুব কঠিনই হচ্ছিল। ওনারা হচ্ছেন পুণ্যাত্মা। স্বর্গে ওনাদের পুণ্যির ওজন মাফিক সব মহল্লা। আমাদের মতন গলায়-দড়ি পাপীতাপীদের সেখানে পৌঁছবার পাশপোর্টই নাই। তবে...

—থাম থাম। ওই মহল্লাটা কী জিনিস?

—ও আজ্ঞে অন্য কিছু না, নামী দামি শহরের 'এসটাইল'। কে কোন্ মহল্লায় ঠাঁই পেয়েছে জানতে পারলেই বোঝা যাবে কার কতটা পুণ্যি। এই যেমন আপনাদের রাজধানীতে—বাসার ঠিকানা শুনলেই বুঝতে পারা যায় কে রাজা, কে গজা। কে মন্ত্রী, কে যন্ত্রী। কে অফিসার, কে কেরানী। কে এলেমদার, কে জমাদার।

—বটে! রাজধানীর এত কথা জানিস তুই?

—আজ্ঞে এখোন তো আর রেলভাড়া লাগে না। সর্বত্র চড়ে বেড়াই আর দেখি।

—হুঁ। কিন্তু ঠাকুর্দার কাছে যেতে পাশপোর্ট লাগে কেন?

—সে আজ্ঞে ওখানকার আইন। বড় কড়া আইন। তবে কিনা পাহারাদারকে একটু ঘুষটুস দিয়ে...

—অ্যাঁ, স্বর্গেও ঘুষ?

—আজ্ঞে কর্তা, ঘুষ আর কোথায় নাই?

খিক খিক একটু হাসির শব্দ।

—থাক। আমার আর জেনে কাজ নেই। ঠাকুর্দা কী বলল তাই বল্?

—বলল? বলল যে...

ঘর অন্ধকার। জোর পাখার বাতাসে মশারি উড়ছে।

বৈকুণ্ঠকে এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার যাচ্ছে না।

—কী রে, কী হল? থেমে গেলি যে? চলে গেলি নাকি?

—আজ্ঞে চুপ চুপ। সিঁড়িতে যেন কার পদশব্দ শুনলুম। আবার না ছোটকর্তা দরজা ধাক্কায়!

—ধাক্কাক। আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। ক্যানেস্ত্রা পিটোলেও ঘুম ভাঙবে না।

—বলল, গিনি ছিল আজ্ঞে সাড়ে বারো সের। ঠাকুর্দার সাক্ষাতে ওজন হয়েছিল।

—সা-ড়ে বা-রো সের গিনি! বৈকুণ্ঠ, এখন তার কত দাম?

—জানা নাই বড়কর্তা। চিরদিনই আদার বেপারি, জাহাজের খবর রাখি না।

—আমিই বলছি—অনে-ক দাম। হিসেব করতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে। ছেলেকে জিগ্যেস করতে হবে। এখন কী উপায়, তা বল।

—আজ্ঞে কীসের উপায়?

—ওই সোনারুপো উদ্ধারের।...বৈকুণ্ঠ, চুপ করে গেলি যে! এই বৈকুণ্ঠ!

—আজ্ঞে ঠাকুর্দাকে শুধিয়ে এলাম।

—এক্ষুনি শুধিয়ে আসা হয়ে গেল?

—তা হলে আজ্ঞে। মনোরথে চেপে যাওয়া-আসা। তো ঠাকুর্দা বলল, উদ্ধারের উপায় কম। মিস্ত্রি উপড়োতে গেলে চুরি করে সাফ করে দেবে।

—আরে বাবা, পাহারা থাকবে।

—যে রক্ষক সেই ভক্ষক হবে। আর চুরি না করে তো গরমেন্টের ঘরে খবরটা তুলে দেবে। ব্যাস্, পুলিশি জেরা চলবে। এত অবধি তোমার পূর্ব-পুরুষ পেল কোথায়? হিসেব দাও। না দিতে পারলে গারদে যাও।

—ওই সেরেছে! তাহলে তো বড় বিপদ!

—আজ্ঞে আপনাকে আর আমি কী বলব? তবে ঠাকুর্দা বলত, সম্পদই বিপদ। তো এখন ঠাকুর্দা বলল, বড়কর্তাকে বলগে, যা করার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে। পুরাতন অট্টালিকাখানা দানই করুন আর বেচেই দিন, যেন চটপট করেন।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—কেন রে বাপু? বড়কর্তার দিন ফুরিয়ে আসছে নাকি?

—আহা! ঈশ্! তা নয় আজ্ঞে। ওই অট্টালিকাখানারই দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোনোদিন না হুড়মুড়িয়ে ভূমিসাৎ হয়। মেরামত তো হয় নাই দু-পুরুষ কাল।

—মেরামত! হুঁ, ও বিশাল বাড়ি মেরামত করা বড় সোজা! তা বলে এক্ষুনি পড়ে যাবে?

—আজ্ঞে যেতে পারে তো! আমি বলি কি কর্তা, এই মওকায় বেচে দিন। মোটা টাকা ঘরে আসবে। তারপর হিঃ হিঃ, পড়ুক হুড়মুড়িয়ে। আপনার কাঁচকলা।

জগদীশ রেগে বললেন,—তার মানে জেনে বুঝে লোকঠকানো!

—তো সে যদি বলেন তো, একখানা ধম্মোপুণ্যির আখড়া খুঁজে দানই করে দ্যান।

—তাও তো ঠকানো। জানছি যখন পড়ে যাবে।

—বাঃ, তাতে আর ঠকানোটা কোতা? তানারা তো গাঁটের কড়ি খরচ করে কিনচেন না? তানাদের আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। মাঝখানে দু-দিন নেত্য করে নেবে। তাছাড়া আপনার পুণ্যির ছালাখানায় মোটা খানিকটা পুণ্যি জমা পড়বে।...যখন দানটা করবেন, খপরের কাগজের লোক আসবে। ফটাফট ফটক উঠবে।

জগদীশ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

—বৈকুণ্ঠ, বললি তো ভালো। কিন্তু ওই দেড় মণ মহারানী-মার্কা টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনি...

—ও আর চিন্তা করে লাভ নাই বড়কর্তা। ওসব তো আপনার গাঁটের থেকে যাবে না? যাদের গেল তেনারা তো আগেই পগার পার হয়ে গ্যাছেন।

—ঠিক। ঠিক। অ্যাঁ, তাই তো! বাঁচালি রে বৈকুণ্ঠ।

—তো এখন যাই বড়কর্তা। আবার আসতে অনুমতি করবেন তো? আপনার কাচে এলে বড় সুক পাই।

বড়কর্তা কিছু জবাব দেবার আগেই দরজায় টোকা।

ব্যাস্। বড়কর্তা চাদর মুড়ি দিয়ে সপাট।

টোকা। টোকা থেকে ধাক্কা। ধাক্কা থেকে দুমদাম। দমাস-দমাস।

কিন্তু জগদীশ তো অঘোরে নিদ্রায়।

তবে ভয় খাবার কিছু নেই। নাক ডাকছে বাঘের গর্জনে।

সকালবেলা ছেলে বলল,—বাবা, আপনাকে আর একা শুতে দেওয়া হবে না।

—কেন? কেন হে বাপু? আমার অপরাধ?

—আপনি রাতের বেলা সারারাত বিজবিজ করে কথা বলে চলেন। এটা একটা ব্যাধি।

—ব্যাধি! ওঃ! সারারাত বিজবিজ? বলি নাক ডাকায়টা কে?

—সেটা শেষ রাতে। আপনার ঘরে আজ থেকে কেউ শোবে।

—কেউ শোবে না। আমি আজই প্রতাপপুরে যাচ্ছি।

—প্রতাপপুরে? একা?

—একা ছাড়া...তোমাদের সময় আছে? দ্যাখার অভাবে ওই বিশাল অট্টালিকাখানা ধ্বংস হতে বসেছে। ওটাকে আমি ওখানেই হরিসভায় দান করে আসব।

ছেলে-বউ দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠল।

—অ্যাঁ! দান করে আসবেন? এখন ওর দাম কত ভেবেছেন? আমি তো একটা খদ্দের ঠিক করার চেষ্টায় আছি।

জগদীশ মনে মনে বলেন, লবডঙ্কা। তোমার চেষ্টা সফল হবার আগেই বাড়ি মাটিতে শোবে।

মুখে বললেন,—না না। পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা হবে না। দানই করে দেব।

—আর ওই ঠাকুরঘরের মেজেয় আর দেয়ালে পোঁতা খাঁটি রুপোর টাকাগুলো?

—পারিস তো উপড়ে নিয়ে আয়।

—সে তো আর সোজা কথা নয়!

—তাই তো বলছি, যেটা সোজা সেটাই হোক। দান করে দেয়া হোক। আমি আজই যাচ্ছি। একটা টিকিট আনিয়ে রাখি।

ছেলে রাগমাগ করে বলল,—একটা নয় দুটো। আপনাকে তো আর এই বয়েসে একা ছাড়তে পারি না।

—তবে চল্। ভালোই হবে। ফটাফট ফটো ওঠবার সময় তোরও উঠে যাবে। কাগজে ছাপা হবে।

শুনে বউ বলল,—আমিও যাব।

—বেশ তো। চলো একবার শেষ-মেষ ভিটেবাড়ির দেশে।

যাওয়া হল।

দিব্যি সমারোহ করেই যাওয়া হল। ছেলে বউ নাতি চাকর সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু...

কারোর ভাগ্যেই কি ফটো-ওঠা জুটল, কাগজে ছাপা হতে?

নাঃ! কপালে ঘি না থাকলে কি হবে?

সন্ধেরাতে পৌঁছলেন। সাপখোপের ভয়ে পুরনো বাড়িতে না উঠে ওখানের বাসিন্দা জ্ঞাতিদের বাড়িতে উঠলেন। ব্যাস্, সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি। ওঃ কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! যেন প্রলয়কাল ঘনিয়ে এসেছে। শুধু তো বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে ঝড়ও।

জ্ঞাতিরা বলল,—দশ বছরের মধ্যে এমন ঝড়বৃষ্টি দেখিনি। গাছ উপড়ে পড়ছে মড়মড়িয়ে, ঘরের চালাটালা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দু-দশ মাইল দূরে। দীঘি-পুকুরের জল উপচে উঠে লোকের বাড়িতে ঢুকে আসছে। কতজনের কত কী ঘটল।

আর?

আর সেই রাতেই ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি। বৈকুণ্ঠর ঠাকুদ্দা যার ওয়ার্নিং বেল দিয়েছিল।

কিন্তু সকালবেলা দিব্যি আকাশ ফর্সা।

ঘুম-টুম নেই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লেন জগদীশ।

দেখলেন সেই দেড়মণ রুপোর টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনির ওপর হাজার হাজার মণ ইঁট পাথর লোহা-লক্কড়ের স্তূপ।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন জগদীশ।

কানের গোড়ায় সহসা ফিসফিস।

—মন খারাপ করবেন না বড়কর্তা। ভবিষ্যৎকালে কোনো একদিন এই স্তূপ খনন হয়ে এইসব পুরাতন মুদ্রা...ইয়ে আবিষ্কার হবে।

—তুই? তুই এখানেও?

—আজ্ঞে আমাদের তো এখানেই বাস। তিন পুরুষ যাবৎ।

জগদীশ এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকেই দেখতে পেলেন না। কেউ কোথাও নেই।

—দিনের বেলাও ঘুরিস?

—আজ্ঞে আমার আবার দিন আর রাত! আমি তো সবসময়ই আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

—তা তোর ঠাকুদ্দার দেখছি গণনায় ভুল। পুণ্যির ছালাটা ভরতে তো তর সইল না।

—না হোক গে, এমনিই আপনার অনেক আছে। পরের ধনে পোদ্দারি করে লাভটা কী? সে ভদ্দরলোক যা করে মঙ্গলের জন্যেই করে।

—সে 'ভদ্দরলোক'! মানে?

—কর্তা, আমার আবার ও নামটা মুকে আসে না। আপনি নিজে বুজে নিন।

রাত তখন এগারোটা

বিমল মিত্র

ঘটনাটি ঘটল রাত এগারোটার সময়।

কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি। দেশ বলতে যেখানে আমি জন্মেছি। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

সকাল পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। তাতে গেলে মাজদিয়া রেলস্টেশনে সকাল আটটা-সাড়ে আটটা বেজে যায়। স্টেশনে নেমে আরো পাঁচ ক্রোশ হাঁটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও তাতে সময় লাগে আরো দু'ঘণ্টা।

তারপর আর একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে সকাল ন'টায়। তারপরে দুপুর দুটোয়। তারপর সন্ধে ছ'টায়।

সন্ধে ছ'টার ট্রেনে গেলে রাত ন'টায় পৌঁছতে পারা যায় মাজদিয়া স্টেশনে। কিন্তু তাতে গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যায় বলে সাধারণত সে ট্রেনে যাই না।

তখন আমি কলকাতার একটা মেসে থেকে পড়াশুনা করি। প্রত্যেক শনিবার দিন দুপুর দুটোর ট্রেনে বাড়ি যাই। তাতে সুবিধে খুব। ট্রেনে ভিড়ও কম থাকে। আর সন্ধের আগেই বাড়িতে পৌঁছনো যায়।

কিন্তু সব সময়ে সে ট্রেনে যাওয়ার সুবিধে হয় না। লেখা-পড়া ছাড়া ফুটবল খেলার নেশা ছিল। রবিবার দিনটায় দেশে না কাটিয়ে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটাতে বেশি ভালো লাগে।

কোনো শনিবার বাড়িতে না গেলে বাবার চিঠি আসে। লেখেন—"তুমি গত শনিবারে বাড়ি আস নাই কেন? আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। তোমার শরীর খারাপ হইল কিনা ভাবিয়া খুবই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ উত্তর দিবে..." ইত্যাদি...

আমি বাবার একই সন্তান। বাবার বয়স হয়েছে। আমাকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্ন সব কিছু। আমি বড় হব, আমি মানুষ হব, আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করব।

কিন্তু ততদিনে আমারও একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে। দেশের চেয়ে কলকাতার আকর্ষণই আমার কাছে বেশি। আমার জন্যে বাবা মোটা হাত-খরচ পাঠান। সেই টাকা দিয়ে আমি ময়দানে ফুটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, আবার কখনো-কখনো বা সিনেমা দেখতে যাই। কলকাতার জীবন গ্রামের জীবনের মতো একঘেয়ে নয়। সেখানে চারদিকে এঁদো পানা-পড়া পুকুর আর কেবল ক্ষেত-খামার আর বন-জঙ্গল। আমাদের মতো যাদের অবস্থা ভালো নয় তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কেবল বারোয়ারি-তলায় বটগাছের ছায়ায় হারু মুদির দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারে। তাস খেলে। আর আমি গেলে তারা আমার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। কারোরই কোনো কাজ নেই। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে তারা কলকাতায় আসতে পারে না। সে-পয়সা তাদের নেই। তাই আমাকে তারা একটু-একটু হিংসেও করে। আমার চাল-চলন, জামা-প্যান্ট দেখে তারা অবাক হয়ে যায়! আমার জুতো, আমার চুল-ছাঁটা, আমার সাবান-মাখা দেখে তাদের তাক লেগে যায়। কারণ আমাদের গ্রাম এমন এক গ্রাম যেখানে শহরের কোনো সভ্যতা ঢোকবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন নসুকাকা। আসল নাম বোধহয় ছিল নৃসিংহ ভট্টাচার্য। বাবা তাঁকে নসু বলে ডাকতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যজমানদের বাড়িতে গিয়ে পুজো করে বেড়াতেন। বড় ভালো লোক। আমি দেশে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন, "কি রকম লেখা-পড়া হচ্ছে বাবা? ভালো তো?"

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। বলতাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বলতেন, "হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বাবা। এখন দিন-কাল খুব খারাপ আর কলকাতা শহরে যে-রকম গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-বাস শুনেছি, খুব সাবধানে চলা-ফেরা করবে।"

নসুকাকা আমাদের দেশের নামকরা পুরুতমশাই। তিনি না হলে কারোরই কোনো পুজো-আচ্চা হত না। কেউ হাতেখড়ি দেবে তাতেও যেমন তাঁর ডাক পড়ত, আবার তেমন কারো বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন হবে তাতেও তাঁকে চাই। তারপর আছে বারোয়ারিতলার দুর্গাপুজো, কালীপুজো থেকে আরম্ভ করে তিন ক্রোশ দূরে

জমিদারবাবুদের বাড়িতে যত উৎসব, যত বিয়ে, ব্রত-উদ্‌যাপন, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত।

তা এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। কিন্তু এই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও যে ঘটনাটা ঘটল তার কথাই বলি।

কলকাতায় তখন আমার স্কুলের পরীক্ষা চলছিল। তিন সপ্তাহ দেশে যেতে পারিনি। বাবাকে সে-কথা লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে পারব না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিন শনিবার। মেসে এসে ভাবলাম দুটোর ট্রেন ধরব। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রাত জেগে পড়বার পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম দেয়াল-ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। আমার বন্ধু, যে আমার পাশের বিছানায় শুত, সেও দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে হল, সর্বনাশ! দুটোর গাড়ি তো কখন ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে তো সেই সন্ধে ছ'টার আগে দেশে যাবার আর কোনো গাড়ি নেই। সে-গাড়িতে গেলে দেশের বাড়িতে পৌঁছতে তো সেই রাত এগারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই সেদিন কেন জানি না আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম ট্রেনটা হয়তো একটু দেরি করেই মাজদিয়াতে পৌঁছবে। তার মানে যখন পাঁচ ক্রোশ হেঁটে বাড়ি পৌঁছব তখন রাত বারোটা বেজে যাবে।

বাবা হয়তো বকাবকি শুরু করে দেবেন। বলবেন—দুপুর দু'টোর ট্রেনে আসতে পারলে না?

কিন্তু না, ট্রেনটা ঠিক সময়েই মাজদিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এদিককার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হলাম। গেটের বাইরেই বাজার। অত রাত বলেই বাজারে লোকজনের ভিড় বেশ পাতলা। তাড়াতাড়ি বাজার ছাড়িয়ে বড়-রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম একটা সাইকেল রিক্‌শা ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছব।

কিন্তু কোনো রিক্‌শাওয়ালাই অত দূরে যেতে চাইলে না। বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও কাউকে রাজি করাতে পারলাম না।

সবাই-ই এক কথা বললে—অত দূরে সওয়ারি নিয়ে গেলে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে যাবে।

আমি বললাম—আমি তোমাদের ডবল ভাড়া দেব।

তবু কেউ যেতে রাজি হল না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম। হাতে অনেক জিনিস ছিল আমার। বাবা কাশির ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে লিখেছিলেন। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবার আগে ওষুধের দোকান থেকে তা কিনে নিয়েছিলাম। মা'র জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম হাজার মলম। মা'র পায়ে হাজা হয়েছিল। তারপর গামছা কিনেছিলাম একটা বাবার জন্যে। আরো অনেক খুচরো-খুচরো জিনিস কিনেছিলাম—যা যা বাবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রাস্তা দিয়ে একলা-একলা হেঁটে চলেছি। চারদিকে নিশুতি অন্ধকার। রাতে গ্রামের

লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ভোর-ভোর উঠতে হয় সকলকে। বড় বড় গাছগুলোকে দূর থেকে অন্ধকারের পাহাড় বলে মনে হচ্ছে!

খানিকদূর গিয়েই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেল। অমাবস্যার রাত। আকাশে শুধু তারাগুলো জ্বলছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া কানে আসছে। দু'একটা কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল। কিন্তু আমাকে চিনতে পেরে আবার চুপ করে গেল। তবু আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিন্তু কিসের যে ভয় বলতে পারব না।

একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে কয়েকটা বড়-বড় বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছে। শনি-মঙ্গলবার ও-জায়গাটায় হাট বসে। হাট বেলাবেলি শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে দু'চারটে ছোট-খাট দোকান। তারাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন যে-যার বাড়ি চলে গেছে।

বহুদিন আগে ওই বটগাছের ডালে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সে ছোটবেলাকার ঘটনা। কিন্তু তখন থেকেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই দিনের বেলাতেও কেমন গা-ছমছম করত। আর তখন তো রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

মনে পড়ল, বাবা-মা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে রাত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবছেন আমি আর আসব না। মা আমার জন্যে ভাত রান্না করে বসে ছিল।

বাবা বলছেন—আর কেন বসে আছ, খোকা আজকে বোধহয় এল না, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

মাও বোধহয় তখন খেয়ে নিয়েছে। তারপর আমার কথা ভাবতে-ভাবতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই হেঁটে চলেছি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। রাস্তাটা গিয়ে নলগাড়ির নাবালে গিয়ে মিশেছে। আগে এখানে একটা নদী ছিল। আগে যখন নদীতে জল ছিল তখন খেয়া নৌকোয় এপার-ওপার করতে হত। কিন্তু এখন নদীটা শুকিয়ে গিয়েছে। সেখানে ঢালু জমিতে এখন চাষ-বাস হয়। তারই একপাশ দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা হয়েছে। বর্ষার পর গরম পড়াতে রাস্তায় আবার ধুলো জমেছে। এখানকার লোক তাই ও-জায়গাটার নাম দিয়েছে, 'নলগাড়ির নাবাল'।

আমি ঢালু রাস্তায় নামতে লাগলাম। তারপর সামনের দিকে নজর পড়তেই যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল।

দেখলাম ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি ঢালু রাস্তা দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি আর এগোলাম না। এগোতে ভয় করল। ও কি তবে সেই লোকটার মূর্তি যে একদিন বটগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল? তখন কত লোকের মুখে শুনতে পেতুম যে, সে নাকি এই অঞ্চলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়! কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি।

হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে মূর্তিটা কথা বলে উঠল।

বলল, "কে ওখানে?"

আমি কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু একটু থেমে বললাম, "আমি।"

"আমি কে?"

বলতে-বলতে মূর্তিটা আমার দিকে আরো এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনে মুখের কাছে এসে বললে, "কে, কে তুমি?"

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি তখন। কিছুই জবাব দিতে পারলাম না সেই মুহূর্তে।

মূর্তিটা জিজ্ঞেস করলে, "ও, তুমি! বিমল! ধীরেশদার ছেলে?"

আমার তখন যেন জ্ঞান ফিরে এল। চিনতে পারলাম মূর্তিটাকে। আমার নসুকাকা।

বললাম, "নসুকাকা, আপনি?"

নসুকাকা বললেন, "হ্যাঁ, আমি। তা তোমার আসতে দেরি হল যে?"

বললাম, "দুপুরে দু'টোর ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই সন্ধে ছ'টার ট্রেন ধরে আসছি।"

নসুকাকা বললেন, "তা আজকে এই অমাবস্যার রাতে না এলেই পারতে! এই রাত-বিরেতে কি আসা ভালো? আমাদের গাঁয়ে যে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল। তারপর ক'দিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—।"

বললাম, "তা আপনি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন?"

নসুকাকা বললেন, "জমিদারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের খুব অসুখ, আমাকে সেখানে গিয়ে শান্তি-সস্তেন্ করতে হবে। যত রাত্তিই হোক আমাকে যেতেই হবে। তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা। তাই খেয়ে নিয়েই দৌড়চ্ছি। আমাকে যে ডাকতে এসেছিল তাকে বলেছি, তুমি এগিয়ে যাও, আমি খেয়ে উঠেই যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে রাস্তায় কোনো লোকের দেখা হয়নি?"

আমি বললাম, "কই, না তো—"

নসুকাকা বললেন, "তা রাত্তির বেলা হয়তো ঠাহর হয়নি তোমার। তা তুমি বাবা একলা এত রাত্তিরে এসে ভালো করোনি। চলো, আমি তোমাকে গাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।"

বললাম, "আপনি আবার কেন এত কষ্ট করতে যাবেন। আর আপনারও তো তাড়াতাড়ি আছে।"

নসুকাকা বললেন, "সে কী কথা! এই এতরাতে তোমাকে কি এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? শুনলে ধীরেশদা যে আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তুমি খোকাকে ওই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে চলে গেলে?"

কী আর করা যাবে। ওদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা, আর তিনি কিনা নিজে আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে চান?

রাস্তায় যেতে-যেতে নসুকাকা বলতে লাগলেন, "তুমি তিন সপ্তাহ বাড়ি আসনি, সেজন্যে ধীরেশদা খুব ভাবছিলেন। কলকাতায় থাক তুমি, তোমার বয়েস হয়েছে। তোমার যত পড়াশোনাই থাক, হপ্তায় একদিনের জন্যে বাবা-মাকে দেখতে আসতে পার না? তুমি যখন বড় হবে, আর নিজে বাবা হবে, তখন বুঝবে ছেলেকে দেখতে না পেলে বাপের মনে কী কষ্ট হয়।"

আমি নসুকাকার কথা শুনে কোনো জবাব দিতে পারলাম না, চুপ করে নসুকাকার

সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। তারপর যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছি তখন নসুকাকা বললেন, "ওই দেখ, তোমাদের বাড়ি, এবার আর কোনো ভয় নেই, আমি চলি, আমার খুব তাড়া আছে।"

বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, "বাবা, বাবা, বাবা!"

বাবা আমার ডাক শুনেই ধড়ফড় করে জেগে উঠেছেন। মা-ও জেগে উঠেছেন।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, "খোকা, তুমি এসে গেছ? কোন্ ট্রেনে এলে? দুপুরের ট্রেনে আসতে পারলে না?

বললাম, "দুপুরবেলা পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই—"

বাবা বললেন, "তা বলে সন্ধের ট্রেনে আসতে হয়? জানো বাড়ি পৌঁছাতে রাত এগারোটা বেজে যাবে। তা ছাড়া গাঁয়ে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল, তা জানো? ক'দিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—"

আমি বললাম, "আমি তো তা জানতুম না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল নসুকাকার সঙ্গে, তিনিই আমাকে নিজে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

"নসু? নসুকাকা?"

বললাম, "হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে নলগাড়ির নাবালে দেখা হয়ে গেল। তিনি জমিদারবাবুদের বাড়ি যাচ্ছিলেন, তাদের বড় ছেলে মরো-মরো, তাই তিনি শান্তি-স্বস্ত্যেন্ করতে সেখানে যাচ্ছিলেন।"

বাবা আমার দিকে হতবাকের মতো চেয়ে রইলেন।

মা-ও অবাক।

বাবা বললেন, "তুমি ঠিক দেখেছ? তোমার নসুকাকা? তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন? তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছ?"

আমি বললাম, "বা রে, আমি ভুল দেখব কেন? আমি নসুকাকাকে চিনতে পারব না?"

বাবা বললেন, "কিন্তু তোমার নসুকাকা যে পরশুদিন মারা গিয়েছেন, আমরা যে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সৎকার করে এলুম—"

কুয়াশা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মহীতোষের ডায়রির কয়েকটা পৃষ্ঠা। সেই ডায়রি থেকে থানার দারোগা ইউসুফ তাঁর এক বন্ধুকে যেমনটি বলেছিলেন তার জবানিতে :

ভয়ে গা'টা একেবারে কাঁটা দিয়ে উঠল মহীর।

তার সহজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার দিয়ে বুঝতে পারছে, এমনটি হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়। তথাপি দু-চক্ষু দিয়ে একটু আগে যা সে দেখেছে, সেটাকে অস্বীকারই বা করে কি করে? এবং একেবারে ভূতুড়ে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়েই বা দেয় কি করে?

কিন্তু আশ্চর্য! ভাবতে গেলে এখনো গা-টা যেন শিরশির করে উঠছে; গায়ের লোমগুলো সোজা হয়ে উঠছে। টেবিলের উপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের শিখাটা আরো একটু উসকিয়ে দিল মহী। আলোর শিখাটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই উজ্জ্বল আলোয় তীক্ষ্ণ প্রখর অনুসন্ধানী চোখে আরেকবার মহী ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, ঘরের প্রতিটি বস্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নাঃ, নেই কিচ্ছু। অথচ এই একটু আগেও দেখেছে সে স্পষ্ট।

যদিও ঘরের আলোটা ঈষৎ কমানো ছিল, তবু সেই কম আলোতেই সে স্পষ্ট দেখেছে। চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। আলোটা চোখে লাগছিল বলে সামান্য একটু কমিয়ে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইটা পড়ছিল মহী।

সুন্দর কমনীয় চুড়িপরা দু'খানি হাত কে যেন তারই ঠিক পাশে টেবিলের উপর রাখল।

চুড়ির মিষ্টি মৃদু আওয়াজেই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। একদৃষ্টে কতকটা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গেই তার সামনে টেবিলের 'পরে ন্যস্ত চুড়িপরা হাত দুটির দিকে তাকিয়ে ছিল মহী। কী সুঠাম হাত দুটি, টেবিলের 'পরে ন্যস্ত হয়ে আছে। যেন কোনো দক্ষ শিল্পীর সাদা ক্যানভাসের উপরে অঙ্কিত দুটি বঙ্কিম রেখা। কিন্তু চোখ তুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহী যেন বিস্ময়ে ও ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কেউ নেই তার সামনে-পার্শ্বে, পশ্চাতে বা ঊর্ধ্বে।

একা সে ঘরের মধ্যে আলোর সামনে বসে আছে। আশ্চর্য, তবে এই একটু আগে সে কার দুটি হাত দেখেছিল তারই সামনে টেবিলের উপর ন্যস্ত?

এতক্ষণে তার মনে পড়ে, বাড়িটা চমৎকার খোলামেলা দেখে অথচ কম ভাড়ায় সে যখন ভাড়া নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, দু'খানা বাড়ির পরের বাড়িটাতে যিনি থাকেন, রাধানাথবাবু—তখন বারবার করে মহীকে বলেছিলেন, 'ও বাড়ি ভাড়া নেবেন না মহীবাবু, অনেকদিন থেকেই বাড়িটা অমনি খালি পড়ে আছে—'

'কেন বলুন তো?' বাড়িটা তো দেখলাম চমৎকার!'

'হ্যাঁ, বাড়িটা দেখতে-শুনতে চমৎকার সন্দেহ নেই, তবে—' রাধানাথবাবু কেমন যেন ইতস্তত করতে থাকেন।

'তবে কি মশাই?'

'মানে বাড়িটা সম্পর্কে নানা রকমের কথা শোনা যায়। এর আগেও দু-একজন এসেছেন, তবে টিকতে পারেননি এক রাত্রের বেশি।'

'তাই বুঝি অমন জায়গায় চমৎকার বাড়িটা আজও খালিই পড়ে আছে?' হাসতে হাসতে মহী বলে, 'কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কি বলতে পারেন? ভূতের উপদ্রব আছে বুঝি বাড়িটায়?'

জানি না মশাই। তবে বছর দুই অমনি 'ভেকেন্ট'ই পড়ে আছে এবং পূর্বে যে দু-চারজন ভাড়াটে এসে উঠেছিল, তারা এক রাত্রির বেশি থাকতে পারেনি—'

হাসতে হাসতে মহী জবাব দিয়েছিল, 'দেখুন রাধানাথবাবু, গত এক মাস ধরে বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি সারাটা শহর প্রায় চষে ফেলেছি, কিন্তু আমারও পক্ষে মানানসই হয়—একটু হাওয়া-বাতাস পেয়ে হাত-পা মেলে থাকতে পারি, এমন একটি বাড়ি আজ পর্যন্ত দেখলাম না, যা ভাড়া পাওয়া যাবে। অথচ আমার ও আমার বুড়ি মা'র পক্ষে ওপরে-নিচে চারখানা ঘরওয়ালা ওই বাড়িটা একেবারে ঠিক যেমনটি খুঁজছিলাম, তেমনি। ভূতের ভয়ই থাক আর যাই থাক, এ সুযোগকে হারাতে আর যেই পারুক, আমি পারব না।'

'কিন্তু—'

'না রাধানাথবাবু, ভূতের ভয় তেমন আমার নেই।' মহী হাসতে হাসতে বলে, 'তাছাড়া সাতাশ বছর বয়স হল, আজ পর্যন্ত বহুকথিত ওই জীবটির দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটেনি, বাড়ি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সৌভাগ্যটা যদি একান্তভাবে উপস্থিত হয়, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাটাও সেই সঙ্গে মিটে যাবে।'

এমন কি বাড়ির মালিক কান্তিবাবুও মহীর বাড়ি-ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং ভাড়ার কথা বলতে বলেছেন, 'দেখুন আগে আপনার বাড়িটা স্যুট করে কিনা, তারপর ভাড়ার কথা না হয় ঠিক করা যাবে।'

প্রত্যুত্তরে মহী বলেছে, 'না কান্তিবাবু, সেটি ঠিক হবে ন। শেষকালে হয়তো একটা অসম্ভব ভাড়া হেঁকে বসবেন—যা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না!'

'না, না, ভয় নেই আপনার। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। যদি আপনার থাকা হয়ই, যা ন্যায্য ভাড়া মনে করেন, তাই না হয় দেবেন—'

'মনে থাকে যেন—'

'থাকবে।'

সমস্ত বিচার-বিবেচনা-বুদ্ধি-শক্তি যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে মহীর।

একটু আগে যা সে স্পষ্ট দেখেছে, কোনো মতেই সেটাকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারছেই বা কই?

আবার মহী বইটা খুলে বসল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার তার মন বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন হল। আধঘণ্টাও বোধ হয় হয়নি, মহী আবার দেখল, চুড়িপড়া পেলব হাত দুটি এবারে তার ডান দিকে টেবিলের 'পরে ন্যস্ত হল।

এবার কিন্তু মহী চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ন্যস্ত হাত দুটির দিকে। কী সুন্দর চাঁপার কলির মতো হাতের আঙুলগুলো। বাম হাতের অনামিকায় একটি রক্তপ্রবালের অঙ্গুরীয়। কী সুন্দর নখাগ্র! যেন নখাগ্রগুলোকে কে চন্দনের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে!

অনিমেষে তাকিয়েই থাকে মহী।

'কি দেখছেন অমন করে? ভয় করছে না আপনার?' সুমিষ্ট মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

তথাপি মহী চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করে না। কী জবাব দেবে ভাবছে। চোখ তুলে চেয়ে দেখবে নাকি?

'কী দেখছেন, বললেন না তো?'

মহী চোখ তুলে তাকাতে লাগল। নাঃ, কেউ নেই। তবে কি সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা ভৌতিক? অবিশ্বাস্য?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত দেড়টা বাজে।

মহীর কেমন যেন একটা রোখ চেপে গেছে মাথার মধ্যে। আবার সে পড়বার ভান করে, কিন্তু পড়ায় মন আর বসে না। দু-চক্ষুর দৃষ্টি তার অধীর অপেক্ষায় টেবিলের দিকে নিবদ্ধ।

তৃতীয়বার। পূর্ববৎ হাত দুটি ন্যস্ত হল টেবিলের উপরে এবং এবারে বাম দিকে প্রথমবারের মতো।

'আশ্চর্য, আপনি এখনো ঘরের মধ্যে রয়েছেন! ভয় পাননি?' সেই মেয়েলি কণ্ঠ।

'ভয়! ভয় কেন পাব?' মহী এবারে জবাব না দিয়ে পারে না।

'ভয় পাবেন না মানে? আচমকা এমনি দুটো হাত দেখলে সবাই তো ভয় পায়! তাছাড়া—'

'তাছাড়া কি?'

'আমার হাত দুটিই যে আপনার ওই কণ্ঠদেশকে মৃত্যুক্ষুধায় টিপে ধরবে না, কেমন করে জানলেন?'

এবার আর মহী না হেসে থাকতে পারে না। হেসে ওঠে।

'হাসছেন যে? বিশ্বাস হল না বুঝি আমার কথা? জানেন, এই হাতে আমি গলা টিপে আমার স্বামীকে হত্যা করেছি? চেয়ে দেখুন, দেখুন আমার আঙুলের বাঁকানো ধারালো নখরে এখনো রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে—'

চমকে উঠল মহী। তবে কি নখাগ্রে ও রক্তের দাগ? চন্দন নয়—রক্তচন্দন নয়?

আবার মুখ তুলে তাকাল মহী এবং পূর্ববৎ এবারেও দেখলে যে ঘর শূন্য।

এবং হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে দপদপ করে বারকয়েক কেঁপে উঠে টেবিল-ল্যাম্পটা

নিভে গেল। ঘরটায় ভরে উঠল নিশ্ছিদ্র আঁধার। একটা চাপা বিষাক্ত নিশ্বাস যেন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে জমাট বেঁধে উঠছে।

'কেন বার বার আমাকে দেখবার চেষ্টা করছেন? আমাকে দেখা যায় না। দেখতে পাবেন না আমাকে, কেবল আমার হাত দুটি ছাড়া। স্বামী-হত্যাকারিণীর মুখ দেখাও যে পাপ, জানেন না এ কথাটা? শোনেননি?'

অন্ধকার যেন কথা বলে উঠল।

'কিন্তু আপনি যেই হোন,—ভূত, প্রেতযোনি—জানবেন ভয় দেখিয়ে আমাকে এ-বাড়ি থেকে সরাতে পারবেন না।' মহী এবার বলে ওঠে।

'তাড়াব কেন, থাকুন না। তা আপনাকে একা দেখছি? বিয়ে-থা করেননি বুঝি?'

'আপনারা যে লোকে বাস করেন শুনি, সব কিছুই তো আপনারা দেখতে পান, জানতে পারেন। এ কথাটা জানেন না?'

'কে বললে আপনাকে, আমরা সব কিছু জানতে পারি? আমাদের গতিবিধি শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বেশি একচুলও এদিক ওদিক আমরা এগোতে পারি না।'

'তাহলেও বায়ুর জগতে শুনি লোকে বলে আপনারা বায়বীয় দেহ ধরে বাস করেন, সেদিক থেকে গতি আপনাদের যত্র-তত্র হওয়ারই তো কথা।'

'সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। সব কিছুই আমাদের বায়বীয় হলে কি হয়, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হিংসা-ক্রোধ সবগুলো অনুভূতিই ঠিক আপনাদের মতোই আমাদের বর্তমান।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

হঠাৎ আবার মহী প্রশ্ন করে : 'এই যে একটু আগে বলছিলেন, আপনি আপনার স্বামীকে হত্যা করেছেন, কিন্তু কেন বলুন তো?'

'সকলকেই যে একঘেয়ে পতিব্রতা হতে হবে, তারই বা কি মানে আছে? তাই পতিঘাতিনী হয়েছি আমি!'

'অদ্ভুত যুক্তি আপনার!'

'অদ্ভুত কিনা জানি না, তবে একজন পুরুষকে হত্যা করে আমার আশ মেটেনি—'

'বলেন কি?'

'হ্যাঁ, আপনাকেও হত্যা করবার আমার ইচ্ছে হচ্ছে!'

'সর্বনাশ! আপনার ইচ্ছাটি তো ভালো নয়!'

'তাই বলে ভয় পাবেন না যেন। এতক্ষণ ধরে আপনার মতো কেউ এর আগে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি—'

'না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, নয় কি?'

'কিন্তু আর নয়, ভোর হয়ে এল। এবারে আমি আজকের রাতের মতো আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। কিন্তু সকালে উঠেই পালাবেন না তো?'

'পালাব কেন? পালাবার কোনো কারণই ঘটেনি!' মৃদু হেসে মহী বলে।

পরের দিন সকালে সারাটা রাত্রি জাগরণের পর একটু বেশি বেলা পর্যন্তই মহী ঘুমিয়েছিল। বাড়িওয়ালা কান্তিবাবুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল তার।

কান্তিবাবুও একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, পরম নিশ্চিন্তে মহীকে ঘরের মধ্যে এত বেলা অবধি ঘুমোতে দেখে।

'ব্যাপার কি? এত সকালে?'

'সকাল কোথায় মহীবাবু? বেলা দশটা বাজে যে! এখনো উঠছেন না দেখে—'

'ভয় নেই কান্তিবাবু, অপনার ভূতের সঙ্গে কাল রাত্রে বেশ আমার, যাকে বলে ভাবই জমে গেছে। বেশ বাড়িটি আপনার। শুধু খোলামেলাই নয়, চমৎকার একটা রোমান্সও এ বাড়িটার সঙ্গে আপনার জড়িত আছে।'

প্রচুর যেন হাসির কথা বলেছে মহী, এইভাবে সে হাসতে লাগল।

কিন্তু পরের দিন রাত্রি সওয়া একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কারো দর্শন পাওয়া গেল না, কতকটা যেন হতাশার সঙ্গেই মহী শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল এবং গত রাত্রের সেই অদ্ভুত অভিসারিণীর কথাই ভাবতে ভাবতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একটা শ্বাসরোধকারী অসোয়াস্তি ও বেদনায় ঘুমটা ভেঙে গেল। কঠিন হাতের দশ আঙুল দিয়ে কে যেন শায়িত তার গলা টিপে ধরেছে। উঃ, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!

তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে আততায়ীর হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করতেই মহী চমকে উঠল। চুড়ি-পরা দুটি হাত লৌহবেষ্টনীতে তার গলা চেপে ধরেছে। নিয়মিত বারবেল-মুগুর ভাঁজার হাত মহীর। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সেই অদৃশ্য আততায়ীর লৌহবেষ্টনী হতে নিজেকে যেন মুক্ত করতে পারে না সে।

একি! ক্রমে শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে যে! একটু হাওয়া। একটা গোঁ গোঁ শব্দ মহীর কণ্ঠ হতে বের হবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ এমন সময় সেই অদৃশ্য হস্তের লৌহবেষ্টনী গলার ওপর থেকে শিথিল হয়ে গেল এবং শোনা গেল একটা সুমিষ্ট হাসি। খিল খিল করে আনন্দে কে যেন হাসছে।

টনটন করছে ব্যথায় এখনো মহীর গলাটা।

'কেমন লাগল?' গত রাত্রের সেই নারীকণ্ঠ।

মহীর গলা দিয়ে কোনো স্বর তখনো বের হয় না।

পুনরায় নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন হল, 'রোমান্সটা উপভোগ করলেন কেমন? নারীর পেলব বাহুতে চিরদিন আপনারা পুরুষেরা কামনার পরশই পেয়ে এসেছেন, মৃত্যুর পরশটা পেলব হাতে কেমন লাগল?'

মহী তথাপি কোনো জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

'কী ভাবছেন?'

'ভাবছি বিংশ শতাব্দীর নারী আপনি, না, সেই আদিম প্রস্তর যুগের বন্য নারী আপনি—'

'বিংশ শতাব্দীর তন্বী নারীও তো সেই আদিম যুগেরই প্রবাহিকা। সেই রক্ত-মাংস, সেই সব—কেবল মাঝখানে হাজার হাজার বছরের একটা ব্যবধান মাত্র।'

'আপনি রাক্ষসী!'

'তবু নারী। এই নারীর জন্যই কি যুগে যুগে হ্যাংলা পুরুষ আপনারা আমাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াননি? এবং এখনো বেড়াচ্ছেন না? যাকগে সে কথা, গলায় আপনার হাত বুলিয়ে দেব?'

'রক্ষে করুন, যে নমুনা একটু আগে দেখিয়েছেন, আর হাত বুলিয়ে কাজ নেই!'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

'ঠিক এমনি—এমনি ব্যথা লেগেছিল আমার, জানেন? আমাকেও যে গলা টিপে হত্যা করেছিল!'

'কে? কে হত্যা করেছিল আপনাকে?'

'কে আবার! আপনার মতো এক পুরুষ। কিন্তু আমিও তাকে হত্যা করেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি। অনেক আশা করে সে এ-বাড়ি করেছিল। ভেবেছিল, আমাকে হত্যা করে আমারই অর্থে তৈরি এই বাড়িতে তার মনোমত বিবাহিত প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে সুখে বসবাস করবে। নর্তকী-অভিনেত্রীর ভালোবাসা নাকি ভালোবাসাই নয়। কিন্তু নর্তকী-অভিনেত্রী করেছিল অর্থের লোভে কে আমাকে? বিবাহিত স্ত্রীকে অর্থের লালসায় রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিয়েছিল কে?'

'আপনার কাহিনীটা শোনবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

'আমার কাহিনী! কোনো নতুনত্ব নেই তাতে। বাংলাদেশে অনেক হতভাগিনীরই জীবনে অমন ঘটনা ঘটেছে। কী শুনবেন সে-পুরাতন কথা!'

'কিন্তু তা যেন হল, আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে আমার পেছনে আপনি লেগেছেন কেন?'

'সব পুরুষই সমান—গোত্র এক।'

'তাহলে আপনি চান যে, এ-বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাই?'

'তা কেন যাবেন? থাকুন না!'

'কিন্তু যেভাবে একটু আগে আজ আমাকে আপনি অভ্যর্থনা করেছিলেন, তার পরে আর থাকতে যে সাহস হচ্ছে না!'

'এই না আপনার ভূতের ভয় নেই বলছিলেন?'

'ভূতের ভয় যে নেই, সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আপনার মতো পেত্নীকে এড়িয়ে চলাই মঙ্গল নয় কি?'

'আমি পেত্নী! জানেন, একদিন আমাকে একটিবার রঙ্গমঞ্চে চোখের দেখা দেখবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহ ভরে যেত?'

'তখন তো আপনি পেত্নী ছিলেন না।'

'ভারি দুঃসাহস তো আপনার! এখুনি যদি আবার আপনার গলা টিপে ধরি?'

'সত্যি সত্যিই ধরবেন নাকি?'

'অসম্ভব নয় কিছু।'

'শুনুন তাহলে, আমি এইমাত্র মনে মনে একপ্রকার স্থির করেছি কি জানেন?'

'কী?'

'এ বাড়ি আমি ছাড়ব না—'

'আমার হাতে মরতে চান নাকি?'

'ক্ষতি কি! সে একটা বিচিত্র নাটকীয় মৃত্যুই হবে। একদিন না একদিন মরতে তো হবেই।' তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টে মহী প্রশ্ন করে, 'ঘরটা বড় অন্ধকার, আলোটা জ্বালাব?'

'আলো জ্বাললেই আমাকে চলে যেতে হবে—'

'তাই তো আমি চাই।'

'কেন, আমাকে কি আপনি সহ্য করতে পারছেন না?'

'না।'

'বেশ, তবে আমি চললাম—'

মহী বাড়িটা ছেড়ে গেল না বটে কিন্তু তার যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল।

রাত্রি হলেই তার মধ্যে কেমন যেন একটা আত্মহত্যা করবার দুর্নিবার প্রচেষ্টা জাগে। আচমকা ঘুমের মধ্যে নিজের গলা দু-হাতে টিপে ধরে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করে।

মা এসেছেন।

তিনি বার বার ছেলেকে বলছেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যেতে, কিন্তু মহী কোনোমতেই রাজী হয় না। দিনের বেলাতে সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, কোনো কিছু বোঝবার উপায় নেই। রাত্রি হলেই বাড়ে তার অস্থিরতা। অধীর আগ্রহে ঘরের দরজা বন্ধ করে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করে। কাউকে সহ্য করতে পারে না।

'এমনি করে কতদিন তুমি এখানে থাকবে?'

মহী জবাব দেয়, 'যতদিন না তুমি আমাকে হত্যা করছ—'

'কিন্তু তোমার এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।'

'তবে আমাকে হত্যা করো। আমিও আর সহ্য করতে পারছি না—'

'বেশ, তবে তাই হোক। তোমাকে হত্যাই আমি করব।'

'হ্যাঁ, তাই করো; আমাকে মুক্তি দাও।'

কিন্তু পারে না সে মহীকে হত্যা করতে।

প্রতি রাত্রের প্রতিজ্ঞা পরের রাত্রে শিথিল হয়ে যায়।

একজন করে প্রতিজ্ঞা, একজন করে চেষ্টা।

কাহিনীর শেষে দেখা গেল, একদিন প্রত্যুষে মহীর হিমশীতল মৃতদেহটা তার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। তার গলায় দশ আঙুলের সুস্পষ্ট দাগ।

গলা টিপে শ্বাসরোধ করে কেউ তাকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কে?

তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল এবং টেবিলের ড্রয়ারে তার ডায়রিটা পাওয়া গিয়েছিল।

বাড়িটা আর ভাড়া হয়নি।

মরণের পরে — সুমথনাথ ঘোষ

—কে? কে? ও কে?

ঘুমোতে ঘুমোতে চেঁচিয়ে ওঠে প্রবীর।

গায়ে ঠেলা দিয়ে মা তাকে জাগিয়ে দেন—এই খোকা—খোকা

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে সে বলে—সে কোথায়...কোথায় গেল সে?

নেটের মশারি ফেলা খাটের ভেতর জমাট অন্ধকারে প্রবীরের চোখ দু'টো যেন টর্চের মতো এপাশে ওপাশে কাকে খুঁজতে থাকে।

মা ছেলের গায়ে আবার হাত দিয়ে ডাকেন, এই খোকা, স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি...

মায়ের কথা যেন তার কানে ঢোকে না। সম্মোহিতের মতো মোহাচ্ছন্ন কণ্ঠে তেমনি বলে যায়—এই তো ছিল, কোথায় গেল!

—কার কথা বলছিস? কে কোথায় গেল? মায়ের গলায় এবার বিরক্তি প্রকাশ পায়।

—সেই যে, সেই মেয়েটা। আমায় ডাকছিল হাতছানি দিয়ে। কি সুন্দর ধবধবে তার হাত আর সরু সরু আঙুল!

তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি, মনে করে মা তার হাতটা ধরে আরো জোরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—স্বপ্ন দেখেছিস, না?

—না না, ওইখানে আমাদের ওই দেওয়াল-জোড়া বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিল কালো শাড়ি পরে। মাথায় ছিল ঘোমটা।

কালো শাড়ি পরে!

ছ্যাঁৎ করে ওঠে মায়ের বুকের ভেতরটা। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—মুখটা কার মতো দেখতে?

—তা জানি না। মুখটা তো তার দেখতে পাইনি। ঘোমটা টানা ছিল। শুধু নাকের আধখানা থেকে মুখের নীচের দিক ও পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মুক্তোর মতো দাঁতগুলো ক'বার দেখেছি। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল। কে মা সে?

তখন ওর মা মনে মনে ভাবতে থাকেন, শুনেছি মানুষ যা নিয়ে সারাদিন

গভীরভাবে চিন্তা করে, অবচেতন মনে সেই সব নাকি গোপন থাকে, রাত্রে তাকেই স্বপ্ন দেখে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে প্রশ্ন করলেন—ওই রকম কালো শাড়ি পরা মেয়েকে কি আজ বা অন্য কোনোদিন পথে-ঘাটে দেখেছিলি?

প্রবীর বললে—না মা। তবে হ্যাঁ, এর আগে—বেশ কয়েকদিন আগে যেন ঘুমের ঘোরে ঠিক ওই রকম কালো শাড়ি পরা ছায়ার মতো মূর্তি দু'একবার দেখেছিলুম, মনে হল যেন আমায় ইশারায় সে ডাকছে, কি বলতে চায়। কিন্তু আজকের মতো এত স্পষ্ট আর কখনো দেখিনি।

মা তখন ছেলেকে বোঝান, স্বপ্নে এইরকম অবাস্তব অসম্ভব কত কি মানুষ দেখে, জানিস তো...শুয়ে পড়্! ঝাঁ ঝাঁ করছে রাত...এটা তো বুঝতে পারছিস, এই দোতলার বন্ধ ঘরের মধ্যে কোনো লোক ঢুকতে পারে না?

প্রবীর বলে—হ্যাঁ, তা ঠিক মা। কিন্তু আজ এত স্পষ্ট দেখেছি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে এটা স্বপ্ন...

প্রবীর ভালো ছেলে। কেবল লেখাপড়ায় ভালো নয়, চরিত্রবান, আদর্শবাদী। ওকে দেখলে মনে হয় স্কুলে পড়ে। কিন্তু সে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থী। ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দিল্লিতে থাকেন।

ওর মা তখন প্রবীরকে বলেন—এত রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করতে তোকে বারণ করি, তা কিছুতেই শুনবি না। বেশি পড়ে মাথা গরম হয়ে যায়, তাই যা-তা স্বপ্ন দেখিস। কাল থেকে ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজলেই শুয়ে পড়বি। আমি আলো নিবিয়ে দেব ঘরের।

—বা রে! আর দু'মাস তিনদিন মোটে বাকি পরীক্ষার, এখনই তো বেশি পড়ার সময়।

—পড়ো না বাবা, সারাদিন ধরে যত পারো। রাত্রে কেন? ডাক্তাররা সবাই বলেন—ভালো ঘুম রাত্রে না হলে শরীর খারাপ হয়, ব্রেনও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মাকে প্রবীর খুব ভালোবাসে। তাই মায়ের কাছে না শুলে এখনো তার চোখে ঘুম আসে না। নইলে ওর পরের যে দুটি বোন, তারা তো পাশের ঘরে আলাদা থাকে।

ভাই-বোনদের ভেতর মাঝে মাঝে এই নিয়ে ঝগড়া বাধে। বোনেরা বলে—তুই তো বুড়ো-খোকা, মা'র কাছে না শুলে তাই ঘুমোতে পারিস না!

ছোট বোনের বয়স দশ বছর। রাগটা তারই বেশি দাদার ওপর। কারণ তার ন্যায্য অধিকার থেকে দাদাই তাকে বঞ্চিত করেছে, এই তার ধারণা। এর জন্যে মনে মনে সে দাদাকে বেশ হিংসে করে। অথচ দাদার ওপর মায়ের এই পক্ষপাতিত্ব দেখে ও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, শুধু মনে মনে গজরায়। আর রাত্রে শুয়ে শুয়ে দিদিকে বলে, মা সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে দাদাকে, না রে দিদি?

দিদি বলে—ওকথা বলতে নেই। মা'র কাছে ছেলে-মেয়ে সবাই সমান।

বেশ ক'দিন পরে আর এক কাণ্ড ঘটলো। এবার স্বপ্ন দেখে প্রবীর চেঁচিয়ে উঠলো না। সম্মোহিতের মতো বিছানা থেকে নেমে, ঘরের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে এসে সদর দরজার খিল খুলে একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

আর সেই কালো শাড়ি পরা ঘোমটা দেওয়া মূর্তিটার পিছনে চলতে থাকে, সে যেন এবার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে পথে টেনে নিয়ে আসে।

নীচে সদর দরজায় খুট্ করে শব্দ হতেই হঠাৎ প্রবীরের মায়ের ঘুম ভেঙে যায়।—খোকা, কিসের শব্দ হল রে? আলোটা একবার জ্বালা তো...! বলেই ছেলের গায়ে হাত দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিতে গিয়েই তিনি চমকে ওঠেন...! কোথায় খোকা! এ্যাঁ, বিছানা যে শূন্য! সারা বিছানায় হাত বুলিয়ে দেখেন।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসতেই বুকটা তাঁর কাঁপে থরথর করে। ঘর তো অন্ধকার, তবে খোকা গেল কোথায়? খোকা—খোকা বলে ডাকেন, কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

খাট থেকে নেমে এসে তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালাতেই আরো যেন বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। বাথরুম তো ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন। ঘরের ভেতর দিয়েই ঢোকার দরজা। সেটা বন্ধ। শিকল টানা রয়েছে। তবে এত রাত্রে দরজা খুলে সে কোথায় গেল?

দেওয়ালের বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করছিল। তার দিকে চট্ করে তাকাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। তখন রাত্তির দুটো। ওমা, ওই রাতদুপুরে ছেলে গেল কোথায়!

শিউরে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গ। প্রবীর নাম হলে কি হয়, বড় ভীতুপ্রকৃতির ছেলে। একলা রাত্রে বাথরুমে যেতে গেলেও মাকে সে আগে ডাকে।

কোনোরকমে শাড়িটা গায়ে জড়াতে জড়াতে পট্‌পট্ করে দালান ও সিঁড়ির সুইচগুলো টিপতে টিপতে নীচে নেমে এলেন তিনি। কিন্তু সেখানে এসে সদর দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করতে দেখে ভয়ে যেন হাত-পা তাঁর হিম হয়ে যায়। 'লক্ষ্মণ—এই লক্ষ্মণ বলে চাকরের দরজায় ছুট্‌টে গিয়ে ধাক্কা দিতে থাকেন।

'কি মা!' বলে সে একেবারে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

—দেখ্ তো, দাদাবাবু এই রাত্রে কোথায় বেরিয়ে গেল। ওপরে নেই, বাথরুমে নেই, আমি তন্নতন্ন করে সব খুঁজে দেখেছি। নীচের দরজা খোলা দেখে আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। নিশ্চয় সে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে।

'সে কি!' বলেই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সাদার্ন এ্যাভিন্যুর দীর্ঘ পথটা শূন্য জনহীন, শুধু নিওন বাতির আলোয় জ্যোৎস্নারাতের মতো চারিদিক ঝলমল করছে। সদর থেকে রাস্তায় নেমেই লক্ষ্মণ দ্বিধায় পড়ে যায়। কোন্ দিকে যাবে—সামনে লেকের দিকে, না বাঁয়ে গোলপার্কের দিকে? অথবা ডানহাতি রবীন্দ্র স্টেডিয়াম-এর দিকে?

হতভম্বের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে শেষে লেকের দিকেই ছুটলো লক্ষ্মণ। ও পল্লীগ্রামের মানুষ—অনেক রকম দৈত্যদানো, ভূত-প্রেতের কাহিনী ওর শোনা ও জানা ছিল। নিশির ডাকের কথাও জানে এবং বিশ্বাস করে।

দৈত্যদানারা নিষুতিরাতে নাকি ওদের গাঁয়ে এমনি অনেক মানুষকে ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। তারপর কাউকে গাছের ওপর তুলে সেখান থেকে ফেলে মারে। কাউকে বা পুষ্করিণী জলাশয়ে চুবিয়ে মারে।

লক্ষ্মণের দৃঢ় বিশ্বাস, তেমনি কিছু একটা হয়তো হয়েছে। নইলে দাদাবাবু যা ভীতু, একা এই গভীর রাত্রে এইভাবে কখনই রাস্তায় বেরিয়ে আসতে পারে না!

খানিকটা ছুটে গিয়ে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর 'দাদাবাবু দাদাবাবু' বলে চেঁচিয়ে ডাকলে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে, আবার তেমনি সে ছুটতে লাগল লেকের দিকে।

সুইমিং পুলের কাছাকাছি আসতেই সে চমকে উঠল—ওই তো দূরে মানুষের মতো একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে! হ্যাঁ, ঠিকই। ওই তো দাদাবাবু, মোহাচ্ছন্নের মতো যেন এগিয়ে চলেছে পা-পা করে। তাহলে তার অনুমানই ঠিক। 'দাদাবাবু!' বলে সে যে এত চিৎকার করছে, কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না। কিসের একটা ঘোরে যেন ডুবে আছে।

প্রবীর তখনো তেমনি চলেছে। সত্যি কিছুই সে শুনতে পায়নি। একেবারে জলের ধারে তখন গিয়ে পড়েছিল প্রবীর। তাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একেবারে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরল লক্ষ্মণ। আর দু'পা এগুলেই একেবারে জলের মধ্যে পড়ে যেত।

'কে?' বলেই শিউরে উঠল বটে প্রবীর, কিন্তু তখনো তার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটেনি। তেমনি রয়েছে।

—আমি লক্ষ্মণ, দাদাবাবু! আপনি এখানে কি করে এলেন? ভয়ার্ত স্বরে সে প্রশ্ন করলে।

—কোথায় গেল সে? চোখেমুখে তখনো তেমনি মোহাচ্ছন্ন ভাব।

—কে দাদাবাবু?

—ওই যে কালো শাড়ি পরা সেই মেয়েটা! যার মাথায় ঘোমটা—শুধু মুখের একটুখানি দেখা যায়, ধবধবে সুন্দর হাত দিয়ে যে আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে! কোথায় গেল সে...বলতে বলতে ছোট ছেলের মতো তার গলা দিয়ে যেন কান্নার স্বর বেরিয়ে আসে।

ওর হাত দুটো এবার দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে জোরে করে বারকতক ঝাঁকানি দিলে লক্ষ্মণ। তারপর এক আঁচলা জল খপ্ করে লেক থেকে তুলে নিয়েই ওর মুখের ওপর ঝাপ্টা মারলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহগ্রস্ত, আবিষ্ট ভাবটা কেটে গিয়ে প্রবীর যেন স্বপ্নের রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তব জগতে ফিরে আসে। তখন চারিদিকে একবার সভয়ে তাকিয়ে লক্ষ্মণের হাতটা জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল—এখানে আনলে কেন আমায়? আমার বড্ড ভয় করছে! শিগ্গির বাড়ি চলো—মা কোথায়?

পরের দিন ওদের বাড়ির যিনি প্রবীণ ডাক্তার, তিনি এলেন প্রবীরকে দেখতে। তাকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, এর নাম 'সম্-নাম্-ব্যুলিজম্'। এ একরকম কঠিন ব্যাধি। ঘুমের ঘোরে ঘর থেকে অচৈতন্যের মতো বেরিয়ে যায় রুগী, তারপর এমন সব অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ডকারখানা করে যে বিশ্বাস করা যায় না। আর এভাবে নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু হয়।

ভয়ে ওর মায়ের হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কি হবে তাহলে! ডাক্তারবাবুর কাছে কেঁদে পড়েন। তাঁর একমাত্র ছেলে ওই প্রবীর।

ডাক্তারবাবু বড় বড় 'নিউরোলজিস্ট' ও 'স্পেশালিস্ট'দের নাম করে দিলেন, যাঁরা ওইরকম মানসিক ব্যাধি ও নার্ভের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

বড়লোকের ছেলে প্রবীর। টাকাপয়সার অভাব নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে ওর মা চিকিৎসকের বাড়ি ছুটলেন। এক ডাক্তার ছেড়ে আর এক ডাক্তার—এমনি করে কলকাতার বহু বড় ডাক্তারকে দেখালেন এবং এইভাবে চিকিৎসার পিছনে প্রবীরের মা বহু টাকা খরচ করলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো ফল হল না।

ইতিমধ্যে আরো দু'দিন ওইভাবে ঘর থেকে গভীর রাত্রে নেমে গিয়েছিল প্রবীর। লক্ষ্মণ ইদানীং রাত্রে ঘুমোয় না, জেগে থাকে। তাই যেমন সদর দরজা খুলতে যাবে, অমনি লক্ষ্মণের কাছে ধরা পড়ে ফিরে এসেছে প্রবীর ঘরে।

কিন্তু তার মুখে সেই এক কথা—কোথায় গেল সেই মেয়েটা? সেই কালো শাড়ি পরা ধবধবে ফর্সা মেয়েটা? যার মাথায় ঘোমটা, যে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এখুনি!

লক্ষ্মণ এবারও তার হাতদুটো জোর করে চেপে ধরে কোমরে বার বার ঝাঁকানি দিতেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে প্রবীর।

চিন্তায় ভেঙে পড়েন প্রবীরের মা। পরীক্ষার আর সাত দিন বাকি। ছেলের যেন সব সময় কেমন একটা বিমর্ষ ভাব, কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। সামনে পড়ার বই খোলা পড়ে থাকে—ওর মন বুঝি চলে যায় অন্য কোনোখানে, কে জানে!

পুজোমানত, ঝাড়ফুঁক, মাদুলী, জলপড়া, হেকিমী, কবরেজী যে যা বলেছে সব করে যখন হতাশ হয়ে ভাবতে থাকেন প্রবীরের মা এখন কি করবেন, ঠিক সেই সময় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর খবর পেলেন। তিনি নাকি এইরকম দুরারোগ্য সব ব্যাধি ভালো করেছেন অনেক। থাকেন দুর্লভপুর, হুগলী জেলার এক সুদূর পল্লীতে।

লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রবীরকে নিয়ে একদিন তিনি খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ঘরে ঢুকে হক্‌চকিয়ে যায় প্রবীর। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কথা বইয়ে পড়েছিল, কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখেনি। সে আশ্চর্য হয়ে যায়, ঠিক যেমনটি গল্পে-উপন্যাসে পড়েছিল, হুবহু সব মিলে যাচ্ছে। মড়ার খুলি, নরকঙ্কাল চারিদিকে ছড়ানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট ধুনি জ্বলছে। বাঘছালের একটা আসন তার সামনে পাতা। তার ওপর বসে আছেন রক্তবস্ত্র পরিহিত জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী, কপালে তাঁর লালচন্দনের রেখা—একটা নয় তিনটে।

প্রবীরের মা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে ছেলের রোগের কথা সব বললেন।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে সব শুনলেন। তারপর 'জয় তারা!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। এমন বিকট সে কণ্ঠস্বর যে আতঙ্কে সবাই শিউরে ওঠে। বললেন—মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবিসনি কিছু। জয় তারা!

কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন—কে ওকে এমনি করে ডাকে বাবা? ছেলে বলে, কালো শাড়ি পরা মেয়েছেলে। ধবধবে সুন্দর হাত দিয়ে কেবল ওকে ডাকে। তার মুখ একদিন মাত্র একটুখানি দেখেছিল, আর কোনোদিন দেখেনি। শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকে। কে সে? কেন ওকে ডাকে বাবা?

প্রবীর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ বলে ফেললে, আমি দেখব তাকে, আমায় দেখান!

—দেখবি কে ডাকে?

—হ্যাঁ, আমি দেখব। বড্ড আমার তাকে দেখতে ইচ্ছা করে। দেখাতে পারবেন? ঠিক বলছেন? মুখে একথা বললেও মনের মধ্যে কিসের একটা আতঙ্ক যেন প্রবীর চেপে রাখে। সন্ন্যাসী তখন জ্বলজ্বলে চোখে প্রবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা দেখাচ্ছি। তোমার নাম-গোত্র কি বল তো মা?

প্রবীরের মা যেই বলে দিলেন। অমনি 'তারা! তারা!' বলে একটা বিরাট হুঙ্কার ছাড়লেন সন্ন্যাসী। তারপর ওদের হাতে জ্বলন্ত ধুনি থেকে একটু ছাই তুলে দিয়ে বললেন—দু'হাতে মুঠি করে চোখ বুজে থাক্। আমি যখন বলব তখন চোখ খুলবি। কিন্তু তার আগে যদি চোখ চাস, তাহলে একেবারে মৃত্যু। কেউ রক্ষা করতে পারবে না, মনে রাখিস।

প্রবীর ও তার মা, সন্ন্যাসী যেমন নির্দেশ দিলেন, সেইভাবে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। চুপিচুপি তিনি ছেলেকে বললেন, খবরদার, তাকাসনি যেন বাবা!

এবার সন্ন্যাসী তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের ক্রিয়া শুরু করলেন। সন্ন্যাসী অস্ফুট স্বরে কি সব মন্ত্র আউড়িয়ে যেতে লাগলেন। শেষে এক সময় 'তারা! তারা!' বলে এমন বিকট এক হুঙ্কার ছাড়লেন যে ওরা আঁতকে উঠল ভয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন—দেখ্ এবার চোখ খুলে!

প্রবীর বলে উঠল—হ্যাঁ, ওই তো—ওই তো সেই কালো শাড়ি পরা মেয়ে, মুখে ঘোমটা! সেই হাত! ওই ধবধবে সুন্দর হাত দিয়ে ও ডাকে আমায়—কে! কে তুমি? বলো—বলো আমায়?

প্রবীরের মা এবার বলে উঠলেন—বাবা, ওর মুখটা তো দেখতে পাচ্ছি না! ঘোমটা ঢাকা! যদি একবার দেখান দয়া করে! দেখি ও কে?

—আচ্ছা দেখাচ্ছি। আবার তোরা চোখ বোজ, যখন বলব খুলবি।

মিনিট পাঁচেক বিড়বিড় করে আবার কি সব মন্ত্রতন্ত্র পড়লেন সন্ন্যাসী। তারপর বললেন—খোল্ চোখ!

চোখ খুলেই প্রথম চিৎকার করে উঠলেন প্রবীরের মা—এ্যাঁ, তুমি! ব্যস, শুধু ঐ দুটি কথা বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেলেন।

প্রবীর কেঁদে উঠল—মা, মাগো!

সন্ন্যাসী তখন ধুনি থেকে একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে প্রবীরের হাতে মন্ত্র পড়ে দিয়ে বললেন—তোমার মায়ের মুখে বেশ করে এটা মাখিয়ে দাও!

প্রবীর সেই ছাই যেমন ওর মায়ের মুখে মাখিয়ে দিলে, অমনি তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। তারপর উঠে বসলেন।

প্রবীর তখন বললে, কে ওই মূর্তি মা? তুমি ওকে চেনো? বলো মা সত্যি করে! ওই মুখখানা আমি শুধু একদিন দেখেছিলুম। জানার জন্যে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে! আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না, তুমি কি বুঝতে পারো না?

তখনো প্রবীরের মা তেমনি নীরব। নিরুত্তর। ছেলের কাছে কি বলবেন?

'তারা! তারা!' বলে সন্ন্যাসী আবার সেইরকম এক বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে প্রবীরের

মায়ের মুখের ওপরে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। যেন তাঁর ওই বড় বড় রক্তচক্ষু দুটো দিয়ে এখুনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রবীরের মায়ের সারা গায়ে। এবার আর গোপন করতে পারলেন না তিনি। প্রবীরকে আস্তে আস্তে শুধু বললেন—ও তোর মা!

—এ্যাঁ, আমার মা! তাহলে তুমি কে? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রবীর তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রবীরের মা পাষাণ-মূর্তির মতো নিস্তব্ধ। তাঁর দুই চোখে ধারা বয়ে যায়।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ নিঃশব্দে প্রবীরের মায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলেন—ইনি তোর চোরনী মা! হাসপাতালের নার্সকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তোকে বদলে নিয়েছিলেন নিজের মেয়ের সঙ্গে। পুত্রসন্তান ওঁর কোনোদিন হবে না, এই কথাই জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিলেন। সেই গণনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে তোকে ওই মায়ের বুক ভেঙে চুরি করে ছিনিয়ে এনেছিলেন। তোর ওই আসল-মা মরে গিয়েছেন। তোকে দেখার বাসনা তাঁর মরেনি। তাই আর থাকতে না পেরে মাঝে মাঝে ছুটে আসেন দেখতে নিজের ছেলেকে।

—আমি পাপী! আমি অপরাধিনী! আমায় ক্ষমা করো বাবা। বলে কাঁদতে কাঁদতে সন্ন্যাসীর পায়ে তিনি লুটিয়ে পড়েন।

সন্ন্যাসী ঘৃণায় পা-দু'টো সরিয়ে নেন। তাঁকে ছুঁতে দেন না।

তাই আবার যেই সন্ন্যাসীর পায়ে ধরতে গেলেন, অমনি তিনি হুঙ্কার দিয়ে প্রবীরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওর কাছে মাপ চা!

—না না, তা হয় না। প্রবীর কেঁদে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

টাইপরাইটার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধেবেলায় দাসের অফিসে ঢুকে দেখলাম, ও তখনো বসে বসে কী কতকগুলো কাগজপত্র পড়ছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠে বলল, "তুমি?" বললুম, "তোমার অফিসে আলো জ্বলতে দেখে ঢুকেছি। এখনো বসে আছ যে বড়?"

"নানা কাজ হে, তুমি বুঝবে না।"

সত্যিই আমি বুঝতে পারি নে। দাস ব্যবসা করে, কিন্তু কি জাতের ব্যবসা সে সম্বন্ধে আজো কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারি নি আমি। সাপ্লাইয়ের কাজ করে, মর্টগেজ রেখে টাকা ধার দেয়—আরো কি দশ রকম করে বেড়ায়—তা দাস শুধু নিজেই জানে। ভগবানও জানেন কি না সন্দেহ।

আমিও জানতে চাই নে। কারণ দাসকে জানি। সেই কলেজ-জীবন থেকেই। ইউনিয়নের টাকা সরিয়েই হাত পাকিয়েছিল দাস। তারপর বার্মা ইভ্যাকুয়িদের নিয়ে যখন নানা কেলেঙ্কারি হয়—তখন দাস ছিল একজন কন্ট্রাক্টার। সেই থেকে ধাপে ধাপে কতদূরে সে এগিয়েছে, সে-সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করতেও সাহস হয় নি আমার।

জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এ-সব সত্ত্বেও দুর্জনসংসর্গ করি কেন? তার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, দাসকে আমার ভালো লাগে। অজস্র ত্রুটি থাকলেও একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে ওর ব্যক্তিত্বে। সেটা ওর তীক্ষ্ণ স্মার্টনেসের জন্যে হতে পারে, আমার মতে। ওরও সেরিকালচার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বলে হতে পারে, এমন কি ওর বিশেষ-ধরনের চুলের ব্যাকব্রাশের জন্যেও হতে পারে। কিন্তু মোট কথাটা হল, সময় পেলে দাসের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভালো লাগে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ওর অফিসে আলো জ্বলতে দেখে তাই ঢুকে পড়েছিলুম।

একটা বেয়ারা নেই—তিনজন কেরানীর একজনও না। মস্ত অফিস-ঘরটায়, সবুজ শেড্ দেওয়া আলোটার পাশে দাসকে কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হল যেন। তখুনি আমি বুঝলুম নিঃসঙ্গতা দাসকে মানায় না। ও ড্রয়িংরুমের জীব—ছাদের অন্ধকারে একলা বসে থাকবার জন্যে সৃষ্ট নয়।

ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বললুম, "একলা একলা এতক্ষণ বসে যখের ধন পাহারা দিচ্ছ নাকি?"

"প্রায় তাই।"—বিশেষ ধরনে ব্যাকব্রাশ করা চুলের ওপর দাস সযত্নে একবার হাত বুলিয়ে নিলে, "এমন কতকগুলো কাজ ডান হাত দিয়ে করতে হয়, যা বাঁ হাতকে জানতে দিতে নেই।"

"তা হলে আমিও যাই। বিরক্ত করব না।"

"বোসো—বোসো।" দাস হাসল, "কাজটা শেষ হয়ে গেছে।" পাশের একটা লোহার ড্রয়ার খুলে তাতে কাগজগুলো রাখল, লক্ করে দিয়ে চাবিটা ফেলল ট্রাউজারের পকেটে। তারপর দামি সিগারেটের টিনটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, "একটা সিগারেট খেয়ে ওঠা যাবে তারপরে।"

কিন্তু সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে—জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটার দিকে আড়াআড়ি তাকাতেই আমার নজর পড়ল কোণের টাইপরাইটার-এর দিকে। ঢাকনা খোলা। ঝক্‌ঝক্ করছে কী-বোর্ড, রোলারটাকে অদ্ভুত মসৃণ মনে হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াটা বেরিয়ে এল প্রশ্নের আকারে।

"তোমার সেক্রেটারির খবর কী?"

দাসের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা যেন চমকে দুলে উঠল, "কোন্ সেক্রেটারি?"

"আবার কোন্ সেক্রেটারি? মিস সুলতা পাল?"

"ওঃ!" ছাই জমে ওঠার আগেই অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটটা ঝাড়ল দাস—কয়েকটা নরম ফুলকি উড়ে গেল পাখার হাওয়ায়। "নো ট্রেস্!"

"কোনো পাত্তা পাও নি?"

"নাঃ!"

"আশ্চর্য! এমন করে কোথায় গেল মেয়েটা?"

অবজ্ঞাকুঞ্চিত মুখে আবার গোটাকয়েক ফুলকি ঝাড়ল দাস, "ও সব মেয়ের কথা ছেড়ে দাও। চেহারাটা ভালোই ছিল, দেখেছিলে তো? নিশ্চয় পালিয়েছে কারো সঙ্গে।"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "পালাবার কী ছিল? যতদূর তোমার কাছে শুনেছিলুম, কলকাতার একটা বোর্ডিঙে একাই থাকত। আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলেও তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওর যদি কাউকে ভালো লেগে থাকে, তবে তাকে নিয়ে চোরের মতো পালাবার দরকার ছিল না নিশ্চয়।"

দাস উদাস ভঙ্গিতে বললে, "কে জানে! হয়তো কোনো রাইভ্যাল ছিল—কলকাতায় থাকলে খুন-টুন একটা কিছু হয়ে যেতে পারত। এ-ধরনের মেয়েকে নিয়ে কত নুইসেন্স হয় জানোই তো।"

তা হয়তো হয়। তবে দাসের সেক্রেটারি সুলতা পাল সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। মিষ্টি চেহারার শান্ত ধরনের ওই মেয়েটিকে কতদিন আমি নিবিষ্টমনে ওখানে বসে টাইপ করতে দেখেছি। সামান্য একটু নিরীহ ঠাট্টাতেও যে মেয়েটির গাল রাঙা হয়ে উঠত, নিচু হয়ে যেত চোখের পাতা—তার মধ্যে ঠিক এসব জিনিস আমি আশা করি নি। আমি সাহিত্যিক নই, তবু সাহিত্যিকের ভাষায় আমার মনে হল—যে সব মেয়ে প্রথম প্রেমের জন্যে চিরকুমারী থেকে যায়, সুলতা সেই দলের।

কিন্তু সুলতা যে প্রায় পনেরো দিন নিরুদ্দেশ—এটা ঠিক কথা। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয় নি, কোনো বিপদে পড়বার মতো কাঁচা মেয়েও সে নয়। অতএব সে পালিয়েছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দাস বললে, "সেক্রেটারির ভাবনা নেই—আজও তিনজন ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। তবে মেয়েটা বড় ভালো কাজ করত।"

"তা করত!"

দাস চুপ করে রইল। একটু আগে যে-সিগারেটটায় বার-বার টোকা দিচ্ছিল, অনেকটা ছাই জমতেও এবারে সে সেটাকে ঝাড়ল না। আমিও চুপ করে বসে বসে ছাইটা কখন ভেঙে পড়ে সেইটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম আর ভাবতে লাগলুম, সুলতা এতখানি সাহস পেল কী করে?

সুতরাং একটু পরেই দাস যখন বলতে যাচ্ছিল, এইবার ওঠা যাক,—অন্তত ওর মুখ থেকে এই কথাটাই বেরিয়ে আসবে বলে আমার মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনি ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে বসল বাইরে। খোলা দরজা দিয়ে ভেজা ধুলোর একটা তপ্ত রুদ্ধশ্বাস চলে এল ঘরে—দাসের সিগারেট থেকে ছাইটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

দাস বললে, "বৃষ্টি নামল যে! গাড়িটাও তো আনি নি!"

বললুম, "না থামলে বেরোনো যাবে না। বেশ ঘটা করে নেমেছে, ট্রাম পর্যন্ত যেতে গেলেও ভিজিয়ে ভূত করে দেবে।"

"তাই থামুক"—দাস বললে, "তা হলে একটু বোসো তুমি। আমি একটা টাইপের কাজ সেরে নিই ততক্ষণ।"

উঠে টাইপরাইটারের দিকে এগিয়ে গেল দাস। সুলতার সম্পর্কে ভাবনাটা ভোলবার জন্যে আমি একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা কুড়িয়ে নিলুম টেবিল থেকে, তারপর মালটিপারপাস স্কিমের ওপরে একটা প্রবন্ধ পড়বার চেষ্টা করতে লাগলুম। আলগা মনোযোগের ভেতরে কানে আসতে লাগল বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ—টাইপরাইটারের রোলারে কাগজ জড়ানোর খস্‌খসানি, তারপরে খটাখট করে গোটাকয়েক টাইপিঙের শব্দ।

পরক্ষণেই দাস হেসে উঠল। "হাসি কেন? ব্যাপার কী?"

"এসো এখানে দেখো, কী মজা হয়েছে।"

আমি উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালুম। মজাই করেছে বটে একটা। ওপরে 'টেন্ডার' বলে হেডিং দিয়ে তার নীচে তিনবার টাইপ করে বসেছে একটি নাম—'সুলতা পাল।' অবাক হয়ে বললুম, "এর মানে? সুলতা পালের নাম টাইপ করছ কেন?"

দাস বললে, "মানেটা তো আমিও ভাবছি। লিখতে গেলুম টেন্ডার—লিখে বসলুম সুলতা পালের নাম! তাও একবার নয়—তিনবার!"

আমি বললুম, "তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এতক্ষণ ধরে ওকে নিয়েই তো আমরা আলোচনা করছিলুম। আর ওর ব্যাপারটাও এত বিস্ময়কর যে, মনের ভেতরে ওর নামটাই ঘুরছিল। অন্যমনস্কভাবে তাই ছেপে বসে আছ!"

"তাই বটে।"—দাসের মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এল। "আজ এক বছর ধরে এইখানে বসে টাইপ করেছে সুলতা—একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো। একটা দিন কামাই করে নি, এক মিনিট লেট করে নি, পাঁচ মিনিট আগে ছুটি নিয়ে চলে যায় নি কোনোদিন। এর প্রত্যেকটা চাবিতে সুলতার আঙুল জড়িয়ে রয়েছে।"

আবার আমরা দুজনে গম্ভীর হয়ে রইলুম। সুলতার শান্ত মিষ্টি মুখখানা আমি ভুলতে পারছি না। দাসের চোখ দুটোও কেমন উদাস আর গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, তুমি কি ওকে ভালোবাসতে?

বাইরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ধুলোর তপ্তশ্বাস নেই—দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস আসছে। দাস দরজাটা বন্ধ করার কথা বললে না, আমিও উৎসাহ পেলুম না। শুধু বৃষ্টির শব্দ, আমাদের চুপ করে থাকা আর ঘরের ভেতর কোথা থেকে উড়ে আসা একটা চামচিকের চঞ্চল ছায়া—কিছুক্ষণ ধরে স্তম্ভিত হয়ে রইল।

দাস স্তব্ধতা ভাঙল, "টাইপটা সেরেই ফেলি।"

কাগজটা খুলে দাস সেটাকে তাল পাকিয়ে নীচের বাস্কেটে ফেলে দিলে, জড়িয়ে নিলে আর একখানা। আবার খট্‌খট্‌ করে বেজে উঠল টাইপিঙের আওয়াজ। আমি টাইপরাইটারের টেবিলের কোণে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটানা বৃষ্টির শব্দর মধ্যে টাইপিঙের শব্দ একাকার হয়ে এল, কখনো কখনো স্পেসিং আর ঘণ্টার যতিপতন কানে আসতে লাগল।

কতক্ষণ পরে জানি নে, কেন যে তাও জানি নে—হঠাৎ আমার চোখ নেমে এল দাসের টাইপের ওপর। কী আশ্চর্য—আগাগোড়া ক্যাপিটাল লেটার সাজিয়ে কী ছাপছে ও! যা দেখলুম, তাতে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রচণ্ড স্পিডে পাগলের মতো দাস যা ছেপে চলেছে, তা এই।

আমি অকপটে স্বীকার করছি যে সুলতা পালকে আমি খুন করেছি। আমার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে—পুরোনো গ্যারেজের ভেতর একটা বড় কেবিন-ট্রাঙ্কে তার মৃতদেহ রয়েছে। আমি তার ওপরে বলপ্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে—

কিন্তু আর তো আমি চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি নে। যা দেখেছি, এ তো স্বপ্ন নয়। আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, "দাস, এ কী ছাপছ তুমি—এ কী ছাপছ!"

টুলের ওপরে দাস থরথর করে কেঁপে উঠল, একটা মৃত প্রাণী যেন নড়ে উঠেছে ইলেকট্রিক কারেন্টের ছোঁয়ায়। যেন এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে টাইপ করে যাচ্ছিল—হঠাৎ জেগে উঠেছে।

আমি আবার বললুম, "দাস—দাস! কী টাইপ করে যাচ্ছ তুমি?"

নিজের টাইপিঙের ওপর চোখ বুলোতে দাসের দশ সেকেন্ডও লাগল না। তার পরেই পেছনে লাথি দিয়ে টুলটাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। হ্যাঁচকা টানে কাগজটাকে টেনে বার করে নিয়ে বিকৃত গলায় চিৎকার করে বললে, "না—না, আমি না—আমি না—" আমি আরো কী বলতে যাচ্ছিলুম, দাস বলতে দিলে না—"মিথ্যে কথা—আমি নয়!"—জান্তব গলায় আবার চিৎকার করে উঠল সে। পরমুহূর্তেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—নেমে গেল রাস্তায়।

আমার বিহ্বলতা কাটতে আরো প্রায় এক মিনিট লাগল। তারপর যখন সেই বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে এলুম তখন মাত্র কুড়ি গজ দূরেই একটা লোক চাপা পড়েছে বাসের তলায়।

কাছে না গিয়েও আমি বুঝতে পারলুম, সে দাস ছাড়া আর কেউই নয়। আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—তাকে নিজের হাতেই তার শাস্তি দিয়েছে সুলতা। এর পরে একটিমাত্র কাজ আছে আমার। কোনো পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে ব্যারাকপুরের গ্যারেজে সেই কেবিন-ট্রাঙ্কটার কথা।

ভুতুড়ে কাণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যে কাজ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, কিংবা যে কাজ আশ্চর্যজনক ভাবে ঘটে যায়, তাকে আমরা বলি ভূতুড়ে কাণ্ড।

আবার ভূতেরা নিজে যে কাজ করে তাকে তো ভূতুড়ে কাণ্ড বলেই।

আমাদের পরিবারে এমনি এক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেছিল।

পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি। দিদিমা আর মামাদের আদরের সঙ্গে প্রচুর আম জাম জামরুল খাচ্ছি। তোফা আনন্দে সময় কাটাচ্ছি।

তিন মামা। বড়মামা রেল অফিসে কাজ করতেন। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের বাসাবাড়িতে থাকতেন। মাসে একবার বাড়িতে আসতেন।

তিনি মেজমামাকে তাঁরই অফিসে চাকরি করে দেবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মেজমামা রাজী নন। ছেলেবেলা থেকে মেজমামা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সব ব্যাপারেই বেপরোয়া।

তিনি বলেছিলেন, চাকরি-বাকরি আমার ধাতে পোষাবে না। আমি স্বাধীন ব্যবসা করব।

তা মেজমামা স্বাধীন ব্যবসাই শুরু করেছিলেন। পাঁচ মাইল দূরের মাছের ভেড়ি থেকে মাছ কিনে গঞ্জের হাটে ব্যাপারীদের কাছে সেই মাছ বিক্রি করা। পরিশ্রমের কাজ কিন্তু ভালো টাকাই হাতে থাকত।

ছোটমামা কিছু করত না। মামাদের চাষবাসের জমি দেখত আর অবসর সময়ে জাল দিয়ে পাখি ধরত, কাঠি দিয়ে খাঁচা তৈরি করত আর তাতে পাখিগুলোকে রাখত। তবে বেশিদিন নয়, হঠাৎ একদিন খাঁচার দরজা খুলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিত। এক নম্বরের খেয়ালী লোক।

আমাদের গল্প অবশ্য মেজমামাকে নিয়ে।

গল্পই বা বলি কেন, একেবারে আমার চোখে দেখা ঘটনা।

মেজমামা খুব ভোরে উঠে সাইকেলে রওনা হয়ে যেতেন। খুব ভোরে, তখন ভালো করে আলোও ফুটত না। রাস্তাটা অনেকটা পাকা নয়—মানুষের পায়ে পায়ে চলা সরু একটু রেখা। বেশ কিছুটা যাবার পর ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা রাস্তা।

একদিন ভোরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। বোঝা যাচ্ছে একটু পরেই ঝড়জল শুরু হয়ে যাবে।

মেঘের ডাকে আমিও ভোর ভোর উঠে পড়েছি। উঠে মেজমামার যাওয়ার তোড়জোড় দেখছি।

দিদিমা বললেন, ওরে, এই আবহাওয়ায় আজ না হয় নাই বেরোলি। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। এখনই জোর তুফান উঠছে।

ঝড়কে দিদিমা তুফান বলতেন।

মেজমামা হাসলেন, তাহলে তো বর্ষাকালে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না। আমার কাছে বর্ষাতি আছে। কোনো অসুবিধা হবে না।

মেজমামা যখন বের হলেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাতাসও বেশ জোর।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দারুণ ঝড় উঠল। চারদিক অন্ধকার। বাজের শব্দে কান পাতা দায়। সেই সঙ্গে তুমুল বর্ষণ। এধারে ওধারে বড় বড় গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কি বাড়ির চালা উড়ে গেল। ধসে পড়ল মাটির দেয়াল। দিদিমার কথাই ঠিক। তুফানই বটে।

আমি জানলার ধারে চুপচাপ বসে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছি। একটু পরেই দিদিমা এসে আমার পাশে বসলেন।

বসেই আক্ষেপ করতে লাগলেন, এই দুর্যোগে বাড়ির কুকুর বেড়াল বাইরে বের হয় না, আর এত বারণ করা সত্ত্বেও ছেলেটা রাস্তায় বের হল!

সত্যিই চিন্তার কথা। এই ঝড়জলে বর্ষাতি আর মেজমামাকে কতটুকু বাঁচাতে পারবে! হাওয়ার দাপটে সাইকেল চালানোই মুশকিল। সাইকেল থেকে নেমে যে কোনো গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন, তাও নিরাপদ নয়। মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লেই হল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঝড়বৃষ্টি চলল। দিদিমা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে বিছানা নিলেন। মেজমামার নাম করে অঝোরে কান্না।

মেজমামা ফিরলেন রাত আটটা নাগাদ। সাইকেল নেই, হেঁটেই এসেছেন। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। পরনের জামা কাপড় ছিন্নভিন্ন। বর্ষাতির খোঁজ নেই।

দিদিমা মেজমামাকে জাপটে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়বেন না। শুধু কি জাপটে ধরা, ভেউভেউ করে কান্না!

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, ছাড়! জাপটাজাপটি আমার ভালো লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মেজমামা তোমার সাইকেল?

বটগাছ চাপা পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।

বটগাছ চাপা?

হ্যাঁ, কাঞ্চনতলার কাছে দারুণ ঝড় উঠল। বটগাছের ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল আমার ওপর। সাইকেল চুরমার হয়ে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম মাটির ওপর। এই দেখ না!

মেজমামা চুল সরিয়ে দেখালেন। মাথার এক জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে আছে।

তারপর থেকে মেজমামা কেমন বদলে গেলেন।

মাছের ব্যবসা বন্ধ। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। রাত্রে বেরিয়ে যেতেন। কখন ফিরতেন কে জানে!

দিদিমা অনেক বলতেন, কিন্তু মেজমামা নির্বিকার।

শেষকালে দিদিমার নির্দেশে আমি শুতাম মেজমামার সঙ্গে। অবশ্য আলাদা খাটে।

একদিন খুব ভোরে মেজমামার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

এই, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?

ঘরের কোণে স্টোভ ছিল। তাকের ওপর চা, চিনি, কাপ ডিশ। আগে আগে ভোরে বের হবার সময় মেজমামা নিজে চা করে খেতেন।

ঘুমজড়ানো গলায় বললাম, তুমি নিজে করে খাও না!

মেজমামা যেন ভয় পেয়ে গেলেন, না, আমি আগুনের কাছে যেতে পারব না। ভয় করে।

ভয় করে কথাটা মেজমামার মুখে নতুন শুনলাম। মেজমামা চিরকাল দুর্দান্ত প্রকৃতির। দারুণ সাহস।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে মেজমামা যেন কুঁকড়ে গেছেন। কারো সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেন না। কেউ ডাকতে এলে বলে দেন, বল, আমি বাড়িতে নেই।

আরো আশ্চর্যের কাণ্ড, মাথার একদিকের রক্ত জমে থাকাটা একই রকম রয়ে গেল। ওষুধপত্র মালিশ কিছুতেই কিছু হল না।

অগত্যা উঠে চা তৈরি করে দিলাম। নিজেও খেলাম এক কাপ।

আর এক রাতে এমন এক ব্যাপার ঘটল, তাতে একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। ক'দিন গুমোট গরম পড়েছে। হাতপাখা নেড়ে নেড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি।

বহুকষ্টে যাও-বা একটু ঘুম এল, সেটা পেঁচার কর্কশ আওয়াজে ভেঙে গেল।

ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

মেজমামার দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। আমার মামার বাড়ির সবাই বেশ একটু খর্বকায়। মেজমামা আবার সবচেয়ে বেঁটে।

সেই মেজমামাকে দেখলাম, বিরাট চেহারা, দেহ খাটের বাইরে গিয়ে পড়েছে।

দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলাম একই দৃশ্য।

খাট থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই দৃশ্য বদলে গেল। মেজমামা যেন নিজের সাইজে ফিরে এলেন।

মনকে বোঝালাম, ঘুম-চোখে নিশ্চয় ভুল দেখেছি। না হলে এমন ব্যাপার হতে পারে নাকি!

একথা কাউকে কোনোদিন বলি নি, জানি কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু পরে যা ব্যাপার ঘটল, তাতে আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম।

এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, মেজমামা বিছানায় নেই। ভাবলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছেন, এখনই ফিরবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, মেজমামা ফিরলেন না।

উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মেজমামা রোয়াকে বসে আছেন, জানলার দিকে পিছন ফিরে।

একটু দূরে গোটাকয়েক গাছ পার হয়ে একটা জাম গাছে ছোটমামা জাল পেতে রেখেছে পাখি ধরবার জন্যে। জালের এক জায়গায় ফুটো ছিল, ছোটমামা বোধ হয় লক্ষ করেনি। সেই ফুটো দিয়ে আটকে থাকা পাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মেজমামা বসে বসেই হাত বাড়ালেন। কি বিরাট হাত! রোয়াক থেকে জাম গাছটার দূরত্ব কমপক্ষে ত্রিশ গজ তো হবেই!

হাতটা সোজা গাছের ওপর চলে গেল। যেখানে জালের ফুটো সেখানে। মেজমামা আঙুল দিয়ে জালে গিট বেঁধে দিলেন। পাখিদের পালানো বন্ধ হল।

আমি বুকের ওপর হাত চেপেও দুপদুপ শব্দ বন্ধ করতে পারলাম না। মনে হল এখনই অজ্ঞান হয়ে যাব। কোনোরকমে কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ভোরে উঠে দেখি মেজমামা খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ! কাল রাতে মেজমামা যখন রোয়াকে বসে তখন লক্ষ করেছি দরজায় ছিটকানি!

তাহলে মেজমামা বাইরে গেলেন কি করে? বন্ধ দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যেই বা কি করে ঢুকলেন?

ঠিক করে ফেললাম, আর মামার বাড়ি নয়। কোনো একটা অছিলায় বাড়ি পালাব।

এটাও কি চোখের ভুল? দু'দুবার এরকম চোখের ভুল হতে পারে কখনো?

দুপুরবেলা কিন্তু মত বদলে গেল। ছোটমামা জালে আটকানো পাখিগুলো নিয়ে খাঁচায় পুরছিল, আমি বসে বসে দেখছিলাম। মেজমামাও বসেছিলেন।

বেশির ভাগই মনুয়া আর টুনটুনি পাখি। একটা শুধু বড় আকারের টিয়া। গাঢ় সবুজ রং। লাল চোখ। কিছুতেই ধরা দেবে না, ছোটমামার হাতে ঠুকরে রক্ত বের করে দিল।

আমি তো তখন দেখছিলামই, আরো একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম। আড়চোখে দেখছিলাম উঠোনে মেজমামার ছায়া পড়ছে কিনা, আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো উল্টোদিকে কিনা।

দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠোনের ওপর মেজমামার রীতিমতো ছায়া পড়েছে আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো একেবারে স্বাভাবিক।

তার মানে রাত্রে নিশ্চয় আমি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। পেটগরম হলে যা হয়। পেট ঠাণ্ডা করার জন্য রোজ সকালে একটা করে ডাব খেতে হবে।

আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার বিপদও আছে। এখানে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি, আর ওখানে বাবা রোজ পাঁচপাতা হাতের লেখা আর দশটা অঙ্ক কষাবে!

বেশ কিছুদিন অলৌকিক কিছু চোখে পড়ল না। বুঝতে পারলাম নিজের ভয়ের বিকৃত রূপটাই দেখেছি।

মেজমামা যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, তাতে দিদিমা খুব খুশি। তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবি, মেজমামার চলবে কি করে?

একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম।

হ্যাঁ মেজমামা, তুমি যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলে? কি হবে?

মেজমামা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, ফিরে বললেন, কেন, তোর অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

মুশকিলে পড়ে গেলাম। সামনে গিয়ে বললাম, না, অসুবিধা আর কি! আগে তুমি মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ আনতে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেজমামা বললেন, ও, এই কথা! তোকে আজই বড় মাছ খাওয়াচ্ছি।

মেজমামা বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন হাতে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে।

আমি তো অবাক।

হ্যাঁ মেজমামা, এর মধ্যে এত বড় মাছ পেলে কোথায়?

মেজমামা হাসলেন, একজন জেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাছের ঝুড়ি নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। আমার তো সবাই চেনা, বলতেই দিয়ে দিল।

দিদিমার আনন্দ আর ধরে না। বঁটি নিয়ে এসেই মাছ কুটতে বসলেন। আমি কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোজ ছাইরঙা একটা উটকো বেড়াল এ বাড়িতে আসত, আহারের সন্ধানে। সেদিনও সে এসে হাজির।

বঁটির পাশে আঁশের স্তূপ। বেড়ালটা এগিয়ে এসে আঁশে মুখ দিয়েই বিকট স্বরে ম্যাও করে উঠল। অস্বাভাবিক স্বর। কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

তারপর ল্যাজটা খাড়া করে সোজা পাঁচিলের ওপর গিয়ে উঠল। দিদিমাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন।

তিনি বললেন, বেড়ালটার কি হল বল তো? ওভাবে চেঁচিয়ে উঠল, গলায় কাঁটা ফুটল নাকি?

কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি, বেড়ালটা একটা আঁশও মুখে তোলে নি। খাওয়া তো দূরের কথা, কেবল শুঁকেই ওই রকম চিৎকার করে উঠল। সব ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

এমন কি দিদিমা যখন একটা কলাপাতায় বড় মাছের টুকরো ভেঙে আমাকে খেতে ডাকলেন, তখন একটু ইতস্তত করেছিলাম।

তারপর মনে সাহস এনে মাছের টুকরা মুখে দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। না, কোনো গোলমেলে ব্যাপার নেই। দিব্যি সুস্বাদু মাছ।

কত অল্পেতে আমরা ভয় পেয়ে যাই! বেড়ালটার ওভাবে চিৎকার করে ওঠার হাজার কারণ থাকতে পারে।

তবে সেদিন থেকে বেড়ালটাকে আর ধারেকাছে দেখতে পাই না। বোধ হয় অন্য কোনো বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে।

এতদিন কথাটা দিদিমা কিংবা ছোটমামাকে বলি নি। কারণ প্রথমত, সব ব্যাপারটা নিজেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। হয়তো আমারই চোখের ভুল কিংবা ভয়ের ছায়াটা রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন হলে এই অলৌকিক কাণ্ড যে কাউকে দেখাতে পারব, এমন সম্ভাবনা কম।

তাছাড়া দিদিমাকে নিজের ছেলের সম্বন্ধে কি করে এসব কথা বলি?

তবে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, আর একবার এরকম বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়লেই মামার বাড়ি থেকে পালাব। এখানে আদরযত্নের লোভে তো আর বেঘোরে প্রাণ দিতে পারি না।

বেশ কিছুদিন সব স্বাভাবিক। কোথাও কোনো গোলমাল হল না। মেজমামা অবশ্য মাছের ব্যবসায় আর গেলেন না। বাড়িতেও বিশেষ থাকতেন না, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতেন কে জানে!

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি। কতদিন আর চুপচাপ বসে থাকব?

তারপরই অঘটন ঘটল।

মাঝরাতে বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখি, ছোটমামা রোয়াকের এককোণে দাঁড়িয়ে। একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ, নিশ্চল।

আমি কাছে যেতেই আঙুল দিয়ে বাগানের দিকে দেখাল। যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।

একটা গাছের ডালে মেজমামা পা ঝুলিয়ে বসে। মেজমামা মানে মুখটা মেজমামার, কিন্তু দেহটা বিরাট। মাথাটা প্রায় গাছের মগডালে ঠেকেছে। পা দুটো মাটির অল্প ওপরে।

কি খেয়ে খেয়ে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছেন। একটা ছিটকে এসে রোয়াকের ওপর পড়তে নিচু হয়ে দেখেই চমকে উঠলাম, রক্তমাখা হাড়ের টুকরো।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল এখনই বুঝি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ব।

ছোটমামা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল।

তারপর দিন পনের কি হয়েছে আমি জানি না। দারুণ জ্বরে আমি প্রায় বেহুঁশ।

দিদিমা চেয়েছিলেন আমার বাবাকে খবর দিতে, কিন্তু ছোটমামা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিল। ছোটমামা বলেছিল, শুধু ভয় পেয়ে আমার এই জ্বর। ডাক্তারেরও তাই মত। এর মধ্যে বাবাকে টেনে নিয়ে এলে আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বাবা বিশ্বাস করবেন, এটা আশা করা যায় না।

অথচ তার পরের দিন সকালে দিদিমার পোষা ছাগলটা নিখোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে বাগানের মধ্যে তার ছিন্নমুণ্ডটা পাওয়া গিয়েছিল। চারদিকে রক্তমাখা যেসব হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল, সেগুলো যে ছাগলেরই হাড় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমন কথা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে শহরের লোক!

মেজমামা নাকি আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে চুপচাপ বসে থাকতেন ঘরের মধ্যে। হাজার ডাকে সাড়া দিতেন না। খেতে ডাকলে রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিতেন, খিদে নেই! শরীর খারাপ!

দিদিমা যে মেজমামাকে এত ভালোবাসতেন, সেই দিদিমা ছোটমামার কাছে সব শুনে মেজমামার ধারেকাছে ঘেঁষতে চাইলেন না।

আমি যখন সেরে উঠলাম, তখন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে।

শোবার ব্যবস্থা পালটে গেছে। একঘরে আমরা তিনজন শুতাম। একপাশে দিদিমা, অন্যপাশে ছোটমামা, মাঝখানে আমি। সারারাত ঘরে আলো জ্বলত।

ছোটমামা দরজায় ভিতর থেকে ডবল তালা লাগিয়ে দিত। আমরা সবাই জানতাম, অলৌকিক শক্তির পক্ষে এ তালা কোনো বাধাই নয়, কিন্তু তবু বারণ করতে পারিনি।

ছোটমামা আর আমি ওই দৃশ্য দেখার পর, আমি আগে যা দেখেছি সব দিদিমা আর ছোটমামাকে বলেছি।

ছোটমামা বলল, কথাটা আগেই তোমার বলা উচিত ছিল, তাহলে আরো আগে ব্যবস্থা নিতে পারতাম!

কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ছোটমামা বলল।

বদনপুর এখান থেকে আড়াই মাইল। সেখানকার ভৈরব রোজা খুবই বিখ্যাত। তার খড়মের আওয়াজে ভূতপ্রেত থরথর করে কাঁপে।

তাকে পাওয়া একটু মুশকিল। লোকের ডাকে প্রায়ই ভিনগাঁয়ে চলে যায়, আর দক্ষিণাও একমুঠো টাকা।

দিদিমাকে ছোটমামা অনেক কষ্টে রাজী করাল। দিদিমা সব বুঝেও একটু ইতস্তত করলেন। হাজার হোক ছেলে তো!

ছোটমামা বোঝাল, বেশ তো, ভৈরব রোজা এলেই সব বোঝা যাবে।

খুব ভোরে ছোটমামা বেরিয়ে পড়ল। বদনপুরে ভৈরবকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য গাঁ থেকে তাকে ধরে আনতে হবে।

ছোটমামা যখন বের হয় তখন মেজমামা বাড়ি ছিলেন না। আধঘণ্টা পরে কোথা থেকে ফিরে এলেন।

চেহারা দেখে মনে হল, অনেক দূর থেকে যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন, হাঁটু পর্যন্ত কাদা। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ফতুয়াটা গাছের ডালে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

দিদিমা রোয়াকে বসে তরকারি কুটছিলেন, আমি পাশে বসেছিলাম।

মেজমামা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের দু'পাশে ফেনা। লাল চোখ পাকিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছোনে কোথায় গেছে?

ছোনে ছোটমামার ডাকনাম।

আমার বুকের দুপদাপ শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ভয় হল, অবশ হয়ে বঁটির ওপর না পড়ে যাই!

দিদিমা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, নিজের কি একটা দরকারে গেছে।

নিজের দরকার না ছাই! মেজমামা দাঁত কিড়মিড়ি করে উত্তর দিলেন, ভাই তো নয়, শত্তুর—শত্তুর! আচ্ছা, ঠিক আছে!

কথাগুলো বলেই মেজমামা জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, দুটো হাত পিছনে, কেবল মাথা নাড়ছেন, থুতু ফেলছেন আর ঘুরছেন।

ব্যাপার দেখে দিদিমা আর সাহস পেলেন না, আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

দিদিমার দিকে চেয়ে দেখি তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনের কষ্টটা বুঝতে পারলাম।

যতক্ষণ মেজমামা বাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, ততক্ষণ আমি আর দিদিমা ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেজমামাকে আর দেখা গেল না। দিদিমা উঠে জানলা দিয়ে দেখে যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে মেজমামা ধারেকাছে কোথাও নেই, তখন আমাকে খেতে দিলেন।

নিজে কিছু খেলেন না। ছোটমামা এলে একসঙ্গে খাবেন।

আমি খাব কি, তখনো শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কোনোরকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাড়ি রওনা হব। এখানে এভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে শীঘ্রই শক্ত অসুখে পড়ে যাব।

ছোটমামা ফিরল বেলা আড়াইটে নাগাদ, সাইকেল রিকশায়। সঙ্গে ভৈরব রোজা।

আমি জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ভৈরবের পরনে লাল টুকটুকে কাপড়। গায়ে কোনো জামা নেই। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। দু'হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা।

লাল দুটি চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঝাঁকড়া পাকাচুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

ভৈরব নেমে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাতাসে কি যেন শুঁকল, তারপর ছোটমামার দিকে ফিরে বলল, কেউ গৃহবন্ধন করেছে!

ছোটমামা অবাক।

গৃহবন্ধন কি?

কেউ মন্ত্র পড়ে গৃহবন্ধন করে দেয়, তাতে এই গৃহের মধ্যে কোনো কাজকর্ম করলে তা ফল দেয় না।

কে এ কাজ করবে?

যাকে তাড়াতে চাও সেই করবে।

কিন্তু তার পক্ষে তো কিছু জানা সম্ভব নয়।

ছোটমামার কথায় ভৈরব খুব জোরে হেসে উঠল।

প্রেতাত্মার পক্ষে সব কিছু জানতে পারাই সম্ভব। মানুষের চেয়ে তারা অনেক বেশি শক্তির অধিকারী হয়।

তাহলে উপায়?

উপায় আছে বইকি। তুমি আগে সাইকেল-রিকশাকে বিদায় কর।

ছোটমামা সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ভৈরব পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটা মাটির সরা বের করল। তার ওপর চারটে পাকা লঙ্কা, একমুঠো সর্ষে, কতকগুলো কুশের ডগা রাখল। তারপর রাস্তার ওপরই বসে পড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল।

মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লঙ্কা, সর্ষে আর কুশের ডগা আমাদের বাড়ির দিকে ছুঁড়তে লাগল।

পিছনে নিশ্বাসের শব্দ হতে ফিরে দেখলাম দিদিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখে তখনো জল।

আধ ঘণ্টা পরে ভৈরব উঠে দাঁড়াল।

ঠিক আছে, এবার বাড়ির মধ্যে চল।

ভৈরবের কাণ্ডকারখানা দেখে ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর গাঁয়ের কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। ভৈরবের পিছন পিছন তারা বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

উঠানে মাটি দিয়ে বেদি করা হল। তাতে কাঠ, শুকনা ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। ভৈরব সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে মাঝে মাঝে কাঠি করে ঘি ছিটিয়ে দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে লাগল।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে আমি রোয়াকে গিয়ে বসেছি। দিদিমা আমার পাশে। ছোটমামা ভৈরবের কাছে তার ফাইফরমাশ খাটছে।

আধ ঘণ্টা কিছু হল না। সব নিস্তব্ধ। শুধু ভৈরবের রুক্ষ গলায় মন্ত্রপাঠের শব্দ শোনা গেল। হিং টিং ছট করে অদ্ভুত ভাষা!

আমি যখন ভাবতে শুরু করেছি যে সবটাই বুজরুকি, তখন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ। ঠিক অনেক দূর থেকে ঝড় এলে যেমন হয়।

পশ্চিম দিকের গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। গাছের ডালে বসা কাকের দল চিৎকার করে আকাশে পাক খেতে লাগল।

একটু পরেই গাছপালার পিছন থেকে মেজমামা এসে হাজির। দুটি চোখ বনবন করে ঘুরছে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। মুখে একটা মুরগি—বেচারি মরণযন্ত্রণায় পাখা ঝটপট করছে। মেজমামার দু'কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মেজমামার সেই মূর্তি দেখে আমি ভয়ে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম, উত্তেজনায় দিদিমাও ঠকঠক করে কাঁপছেন।

মেজমামা এসে দাঁড়াতে ভৈরবেরও চেহারা বদলে গেল। সে আরো জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগল। আগুনে মুঠো মুঠো কি ফেলল, তাতে আগুন আরো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

মেজমামা এগোতে পারলেন না। গাবগাছের তলা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিশ্রীভাবে ভৈরবকে গালাগাল দিতে লাগলেন। আধখাওয়া মুরগিটা ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে, মুরগিটা এসে পড়ল আগুনের মধ্যে।

কে তুই? ভৈরব চেঁচিয়ে উঠল।

আমি দয়াল বাঁড়ুজ্জে। মেজমামা আরো জোরে চিৎকার করে বললেন।

না, তুই দয়াল ন'স। ঠিক করে বল, কে তুই?

দয়াল বাঁড়ুজ্জে মেজমামার নাম। ডাকনাম টোনা।

বলব না।

মেজমামার সে কি গর্জন। ঠোঁটের দু'পাশে ফেনা এসে জমল।

বলবি না? আচ্ছা দেখি বলিস কিনা?

ভৈরব পাশে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘটের ওপর মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মেজমামা আর্তনাদ করে উঠলেন। মনে হল ঝাঁটার প্রত্যেকটি ঘা যেন তাঁর দেহেই পড়ছে।

বলছি, বলছি, আর মারিস নি!

মেজমামা গাছতলায় বসে পড়লেন।

বল! ভৈরব ঝাঁটা আছড়ানো শব্দ করল।

আমি মহিন্দর ডোম।

ভৈরব দিদিমার দিকে চোখ ফেরাল, চেনেন মহিন্দর ডোমকে?

দিদিমা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি কখনো দেখিনি। বাবার কাছে শুনেছি, মহিন্দর পুজোর সময় ঢাক বাজাত। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়াতে তারা পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠি মেরে লোকটাকে শেষ করে দিয়েছে।

মেজমামা আর বলব না, মহিন্দরই বলি।

মহিন্দর সব চুপচাপ শুনল। দিদিমার কথা শেষ হতে বলল, মা-ঠাকরুণ ঠিক বলেছেন। শিবে আমার মাথায় লাঠি মেরেছিল। আমিও শোধ নিয়েছি, শিবের গুষ্টির ঘাড় মটকে পগারে ফেলে দিয়েছি। ওর বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই।

তুই দয়ালের দেহে এলি কি করে?

সেদিন খুব ঝড়জলের সময় দয়াল সাইকেলে চেপে বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই আমার আস্তানা। হঠাৎ মোটা একটা ডাল ভেঙে পড়ল দয়ালের মাথার ওপর—দয়াল খতম, তার সাইকেল চিঁড়েচ্যাপ্টা। আমি দেখলাম এমন সুযোগ আর পাব না। অমাবস্যায় বামুনের মড়া—অনেক বছর দেহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লাম।

এ দেহ তোকে ছাড়তে হবে! ভৈরব বলল।

মাথা খারাপ! আমি ছাড়ব না!

তবে রে!

আবার ঘটের ওপর ঝাঁটার আছড়ানি।

মাটির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে মহিন্দর যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

একটু পরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।

কি করে বুঝব তুই গেছিস?

কি করতে হবে বল?

ভৈরব এদিক ওদিক দেখল, উঠোনের একপাশে মরচে ধরা একটা বরগা পড়েছিল। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ভৈরব বলল, ওটা দাঁতে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। আর একটা কথা...

বল?

গাঁ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।

ঠিক আছে। কাসুন্দিপুরের শ্মশানে আস্তানা বাঁধব, এদিকে আর আসব না।

যা তবে।

লোহার ভারী বরগা, যেটা তুলতে অন্তত জনচারেক লোকের দরকার, সেটা মহিন্দর অবলীলাক্রমে দাঁতে করে তুলে নিল।

আবার সেই ঝোড়ো হাওয়া! গাছপালার মধ্য দিয়ে বরগা নক্ষত্রবেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

এদিকে নজর পড়তে দেখলাম মেজমামার প্রাণহীন দেহটা গাবগাছতলায় পড়ে আছে। দেহ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে।

ভৈরব বলল, এখনই দেহটা সৎকারের ব্যবস্থা কর। অনেকদিনের বাসি মড়া!

দুম করে একটা শব্দ। দিদিমা অজ্ঞান হয়ে রোয়াকের ওপর ঢলে পড়লেন।

এসব অনেকদিনের কথা।

দিদিমা কবে মারা গেছেন। মামারাও কেউ বেঁচে নেই। মামাতো ভাইবোনেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, খবর রাখি না।

আমারও বেশ বয়স হয়েছে।

খুব ঝড়জল শুরু হলে সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই কি এসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল?

কিন্তু চোখের সামনে দেখা সব কিছু অস্বীকারই বা করি কি করে!

তৃষ্ণা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্যাট মেনডোনসা! এই ঘরে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পারছি। আমি আর বুঝব না, বাধা দেব না, আমার ক্ষমতা ফুরিয়েছে—তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভয় হচ্ছে। তুমি সামনে এসে দাঁড়াও, তোমার কাকে ভয়?

ঘরে যে ক'টি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমন কি অমন নামজাদা ডাক্তারও। রোগের ঘোরে অনেকে অনেকরকম প্রলাপ বকে, সেটা অসংলগ্ন হয়। জড়তা থাকে। কিন্তু এ যেন কেউ সর্বরকমভাবে হার মেনে ক্লান্ত বিষণ্ণ থমথমে গলায় স্পষ্ট করে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। অনেকের কানে সেটা নিজের মৃত্যুঘোষণার মতো লাগল।

অসুখের ঘোরে রোগী আগেও অনেকবার ভুল বকেছে, বিকারগ্রস্ত দুই চোখ টান করে অনেকবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর এমন স্পষ্ট হয়ে কানে লেগে থাকেনি কারো, সেই চাউনি এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হয়নি। তাতে নিজেকে আগলে রাখার ব্যাকুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইন্‌জেকশন আর ঘুমের ওষুধ দিয়ে তখন রোগীকে ঘুম পাড়িয়েছেন। আজ ছ'দিন ধরেই তাই করছেন। দেহগত লক্ষণ তিনি সুবিধের দেখছেন না। অথচ আরো দুজন সতীর্থ চিকিৎসকের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেও সঠিক রোগের হদিস পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

এক একবার ভেবেছেন হাসপাতালে এনে ফেলা দরকার। আবার মনে হয়েছে এই অবনতির লক্ষণ গোটাগুটি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দরুন। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কোনো রোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভয়ের কিছু নেই বোধ হয়। স্নায়ু সে-রকম বিকল হলে দেহের অন্যান্য লক্ষণও তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তিনি শুনেছেন রোগীর প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এর ওপর বড় রকমের মানসিক বিপর্যয়ের যে কারণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি, সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তাও তাঁর মাথায় আসেনি। সুপ্ত বাসনার একটা বিকৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি তিনি। যে রাতের কথা শুনেছেন সেই রাতে ছোকরা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তারের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকালকার রোমান্সসর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলেছোকরাদের জানতে বাকি নেই তাঁর। যে কারণেই হোক বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে, সেটা সামলে ভালো কোনো মানসিক চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে ভাবছেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতরে ভিতরে তিনিও শঙ্কা বোধ করছেন এখন।

রোগীর এই শেষ কথা শুনে আর তার এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমকে উঠেছিল খবরের কাগজের চ্যাটার্জি। বন্ধুদের মধ্যে আরো দুই একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চ্যাটার্জির কাছ থেকেই তারাও ঘটনার কিছু কিছু আভাস জেনেছিল। আর সাতদিন আগে উৎসবের সেই রাত্রি শেষে একটা মজার প্রহসন তারা স্ব-চক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছিল। কেউ কেউ অসংযত ঠাট্টাবিদ্রূপে জর্জরিত করেছে নরিসকে, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলি? সঙ্গে ঢুকলি না! তোর মতো হাঁদা প্রেমিককে কলা দেখাবে না তো কি, কোটের শোক করতে করতে এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোগে যা—।

ঠাট্টা যারা করেছিল, ফিলিপ নরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু খবরের কাগজের চ্যাটার্জিও তাদের একজন।

ফিলিপ নরিসের এই কণ্ঠস্বর শুনে আর এই চাউনি দেখে ঘরের অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে দরজার দিকে তাকালো। মনে হল, এই কথার পর, এই আত্মসমর্পণের পর দ্বারপ্রান্তে বুঝি সত্যই কোনো রমণীর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। রোগীর দৃষ্টি ধরে চ্যাটার্জির চোখ যে দিকে ফিরল ঘরের সেখানটায় আল্না। আল্নার হ্যাঙারে গরম কোট ঝুলছে একটা। ফিলিপ নরিস সেদিকেই চেয়ে আছে, বিকারের চাউনি জানে, কিন্তু বড় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন সেদিকে চেয়ে সত্যিই কাউকে দেখছে সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু। শোনা যায় না। কিন্তু চ্যাটার্জির মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা...প্যাট মেনডোনসা...!

ঘরের মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করছে চ্যাটার্জি। এ ছ'দিনে অনেকবার যে কথা মনে হয়েছে, কোটটার দিকে চেয়েও আবার সেই কথাই মনে হল। দিয়ে যখন দিয়েই ছিল, এই কোটটা নরিস আর ফিরিয়ে না আনলেই পারত। এই আনাটাই যেন—ভুল হয়েছে। কি ভুল, কেন ভুল চ্যাটার্জিও জানে না। অথচ তার সামনেই তো ওটা ফিরিয়ে এনেছে নরিস, চ্যাটার্জি নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল—অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু বাধা দেবার কথা মনে হয়নি।

ডাক্তার আবার ওষুধ খাওয়ালেন, ইন্‌জেকশন দিলেন।

বাইরে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জিকে বলল, দেখো, এক কাজ করো, উৎসবের পরদিন পর্যন্ত তোমারও মাথা খুব সাফ ছিল না বুঝতে পারছি, তোমাদের কাগজে প্যাট মেনডোনসার নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও—ফিলিপ নরিসের এই অবস্থা জানিয়ে অতি অবশ্য তার সঙ্গে এসে দেখা করতে লেখো—এই বোম্বাই শহরে প্যাট মেনডোনসা হয়তো ডজন দুই বেরুবে, কোথায় কার সঙ্গে লটঘট বাধিয়ে রেখেছে কে জানে—বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে যে আসবার ঠিক এসে হাজির হবে'খন দেখে নিয়ো। তোমরা যে ঠিকানায় গেছলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলযোগ ঘটে থাকতে পারে—সে-তো বে-সামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে!

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জি নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে! তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধা লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না হয় মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল? বন্ধুর কথামতো কাগজে বিজ্ঞাপন একটা দিয়ে দেখবে? পর মুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে। না ভুল কিছু হয়নি, যারা জানে না তাদের এ-রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জি ভাববে কি করে, এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

যাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে সে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও পরদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

এবারে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গ-ভারতীয় ধাঁচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধ করি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ-সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্বভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান্ মেয়ে পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশি। এই গোয়ান্‌দের মধ্যে আবার জাতের রেষারিষি আছে। গোড়া ব্রাহ্মিন্-ক্রিশ্চিয়ান গোয়ান্‌দের মাথা উঁচু—সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ান্‌দের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মতো। এখানে জাত বর্ণের খোঁজ বড় পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সঙ্গতি। যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে, তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। নবীন সভ্য-সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল্-এর জোর বেশি। টাকার থেকেও তাদের বড় মূলধন আনন্দ আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনা। এই উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণত সংস্থার মুরুব্বিদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতার পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জি এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সবজান্তার আসরে যে নামতে

পারে, দুনিয়া উলটে-পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে—এখানে তারই কদর বেশি। সেই হিসেবে চ্যাটার্জি প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশি খরচ করতে জানে। নিজের গতি-বিধি আচার-আচরণ সরল, সংযত—অথচ বন্ধুবান্ধবরা তার বেশির ভাগই বেপরোয়া, সদা মুখর। কারো টাকার দরকার হলে অসঙ্কোচে হাত পাতো ফিলিপি নরিসের কাছে, হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিয়ে দেবে। না থাকলে, আর টাকার প্রয়োজন যার সে প্রিয়পাত্র হলে, ধার করে এনে দেবে। দিয়ে অনুগ্রহ করবে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালো চাকরিই করে, ব্যাচিলর, তাই ভালো হোটেলে আলাদা একখানা ঘর নিয়ে থাকার সঙ্গতি আছে।

তাহলেও ফিলিপ নরিস ক্লাবের প্রথম সারির কেউ নয়। অর্থাৎ চ্যাটার্জির মতো নিজের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সভ্য বা সভ্যারা ভালো করে চেনেও না তাকে। তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দরুন সভার আলো উজ্জ্বল বা স্তিমিত হয় না। তার মতো সাদামাটা সভ্যসংখ্যা শতকের ওপর। দু' দশজনের কাছে যেটুকু খাতির সে পায় তাও চ্যাটার্জির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার দরুন। এইজন্যই চ্যাটার্জির প্রতি সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে, চ্যাটার্জির সক্রিয় সহযোগিতায় তার কাগজে নরিসের দুই একটা আবেগমুখর প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। তিরিশ টাকা দক্ষিণা পেলে, আনন্দাতিশয্যে যাট টাকা খরচ করে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জির ঋণ শোধ হয়েছে ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ করে। চ্যাটার্জিরও ভালো লাগে ফিলিপ নরিসকে।

ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের রাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয় আলোয় একাকার। ছ'মাস আগে থেকেই এই একটা রাতের প্রতীক্ষা করে থাকে সকলে। এক রাতের উৎসবে কত হাজার টাকা খরচ হয় সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। সভ্য এবং অতিথি অভ্যাগতদের গাড়ির ভিড়ে প্রাসাদসৌধের সামনের দুটো বড় বড় রাস্তার অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত রাতের উৎসব—খাওয়া দাওয়া নাচ গানের ঢালা ব্যবস্থা। যে সময়ের ঘটনা, বোম্বাই শহর তখন 'ড্রাই' নয়, অতএব বহুরকম রঙিন পানীয়ের ব্যবস্থারও ত্রুটি ছিল না কিছু। রাত বারোটার পরে ডান্স হল্‌এ যখন নাচের ডাক পড়ল, নিজের নিজের দুটো পায়ের ওপর তখন অনেকেরই খুব আস্থা নেই।

...সেই মেয়েটির দিকে আবার চোখ পড়ল ফিলিপ নরিসের। এই নিয়ে বারকয়েক চোখ গেল তার দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স। এই উৎসবে এই বয়সের সঙ্গীহীন মেয়ে বড় দেখা যায় না। ডান্স হলের দরজার ওধারের দেয়াল ঘেঁষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয়, কিন্তু ওই মেয়েটির মতো একা কাউকে মনে হল না নরিসের। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড় শুকনো—এক ধরনের বিষণ্ণ ঘুম-জড়ানো চোখ-মুখ-চাউনি। এই পরিবেশ মেয়েটির যেন পরিচিত নয় খুব—মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কের মতো নাচ দেখছে এক-একবার, আবার শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক-ওদিক ফিরিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে, বিশেষ করে এই সময়ে কারো দিকে চোখ নেই। সকলেই যে যার

সঙ্গী-সঙ্গিনী বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। এই রাতের মতো রাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকার কথা নয় ফিলিপ নরিসেরও। সে নাচতে একটু-আধটু জানে বটে, কিন্তু গিয়ে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচরাচর খায়ই না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে, আর তাইতেই বেশ একটু আমেজের মতো লাগছে। ভালো লাগছে। একটু আনন্দ করার ইচ্ছে তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সহজাত সঙ্কোচে কারো দিকে এগোতেও পারছে না। আর এগোবেই বা কার দিকে, সকলেই ব্যস্ত, আনন্দমগ্ন।

মেয়েটির বিষণ্ণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নরিসের মুখের ওপরেও আটকালো দুই একবার। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট করে সরে গেল না মুখ থেকে।

ফিলিপ নরিস উঠে মেয়েটির কাছে এল একসময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কারো অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেয়েটির চোখ-মুখ আরো নিষ্প্রভ বিষণ্ণ মনে হল নরিসের। কেমন এক ধরনের আত্মবিস্মৃত জড়তার ভাব। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত চেয়েই রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অস্ফুট শ্রান্ত স্বরে বলল, না...আমি কেমন করে যেন এসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নরিস উদার হয়ে উঠল, বলল, বেশ করেছেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাদাম, দয়া করে নিজেকে আপনি আমার অতিথি ভাবুন। আগে কি খাবেন বলুন?

মেয়েটি নিঃশব্দে চেয়েই আছে তেমনি। অথচ নরিসের মনে হল সে যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। বলল, না কিছু খাব না। একটু থেমে আবার বলল, দেখো, আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না...ভাবলাম এখানে থাকতেও পারে। তুমি কি বলতে পারবে...

হঠাৎ 'তুমি' শুনে নরিস রীতিমতো অবাক। অথচ মেয়েটি যে খেয়াল না করেই বলেছে তাতেও ভুল নেই। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার মেম্বার? কি নাম?

নরিস বিস্মিত। কি নাম তাও চট করে মনে করতে পারছে না। স্মরণের চেষ্টা। বেশি মাত্রায় মদটদ খেয়েছে কিনা নরিসের সেই সন্দেহ হল একবার। না, তাহলে টের পেত। মনে পড়েছে। মনে পড়ার দরুনই যেন মেয়েটির শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্বরে বলল, ডিসুজা...মার্টিন ডিসুজা...চেনো?

নরিস মাথা নাড়ল, চেনে না।

মেয়েটির বিষণ্ণ মুখখানা বড় অদ্ভুত লাগছে নরিসের। রাজ্যের অন্যমনস্কতার দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকের সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে তাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কোথায় থাকে ডিসুজা, কি করে তাও স্মরণ করতে পারল না। নরিসের কেমন মনে হল, মেয়েটি যে কারণেই হোক বড় অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু মানসিক রোগ থাকাও বিচিত্র নয়। যার নাম করছে, তার কাছ থেকেই হয়তো বা বড় রকমের কোনো আঘাত পেয়েছে।

নরিস বলল, দেখো এটা আনন্দের হাট, এই আনন্দের টানেই তুমি এসে পড়েছ—বি চিয়ারফুল অ্যান্ড হ্যাপি, আমাকে তোমার বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটল একটু। ঘুম জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে যেন।

দেখছেই তাকে। এত কি দেখছে নরিস ভেবে পেল না। তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বিস্মরণের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করছে।

মাথা নাড়ল। নাচবে।

ডান্স হল্। তারা আস্তে আস্তে নাচছে। বাহু স্পর্শ করে নরিসের মনে হয়েছে মেয়েটি বড় দুর্বল, হয়তো অনেকটা পথ পার হয়ে নিজের অগোচরে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয় সুরে বলল, আগে কিছু খেয়ে নাও না, এই উৎসব সমস্ত রাত ধরে চলবে।

তার চোখের আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি এখন আরো একটু বদলেছে। নাচের ফাঁকে নরিসের মুখখানাই দেখছে ঘুরে ফিরে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেয়েটির তাকে পছন্দ হয়েছে বোঝা যায়। মাথা নেড়ে জানালো খাবার ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

নরিস...ফিলিপ নরিস। তোমার?

প্যাট মেনডোনসা।...তুমি খুব ভালো...ডিসুজার মতোই দরদী, তুমি কি ব্রাহ্মিন্ ক্রিশ্চিয়ান?

নরিস হঠাৎ এ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝল না।—না, কেন বলো তো?

নয় শুয়ে প্যাট মেনডোনসার চোখে মুখে খুশির আভাস। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। একটু বাদে বলল, আমার কেমন শীত শীত করছে।

নরিস কি করতে পারে! আধঘণ্টার আলাপে মেয়েটির প্রতি মায়া অনুভব করছে কেন জানে না। আর কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পারে। এ যেন এরই মধ্যে তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর একটু কাছে টেনে আনল, নাচের গতি বাড়িয়ে দিল। সঙ্গী এত সদয় বলেই যেন প্যাট মেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছ ঘেঁষে এসেছে, মন্থর পায়ে নাচছে, আর প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামের জন্য দুজনে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসল একটু। আর তখনি প্যাট মেনডোনসা অস্ফুট ক্লান্ত সুরে বলল, আমার ভয়ানক শীত করছে। আমি আর থাকতে পারছি না...

জামার ওপর তার কাঁধে হাত রেখে নরিস বিচলিত হল একটু। গা'টা সত্যি বড় বেশি ঠাণ্ডা। আবার আগের মতোই শ্রান্ত আর ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নরিস নিজের দামি গরম কোটটা নিয়ে এসে তার গায়ে পরিয়ে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না, আর রাত না করে তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাও, বাড়ি কোথায়?

বান্দ্রা...।

বেশি দূরে নয় তা হলে। প্যাট মেনডোনসার গায়ে তার নিজের কোটের পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ আর কলম বার করল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তার দিকেই বাড়িয়ে দিল।—তোমার বাড়ির ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিয়ে আমি কোটটা নিয়ে আসব'খন।

এ-রকম বিদায়টা যেন খুব পছন্দ নয় মেয়েটির, মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নাম, বাড়ির নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজের পকেটে রেখে নরিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে আসি।

দোতলার সিঁড়ির কাছে আসার আগেই সামনের লম্বা প্যাসেজের দিকে চোখ পড়তে মেনডোনসা দাঁড়াল।—ও-দিকটা কি?

বাথ...

অস্ফুট স্বরে বলল, আমি যাব, দেখিয়ে দাও—

প্যাসেজ ধরে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে নরিস দাঁড়াল। প্যাট মেনডোনসা হালফ্যাশানের মস্ত বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীর ক্লান্ত দুটো চোখ আবার নরিসের মুখে এসে আটকালো। মাথা নেড়ে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নরিস। বলে কি! এ কার পাল্লায় পড়ল সে! তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, না না, কিছু ভয় নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

রমণীর নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের থেকে নড়ছে না। এই মুখে আর চোখে একটা কঠিন ছায়া পড়েছে। শান্ত ঠাণ্ডা গলায় আবার বলল, তুমিও এসো।

প্রায় আদেশের মতো শোনালো। নরিস ঘাবড়েই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে! ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই—নাকি এও মানসিক রোগ কিছু! বিস্ময় সংবরণ করে এবারে জোর করেই মাথা ঝাঁকালো নরিস, বলল, আঃ! কেউ এসে পড়লে কি ভাববে! বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি—

প্যাট মেনডোনসা চেয়েই আছে। চেয়েই আছে। তারপর আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজা খুলল সে। ভিতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নরিসের।...ভালোয় ভালোয় এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয়।

জানালায় ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগারেট শেষ হয়ে গেল, আর একটা কখন ধরিয়েছে এবং আধাআধি শেষ করেছে খেয়াল নেই—অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনো বেরোয়নি। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

দ্বিতীয় সিগারেট শেষ হল। নরিস পায়চারি করছে। কিন্তু দরজা খোলার নাম নেই।

তারপর আরো আধঘণ্টা কেটে গেল। নরিস বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। দরজা ঠেলেছে, দরজায় মৃদু আঘাত করেছে, ডেকেছে—কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। তারপর একটা করে মিনিট গেছে আর নরিসের ভয় বেড়েছে। গোড়া থেকেই কেমন লাগছিল মেয়েটাকে—ভিতরে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল, না কি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসল!

ঘড়ি দেখল! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে রাত্রি। তার মানে একঘণ্টার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে! বিমূঢ় নরিস কি করবে দিশা পেল না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল কয়েকবার। মজবুত দরজা একটু কাঁপল শুধু।

নরিস দৌড়লো হঠাৎ। আধ ভাঙা আসর থেকে চ্যাটার্জিকে খুঁজে বার করল। চ্যাটার্জি প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাত পায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এল নরিস। চ্যাটার্জির পিছু পিছু আর দুই একজন উৎসুক বন্ধুও এল। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারাও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারাও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ারটেকার পুলিশে ফোন করল। পুলিশ এসে দরজা ভাঙল যখন, তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

এক সঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নরিস বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই একজন ঠাট্টা করল, নরিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পাখি হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোনো পথ নেই।

কেয়ারটেকার বা পুলিশের লোকেরও ধারণা হল, নরিস বেসামাল হয়েছিল, হয়তো ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি—আর বাইরে থেকে দরজার হ্যান্ডেল টানা-হেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক কারণে হোক ভিতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানা হেঁচড়া করে বা কোনোরকম অস্বাভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিনা—এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে—গবেষণা করার মতো ধৈর্য কারো নেই।

চ্যাটার্জি হতভম্ব নরিসকে একদিকে টেনে এনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, রাত্তিরে কতটা খেয়েছিলে?

নরিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু চ্যাটার্জির সংশয় গেল না। বলল, অভ্যেস নেই—ওটুকুতেই গণ্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নরিস, এই দ্যাখো, আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে, নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে—

চ্যাটার্জি দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিষ্কার নয়। তবু একমাত্র সঙ্গত মন্তব্যই করল সে। বলল, তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনি বেরিয়ে চলে গেছে সে, তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার, তাই—

নরিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে তার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জি হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে—বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নরিসের। সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনি চলে গিয়ে থাকবে। এ ছাড়া কি আর হতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়তো কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা যে রুষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে—তাই কোনোরকম বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টা তিনেক নরিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জি, তারপর নরিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে। ঘুম তাড়িয়ে নরিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জি। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে বান্দ্রার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

নরিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে?

নরিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গত রাতের ফাংশানে শীত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল নরিস।

বৃদ্ধ দেখলেন। গম্ভীর। বললেন, আচ্ছা, আপনারা বসুন একটু—

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কি না।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট দশটি নারী পুরুষের বড় গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে এক নজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নরিস। বলল, ইনি—

দু' চোখ টান করে বৃদ্ধ নরিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নরিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকত। এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দুবছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নরিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জিও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনো রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মতো আরো একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সব থেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা—মার্টিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে। কিন্তু ডিসুজার বাপ মা'র বড় গর্ব তারা ব্রাহ্মিন্ ক্রিশ্চিয়ান—বিয়ে হতে দিলে না। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই হয়তো বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে—দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হল—তক্ষুনি শেষ। অ্যাকসিডেন্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটাল নরিস। চ্যাটার্জি ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না। মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল এক গোছা, চ্যাটার্জিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল।

সমাধি-ক্ষেত্র। নিঃশব্দে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশি খুঁজতে হল না। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই। ওই ছোট সমাধি একটা। সমাধির ওপর ক্রস্। ক্রস্-এ ঝুলছে নরিসের সেই কোট। সমাধির গায়ে নামের হরফ—প্যাট মেনডোনসা।

নির্বাক স্তব্ধ দুজনেই। অভিভূতের মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সমাধির সামনে হুঁশ নেই।

নরিস ফুল দিল। ক্রস্-এর ওপর থেকে কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো—

ফিলিপ নরিসের হাতে কোটটা দেখে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছিল চ্যাটার্জি। কিন্তু বলা হয়নি, ওটা থাক্।

** আখ্যানের বক্তা খবরের কাগজের চ্যাটার্জি আমার বন্ধু। মূল ঘটনাটি সত্যি বলে তাঁর দাবি।*

সত্যি ভূতের গল্প

বিমল কর

সারদাচরণ বকসির নাম তোমরা নিশ্চয় শোনোনি। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম। তখন সারদাচরণকে বলা হত গোয়েন্দা সারদা। উনি লহরী সিরিজের ছ'আনা দামের বইগুলোতে হামেশাই দেখা দিতেন। 'মারাকানার গুপ্তধন', 'তিন প্রহরে ঘণ্টা বাজে', 'পরশুরামের পিস্তল'—এ সব ছিল তাঁর বিখ্যাত বই। তবে সারদাচরণের আসল খ্যাতি ছিল ভূতের গল্প লেখায়। প্রায় প্রত্যেকটি কাগজেই তাঁর ভূতের গল্প বেরুত। দারুণ গল্প। অমন গল্প কেউ আর লিখতে পারত না। এক-একটা গল্প পড়ার পর দিন-দুই গা ছমছম করত।

সারদাচরণ যে কবে লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তা জানতাম না। আর মানুষের ছেলেবেলা তো বরাবর থাকে না, আমরাও বড়সড় হয়ে চাকরি-বাকরি করতে লাগলাম।

ঘটনাচক্রে সারদাচরণের সঙ্গে আমার আলাপ হল সেদিন। ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সারদাচরণের বাড়ির এক পাশেই আমায় থাকতে হয়েছিল। সেই সূত্রেই আলাপ, তারপর কথায়-কথায় ধরা পড়ে গেলেন এই সারদাচরণই সেই গোয়েন্দা সারদাচরণ। বৃদ্ধ মানুষটি এত চমৎকার, আর গল্প-গুজবে এমন পাকা যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা পড়েছে সামান্য। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল।

কথায়-কথায় আমি বললাম, "আপনি ভূতের গল্প লেখা কবে ছাড়লেন?"

"অনেক কাল আগে।"

"ছাড়লেন কেন? দারুণ লাগত আপনার ভূতের গল্প। দু'-একটার কথা এখনো মনে আছে।"

সারদাচরণ হাসলেন। বললেন, "কেন ছাড়লাম জানো? একবার এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। সেই থেকে ছেড়ে দিলাম।"

"কী কাণ্ড?"

"শুনতে চাও?"

"বাঃ, শুনব না কেন? আপনি বললেই শুনব।"

সারদাচরণ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু হল তাঁর গল্প :

সেটা নাইনটিন ফরটি-টুয়ের গোড়া হবে। তখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পিক পিরিয়ড। কলকাতা থেকে লোকজন সব পালিয়ে গিয়েছে বোমার ভয়ে। খাঁ-খাঁ করছে শহর। ব্ল্যাক-আউটের চোটে কলকাতা সন্ধে হতে না হতেই অন্ধকার। ঠুঙি-পরানো গ্যাসের আলো জ্বলে রাস্তায়—তাও সিকি মাইল অন্তর। আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে পালাইনি। কেমন করে পালাব বলো? পেট চালাতে হবে তো! পল হ্যামলিন কোম্পানিতে চাকরি করি, তারা খুব কড়া ধাতের। থাকতাম শীলবাবুর হোটেলে। মির্জাপুর স্ট্রিটে। চাকরি করি, লহরীর ছ'আনা সিরিজের বই লিখি, আর বাচ্চাদের কাগজে গল্প। ভূতের গল্পই বেশি। বড়দের কাগজেও লিখেছি দু-চারটে।

একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা পায়চারি করে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলাম। একটু-একটু চাঁদের আলো, শীত পালাই-পালাই করছে, বেশ লাগছিল। আমার বরাবরই চুরুট খাবার অভ্যেস। নতুন একটা চুরুট ধরিয়েছি, এমন সময় কে যেন এসে পাশে বসল।

কলকাতায় তখন সন্ধের পর লোকজন বড় একটা বেরুত না। কোথায় বা যাবে অন্ধকারে! পাড়ার মধ্যেই সিনেমা-থিয়েটারে যেত, বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে। কলেজ স্কোয়ার একেবারেই ফাঁকা। দু-চারজন আমারই মতন আছে হয়তো, চোখে পড়ে না।

পাশে এসে যে লোকটি বসল তাকে আমি নজর করলাম। লিকলিক করছে রোগা, গায়ের রং কালোই মনে হল। লম্বা ধরনের একটা জামা পরেছে। সেটা কোট না আলখাল্লা বুঝতে পারছিলাম না।

একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। লোকটা জবাবই দেয় না কথার, শুধু হ্যাঁ আর না। মনে হল লোকটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে রয়েছে।

আমারও কেমন জেদ ধরে গেল। লোকটাকে কথা না বলিয়ে ছাড়ব না। তাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলাম, আজে-বাজে যা মুখে এল, লোকটারও সেই একই রকম জবাব, হ্যাঁ আর না।

আমি যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছি তখন লোকটা আমায় চমকে দিয়ে একটা কথা বলল। কী বলল জান?

বলল, আমাকে সে জানে। আমার নাম সারদাচরণ বকসি। আমি শীলবাবুর হোটেলে থাকি।

শুনে আমি অবাক। লোকটা কি গোয়েন্দা নাকি?

তারপরই লোকটা বলল, আপনি মশাই যা জানেন না তা লেখেন কেন? ফাজলামি পেয়েছেন?

আমি একেবারে বেইজ্জত। বলে কী লোকটা! চটেমটে বললুম, 'আমি কী লিখি বলুন তো?'

'যত্ত ছাঁই-পাঁশ।'

শুনলে কথা! রাগে গা জ্বলে উঠল। মনে হল, এক চড়ে লোকটার বদন বিগড়ে দিই। একেবারে অসভ্য। কোনোরকমে রাগ চেপে বললাম, 'মশাইয়ের কি ছাই তোলার অভ্যেস আছে?'

'আমার কী আছে আপনার জেনে দরকার নেই।...বেশ তো করে খাচ্ছিলেন তিন

রাতে তিন খুন, মৃত্যুফাঁদ লিখে—গল্পের গরু তরতর করে গাছে উঠছিল; তা মরতে আমাদের দিকে হাত বাড়ালেন কেন?'

রাগে পিত্তি জ্বলছিল। আমার আবার বদ-অভ্যেস ছিল। রাগের মাথায় তিন পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্টও চালিয়ে দিতাম—মানে ঘুঁষি। কিন্তু রাগ হলেও লোকটার কথাবার্তা শুনে একটু ঘাবড়েও যাচ্ছিলাম। বললাম, 'আপনাদের দিকে হাত বাড়ালাম মানে?'

'একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা সাজছেন যে! বলি এই সেদিন রংবাহার কাগজে কী লিখেছেন ওটা? ভূত বলে তার জাত নেই—যা খুশি করলেই হল? কোথায় আপনি দেখেছেন ভূতে রিকশা টানছে? ছি ছি, বলিহারি আপনার আক্কেল মশাই, রাত একটায়—অমন শীতের দিনে আপনি ভূতকে দিয়ে নিমতলা স্ট্রিট থেকে বেলগেছে পর্যন্ত রিকশা টানালেন! আপনি নিজে পারবেন টানতে? দেড়-দু মাইল রাস্তা...ছি ছি ছি...!'

আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম লোকটার কথা শুনে। কথাটা তো মিথ্যে বলেনি। একেবারে হালে রংবাহার পত্রিকায় আমার একটা ভূতের গল্প বেরিয়েছে; তাতে বাস্তবিক এক ভূতুড়ে রিকশা আর রিকশাঅলার কথা রয়েছে।

রাগ একটু কমল। বললাম, 'কেন, ভূতে রিকশা টানতে পারে না?'

'না। কভি নেহি...আপনি মশাই বড় বেএক্কেলে। নিজে ফুসফুস করে চুরুট ফুঁকছেন—কই আমাকে তো ভদ্রতা করে একটা দিচ্ছেন না? একটা চুরুট ছাড়ুন।'

এবার আমার হাসি পেল। আচ্ছা মজার লোক তো।

একটা চুরুট তাকে দিলাম। দেশলাইও।

লোকটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'আপনি আমার গল্প-টল্প পড়েন?'

'বাধ্য হয়ে।'

'কেন, বাধ্য হয়ে কেন?'

'ওটা আমার চাকরি।'

আপনি কি রংবাহাদুর কাগজে, কাজ করেন? রণদাবাবুর...

'না না, রণদার-টনদার কিছু নয়। ওই রণদাবাবুকেও একদিন শিক্ষা দিতে হবে। বাপের পয়সায় কাগজ করে গাধাটা সম্পাদক হয়েছে। ওর বাবা গঙ্গাবাবু প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, ছেলেটার কপালে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে।'

বলে কী লোকটা? রণদাবাবুর বাবা মারা গিয়েছেন বছর কয়েক, তাঁর সঙ্গে এই লোকটার দেখা হবার কথা নয়। ডাহা মিথ্যে বলছে। বললাম, 'রণদাবাবুর বাবা তো স্বর্গে!'

'আমি কি মর্ত্যে থাকার কথা বলছি! মায়ের কাছে মামারবাড়ির গল্প!'

লোকটার কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিল, ও যেন আমাকে ধমকাবার জন্যেই এসেছে। বলতে যাচ্ছিলাম, রণদাবাবুর বাবার সঙ্গে আপনার কি কোনো টেলিফোন কানেকশান আছে?—আমাকে কথা বলতে না দিয়ে লোকটা বলল, 'ক'দিন আগে বেণুবীণা কাগজে আপনি কী অখাদ্য লেখাই লিখেছেন! ছ্যা ছ্যা! রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ভূত ঢুকিয়েছেন! তাও আবার গোসলখানায়! কেন মশাই, ভূত কি রেলের জমাদার না ঝাড়ুদার? আপনার মতো নিরেট মাথা আর দেখিনি!'

আমি হাঁ করে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। অন্ধকারে যেটুকু ঝাপসা জ্যোৎস্না

ফুটেছে তাতে তাকে অস্পষ্টই দেখাচ্ছিল। লোকটা দেখি টপাটপ গল্প বলে দিচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, রংবাহার আর বেণুবীণা—কাগজ দুটো আলাদা হলেও ছাপা হয় একই প্রেসে। লোকটা নিশ্চয় ছাপাখানার লোক! ছাপাখানায় কাজ করে!

'আপনি কি প্রেসে কাজ করেন? কম্পোজিটার?' আমি বললাম।

'কম্পোজিটার! কেন?'

'না, বলছিলাম—মানে ছাপাখানার কম্পোজিটার হলে তাকে সবই পড়তে হয়। আপনি পটাপট এত গল্পের কথা বলে যাচ্ছেন—!'

'চ্যাঙড়ামি করছেন!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। 'কম্পোজিটার! আপনার সব ক'টা ভূতের গল্পের ভূতদের কথা আমি বলে দিতে পারি। বলব?' বলে লোকটা চুরুটে গোটা-পাঁচেক টান মারল। কাশল খকখক করে। তারপর বলল, 'আপনার একটা ভূত ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেছে লোয়ার সারকুলার রোডে, তার জন্য দুটো বাস মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়েছে। এ-রকম হয় না। ভূতরা মানুষের মতন অত বাজে ট্রাফিক পুলিশ হয় না। আপনি আর-একটা যা কাণ্ড করেছেন, লাশকাটা ঘরে একটা ভূতকে দিয়ে অনবরত হা-হা-হি-হি করে হাসিয়েছেন। ভূতরা আপনাদের মতন হ্যা-হ্যা করে হাসে না, তারা দাঁত বার করে হাসতে শেখেনি। লাশকাটা ঘর দেখেছেন কখনো জন্মে? তার গন্ধ শুঁকেছেন? গল্পটা পড়ে আপনাকেই কাটতে ইচ্ছে করছিল। আপনি অদ্ভুত লোক মশাই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতন—যত রাজ্যের বাজে নোংরা কুচ্ছিত কাজ ভূতদের দিয়ে করিয়েছেন। যেমন মানুষরা কত ভালো, তারা সব ভালো ভালো কাজ করে। বোলপুরের সেই গল্পটায় একটা বুড়ো ভূতকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আপনি তেলেভাজা খাইয়েছেন, আর নিজেরা খেয়েছেন ওমলেট। তার রেজাল্ট কেমন হয়েছিল মনে আছে তো? কলেরা হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন!...আপনি খুবই বাজে লোক। ভূতকে দিয়ে সংস্কৃত বলিয়েছেন। পৃথিবীতে কোনো ভূতই দু-তিনটে ভাষা বলতে পারে না। সংস্কৃত পারে না, পুস্তু পারে না, জার্মান পারে না। কেন পারে না জানেন না, আপনাকে জ্ঞান দেওয়া বৃথা। আপনি গবেট টাইপের। যাক্‌গে, দুটো কথা বলতে এসেছি, বলে চলে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি চুপ। মুখে কথা আসছিল না।

লোকটা বলল, 'শুনুন। যা বলছি তার অন্যথা করবেন না। খুন, পিস্তল, গুমখুন—এ-সব নিয়ে যত খুশি লিখুন, কেউ কিছু বলতে আসছে না। কিন্তু ভূত নিয়ে নয়। আপনারা বাঙালি লেখকরা ভূত নিয়ে ভেলকির গল্প ফাঁদছেন, না-হয় হাসি-মসকরা করছেন। সাহেবরা এমন নোংরা কাজ করে না। তাদের ভূতরা ভদ্রলোক। দু'চারটে হাই ক্লাসের ভূতের গল্প মেরে লিখলেও তো পারেন! যত্ত সব! আচ্ছা চলি, অনেক দূর যেতে হবে। তবে যা বললাম মনে রাখবেন। আর ভূতের গল্প লিখবেন না। লিখলে এমন শিক্ষা পাবেন যে নবাবের মতন পার্কে বসে বসে চুরুট ফুঁকতে হবে না!'

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনার পরিচয় স্যার?'

'পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি ভূতদের রিপ্রেজেনটেটিভ। দূত বলতে পারেন। ওখানকার সেনসার অফিসের একজন জুনিয়র অফিসার। সদ্য গিয়েছি। আরে মশাই, গত বছর মিলিটারিতে চাকরি পেয়েছিলাম। ফোর্ট উইলিয়ামে আমার পোস্টিং ছিল। মিলিটারি

সেনসার অফিসে। এক হুদো আর্মি অফিসার আমায় তার ট্রাকে চাপা দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব। সাইডে যেতেই ওরা আমাকে ওদের সেনসার অফিসে কাজে বসিয়ে দিল। যাকগে, চলি। আপনি ভূতদের মান-সম্মান ইজ্জত তো নষ্ট করেছেনই, তার ওপর বাচ্চা-কাচ্চারাও যে ভূতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—তারও বারোটা বাজিয়েছেন। আমায় বলা হয়েছিল—আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে। সাবধান করে দিলাম আপনাকে। আচ্ছা চলি।'

লোকটা চলে গেল।

আমি হাঁ করে বসে থাকলাম।

সারদাচরণ তাঁর গল্প শেষ করলেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ''লোকটা কে?''

''জানি না বাপু। তবে ভূতের গল্প আর লিখিনি।''

''ভয়ে?''

''না না, ভয়ে নয়। মনে হল, আমি ভূতের গল্প লিখলে লোকটার অন্ন মারা যাবে।'' সারদাচরণ হেসে উঠলেন।

ভুলো ভূত

মহাশ্বেতা দেবী

তপনবাবু জীবনে কিছু ভোলেননি। ওঁর জন্ম ১৯১২ সালে। এ গল্প যখন লেখা হচ্ছে, তখন তিনি সত্তর পেরিয়েছেন। কিন্তু ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ে কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায় কোন্ কবিতা পড়েছিলেন সব বলে দিতে পারেন।

সারা জীবনে উনি একবারও ছাতা ট্রামে রেখে নেমে পড়েননি, বাজার থেকে কি কি আনতে হবে তা ভোলেননি। এসব খুবই ভালো গুণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে।

কেননা কেউ কিছু ভুলে গেলে তপনবাবু বেজায় চটে যান। ভুলে যাওয়াটা ওঁর মতে সবচেয়ে বড় দোষ। এ হেন তপনবাবু বড় বিপদে পড়লেন। ওঁর নাতি বাবুয়ার বয়স এগারো। সে আবার বেজায়রকম ভুলো। এই নিয়ে যথেষ্ট বকাবকি করে একশো আটবার বাবুয়াকে দিয়ে ''হে রাম, আর ভুলব না'' বলিয়ে উনি যেই নিজের ঘরে ঢুকেছেন, সেই আলো নিভল।

যা হোক, রাতটা চাঁদনী ছিল। ঘরে বেশ স্বচ্ছ একটা আলোও আসছিল। হঠাৎ তপনবাবু দেখলেন, ওঁর ঘরে চেয়ারের ওপর একটা মাথা ভেসে আছে, এবং মাথাটি কাঁদছে। যথেষ্ট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—এর মানে কি?

তপনবাবু যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন। লোডশেডিং হোক বা না হোক এখন উনি বজ্রাসন করবেন, জল খাবেন, তারপর শোবেন। রুটিনে বাগড়া পড়লে ওঁর মেজাজ ঠিক থাকে না।

—আমার ঘরে একটা মুণ্ডু কেন?

—স্যার, আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—তুমি কে হে?

—আজ্ঞে আমি এখন ভূত।

—আহাহা! কান জুড়িয়ে গেল।

—আমি ভূত, স্যার!

—বলি ধড়টা কোথায়?

—মনে করতে পারছি না।

—তার মানে?

—স্যার, একটু শুনবেন?

—বলো। শুনে ধন্য হই।

—আমি...মানে...আমার মাথা তো কাটা গিয়েছিল কিনা। মানে ডাকাতরা আমার মাথা কেটে ফেলেছিল।

—কেমন করে?

—আমি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলাম তো...

—কেন? জঙ্গল ছাড়া যাবার পথ ছিল না?

—ছিল। তবুও...

—বেশ! মাথা কেটেছিল, বুঝলাম।

—সেই থেকে যখনি মানুষকে...মানে আপনাদের ভয় দেখাতে যাই, ধড়ের একটু উপরে মাথাটা...ভাসতে থাকে।

—আজই বা এমন মূর্তিতে এলে কেন বাপু?

—সেই তো বলতে চাইছি স্যার। আজ আমি ধড়টা ভুলে চলে এসেছি।

—কি বললে?

—অত ধমকে কথা বলবেন না স্যার। আমার ভীষণ ভয় করে।

—ভয় করে! লজ্জা করে না?

—লজ্জা?

—আবার জিগ্যেস করছ? মানুষের মধ্যে রাতদিন দেখছি ভুলো স্বভাব! অপদার্থ সব! ভূতের মধ্যেও সেই স্বভাব? ধড়টা ভুলে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তার মানে, যখন জ্যান্ত ছিলে তখনো এমনি ভুলোই ছিলে? নিশ্চয় তাই হবে।

—হ্যাঁ স্যার!

মুণ্ডুটি গভীর অনুশোচনায় কাঁদতে থাকে। সে এক দৃশ্যই বটে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে, কিছু মনে করতে পারছি না স্যার। কোথায় রেখে এলাম ধড়টা? আসলে আজ যে আমার মানুষকে ভয় দেখাবার কথা, তাই ভুলে গিয়েছিলাম।

—বটে!

এতক্ষণে তপনবাবুর গভীর কৌতূহল হল। বলতে কি, এই প্রথম তাঁর মনে হল যে ভূতদের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। সন্ধেবেলা লেকে হাঁটতে যান। তাঁর কয়েকজন বন্ধুও আছেন। তাঁদের এ সব কথা বললে তাঁরা অবাক হয়ে যাবেন।

—ভয় দেখাবার কি দিনক্ষণ থাকে নাকি?

গভীর দুঃখে মুণ্ডুটি বলতে লাগল, মানুষকে ভয় দেখাতে আসা তো নিয়ম স্যার। তা আমি মানুষদের বেজায় ভয় পাই তো। বারতিনেক ভয় দেখাবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেদিন তা নিয়ে খুব গণ্ডগোল।

—ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

—মানুষ আজকাল ভালো নেই স্যার। ভয় পাবে কি, তারাই উলটে ভয় দেখায়। এই দেখুন না, কত দেখেশুনে ঢুকেছিলাম একটা এঁদোপড়া বাড়িতে। সেখানে দেখি তিনটে ভয়ানক চেহারার ছোকরা বসে তাড়া তাড়া নোট ভাগ করছে। আমি তো কথাবার্তায় বুঝলাম যে ওরা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে এখন নোট ভাগ করছে। আমাকে দেখে তারা ছোরা নাচিয়ে বলে কি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব আমরা আর তুমি বেটা ভূত সেজে তাতে বখরা বসাতে এসেছ? কত বললাম যে আমি ভূত। আমি টাকা চাই না, আমি ভয় দেখাতে চাই।

—ওরা শুনল না?

—না, না। এমন খেঁকাল যে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। তারপর দেখুন ক'দিন বাদে পুলিশ অফিসারের ঘরে গিয়েছিলাম। যথেষ্ট বন্ধুভাবেই বললাম, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা কিন্তু অমুক জায়গায় আছে।

—সে কি বলল?

—আমলই দিল না। সে কি জঘন্য ভাষায় 'ফোটো ফোটো' বলে চেঁচাতে থাকল। বলল, ধড়ে মাথা বসানো নেই, কোন্ আক্কেলে থানায় ঢুকেছ? নাম কি? নিবাস কোথায়? ঠিকানা কি? ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে?

—তখন?

—তখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলাম। আচ্ছা, 'ফোটো' বলছিল কেন? আমি কি ফুল যে ফুটব?

—ওটা এখনকার বুলি। ওর মানে সরে পড়, চলে যাও।

—দু-বার দু-বার এ রকম হল যখন, তখন আমি বেজায় মুষড়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের ইউনিয়ানে এখন সব চ্যাংড়া ভূত।

—ইউনিয়ানও করা হয়?

—করাকরির কি আছে স্যার? ভূত হলেন যখন, তখন আপনি এ ইউনিয়ানের লোক।

—একটা ইউনিয়ান, না অনেক?

—একটাই। চ্যাংড়াগুলো অসম্ভব গোলমাল করে। তারা বলল, তুমি ভয় দেখাতে

যাবে না, মজা পেয়েছ? যত বলি, ওরে, মানুষ আজকাল ভয় পায় না। কে কার কথা শোনে!

—তারপর কোথায় গেলে?

—আপনার বাড়ির উলটো দিকে। ওই তেতলা বাড়িতে। সে এক দজ্জাল মেয়েমানুষ বটে। ভয় পাওয়া দূরস্থান, সে বঁটি নিয়ে আমায় তাড়া করল।

—ওখানে গিয়েছিলে কেন বাপু? বোসবাবুর গিন্নি নামকরা দজ্জাল।

—তারপর আমি একেবারে বেঁকে বসেছিলাম। আর আমি ভয় দেখাতে যাব না। মানুষ এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে। ছোট ছেলেরাও ভূত দেখলে ভয় পায় না। কিন্তু আজ শুনলাম, ভয় দেখাতে না বেরোলে আমাকে একঘরে করা হবে।

—তাতে কি?

—ভূত হয়ে ভূতের সমাজে থাকতে পাব না, এটা তো খুবই অপমানজনক। নাকি বলুন? ওরা সব বলেও দিল, অমুক জায়গায় যাও, এই ঠিকানায়। সেখানে যাবার পথেই ধড়টা ফেলে গেলাম, না সেখানে গিয়ে তবে ফেলে এলাম, কিছু মনে করতে পারছি না। সব ভুলে গেছি।

—সেখানে গিয়েছিলে?

—মনে হচ্ছে, গিয়েছিলাম।

—সে কোথায়?

—মনে নেই স্যার।

—তা আমার মনে হয়, তোমার এখন ফুটে যাওয়াই ভালো। তোমার সমস্যা খুবই জটিল। কিন্তু এ সমস্যার বিষয়ে আমার কিছুই করার নেই।

—স্যার, আমি কি ধড় ছাড়া ফিরতে পারি! শুধু মুণ্ডুকে কোনো ভূত সম্মান করবে কি?

—এ তো ভারি জ্বালা হল।

—রাস্তাটার নামটা যদি মনে পড়ত!

—তোমরা কি নাম ঠিকানা নিয়ে ভয় দেখাতে বেরোও?

—হ্যাঁ স্যার। আগে যার যা ইচ্ছে হত তাই করত। এখন খুব কড়াকড়ি। প্রত্যেকদিন প্রত্যেককে কোথায় যাবে, কার বাড়ি যাবে—সব জেনে বেরোতে হয়। এ তো মানুষের কাণ্ড নয়, স্যার, যে যা ইচ্ছে তাই করবে। আমরা খুব ডিসিপ্লিনে থাকি।

—কি রকম ডিসিপ্লিন?

—সব তো বলা যাবে না স্যার। তবে কিছু কিছু বলতে পারি। আমরা, যারা ভূত, তারা বাঁধাধরা এলাকায় ঘুরব। যেমন আমি কলকাতা থেকে ক্যানিং-এর মধ্যে থাকব। আবার যারা ধরুন শাঁকচুন্নি, বা পেতনি, বা মেছো ভূত, তারা থাকবে গ্রামে।

—এ সব নিয়ম কেউ ভাঙে না?

—কে ভাঙবে তা বলুন? পুঁচকে ভূতরা রাত দশটা বাজলেই ফিরে যাবে, এও একটা নিয়ম। মানুষদেরকে এত কথা বোঝানো মুশকিল।

—তোমার এই ভুল সারানোর দাওয়াই ভূতের রাজ্যে নেই?

—না স্যার।

—কোন্ রাস্তা তাও মনে নেই?

—না স্যার।

—তোমার ভুল সারাবার দাওয়াই আমি জানি।

—একটু দেবেন?

—দেবার দাওয়াই নয়, বলতে হবে।

—কি?

—দাওয়াই অব্যর্থ, তবে তোমার পক্ষে...যাক, একশো আটবার হেঁকে বলো দেখি—রাম!

—কি বললেন! মুণ্ডুটি আর্তনাদ করে ওঠে।

—বলো 'রাম'!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রামময় রোডই বটে...গলার শব্দ তীক্ষ্ণ হয় এবং মুণ্ডুটি মিলিয়ে যেতে থাকে।

—রামময় রোডে যাবে তাই ভুলে গিয়েছিলে?

তপনবাবু যথেষ্ট হেঁকে বলেন। মুণ্ডুটি কি যেন বলে, তা বোঝা যায় না।

এবং আলো জ্বলে ওঠে। তপনবাবু ভালো করে দেখে নেন ঘরটা। নাঃ, কোথাও কিছু নেই। এবার বজ্রাসন করে জল খেয়ে শুয়ে পড়া যাক।

কাল সকলকে গল্পটা বলতে হবে। নাতিকে আর ধমকধামক দেবেন না তপনবাবু। ভুলে যাওয়াটা, বোঝা যাচ্ছে একটা গুরুতর ব্যাধি। রীতিমতো গুরুতর।

একদিন রাত্রে

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি.এস.সি পরীক্ষা সামনে এসে গেছে, পড়াশুনো কিছুই করি নি। মেজদার নতুন মোটরটায় সত্তর মাইল স্পিড দিয়ে ডায়মন্ডহারবারে কিম্বা চন্দননগরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা, এ-সবেই দিন কেটেছে। কিন্তু আর নয়, বই খুলে এবার ঘরে বসেছি। রাত বোধহয় অনেক হল। বৈঠকখানা থেকে বড়দার ব্রিজের আসরের তর্কাতর্কি আর কানে আসছে না। মেজদা ডাক্তার, অনেকক্ষণ রোগী দেখে ফিরে এসে তাঁর ঘরে শুয়ে পড়েছেন।

কেটে গেছে আরো বেশ কিছুক্ষণ। এবার ঘুম পাচ্ছে, রীতিমতো ঢুলে পড়ছি, কিন্তু না, ঢুললে চলবে না, ঘুমোলে চলবে না। খাতা নিয়ে অঙ্ক কষতে শুরু করলাম। অঙ্ক কষছি তো কষছিই। এমন সময় দরজার পাল্লা ঠেলে হঠাৎ-ই মেজদার আবির্ভাব।

বললেন, ওরে একটু আমার সঙ্গে চল্ তো। ড্রাইভার বাড়ি চলে গেছে। এদিকে 'কল্'-ও এসে গেছে জরুরি, না গেলেই নয়। যত জ্বালাতন এই এত রাত্রে! ডাক্তারি করা যে কী ঝক্মারি!

বড় ভারিক্কি মানুষ এই মেজদা, এখনো বেশ সমীহ করে চলতে হয়। বড়দা হলে না-হয় একটু আপত্তির গুনগুনানি তুলতাম, কিন্তু মেজদা— ? ওরে বাবা, তবেই সর্বনাশ!

নিরুত্তরে চললাম মেজদার সঙ্গে। গাড়ি বার করলাম গ্যারেজ থেকে। মেজদা এসে পাশে বসলেন। আর ভিতরের সিটে বসলো একটি মধ্যবয়স্ক গেঁয়ো লোক। এই লোকটিই বুঝি ডাকতে এসেছিল মেজদাকে! ঐ বোকা-বোকা ভালোমানুষ গোছের লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যা চটলাম ওর ওপরে, তা বলার নয়। ব্যাটা এত রাত্তির করে এসেছে ডাক্তার ডাকতে! না হয় অন্য ডাক্তারকে ডাক! তা নয়, মেজদাকেই চাই, কেন, সারা শহর জুড়ে আর কোনো ডাক্তার ছিল না?

নির্জন রাস্তা, রেগেমেগে দিলাম স্পিড বাড়িয়ে, যতটা পারি।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা করতে করতে শহরের প্রায় বাইরে অন্ধকার এক কানা গলির সামনে লোকটা দাঁড় করালো আমাদের। তারপরে গাড়ি থেকে নেমে মেজদাকে বললো, একটু বসুন ডাক্তারবাবু, আমি লণ্ঠনটা নিয়ে আসি, বড় অন্ধকার! (ওদিকে তখন লোডশেডিং চলছিল বোধহয়)।

লোকটা দেখতে দেখতে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তার কয়েক মুহূর্ত পরে গলির মধ্য থেকে বেরিয়ে এল আর একটি মধ্যবয়সী লোক। (ঐ অন্ধকার থেকেই। হাতে কোনো লণ্ঠন বা টর্চ ছিল না।) মোটরের কাছ-বরাবর এসে আমাদের দুজনকে দেখে একটু ধমকে দাঁড়ালো, বললো,—ডাক্তারবাবু বুঝি?

মেজদা মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার। লোকটি বললে, আর দেখে কী করবেন বাবু, রোগীর ওদিকে হয়ে গেছে। বলেই আর দাঁড়ালো না, গাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন কোন্‌দিকে।

আমরা নির্বাক। একটু পরেই এল সেই আগের লোকটি, লণ্ঠন হাতে। বললো, আসুন ডাক্তারবাবু।

মেজদা যথারীতি গেলেন তার পিছনে পিছনে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ফিরে এলেন একটু পরেই। যেন পলক ফেলতে না ফেলতে! একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে ছিল, তার আর ফুরসৎ পেলাম না।

মেজদা হাতের ব্যাগটা ভিতরে রেখে দিয়ে বসলেন এসে আমার পাশে। বললেন, দেরি করিস নি, শীগগির স্টার্ট দে!

গলাটা ওঁর যেন একটু ধরা-ধরা, স্বরটা কাঁপা-কাঁপা।

দিলাম গাড়ি চালিয়ে। একটুক্ষণ চলবার পর মেজদা বললেন, হ্যাঁরে, যে-লোকটা আমাদের কাছে এসে বললে, 'রোগী মরে গেছে',—তার মুখখানা লক্ষ করেছিলি?

—হ্যাঁ। ন্যাড়ামাথা—কালোপানা মুখ। চোখ দুটো—

—সেই লোকটাই রোগী। গিয়ে দেখি বিছানায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে! কথাটা বলেই মেজদা আমার দিকে একটু ঘন হয়ে সরে বসলেন।

ছক্কা মিয়ার টমটম

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কা মিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড়-বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশমাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে একচিলতে টিমটিমে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর এগিয়ে আসবে। মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং....টং লং...টং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি—তেরপলের চৌকা একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়ানো এক টাট্টু!

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল সরিয়ে চৌকা টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবার টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম—টং লং...টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম্' থেকে—যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেত। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কা মিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটি কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিঙটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রং রোদপোড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড়-জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়-মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না। কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কা মিয়া এটা

বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।...

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল, আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না—আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কা মিয়ার টমটম আছে। বাপ্‌স্‌!'

ওই টমটমে কখনো চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে, তাই না ছোটমামা?'

ছোটমামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মজা হবে! বুঝবে ঠ্যালাটা 'খন!'

ঠ্যালাটা কিসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বার বার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড়বৃষ্টি হবে। কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম! বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না, ছ্যা ছ্যা, আমার কী আক্কেল!'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনো কিন্তু ঝড়বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পিছনদিকের তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী? উঠে আয়, এক্ষুনি একগাদা লোক এসে ভালো জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পর্দাটা ফাঁক করে রাখলেন। একটু পরে আরো জনা দুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে হেঁড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম, হল তো?'

ছক্কা মিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা। এবার রওনা দিই।' তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা 'বাপ্‌স্‌' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপ্‌স্‌'! হাড়গোড় ভেঙে যাবার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই আর মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কা মিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজী হয়ে উঠছে। একটু পরেই চড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টোপরের তেরপলে পড়তে শুরু করল। ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে, ওর বৃষ্টির ছাঁট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেল লাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়বৃষ্টিটা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলেছে। মাঝে মাঝে

ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ—টং লং...টং লং...টং লং। কখনো ছক্কা মিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁ হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষীরাজের বাচ্চা!'

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামাকাপড়। একসময় ছোটমামা হঠাৎ বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, 'আঃ! হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?'

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন!'

'কী বাজে কথা বলছেন, আমায় ঠাণ্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?'

'আমি বরফ! আপনিই তো বরফ। ইস, কী ঠাণ্ডা! হাড় অবদি জমে গেল দেখছেন না।'

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, 'ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিক্‌খিক্ খিক্‌খিক্।

এমন বিদঘুটে হাসি কখনো শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও যে বরফের মতো হিম। বললুম, 'ইস! একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠাণ্ডা করে যে!'

লোকটা ভারি অদ্ভুত। সে ওই বিদঘুটে খিক্‌খিক্ হাসতে হাসতে আরো যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছোটমামা! ছোটমামা!'

কিন্তু ছোটমামার কোনো সাড়া পেলাম না। টোপরের ভেতরটা যেন ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, 'ছোটমামা, কোথায় তুমি?'

লোকটা সেই খিক্‌খিক্ হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটমামা বড়মামা। মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে!'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলুম। সুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু সত্যিই ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাট এসে ঢুকছে। আমি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললাম, 'ছক্কা মিয়া, ছক্কা মিয়া! গাড়ি থামাও—গাড়ি থামাও!'

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও বলছি!'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই।

'ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়!'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই ষাট পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না!'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কিনা বলো?'

'সামনে একটা মন্দির আছে, সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক নেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে-সেখানে থামলে ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই, বুঝলেন না? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলাম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লাম। বুদ্ধি করে ছোটমামার সুটকেস আর আমার কিটব্যাগটাও দু'হাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া!

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট শার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কি!

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে—কে?'

ছোটমামার সাড়া এল। 'অন্তু নাকি রে?'

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ। তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা?'

ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার! যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনো ছক্কা মিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটমামা আমার কাছে সুটকেস দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?'

হাসলেন ছোটমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনো? ওটা কি লোক নাকি?'

'তবে কে?'

'বুঝলিনে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ও-নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস, অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু-একজন সওয়ারি ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।'

'তারপর? তারপর ছোটমামা?'

'তারপর আর কী? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা সব অ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুঁড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোনো বাজ পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে।' ছোটমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঘণ্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা মুছে ফেল। বাপ্‌স্‌!'

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়, সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল? অন্য লোকটার মতো?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপ্‌স্‌!...

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চা-ওলা সবে ঝাঁপ ফেলার যোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই, তাহলে যাবেন কিসে গদাইতলা?'

'কিসে আর যাব?' বরং দেখি যদি ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটানো যায়!'

চা-ওলা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। সেবার ঝড়বৃষ্টি ছিল কম। ছোটমামাও বড় গপ্পে মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরি। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে একটুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটম চড়তে বলল।

আজ আর কোনো সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমনকি ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায়নি। আর সে অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ, টং লং...টং লং...টং লং।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোণা ঘেঁষে রইলুম। সামনেকার মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশা মাখানো জ্যোৎস্নায় ঝিমধরা মাঠঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাছতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে; আর মাথায় পড়েছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো!' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবত সামনে দু'ঠ্যাং তুলে একখানা চিঁ-হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনলুম, 'দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম!'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টোপরের ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'কে? কে?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ

দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা! সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনো দেখিনি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল, তাই দেখেননি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?'

'বংকুবিহারী রায়।'

'আসামী ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি? ওঁকে খুশি করার জন্যই বললুম।

বঙ্কু দারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম! ব্যাটা এক দাগী বেগুনচোর, ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দুজন সেপাই নিয়ে ওৎ পেতে ছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডলায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না। তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগী বেগুনচোর এই শীতকালে সারারাত তালগাছের ডগায় বসে আছে। কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা!'

'আহা মানে?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বঙ্কু দারোগা বললেন, 'হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এত রাতে চাপলেন যে? আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটে না বলে ছক্কা মিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে!'

'বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা, আগে জানলে...'

কথা কেড়ে বঙ্কু দারোগা বললেন, 'হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিচ্ছু বলা যায় না।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিমসে বাসি মড়ার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না কি না।'

এবার আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই!'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত!'

বঙ্কু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপ্‌স্‌! এ যে বেজায় ঠাণ্ডা!'

'ঠাণ্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?'

'না মশাই, এমন রাতে বিস্তর সিঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি, তারা কেউ এমন ঠাণ্ডা ছিল না।'

'কী? আমায় সিঁদেল চোর বললেন?'

বঙ্কু দারোগা গলার ভেতর থেকে বললেন, 'সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপ্‌পা হয়ে চেঁচালুম, ‘পুলিশ হোন আর যাই হোন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।’

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন, ‘উঁ হুঁ হুঁ। বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন! সরে বসুন বলছি!’

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয়! ‘টর্চ নেভান!’ বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধ হয় ভুল হল। আর বঙ্কু দারোগা বিকট গলায় ‘ভূত! ভূত!’ বলে চিক্কুর ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টোপরের একপাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। পলকের জন্য দেখলুম কুয়াশা-ভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে সরে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টং লং...টং লং...টং লং...!

ভাগ্যিস রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল! আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল, লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, ‘কী বলছেন বাবু? ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে! ভাগ্যিস টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু! সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালোয় ভালোয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।’

বঙ্কু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে! আহা বেচারা!

কী ঘটল, তা পরদিন শুনলুম। বঙ্কুবাবু এখন হাসপাতালে। লোকে বলছে, আসামী ধরতে গিয়ে সাইলে থেকে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশন বাজারের সেই ধড়িবাজ চা-ওলা। কেমন হেসে বলেছিল, ‘ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন!’ সব জেনেশুনেও কী অদ্ভুত রসিকতা!

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল, ‘ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন।’ আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ!...

বৃত্তের বাইরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্তিরে শুতে যাবার আগে প্রত্যেকদিনই স্নান করা অভ্যেস রীনার। শীত গ্রীষ্ম মানে না। রীনাই দোতলার বাথরুমে নীল বাল্‌ব লাগিয়েছে। সারা বাড়িটা যখন নির্জন হয়ে আসে, তখন শাওয়ার খুলে নিয়ে নীল আলো জ্বেলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে।

একটা অস্পষ্ট চিৎকার রীনাও শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু গ্রাহ্য করে নি, সারা গায়ে সাবান মেখে সে তখন স্পঞ্জ দিয়ে পিঠ ঘষার চেষ্টা করছিল, ঠোঁটে আলতো গুনগুন গান। আর একবার চিৎকার উঠতেই কোণের ঘরের দরজা খুলে মা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে চেঁচাচ্ছে কে? বউমা? আমাদের বাড়িতে নাকি?

বন্ধ বাথরুমের ভেতর থেকে রীনা জবাব দিল, মনে তো হল কাঞ্ছার গলা। আবার বোধহয় আজ ওর মাথায় ভূত চেপেছে!

বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে মা জিজ্ঞেস করলেন, এই কাঞ্ছা, কাঞ্ছা? কি হয়েছে কি? চেঁচাচ্ছিস কেন?

একতলার কোণের ঘর থেকে কাঞ্ছা হাউমাউ করে কি যেন বলে উঠল। একটি বর্ণও বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হল খুব ভয় পেয়েছে। বাথরুমের জানলা দিয়ে রীনা ধমকের সুরে বললো, এই কাঞ্ছা, চুপ কর। এত রাত্তিরে মানুষজন ঘুমোবে না?

চিৎকার থামলো না, বরং সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে উঠল। মা ডাকলেন, দীপু, দীপু ঘুমিয়েছিস নাকি? আয় না একবার নিচে—বউমা, তাড়াতাড়ি বেরোও।

রাত্তিরের স্নানটা তাড়াতাড়ি সারতে হলেই রীনা বিরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বেরুতেই হবে, সব জায়গায় স্পঞ্জ বুলোনো হল না, তাড়াতাড়ি জল ঢেলে সাবান ধুতে লাগলো। মা ততক্ষণে শিপ্রাকেও ডেকে তুলেছেন। দীপুর গম্ভীর গলা শোনা গেল, কি হয়েছে কি? আজ আবার জ্বালাচ্ছে তো কাঞ্ছাটা! বলছি ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও!

গত বছর কার্সিয়াং বেড়াতে গিয়ে এই নেপালী ছেলেটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওর বাবাই বলেছিল, এখানে খেতে পাচ্ছে না, কলকাতায় বাবুদের কাজ করে খেয়ে পরে তবু বাঁচবে। চোদ্দ-পনেরো বছরের হাসি-খুশি ছেলেটা, যেমন বিশ্বাসী তেমন খাটতে পারে, কোনো কথায় না নেই, বাড়িতে সবারই ছেলেটাকে খুব পছন্দ। কিন্তু একটা মুশকিল

হয়েছে ছেলেটাকে নিয়ে—সন্ধ্যের পরই ও কেমন যেন বদলে যায়, মুখ-চোখে ভয়ের ছাপ পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে একা পড়ে গেলেই চেঁচিয়ে ওঠে। দারুণ ভূতের ভয় ছেলেটার। প্রথম প্রথম বাড়ির সবাই হাসি ঠাট্টা করে ওর ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বহু জন্মের পাহাড়ি কুসংস্কার সহজে যাবার নয়।

নিচতলায় ভাঁড়ারঘরে শুতে দেওয়া হয়েছে কাঞ্চাকে, কিন্তু প্রায় রাত্তিরেই ও ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে। আসলে একা ঘরে শোয়ার অভ্যেস ওর নেই। কিন্তু বাড়ির চাকরকে আর কোথায় শুতে দেওয়া হবে—কিছুদিন দোতলার বারান্দায় শুতে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও ওর ভয় কমে নি তা ছাড়া নিচতলাটা একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকে। এখন ওর সঙ্গী হিসেবে একটা কুকুর কিনে দেওয়া হয়েছে, কুকুরটা রাত্রে ওর ঘরে শোয়। এমনিতে ছেলেটা দিনের বেলা সাহসী, দুপুরবেলা বৈঠকখানায় যেবার চোর ধরা পড়লো তখন কাঞ্চাই তো ছুটে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরেছিল, আর একটু হলে ভোজালি চালিয়ে দিত। অথচ রাত্তির হলেই ওর যত রাজ্যের ভয়। রোজ খাবার সময় ও রীনা আর শিপ্রাকে শোনায়—ভূতেরা নাকি ওর ঘরে ফিসফিস করে, ওকে ভয় দেখাবার জন্য হাসে। আসলে পুরোনো বাড়ি, মোটা মোটা দেয়ালে নোনা ধরার গন্ধ, দিনের বেলাতেও নিচতলাটা অন্ধকার হয়ে থাকে, সিঁড়ির তলার অন্ধকার জায়গাটার দিকে তাকালে এমনিতেই গা ছম্ ছম্ করে তবে কাঞ্চার আজকের চিৎকারটা যেন একটু বেশি চরম।

ওরা তিনজন নিচে নেমে গেছে, গোলমাল থামে নি, সবাই মিলে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলছে। রীনা তাড়াতাড়ি ব্লাউজ সায়া পরে নিল, শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে ঝটাস্ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মাথাটা ভালো করে মোছা হয় নি, টপ্‌টপ্ করে জল ঝরছে। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নিচে।

কাঞ্চার ঘরে উঁকি দিয়ে রীনা জিজ্ঞেস করলো, কি, কি হয়েছে কি? কাঞ্চার থেকেও এখন বেশি চেঁচাচ্ছে শিপ্রা, কিন্তু তার কথা শোনার আগে রীনা নিজেই দেখতে পেল। কাঞ্চার হাতে একটা শাবল, ঘরের মেঝেটা অনেকখানি খুঁড়ে ফেলেছে। এ ঘরের মেঝেটা অনেকদিন ধরেই এবড়ো-খেবড়ো, বহুকালের ড্যাম্পে মাটি এরকম ফুলে ফুলে ওঠে। কাঞ্চা প্রায় বলে, রাত্তিরে নাকি ওর বিছানার তলায় গুম্‌গুম্ শব্দ হয়। তাই শুনে শিপ্রা বলেছিল, তোর ঘরের ঠিক নিচেই পাতাল পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ আছে। তাই না রে? আজ কাঞ্চা কারুকে কিছু না বলে শাবল দিয়ে সিমেন্টের মেঝেটা খুঁড়ে ফেলেছে। রীনা দেখতে পেল সেখানে একটা মড়ার মাথার খুলি।

কাঞ্চা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা তার রক্তহীন ফ্যাকাসে, গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুল না এখন। শিপ্রা তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে, বাচ্চা কুকুরটা শুঁকছে সেই মড়ার মাথার খুলি—কুঁই কুঁই করে শব্দ করছে। রীনার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, পায়ের জোর চলে গেল, মনে হল, এক্ষুনি মাটিতে ঝুপ করে পড়ে যাবে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তীব্র গলায় বললো, একি! সঙ্গে সঙ্গে মা আর শিপ্রার কান্না মেশানো চিৎকার।

একমাত্র দীপুরই ঠাণ্ডা মাথা। সে জিজ্ঞেস করলো, এই ছোঁড়া, তুই হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘর খুঁড়তে গেলি কেন?

মা বললেন, কি সর্বনাশ! এটা কি করে এখানে এল! এই দীপু—

—আমি তা কি করে জানব! পুরোনো বাড়ি, কবেকার কি সব ব্যাপার!

—তোর দাদাকে খবর দে! আমার মাথা ঘুরছে—এই শিপ্রা, ওরকম করছিস কেন?

—দাদাকে খবর দেবার কি হয়েছে?

মা আর শিপ্রার ভয় দেখে রীনার প্রথম আতঙ্কটা কেটে গেছে। মা শিপ্রা দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে রয়েছেন, দু'জনেরই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। রীনা তাড়াতাড়ি উঠোনের আলোটাও জ্বেলে দিল। মাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললো, দেখেই তো মনে হচ্ছে বহুদিনের পুরোনো—

দীপু এগিয়ে পা দিয়ে খুলিটাকে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। মা আর্তস্বরে বললেন, ছুঁস্ না ছুঁস্ না—এই দীপু, সরে আয়—।

মা দীপুর হাত ধরতে যেতেই দীপু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, দাঁড়াও না—আমার ডাক্তার বন্ধু আলোকের ঘরে দু'দুটো কঙ্কাল আছে, কতবার তাতে হাত দিয়েছি!

খুলিটা সত্যিই খুব পুরোনো, ভেতরে মাটি ভর্তি। চোয়ালের খানিকটা ফেটে গেছে, চোখের জায়গায় দুটো শূন্য গর্ত। শিপ্রা ভয়ে মা'র পিঠে মুখ গুঁজে দিয়েছে। দীপু বললো, মনে হচ্ছে এর নিচে আরো হাড়গোড় আছে, একটা গোটা মানুষই ছিল—শ'খানেক বছর আগে কেউ বোধহয় একটা লোককে খুন করে এখানে পুঁতে ফেলেছিল—কিংবা এমনও হতে পারে, এ জায়গাটা ছিল কবরখানা।

রীনা বললো, কিন্তু বাড়ির ভিত খোঁড়ার সময় তা দেখে নি কেউ?

—হয়তো বাড়ির মালিকই কাউকে পুঁতে রেখেছিল। যাকগে, এই কাঞ্চা বেরিয়ে আয়, কুকুরটা নিয়ে আয়।

ভয়, উত্তেজনা ও চেঁচামেচি চলল আরো কিছুক্ষণ। দীপু শেষ পর্যন্ত বললো, এখন এ ঘরে তালা দেওয়া থাক, কাঞ্চা আমার ঘরেই শুয়ে থাকুক আজ। কাল সকালে আমি বাকি মেঝেটা খুঁড়ে দেখব এখন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, তুই খুঁড়বি কেন?

রীনা বললো, বলা যায় না হয়তো গুপ্তধন টুপ্তধনও থাকতে পারে!

দীপু হেসে বললো, যা বলেছো! হয়তো গুপ্তধন পুঁতে যখ দিয়েছিল! আয় কাঞ্চা, তোর বিছানা নিয়ে আয়। বউদি, তুমিও না হয় মা'দের ঘরে গিয়ে শোও—ভয়-টয় পাবে রাত্তিরে।

—আমি অত ভয় পাই না।

—না-বৌমা, তুমি আমার ঘরেই এসো।

—কাঞ্চার ঘর বন্ধ করে উঠোনের আলো নেভাবার পর নিচতলাটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সিঁড়িতে ওঠার আগে শিপ্রা আবার মাকে জড়িয়ে ধরলো, রীনা রইলো সবার পেছনে। শিপ্রা কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, মনে হচ্ছে উঠোনে এখনো একটা কিসের শব্দ হচ্ছে, না?

রীনা বললো, ধ্যাৎ! কোথায় শব্দ?

দীপু বললো, শিপ্রাটার সব সময়ই ভয়—এত বড় মেয়ে, চল্ তোকে এখন একবার একা রেখে আসি নিচে।

—ওরে বাবা! শিপ্রা, দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে ওপরে উঠে এল।

রীনা মা'দের ঘরে গেল না। নিজের ঘরেই এল শুতে। ভালো করে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে, খাটের নিচেও একবার উঁকি মেরে দেখলো।

একা শোওয়া অভ্যেস আছে রীনার। এক সপ্তাহ অন্তর এক সপ্তাহ করে নাইট ডিউটি থাকে দেবনাথের। খবরের কাগজের চাকরি, রাত দুটো-আড়াইটের সময় ডিউটি শেষ হয়। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস রাত আড়াইটের পরই হেঁটে বাড়ি ফিরে আসত, জেগে থাকত রীনা। এখন রীনাই তাকে বারণ করে দিয়েছে অত রাত্রে ঝুঁকি নিয়ে ফিরতে, গুণ্ডা বদমাইসদের হাতে পড়তেই পারে, একদিন পুলিশের গাড়িও থানায় নিয়ে গিয়েছিল, নেহাত খবরের কাগজে চাকরি করে বলেই অফিসে টেলিফোন করে ছাড়া পায়।

কলেজে পড়ার সময়ও রীনা বরাবর হোস্টেলে কাটিয়েছে। তার ঘরে অবশ্য আরো দুটি মেয়ে শুত, কিন্তু কখনো কখনো তারা হয়তো বাড়িতে গেছে, আর ফেরে নি—রীনা একা ঘরে শুয়ে থেকেছে, তার কোনোদিন ভয় করে নি।

খাটের তলা-টলা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রীনা শাড়ি ব্লাউজ সায়া খুলে নাইটি পরে নিল। সারা বাড়ি এখন আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এ পাড়াটাও বেশ নির্জন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রীনা ভাবলো, শিপ্রার বড় বেশি বেশি ভয়। কচি খুকি! তেইশ বছরের মেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিয়েছে। কাপ্পার চেয়েও ওর ভয় যেন বেশি।

রীনার ভূতের টুতের ভয় নেই! কিন্তু চোর-ডাকাতকে তার বড্ড ভয়। রাতদুপুরে তার ঘরে যদি একটা চোর ঢোকে—ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখতে পেলেই রীনা হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। অবশ্য তার আগে ভালো করে দেখে নেবে সত্যিকারের চোর কিনা। দেবনাথের মতন করবে না। দেবনাথ একদিন মাঝরাতে বাথরুমে যাবার জন্য বেরিয়েছিল—সিঁড়িতে দীপুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, চোর! চোর! দীপুও তখন বাথরুমে যাবার জন্যই নিচে এসেছিল, সে যত বলে দাদা আমি—দেবনাথ শুনতেই পায় নি—তারস্বরে চেঁচিয়েছিল চোর, চোর!

চুল আঁচড়ানো শেষ করে রীনা মুখে ক্রিম মাখতে লাগলো। তারপর গ্লিসারিনের শিশি থেকে খানিকটা গ্লিসারিন মাখলো ঠোঁটে আর কনুইয়ের কাছে। অনেক মেয়ের দুই কনুয়ের কাছে কি রকম খরখরে হয়ে থাকে। রীনা একদম পছন্দ করে না। রীনা আবার ভাবলো, দীপুর কিন্তু সাহস আছে। দীপুর স্বাস্থ্য ভালো, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হলেও সবাই সাহসী হয় না। তবে এটা ঠিক, দীপু যখন পা দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটায় ঠোক্কর মারছিল, তখন রীনারও বুকের মধ্যে শিরশির করছিল একটু একটু। ঠিক ভয় নয়, অন্য রকম কি যেন। সুইচ টিপলেই ইলেকট্রিক আলো, এর মধ্যে ভয় পাবার কি আছে? কিন্তু শুধু একটা মড়ার মাথা দেখলেই কি-রকম কি-রকম যেন লাগে। ওটা ওখানে এলই বা কি করে! ঘরের মেঝেতে মড়ার মাথা! কেউ কখনো এরকম শোনে নি।

দেবনাথের বাবাই এই বাড়িটা কেনার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন, হঠাৎ তিনি এলাহাবাদে অফিসের কাজে গিয়ে সেখানেই হার্ট-ফেল করেন। দেবনাথরা পরে বাড়িটা কিনে ফেলে, সাঁইতিরিশ হাজার টাকায় বাড়িটা একটু সস্তাই বলতে হবে—যদিও বাড়ি খুব পুরোনো, কিন্তু জায়গা আছে অনেকটা। কিন্তু এ পর্যন্ত বাড়িটা সম্পর্কে কোনো দুর্নাম তো

কখনো শোনা যায় নি। এই এগারো বছর ওরাও দেখে নি কিছু। রীনারই তো বিয়ে হয়েছে আট বছর।

আলো নিবিয়ে খাটে উঠতে গিয়ে রীনার হঠাৎ একটু ভয় করলো। যতক্ষণ আলো জ্বালা ছিল, তার কিছুই মনে হয় নি। খালি তার মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যেন কেউ আছে। প্রথমে ভয়টা কাটিয়ে ফেলার জন্য রীনা চোখ বুজে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ, অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করলো, পুজোর সময় পুরী যাবার কথা বলেছিল দেবনাথকে, কিন্তু দেবনাথ কিছুতেই নাকি ছুটি পাবে না—প্রায় তিন বছর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া হয় নি...। রীনা কিছুতেই ভয়টা তাড়াতে পারছে না। খালি মনে হচ্ছে মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে, তার নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে—তার মুখখানা রীনার মুখের খুব কাছে ঝোঁকানো।

একটুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে ভয়টা যখন ক্রমশ বাড়ছে, তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তখন ঝট করে রীনা চোখ মেলে তাকালো, ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালালো। কেউ কোথাও নেই। নিছক মনের বিকার। অন্য কোনো রাতে একরকম মনে হয় না। শুধু আজই—নিচতলার ওটা দেখার পর...মনটা দুর্বল হয়ে গেছে। খাটের তলা, আলমারি, আলনার পাশগুলো আবার ভালো করে দেখলো—কোনোরকম সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণই নেই। দরজা জানলা সব বন্ধ, ঘরের ভেতরটা একটু গুমোট হয়ে গেছে। সেইজন্যই বোধহয়...

রীনা দারুণ জেদী মেয়ে। অকারণে সে আজ ভয় পাচ্ছে বলে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। একটা জানলা খুলে দিল রাস্তার দিকের—সেখান থেকে তাকিয়ে রইলো বাইরে। ঠুনঠুন করে একটা রিক্‌শা যাচ্ছে, রিক্‌শার ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে একটা লোক—তাছাড়া রাস্তায় আর জনমনুষ্য নেই। এক ঝলক হাওয়া এসে তার মুখে লাগতেই ভয়টা অনেক কেটে গেল।

অন্য মেয়ে হলে ওইটুকুতেই খুশি হয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ত। কিন্তু রীনা অকারণে ওরকম ভয় পাবার জন্য নিজের মনটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে চাইলো। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সাধারণত সে পাতলা স্বচ্ছ নাইটি পরে ঘরের বাইরে বেরোয় না রাত্তিরে—কিন্তু ড্রেসিং গাউনটা আজই কেচে দিয়েছে, এখনো শুকোয় নি। এখন সবার দরজা বন্ধ, কেউ তাকে দেখবে না অবশ্য।

ভয়টাকে একেবারে শায়েস্তা করার জন্যই রীনা বারান্দার আলোও জ্বাললো না। অন্ধকারে রেলিং-এর কাছে এসে তাকালো উঠোনের দিকে। ওপরে তিনতলায় দীপুর ঘরে আলো নিবে গেছে। মা-শিপ্রার ঘরও অন্ধকার। রীনার ছিটকিনি খোলার শব্দ কেউ শোনে নি। অন্ধকারে চোখটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করে রীনা উঠোনের দিকে চেয়ে রইল। তার ঘরের দরজা একটুখানি খোলা, একটা আলোর রেখা এসে পড়েছে বারান্দায়। নিচতলাটা সেইজন্য আরো বেশি অন্ধকার লাগছে। একটু বাদে চোখে খানিকটা সয়ে এল। কাঞ্চার ঘরটা তালাবন্ধ দেখা যাচ্ছে—ওর ভেতরে আছে মাথার খুলিটা—কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রীনা পেছন ফিরতে যাচ্ছে—এমন সময় একটা শব্দ শুনতে পেল নিচে। কে যেন উঠোনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে দৌড়ে গেল হাল্কা পায়ে।

চোররা ভেতরে একটা বাচ্চা ছেলেকে আগে ঢুকিয়ে দেয়। হঠাৎ যেন তার সব ভয় চলে গেছে, অদম্য সাহস এসেছে বুকে। দৃষ্টি প্রাণপণে তীক্ষ্ণ করে আবার তাকালো উঠোনে, খুঁজতে লাগলো। আবার সেই শব্দ!

রীনা চেঁচিয়ে ডাকলো, দীপু! দীপু। আলো জ্বালার জন্য ছুটে গেল সুইচের দিকে। যে দৌড়াচ্ছে সে মানুষ নয়—মানুষ হতে পারে না। রীনা এবার স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে একটা কালো কুচকুচে বালিশের মতন কিছু একটা উঠোনের এপাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে গেছে। লম্বা লম্বা চুলওয়ালা এটা মানুষের মাথাও হতে পারে—সেই সঙ্গে চাপা কান্নার মতন আওয়াজ।

রীনার ডাক নিশ্চয়ই দীপু শুনতে পায় নি, মা-শিপ্রাও জাগে নি। কিন্তু আলো জ্বলতেই রীনা এবার দেখতে পেল তাদের কুকুরটা নিচতলার উঠোনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে আর ডাকছে কুঁই কুঁই করে। কুকুরটাকেও দীপু তিনতলায় নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ ফাঁকে আবার নিচে নেমে গেছে। কুকুরটা অকারণেই উঠোনের এপাশ-ওপাশ ছুটছে। এবার সত্যিই দারুণ ভয় পেয়েছিল রীনা। ইস, মানুষ এইভাবেই তো ভয় পায়! মনটা আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই কুকুরটাকেও চিনতে পারে নি। কালো রঙের বালিশ কিংবা শুধু কোনো মানুষের মাথা আবার উঠোন দিয়ে গড়াতে পারে নাকি! ভাগ্যিস দীপুরা ওঠে নি, নইলে দীপু নিশ্চয়ই তাকে ঠাট্টা করে করে একেবারে কাঁদিয়ে ছাড়ত। কুকুরটা ওখানে গিয়ে ওরকমভাবে ছোটাছুটি করছে কেন? জন্তু-জানোয়ারদের ব্যবহারের কি কোনো ঠিক আছে! রীনা ফিসফিস করে ডাকলো, লিজি, লিজি, ওপরে উঠে আয়।

কুকুরটা তবুও শুনলো না, অনবরত উঠোনে ছোটাছুটি করছে, যেন কিছু একটা জিনিসকে সে তাড়া করে যাচ্ছে বার বার, অথচ কিছুই নেই। রীনা আবার ডাকলো, লিজি! লিজি! কাম হিয়ার!

তিনতলায় দীপুর ঘরে খুট করে আলো জ্বলে উঠল। একটু আগে রীনার চিৎকার সে শুনতে পায়নি, এখন এই ফিসফিসানি ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

নেমে আসছে।

রীনার তখন খেয়াল হল, সে সামান্য একটা পাতলা নাইটি পরে আছে। শরীরের সব কিছুই এতে স্পষ্ট দেখা যায়। এই পরে দেওরের সামনে দাঁড়ানো যায় না। রীনা ঝট্ করে নিজের ঘরে ঢুকে, আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে। সে যে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সেটাই দীপুর জানবার দরকার নেই। কিন্তু বারান্দার আলোটা নেবানো হয় নি।

দীপু দোতলায় নেমে এসে একবার অনুচ্চ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে? কে কথা বলছিল?

রীনা কোনো সাড়া দিল না। মা আর শিপ্রা দু'জনেরই ঘুম বেশ গাঢ়, আজ আবার ভয় পাবার পর বোধহয় বেশি করে ঘুমোচ্ছে, দীপুর গলার আওয়াজে কেউ জাগল না। দীপু বারান্দার এদিকে এল, রীনার ঘরের দরজার সামনে একবার দাঁড়ালো, ভেতর থেকে রীনা সব বুঝতে পারছে। দীপু চাপাগলায় বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলো, বউদি, ঘুমোচ্ছ! রীনা একবারও উত্তর দিল না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। দীপু উত্তর না পেয়ে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বারান্দার আলো নিবিয়ে ডাকতে লাগলো, লিজি

লিজি! আঃ আঃ, লিজি! রীনা শুনতে পেল, দীপুর গলার আওয়াজ ক্রমশ একতলার দিকে নেমে যাচ্ছে।

রীনা সামান্য একটু হেসে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। দু'হাতের পাঞ্জায় চোখ দুটো ঢেকে রইলো। এখন আর তার ভয় করছে না।

দেবনাথ বললো, পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। খুন-টুনের ব্যাপার মনে হচ্ছে!

দীপু বললো, কিন্তু দাদা, এ অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই। পুলিশ এখন এর কি করবে?

—কি করে বুঝলি অত পুরোনো?

—দেখছ না, খুলিটা ছাড়া আর সবই ঝুরঝুরে হয়ে গেছে!

শিপ্রা দিনের আলোতেও ভয় পাচ্ছে, শুকনো গলায় বললো, ছোড়দা আরো একটু খুঁড়ে দেখো না, যদি আরো থাকে-টাকে?

—তা বলে সারা বাড়ির ভিতরই খুঁড়ে ফেলব নাকি?

দেবনাথ জিজ্ঞেস করলো, কি করে জানলি আর নেই?

—এমা! কবারখানা ছিল না, বোঝাই যাচ্ছে। ডেড বডিটাকে লম্বালম্বি শুইয়ে কবর দেওয়া হয় নি, একটা পুঁটলি মতন করে এখানে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। বস্তা আর পুরোনো খবরের কাগজের টুকরোও রয়েছে।

—অনেক সময় ছোট ছেলের মড়া ওই রকমভাবেই কবর দেয়।

—ছোট ছেলে নয়, রীতিমতো বয়স্ক—স্কাল দেখলেই বোঝা যায়। খুব সম্ভবত কোনো মহিলার স্কেলিটন।

—মেয়েছেলে?

—হ্যাঁ। জামা-কাপড়ের কোনো চিহ্ন নেই যদিও, কিন্তু দ্যাখো না, ভেতরে দু'তিনটে ভাঙা কাঁচের চুড়ি রয়েছে!

—যাঃ, তোকে আর ডিটেকটিভগিরি করতে হবে না। পুলিশে খবর দিয়ে আয়। পুলিশ কিছু করুক না করুক, খবর দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

মা বললেন, তখুনি আমি বলেছিলুম, এই পুরোনো বাড়ি কিনতে হবে না! অপয়া বাড়ি। এর চেয়ে মধ্যমগ্রাম কিংবা বারাসতে একটু ছোট দেখে নতুন বাড়ি হলে...

দীপুই সকালবেলা শাবল দিয়ে মেঝে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলে হাড়গোড় সব বার করেছে। দীপুর উৎসাহ বেশি ছিল গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার। কতকগুলো হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। বেশ গভীর গর্ত করে মড়াটাকে পোঁতা হয়েছিল বোঝা যায়, যে কোনো কারণেই হোক—সেটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝের খানিকটা জায়গা ঢিপি মতন হয়ে ফুলেছিল। পুরোনো বাড়ির মেঝে ড্যাম্প লেগে অনেক সময়েই এ রকম হয়—আগে ওদের কিছু মনে হয় নি এ সম্পর্কে।

ব্যাপারটা যে অনেকদিনের পুরোনো তার আর একটা প্রমাণও পাওয়া গেল। গর্তটার মধ্যে ছেঁড়া চটের বস্তা আর খবরের কাগজের টুকরো ছিল কয়েকটা।

ড্যাম্পে কাগজগুলো লালচে হয়ে পচে গেছে, তবুও দীপু তার পাঠোদ্ধার করার

অশেষ চেষ্টা ...র একটুখানি পড়তে পারলো। কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের প্রস্তাবের একটা প্রতিবাদ সভার রিপোর্ট। কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ১৯১১ সাল পর্যন্ত, এ কাগজটা নিশ্চয়ই তারও আগের।

বাড়িতে এ রকম একটা সাংঘাতিক কাণ্ড, রীনা কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত নয়। সে মাঝে মাঝে ওখানে এসে ঘুরে যাচ্ছে, আর অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কি করে খবর ছড়িয়ে যায় কে জানে, তাদের বাড়ির সামনে বিরাট ভিড় জমে গেছে, পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে নানা উদ্ভট গল্প জুড়ে দিয়েছে। রান্নার ঠাকুরটা রাত্রে এখানে শোয় না—সে থাকে কাছেই একটা বস্তিতে। সকালবেলা সে এসে এই কাণ্ড দেখে হৈ চৈ করেছিল, রীনা তাকে ধমক দিয়ে নিয়ে এসেছে রান্নাঘরে। একটা মড়ার মাথা খুঁজে বার করা হয়েছে বলে কি বাড়িতে সবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবে? কেউ অফিস-টফিস যাবে না? একটা ব্রিটিশ কোম্পানিতে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করে রীনা, সে অফিসে হুট-হাট করে ছুটি নেওয়া যায় না।

সবাই মিলে জেরা শুরু করেছে কাঞ্চাকে। দিনের বেলা কাঞ্চার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। চোর-ডাকাত ধরার মতোই ভূতের রহস্য বার করে ফেলার কৃতিত্বে ও এখন গর্বিত। সে জোর দিয়ে বলছে—জিন মাটির তলায় আর থাকতে চাইছিল না, তাই রোজ রাত্তিরে সে শুয়ে পড়ার পর তার কানে কানে কথা বলত। জিন চেয়েছিল গর্ত খুড়ে তাকে বার করে দিতে।

এই রহস্যটা নিয়ে সবাই খুব মশগুল হয়ে রইলো। এখন মড়ার মাথাটা দেখার পর—অনেকেই হয়তো ভয় পেতে পারে, কিন্তু কাঞ্চা আগে থেকেই টের পেয়েছিল কি করে? সে তো অনেকদিন থেকেই বলছিল, ও ঘরে ভূত আছে, ও ঘরের মাটির তলায় খুটখুট করে শব্দ হয়! সেটা কি করে সম্ভব? এর ব্যাখ্যা কি?

নাইট ডিউটি থেকে ফিরে সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোয় দেবনাথ। তখন ঘুমোতে পারে নি, এই জন্য মুখখানা তার বিরক্ত তার ওপর এই ঝঞ্ঝাট। সে একটু শান্তিপ্রিয় লোক, বেশি লোকজন তার পছন্দ হয় না। দেবনাথ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, এই, এই দীপু, ওকি করছিস! না, না—বারণ করছি—

দীপু ততক্ষণে হাতে শাবল নিয়ে গর্তটার মধ্যে নেমে পড়েছে। গেঞ্জী পরা তার সবল শরীরে ফুলে উঠেছে হাতের মাস্‌ল। হাসতে হাসতে বললো, দাঁড়াও দেখি না—নিচে আরো কিছু আছে কিনা!

—না, দেখতে হবে না। উঠে আয়! একটা ডেডবডি বছরের পর বছর পচেছে ওখানে, অস্বাস্থ্যকর জায়গা!

দীপু তার দাদার সব কথা শোনে না। উঠে না এসে শাবল দিয়ে এদিক ওদিক খুঁচিয়ে দেখতে লাগলো। ঘরের দরজার কাছে ভিড় একেবারে ভেঙে পড়লো, একটি অতি উৎসাহী ছেলে তো হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল। নতুন করে চেঁচামেচি শুনে রীনা আবার এসে জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু পাওয়া গেল? রান্নার ঠাকুরকেও সেদিকে ছুটে আসতে দেখে তাকে ধমক দিয়ে বললো, আবার তুমি আসছ কেন? যাও ডালটা নামিয়ে ফেলো! ন'টা বাজে প্রায়।

মা এসে পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলেন, দীপু শিগগির উঠে আয়, শিগগির আয়—নইলে আমি...

দু'হাতের তালুতে ভর দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে এল দীপু। হাসতে হাসতে বললো, নাঃ, আর কিছু নেই, ডেফিনিট। গুপ্তধন-টুপ্তধন নয়, ক্লি-ন মার্ডার কেস!

দেবনাথ বললো, তুই যদি পুলিশের কাছে না যাস্, আমিই যাই তা হলে। অন্তত ভিড় সামলাবার জন্যও পুলিশ ডাকা দরকার।

দীপু কোনো উত্তর না দিয়ে দাদার প্রস্তাবেই সম্মতি জানালো। অর্থাৎ মাটিমাখা গায়ে তার পক্ষে থানায় যাওয়ার চেয়ে, যেতে হলে দাদারই যাওয়া উচিত। বিরক্ত মুখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল দেবনাথ।

মা বললেন, দীপু কারুকে ছুঁবি না, যা আগে চান করে আয়!

—যাচ্ছি যাচ্ছি, দাঁড়াও না!

—না, যাচ্ছি না,—কোন্ অজাত কুজাতের মড়া তার ঠিক নেই!

—মড়ার আবার জাত কি মা! মরার আগেই তো জাতফাতের ঝামেলা।

ভিড়ের মধ্যে পাড়ার কয়েকজন প্রবীণ লোকও ছিল। দীপু তাদের জিজ্ঞেস করলো জ্যাঠামশাই, আমাদের আগে যারা এ বাড়িতে ছিল—তাদের ফ্যামিলিতে কোনো খুন-টুন কিংবা নিরুদ্দেশের ঘটনা শুনেছেন?

দু'তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে কথা শুরু করলেন। তাদের কথা থেকে এইটুকু জানা গেল যে, আগে থাকত শুধু বুড়ো-বুড়ি আর তাদের একটি ছোট ছেলে। বুড়ো-বুড়ির বড় ছেলে চাকরি করত এলাহাবাদে, তার সঙ্গে বাপ মা'র বেশি বনিবনা ছিল না। বুড়ো মারা যাবার পর, বড় ছেলে এসে মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে এলাহাবাদে আর উকিলের মারফত বিক্রি করিয়েছে এ বাড়ি। বুড়ো মরার পর পাড়ার লোকেরাই তাকে পুড়িয়ে এসেছে, সুতরাং সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে এ বাড়ি অবশ্য বুড়ো-বুড়ির পৈতৃক ছিল না। তাঁরাও এ বাড়ি কিনেছিলেন বছর তিরিশেক আগে। কিন্তু বছর তিরিশেক আগে এ বাড়ি কার ছিল এ সম্পর্কে পাড়ার প্রবীণদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। কেউ বললেন, আগে এ বাড়ির মালিক ছিলেন এক মুসলমান জমিদার, তিনি এ বাড়ি ভাড়া খাটাতেন। আবার কেউ বললেন, এখানে আগে ছিল একটা ইস্কুল। অর্থাৎ তিরিশ বছর আগেকার স্মৃতি কারুরই নিশ্চিত নয়।

ভিড় ঠেলে বাড়ির একেবারে ভেতরে চলে এল এক যুবক। ধুতি আর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। হন্তদন্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে...শুনলাম নাকি খুন হয়েছে এ বাড়িতে?

দীপু তাকে বিশেষ পাত্তা দিল না, এক পলক তার দিকে তাকিয়ে আবার বৃদ্ধদের গালগল্প শুনতে লাগলো। ছেলেটি দীপুর হাত ছুঁয়ে আবার বললো, কি হয়েছে দীপুদা? কি ব্যাপার?

দীপু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুধু বললো, মড়ার মাথা! এমনভাবে সে উচ্চারণ করলো, যেন বলতে চায়, আমার মাথা!

ছেলেটি দমলো না, বললে, ভিড় দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটা কাজে যাচ্ছিলুম, তারপর বাড়ির সামনে এত ভিড় দেখে মনে হল, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে!

ছেলেটির ভাব এমন যেন, এ বাড়ির কোনো বিপদ হলে তার প্রতিকার করা ওরই

দায়িত্ব। সমস্ত কাজ তুচ্ছ করে তাকে ছুটে আসতেই হবে। দীপু তাকে বললো, ঐ শাবলটা সরিয়ে রাখো তো রমেন, গর্তে পড়ে যাবে!

রমেন নিচু হয়ে শাবলটা তুলতে তুলতে আড়চোখে একবার শিপ্রার দিকে তাকালো। কঙ্কালের খুলিটার দিকেও তার চোখ পড়েছিল, কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্যই করলো না, বার বার তাকাতে লাগলো শিপ্রার দিকে। শিপ্রা ভিড় থেকে একটু সরে চলে এলো সিঁড়ির কাছে, রমেনও এক ফাঁকে এসে গেল তার পাশে।

পুলিশ যখন এলো, রীনা তখন অফিসে বেরুচ্ছে। ভিড় ঠেলে রীনা বেরুতে পারছিল না, পুলিশের জন্যই ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা তখন লোকে লোকারণ্য। কত রকম গল্প লোকের মুখে মুখে তখন ফিরছে তার ঠিক নেই। এ বাড়ির প্রত্যেকটা লোকই এখন দর্শনীয়। সিনেমার অভিনেত্রীকে দেখার মতন লোকে ভিড় করে এসেছিল রীনাকে দেখার জন্য। অফিসে যাবার সময় রীনা সানগ্লাস পরে, হালকা লাল রঙের শাড়ি আর ব্লাউজে রীনাকে দেখাচ্ছে খুব সুন্দর।

দেবনাথকে দেখে রীনা বললো, আমি অফিসে চললুম, বুঝলে? তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, এসব ঝামেলা চুকিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।

দেবনাথ, বলল, আজ না গেলে পারতে না?

—উপায় নেই। কালকে কয়েকটা ইনকমপ্লিট চিঠি আমার ড্রয়ারে রেখে এসেছি। সেগুলো আমি না গেলে কেউ খুঁজে পাবে না, আর চিঠিগুলো যদি আজ না যায়, ডেভিস সাহেব রেগে আগুন হয়ে যাবেন।

দেবনাথ পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বললো, ইনি আমার স্ত্রী। এঁর অফিস আছে, গেলে আপত্তি নেই তো?

ইন্সপেক্টরটি অতিরিক্ত ভদ্র হয়ে বললেন, না না, আপত্তি কিসের! অফিস যাবেন না কেন? যা কেস শুনছি—

রীনা হাতব্যাগ খুলে বললো, এই নাও আলমারির চাবি, তোমার পাজামা-টামা বার করে রাখতে একদম ভুলে গেছি। চলি তাহলে।

উঠোনে চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে ইন্সপেক্টরকে। মুখ চোখ দেখলে মনে হয় এ ব্যাপারে যেন বিশেষ কোনো উৎসাহই নেই। নেহাত বেড়াতে এসেছেন।

দেবনাথ হঠাৎ অকারণে শিপ্রাকে একটা ধমক দিয়ে বললো, এই খুকু, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চা কর না! সকাল থেকে চা খাই নি ভালো করে!

শিপ্রার পাশ থেকে রমেন ছিট্‌কে সরে গেল। শিপ্রা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

দীপু ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলো, প্রথমে কার এজাহার নেবেন?

ইন্সপেক্টর হেসে বললেন, আপনি বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন?

—হ্যাঁ, না—মানে কেন বলুন তো?

—আপনার ভাব দেখলেই বোঝা যায়। শুনুন, সে রকম কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটার আশা নেই। ইংরেজি গোয়েন্দা গল্প হলে হয়তো দেখা যেত, এই পঞ্চাশ বছরের পুরোনো কেস থেকেই একটা বিরাট রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের এই বছরই এত কেস পেন্ডিং আছে যে পঞ্চাশ বছরের বাসি মড়া ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় আমাদের নেই।

—তা হলে এগুলো কি হবে? এই হাড়টাড়? রাস্তায় ফেলে দেব?

—একটু বাদে থানা থেকে ডোম পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে বস্তায় ভরে সব নিয়ে যাবে। একটা রুটিন মাফিক ফরেনসিক টেস্ট হবে—তবে বোঝাই যাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো কেস ওপন্ করা হবে না। এমনিতেই সব মার্ডার কেস্ সল্‌ভ করা যায় না, আর এ তো মশাই হাফ্ সেঞ্চুরি আগের ব্যাপার!

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্সপেক্টর দেবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো মশাই খবরের কাগজের লোক। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপার কি বুঝছেন? মিটবে শিগগিরই?

দীপু জিজ্ঞেস করলো, ফরেনসিক টেস্টে জানা যাবে, কঙ্কালটা কোনো পুরুষের না মেয়ের?

—তা জানা শক্ত নয়। কিন্তু জেনে কি হবে?

—আমার ধারণাটা ঠিক কিনা বুঝতে পারতুম। আমার ধারণা এটা একটা মেয়েরই, দুটো ভাঙা চুড়ির টুকরো—

—এমনও তো হতে পারে—কোনো মেয়েই এই লাশটা পুঁতেছিল। গর্ত খোঁড়ার সময় তার হাতের চুড়ি ভেঙে—

—একটা মেয়ের পক্ষে সেটা টু-মাচ্! পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একটা মেয়ে আর কাউকে খুন করে আবার নিজেই গর্ত খুঁড়ে ডেড বডি পুঁতে রাখবে, এতটা ভাবা—

ইন্সপেক্টর হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, আপনার বুঝি ধারণা পঞ্চাশ ষাট বছর আগে মেয়েরা খুব শান্ত-শিষ্ট ছিল? তখন তারা খুনটুন করত না?

দীপু বললো, তখন কেন, এখনো কোনো মেয়ের পক্ষে অতটা করা সম্ভব নয়।

ইন্সপেক্টর বললেন, মেয়েদের চেনেন না আপনি। আমাদের লাইনে থাকলে...দেখলুম তো অনেক, মেয়েরা যেমন দেবীর মতনও হতে পারে, তেমনি যদি আবার—ইন্সপেক্টর হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে প্রসঙ্গ বদলে বললেন, নেপালী চাকরটাকে একবার থানায় পাঠিয়ে দেবেন। ওর একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে রাখতে হবে—নিছক ফর্মালিটি আর কি!

ভিড় কাটতে কাটতে দুপুর গড়িয়ে গেল। খিদেয় পেট জ্বলছে দেবনাথের, কিন্তু খাবার উপায় নেই। শান্তিস্বস্ত্যয়নের জন্য মা পুরুতমশাইকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, তার আগে খাওয়া হবে না। দীপু আর অফিসে যায় নি, শিপ্রা কলেজে যায় নি। রীনা গেছে বলে মা তখন থেকে গজগজ করছেন। রীনাকে একটু ভয় পান তিনি—রীনা যখন যায় তখন শাশুড়িকে বলেই গেছে, কিন্তু তখন তিনি আপত্তি করতে পারেন নি। এখন বলতে শুরু করেছেন, প্রেতাত্মার বিহিত মন্ত্র পড়ে না তাড়ালে কখন কি বিপদ হয় মানুষের! আজকের দিনে বাড়ি থেকে কারুরই বেরুনো উচিত নয়।

দীপু ঠাণ্ডা করে বললো, ভূত কি বউদিকে অফিস পর্যন্ত তাড়া করবে নাকি?

মা বললেন, যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলিস না। ভূতের কথা বলছি নাকি? আত্মা বলে একটা জিনিস আছে, সেটা অন্তত মানবি তো? এতকাল মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল!

—আত্মা আবার কোথাও চাপা পড়ে থাকে নাকি? সে তো শুনেছি, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়!

—তুই থাম তো! দেবু, তুই বউমার অফিসে একবার ফোন্ করে খবর নে না?

দেবনাথ বললো, খবর আবার কি নেব?

ঠিকমতো অফিসে পৌঁছেছে কিনা—তা ছাড়া বলে দে, আজ যেন সন্ধের আগেই বাড়িতে ফেরে।

—এখন আর ফোন-টোন্ করতে যেতে পারব না। ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছে পেটে খিদে জ্বলছে—কোথ্থেকে একটা মড়ার মাথা এসে বাধিয়েছে যত ঝামেলা!

রমেন নামের ছেলেটিই পুরুতমশাইকে খবর দেবার ভার নিয়েছিল। সে ফিরে এসে বললো, পুরুতমশাইকে পাওয়া গেল না, তিনি নবদ্বীপ গেছেন কি যেন কাজে। যেন দোষটা তারই, রমেনের মুখখানা সেই রকম কাঁচুমাচু।

দেবনাথ বললো, ভালোই হয়েছে। দাও ঠাকুর, খেতে দাও। আর দেরি করতে পারছি না।

দীপু বললো, রমেন, তুমিই তো বামুনের ছেলে, তুমিই ক'টা মন্ত্রটন্ত্র আওড়ে দাও না।

—আমি তো মন্ত্র জানি না। অন্য পুরুতের খোঁজ করব?

মা জিজ্ঞেস করলেন, অন্য পুরুত কোথায় পাবে? আর কারুর ঠিকানা জানো?

—না, তা জানি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখব?

দীপু হাসতে হাসতে বললো, একি দুর্গাপুজো কিংবা সরস্বতী পুজো পেয়েছ নাকি যে রাস্তা দিয়ে অনবরত পুরুত যাবে?

দেবনাথ বিরক্তভাবে বললো, আঃ, কি হচ্ছে কি! মা, আজকেই কি তোমার ওসব না করালে নয়? রবিবার দিন না হয় পুরুত ডেকে তোমার যা খুশি করিও। এখন খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো, আমাকে আবার সারারাত জেগে আজ ডিউটি দিতে হবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে রীনা ঘড়ি দেখলো। ঠিক পাঁচটা পাঁচ। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপরাইটারে ঢাকনা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রীনা কি যেন ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো ময়দানের দিকে—রাস্তা পেরিয়ে ও পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

পার্ক স্ট্রিট ক্রসিং-এ অন্তত শ'খানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লাল আলোর সামনে। বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে আজ বিকেলে। রীনার একটু খিদে পেয়েছে, খুব ইচ্ছে করছে বাদামভাজা কিনতে কিন্তু একা একা রাস্তা দিয়ে বাদাম খেতে খেতে যেতে কি রকম যেন লাগে। রীনা একবার পেছনে তাকালো, তাকিয়ে সেই লোকটাকে আবার দেখতে পেল। অফিস থেকে বেরিয়েই গেটের উল্টোদিকে এই লোকটাকে দেখেছিল। তখন খেয়াল করে নি, কিন্তু ট্রাম স্টপেও লোকটাকে ঠিক তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটার চেহারা দেখলে তো অভদ্র মনে হয় না। রীনার চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তবু বোঝা যায়, লোকটা রীনার দিকেই চেয়ে আছে। এখন লোকটা আসছে তার পেছনে পেছনে। এসব রীনার গা-সহা হয়ে গেছে। অফিস থেকে বেরিয়েই রীনা ট্রামে ওঠে না। এসব পাড়ায় একা কোনো মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই কেউ না কেউ তার পিছু নেবে। এই লোকটাকে দেখলে তো মনে হয় শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু

চোরের মতন মুখ করে তার পেছনে পেছনে আসছে। সামনাসামনি এসে কথা বলার সাহস নিশ্চয়ই হবে না। বেশ খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম একটু আনন্দ এবং গর্বও বোধ করলো রীনা। তার এখন একত্রিশ বছর বয়েস—তবুও তাকে দেখে পুরুষ মানুষেরা আকৃষ্ট হয়।

আর একটা কথা মনে পড়তেও রীনার একটু হাসি পেল। দেবনাথও বিয়ের আগে তাকে এই রকম অনুসরণ করত। কলেজ থেকে ফেরার পথে রীনা রোজ দেখত, করুণ ব্যর্থপ্রেমিকের মতন মুখ করে দেবনাথ তার পেছনে পেছনে আসছে। একদিন রীনা ওকে অনেক কড়া কথাও শুনিয়ে দিয়েছে।

বড় গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল সুবিমল, রীনাকে দেখে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললো, আজ একেবারে ঠিক সময় এসেছো!

রীনা বললো, আজ থাকতে পারব না, আজ এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো সেই অনুসরণকারী লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করছে। এদিকে আসতেও সাহস করছে না, আবার ঠিক উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতেও পারছে না। লোকটা শেষ পর্যন্ত ময়দানের দিকে চলে গেল।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, আজ তোমার ওভার টাইম নেই?

—ওভার টাইম থাকলেও আজ আমাকে বাড়ি যেতে হত। আমাদের বাড়িতে আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের বাড়িতে একতলার মেঝে খুঁড়ে একটা মড়ার মাথা পাওয়া গেছে।

—অ্যাঁ? কি পাওয়া গেছে?

রীনা মৃদু হেসে বললো, এসো ঘাসের ওপর একটু বসি, বেশিক্ষণ না কিন্তু। বাদাম কেনো না!

সব শুনে সুবিমল বললো, এটা তোমার কাছে মজার ব্যাপার?

রীনা বললো, তা ছাড়া কি!

—আমি তো এমন ঘটনা কখনো শুনি নি, বাড়ির মধ্যে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে আর সে বাড়ির বউ বলছে, এটা একটা মজার ব্যাপার! তোমার ভয় করে নি একটুও?

—সত্যি বলতে কি, কাল রাত্তিরে আমার একটু গা ছমছম করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কে যেন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে!

—তার আগেই মাথার খুলিটা তুমি দেখেছ?

—হুঁ।

—তারপরও তুমি একা ঘরে শুতে পারলে?

—বাঃ, রোজই তো শুই। কালই বা শোব না কেন? তা ছাড়া কে শোবে আমার সঙ্গে?

রীনা মুচকি হেসে তাকালো সুবিমলের দিকে। সুবিমল দুঃখিতভাবে বললো, কেন, শিপ্রা তো তোমার সঙ্গে শুতে পারত!

—না, শিপ্রার সঙ্গে শুতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া মা একলা থাকবেন কি করে? মাও খুব ভয় পেয়েছেন!

—রীনা, তোমার সত্যিই খুব মনের জোর!

—মনের জোর না থাকলে কি আর এক বাড়ির বউ হয়েও তোমার সঙ্গে এখানে বসে গল্প করতে পারি?

—দেবনাথ যদি কোনোদিন দেখতে পায়, কি বলবে তুমি তখন?

—কি বলব, তখন ভেবে দেখা যাবে। তবে খুব বেশি চেঁচামেচি বা রাগারাগি করার মানুষ ও নয়। চাপা লোক, দুঃখ পেলেও মনের মধ্যে চেপে রাখবে।

—রীনা সত্যি বলছি, দেবনাথের কথা ভাবলে আমার মাঝে মাঝে নিজেকে দারুণ অপরাধী বোধ হয়। ওর উদারতার সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকাচ্ছি আমরা।

—বেশ তো, কাল থেকে আর ঠকিও না!

—তুমি জানো, সে উপায়ও আমার নেই। তোমারও কি আছে? তুমি পারবে আমাকে ছেড়ে থাকতে?

আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে, ময়দানের সব দৃশ্য এখন অস্বচ্ছ। কাছাকাছি আরো কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। সুবিমল আলতোভাবে রীনার কোমর জড়িয়ে ধরলো, তার নিরাবরণ বাহুতে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, রীনা, কয়েকশো বছর আগে, যখন তুমি কোনো রাজার পুরীতে পাটরানি ছিলে, তখন কি তুমি কোনো হাট থেকে আমাকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনেছিলে?

রীনা সুবিমলের বুকে মাথা হেলিয়ে হাসতে হাসতে বললো, কিনেছিলাম তো! এক কানাকড়ি দিয়ে কিনেছিলাম!

—তাহলে বলো রাজেন্দ্রাণী, আমার ওপর আর কি হুকুম তোমার? পদসেবা করে দেব?

—না, আপাতত তোমার বুকপকেট থেকে ফাউন্টেন পেনটা সরিয়ে নাও। আমার ঘাড়ে ওটাতে লাগছে।

সুবিমল পেনটা সরাতে গিয়ে রীনার ঠোঁটে তার আঙুল ছোঁয়ালো। তারপর মুখটা নিচু করে রীনার চুলের গন্ধ শুঁকতে লাগলো। রীনা ঠোঁটের ওপর থেকে সুবিমলের আঙুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আরো এলিয়ে দিল শরীরটা। সুবিমল রীনার বুকের ওপর রাখলো তার হাত, মুখটা সরিয়ে রীনার ঠোঁটের কাছে আনতেই রীনা ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললো, ইস, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব বলেছিলুম, দিলে তো দেরি করিয়ে!

—বাঃ, আমি দেরি করিয়ে দিলুম?

—নিশ্চয়ই। তুমি তো দেরি করালে। চলো, শিগ্‌গির আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

—আমি তোমাকে খানিকটা পৌঁছে দিয়ে আসব?

—না।

শিপ্রা চেঁচিয়ে ডাকলো, মা, মা! তুমি কি করছ ভেতরে?

কোনো সাড়া পেল না। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

শাড়ি সায়া গুছিয়ে শিপ্রা বাথরুমে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, দেখলো মা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন বাথরুমের দিকে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময় শিপ্রা দেখলো, মায়ের মুখখানা কিছু একটা চিন্তায় থমথমে। মা কাপড়-টাপড় নিয়ে যান নি বলে শিপ্রা ভাবলো, মা বোধহয় হাত-টাত ধুতে গেছেন। এক্ষুনি বেরিয়ে আসবেন।

সেই থেকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। সন্ধে হয়ে এসেছে, শিপ্রাকে এক্ষুনি যেতে হবে গানের ইস্কুলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেও মা বেরুলেন না। ব্যস্ত হয়ে শিপ্রা আবার ডাকলো, মা, মা, তোমার দেরি হবে?

কোনো উত্তর নেই।

শিপ্রা গুনগুন করে গান ধরলো, 'ওগো, কিশোর আজি তোমার দ্বারে—' এই গানটা শেখানো হচ্ছে এই সপ্তাহে। একটু বাদে শিপ্রা রীতিমতো ঝাঁঝালো গলায় বললো, মা তুমি বেরুবে না কি? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এবারও কোনো উত্তর নেই।

শিপ্রার কি রকম খট্‌কা লাগলো। অনেকদিন আগে মায়ের ফিটের অসুখ ছিল। বাবা মারা যাবার পরই দেখা দিয়েছিল এই উপসর্গ, বছর-চার-পাঁচের মধ্যে আর হয় নি, আবার সেটা দেখা দিল নাকি? বন্ধ দরজার একেবারে কাছে এসে শিপ্রা বললো, মা, সাড়া দিচ্ছ না কেন?

তবু কোনো সাড়া নেই।

বাথরুমের দরজার গায়ে জোর ধাক্কা দিতে যেতেই হাট করে খুলে গেল। ভেতরে নীল আলোটা জ্বলছে। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। পায়খানার দরজাটাও খোলা, সেখানেও কেউ নেই। শিপ্রার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। মা কোথায় গেল? নিজের চোখে সে মা-কে ঢুকতে দেখেছে, মা তো আর ছেলেমানুষ নয় যে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে তার সঙ্গে খেলা করবে!

তবু শিপ্রা ভয়ে ভয়ে একবার তাকালো দরজার দু'পাশে। দীপু বাড়িতে নেই, বউদি এখনো ফেরে নি, দাদা শুয়ে আছে ঘরে—মা কোথায় গেল? শিপ্রা একেবারে বাড়ি-ফাটানো চিৎকার করলো কান্না মেশানো গলায়, মা! মা!—

—কি রে, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—শিপ্রা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বিস্ফারিত। সমস্ত শরীরে শিহরন। মা তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। মা কখন বেরিয়ে গেলেন বাথরুম থেকে? শিপ্রা তো বরাবর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে! গান গাইবার সময় সে কি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল? এতখানি অন্যমনস্ক?

মা দোতলায় নেমে এসে আবার বললেন, কি রে, এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—মা, তুমি বাথরুম থেকে কখন বেরুলে?

—আমি আবার বাথরুমে গেলাম কখন?

—তুমি বাথরুমে যাও নি? আমি দেখলাম!

—যাঃ!

—মা, আমি নিজের চোখে দেখলাম, বিশ্বাস করো!

—আমি তো দীপুর ঘরে আলনা গোছাচ্ছিলাম—

বলতে বলতে মা গেলেন, বাথরুমের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একবার গিয়েছিলাম...

কিন্তু শিপ্রা তখন আর কিছু শুনছে না। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো। তার শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, মা, আমি নিজের চোখে দেখেছি—এমন কি মুখ পর্যন্ত!

দেবনাথ বোধহয় ঘুমিয়েই ছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে বললো, কি হয়েছে কি? এত জোরে জোরে কথা বলছিস কেন শুধু শুধু?

—দাদা, আমি দেখলাম...

মা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, হয়েছে, হয়েছে! শিপ্রা চোখে কি ভুল দেখেছে।

—না, চোখের ভুল নয়। ভুল হতেই পারে না।

—যা, তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নে। গানের স্কুলে যাবি না?

—মা দেখ, আমার গা কাঁপছে। আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করছে। আমাকে একটু ধরো তো—

মা ধরার সুযোগ পেলেন না, দেবনাথও ছুটে এসে ধরতে পারলো না, তার আগেই শিপ্রা নেতিয়ে পড়ে গেল, মাথাটা বেশ জোরে ঠুকে গেল মাটিতে।

মা ছুটে ওর মাথাটা তুলে নিলেন। দেবনাথ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি ওর একটা হাত তুলে মণিবন্ধ টিপে নাড়ি দেখতে লাগলো। বিশেষ কিছুই হয় নি, এমনি অজ্ঞান হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে।

দেবনাথ বললো, মা দ্যাখো, ওকে বোধহয় তোমার রোগটা ধরলো!

—না, মৃগী নয়। হঠাৎ ভয় পেয়েছে। শ্রী রাম রাম রাম! কি যে অনাসৃষ্টি হল বাড়িটায়!

—ভয় পেয়েছে? এখনো সাড়ে ছ'টাও বাজে নি, অন্ধকার হয় নি ভালো।—কিসে ভয় পেল?

—কি জানি! আমি তিনতলা থেকে নেমে এসে দেখি বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে মা মা বলে চ্যাঁচাচ্ছে। ও নাকি আমাকে বাথরুমে ঢুকছে দেখেছে! অথচ আমি দু'ঘণ্টার মধ্যে বাথরুমে যাই নি। এক মগ জল নিয়ে আয় তো!

—হুঁ, বুঝলাম। পেট গরম হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন? যা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ায়! কদিন আগে বাসে আসার সময় দেখলাম কলেজ পালিয়ে আর দু'তিনটে মেয়ের সঙ্গে হই-হই করে ঘুরছে। যা গনগনে রোদ্দুর তখন, আমাদেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত আর ওরা শখ করে—

রীনা যখন ফিরলো, তখনো শিপ্রা ভালো করে সুস্থ হয় নি। ঘরে এনে খাটে শোয়ানো হয়েছে, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে ব্যাকুলভাবে বলছে, কিন্তু আমি যে দেখলাম, বাথরুমের আলো জ্বলছে—আলো জ্বাললো কে?

দেবনাথ ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বললো, যা যা, ভূতে কখনো আলো জ্বালে না! আমিই হয়তো কখন আলো জ্বেলে রেখে এসেছি!

—তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে?

—ঘুমের ঘোরেই কখন হয়তো একবার উঠে চলে গিয়েছিলাম। তুই আমাকেই দেখিস্ নি তো?

—না না, আমি মুখ পর্যন্ত দেখেছি।

বলেই আবার উঠে বিছানায় ঢলে পড়লো শিপ্রা। রীনা ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দিলো না। চুপচাপ করে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে একটু দেখলো। মা প্রাণপণে ঠাকুরের সামনে

ধূপধুনো দিচ্ছেন। রীনা ঘর থেকে বেরিয়ে নির্লিপ্তভাবে চলে এল নিজের ঘরে। তারপরই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

শিপ্রা আর একবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললো, আমি গানের স্কুলে যাব!

মা ঠাকুরের ছবির সামনে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন, না, আজ আর বাইরে বেরুতে হবে না।

দেবনাথও বললো, একদিন গান শিখতে না গেলে কি হয়?

শিপ্রা আবার শুয়ে চোখ বুজলো। এবার আর সে অজ্ঞান হয় নি, এমনিই চোখ বুজে রইলো।

আর ওদিকে শিপ্রার গানের ইস্কুলের উল্টোদিকে বকুল গাছটার তলায় অনবরত পায়চারি করতে লাগলো রমেন। অনবরত ঘড়ি দেখছে আর তাকাচ্ছে বাস-স্টপের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ আর ঘাড় ব্যথা হয়ে এল।

পাড়ার লাইব্রেরিতে 'গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র' এই বিষয়ে বিতর্ক ছিল, দীপু সেখানে জোরালো গলায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের সমর্থনে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। বাড়ি ফিরলো সাড়ে ন'টার সময়। সমস্ত বাড়িটা তখন থমথমে—যদিও সব ক'টা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

শিপ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে, এ ছাড়া আর কিছু খেতে চায় নি। সব শুনে দীপু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, ভূতটুত সব বাজে কথা। বাড়িতে মানুষের হাড় পাওয়া গেছে তো, তাই এখন অনেকে অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু বাড়িটার একটা কিছু রহস্য আছে, আজ বাড়িতে ঢোকার সময়ও কি রকম গা-ছমছম করলো।

বারান্দায় খাবার দেওয়া হয়েছে। দু'ভাই আর রীনা খেতে বসেছে—মা একটা চেয়ার টেনে এমনিই বসে আছেন দূরে। শোবার ঘরের দরজা খোলা, বিছানার ওপর শুয়ে থাকা শিপ্রাকে স্পষ্ট দেখা যায়, মা চোখ রেখেছেন সেদিকে। মা বললেন, তোরা তো বিশ্বাস করিস না এসব। আমার বিয়ের পর, তোদের এক সম্পর্কের কাকা—তোর বাবার পিসতুতো ভাই, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল—বাবা বাবা, আমি যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি! তারপর সারাক্ষণ চেঁচাতে লাগলো ঐ কথা বলে, এমনভাবে সামনে চেয়েছিল যেন ঠিক কারুকে দেখতে পাচ্ছে! কত ডাক্তার ডাকা হল। তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ গণনাথ সেনকেও ডাকা হয়েছিল—কিন্তু তিন দিনের দিন তোদের সেই কাকা মারা গেল।

দেবনাথ বললো, তুমি চুপ করো তো! যতসব বাজে বাজে গল্প বলে আরো ভয় ধরিয়ে দেওয়া!

রীনা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কার ভয় ধরবে? তোমার?

দেবনাথ বললো, তুমিই তো ভয় পাবে! রাত্তিরে বাথরুমে যাবার সময় আমাকেই ডাকবে।

—কোনোদিন ডেকেছি?

—দেখব আজ কি হয়!

—রীনা মুখের হাসিটি অম্লান রেখেই বললো, আমার ভূতের গল্প শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু ভূতের ভয় করে না।

—দেখা যাবে!

দীপু বললো, অনেকে অনেক রকম ভুল দেখে—কিন্তু শিপ্রা মাকে ভুল দেখলো কি করে? ভূতের গল্পেও তো কখনো ভূতেরা জ্যান্ত মানুষের চেহারা ধরে আসে না?

দেবনাথ বললো, এও এক ধরনের অটো সাজেসশান। শিপ্রা হয়তো কোনো কারণে মা-কে ভয় পাচ্ছে—

দেবনাথ আর যেটুকু বলতে চাইলো, তা হচ্ছে এই যে, শিপ্রা হয়তো মা'র কাছে এমন কিছু গোপন করে আছে—যা ধরা পড়ে গেলে মা ভয়ঙ্কর রাগ করবেন—কিন্তু ছোট ভাইয়ের সামনে এ কথা আর বললো না।

খাওয়া শেষ হবার পর সবেমাত্র হাত ধুয়েছে ওরা, এমন সময় মাথার ওপর গুম্‌গুম্‌ শব্দ হল।

দীপু গম্ভীর গলায় বললো, মেঘ ডাকছে। রাত্তিরে নিশ্চয়ই দারুণ বৃষ্টি হবে।

মা আর্তগলায় বললো, মেঘ কোথায়? এ তো ছাদে শব্দ হচ্ছে! ও দেবু, ও দীপু—

আর একবার শব্দ হল, যেন ছাদের ওপর দিয়ে কেউ একটা লোহার বল গড়িয়ে দিচ্ছে।

মা আবার চিৎকার করতে যেতেই দেবনাথ বললো, দাঁড়াও, আগে থেকেই অত ব্যস্ত হয়ো না। ভালো করে শুনতে দাও।

রীনা বারান্দায় গিয়ে ওপরের দিকে উঁকি মেরে বললো, আকাশে একটুও মেঘ নেই।

দীপু বললো, গরমের দিনে ছাদে এরকম শব্দ হয়। দিনের বেলা প্রচণ্ড উত্তাপে সবকিছুই একটু বেড়ে যায়, রাত্তিরে ঠাণ্ডা পেয়ে যখন আবার কমতে শুরু করে তখন ঐ রকম শব্দ হয়।

—আগে আর তো কখনো শুনি নি?

—শুনেছ নিশ্চয়ই, তখন গ্রাহ্য করো নি। ঠিক আছে আমি দেখে আসছি।

দীপু সিঁড়িতে উঠতে যেতেই মা বললেন, না, তুই একা যাবি না। খর্বদার দীপু বারণ করছি—

রীনা দেবনাথকে বললো, তুমিও যাও না! চলো আমিও যাচ্ছি...

দেবনাথ বললো, তুমি নিচে থাকো মায়ের কাছে। আমি যাচ্ছি।

দীপুই আগে উঠে এল। তিনতলায় তার একখানা ঘর, বাকিটা ছাদ। আবছা জ্যোৎস্নায় পুরো ছাদটা ফাঁকা পড়ে আছে। নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার ঘর খোলা, দরজার কাছে শাড়ি পরা একটি আবছা নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে।

এক মুহূর্তের জন্য দীপুর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। চিৎকার করতে গিয়েও মুখ চাপা দিল, অস্ফুটভাবে জিজ্ঞেস করলো, কে?

নারীমূর্তি একবার যেন নড়ে উঠল, কোনো সাড়া দিল না। দীপু স্থিরদৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই তার সমস্ত শরীরটা আবার হাল্কা হয়ে গিয়ে কুলকুল করে ঘাম বইলো।

দূর ছাই, কেউ না! দরজার পর্দাটা হাওয়ায় উড়ে ঐ রকম দেখতে হয়েছিল। ঠিক

যেন টাইটভাবে শাড়ি পরে একটি মেয়ে, নবনীতার মতন। ইস, এইরকম ভাবেই মানুষ ভয় পায়। তার নিজের পর্যন্ত এই রকম ভুল হয়েছিল। অবিকল মনে হয়েছিল নবনীতার মতন--এমন কি অসম্ভব হলেও তার একবার মনে হয়েছিল, নবনীতা। তাই বুঝি কোনো রকমে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে...

পেছন থেকে দেবনাথ বললো, কিরে?

দীপু আলগাভাবে হেসে বললো, কই কিছু না!

দু'ভাই সারা ছাদটা ঘুরে দেখলো। এমন কি জলের ট্যাঙ্কের পাশে উঁকি দিতেও ছাড়লো না—যদি ভূত ওদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে! কোথাও কিছু নেই। ট্যাঙ্কের পাশে কয়েকটা ফুলের টব, একটা খালি টব কাত হয়ে পড়ে আছে। সেটা গড়াবার জন্যই কি শব্দ? কিন্তু তাহলে সারা ছাদ জুড়ে শব্দ হবে কেন? ওসব কিছু নয়!

রীনা আর মা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, কিন্তু দু'জনেই নিঃশব্দ।

বছরখানেক ধরে দু'জনে পরস্পর কথা বলে না। অন্যদের সামনে অবশ্য সেটা বুঝতে দেয় না। রীনা প্রয়োজনীয় দু'একটা কথা বলে মা'র সঙ্গে, কিন্তু একা থাকলে কোনো কথা নেই।

দু'ভাই নেমে এল একসঙ্গে। রীনা দীপুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কিছু দেখতে পেলে?

দীপুও হেসে উত্তর দিল, না বউদি, ভূতেরা দারুণ কাওয়ার্ড। কিছুতেই সামনাসামনি আসে না। অন্তত আমার সামনে কখনো আসে নি।

মা আজ তিনতলায় দীপুকে কিছুতেই একা শুতে দেবেন না। দীপু শোবেই। দোতলায় আর একটা মাত্র ঘর আছে, সেটা মাল-পত্রে ঠাসা, তা ছাড়া সে ঘরটার মাত্র একদিকে জানলা বলে ভালো হাওয়া খেলে না। দীপুর একা ঘরে শোওয়া অভ্যেস, মা আর শিপ্রার সঙ্গে এক ঘরে সে কিছুতেই শোবে না।

দেবনাথ বললো, শুক না ওপরে। এতদিন ধরে শুচ্ছে কিছু হয় নি—ওরকম বেশি বেশি করলে ভয় আরো পেয়ে বসবে তোমাদের।

মা শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করলেন, দীপু তবুও শুনলো না। এ বংশের ছেলেরা বড় গোঁয়ার!

দীপু বললে, কাঞ্চা তো সঙ্গেই আছে—তা হলে আর একা শোওয়া হল কোথা?

কাঞ্চা আর কুকুরটাকে নিয়ে দীপু ওপরে উঠে গেল।

দেবনাথ নিজের ঘরে ঢোকার আগে মাকে বললো, ভালো করে দরজা জানলা বন্ধ করে শুয়ো। ভয়ের কিছু নেই। যদি কোনো কিছু হয়—আমাকে ডেকো কিন্তু।

রীনা তখন বাথরুমে। তার চাপাগলায় গান পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। ওই বাথরুমেই শিপ্রা আজ ভয় পেয়েছিল—রীনার সেসব ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। শোয়ার আগে গা না ধুলে তার চলে না।

পাতলা নাইটি পরে বাথরুম থেকে বেরুলো রীনা, একবার নিচের উঠোনের অন্ধকারের দিকে, একবার ছাদের দিকে চেয়ে কিছুই দেখতে পেল না, ঘরে এসে ঢুকলো।

দেবনাথ একটা বই বুকে নিয়ে সিগারেট টানছে শুয়ে শুয়ে। দুপুরে অনেক ঘুমিয়েছে। এখন সহজে ঘুম আসবে না। এক সপ্তাহ অন্তর নাইট ডিউটি থাকে বলে

যে-কটা রাত্রে সে বাড়িতে ঘুমোয় সেই কটা রাতই তার ইচ্ছে করে রীনার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করতে। অন্যদিন রীনা দুপুরে অফিস যায়, সন্ধের পর যখন ফেরে তার একটু বাদেই দেবনাথকে অফিস চলে যেতে হয়। বউয়ের সঙ্গে কথাই হয় না প্রায়।

দেবনাথ আড়চোখে দেখছে রীনার পাউডার ও ক্রিম মাখা। প্রত্যেকদিন সে প্রায় একই রকম ভাবে প্রসাধন করে, দেবনাথ বাড়িতে থাক বা না থাক। তার শেষ হয়ে গেলে সে দেবনাথকে জিজ্ঞেস করলো, আলো নেভাব, না তুমি পড়বে?

দেবনাথ বললো, আর পড়ব না, কিন্তু আলোটা থাক।

মস্তবড় খাট, অঢেল জায়গা, রীনা এসে একটু দূরে শুতেই দেবনাথ হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁলো। ঘাড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে টেনে আনলো তাকে কাছে। বুকের ওপর আলতোভাবে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে আজ একটু গম্ভীর দেখছি কেন?

—কই গম্ভীর না তো! তোমার ঘুম পায় নি?

—না।

দেবনাথের ইচ্ছে হল, রীনার ঠোঁটে একটা চুমু খায়। কিন্তু অনেকখানি ক্রিমে ঠোঁট দুটো চটচটে হয়ে আছে। রীনার বুকে সামান্য চাপ দিয়ে বললো, বাথরুমে এতক্ষণ ছিলে, তোমার ভয় করে নি?

—ভয় আবার কি?

—সব মেয়েরাই তো একটু একটু ভূতের ভয় পায়!

—আমি পাই না। আমি সারা জীবন মানুষকেই এত ভয় পেয়েছি—আজও একটা লোক—

—আজ আবার কি হল?

—আজ অফিসের গেটের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল—আমি যেখানেই যাই—আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগলো।

—অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার যাব! বাস-স্টপে এলাম—সেখানেও লোকটা, পর পর ক'টা বাস ছেড়ে দিলাম, তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

—লোকটাকে আগে কখনো দেখেছো?

—না। আমার এমন ভয় করছিল—

—ওরকম বাজে লোক অনেক ঘোরে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়।

—বিয়ের আগে তুমিও আমার পেছন পেছন আসতে।

দেবনাথ হেসে বললো, আমিও তাহলে বাজে লোক! তুমি আমাকেও ভয় করো!

রীনা বললো, আমার দুর্ভাগ্য কিনা বলতে পারি না—অনেক ছেলেবেলা থেকেই আমার পেছনে পেছনে এ রকম একটা না একটা লোক ঘুরছে। তার মধ্যে তোমাকেই আমি শুধু বিয়ে করেছি।

—আমাকে বিয়ে করাটাও বুঝি দুর্ভাগ্য?

—তাই বললাম নাকি? বললাম, তাদের মধ্যে শুধু তোমাকেই ভালো লেগেছিল বলে তোমাকে বিয়ে করেছি।

—লেগেছিল? এখন আর লাগে না?

—তুমি সাংবাদিক হলে কেন? উকিল হলেই পারতে?

দেবনাথ আবার হেসে রীনাকে আর একটু কাছে টেনে আনলো। রীনা বাধা দিল না, নিজে থেকে জড়িয়ে ধরলো না।

দেবনাথ বললো, বাড়িতে যা শুরু হয়েছে, বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়াই ভালো মনে হচ্ছে।

—বাঃ, ভূতের ভয়ে বাড়ি বিক্রি করে দেবে কেন? তাহলে তো আমার অফিসের গেটে লোক দাঁড়িয়ে থাকে বলে আমাকেও অফিস ছেড়ে দিতে হয়!

—কিন্তু খুকু ওরকম ভয় পেল কেন?

—এবার খুকুর বিয়ে দিয়ে দাও। ওর যে আর লেখাপড়া হবে না, তা তো বুঝতেই পারছো!

—কার সঙ্গে? ঐ রমেনের সঙ্গে? জুতিয়ে ওর মুখ ভেঙে দেব একদিন। রাস্কেল একটা—কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু মেয়েদের পেছন পেছন ঘোরা!

—মেয়েদের নয়, আমি যদ্দূর জানি, শুধু শিপ্রার পেছন পেছনই ঘোরে।

—তাই বা ঘুরবে কেন? এখনো কোনো চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে নি। বরং চাকরির জন্য ঘুরলে কাজ দিত।

—তুমি যখন আমাকে ফলো করতে, তখন তোমারও কোনো চাকরি ছিল না।

দেবনাথ এবার রীতিমতো চটে উঠল। স্ত্রীর শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, রীনা, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ! তুমি আমার সঙ্গে তুলনা করছ ঐ লোফারটার?

রীনা এবার নিজে থেকে হাত রাখলো দেবনাথের গায়ে। ঠোঁট থেকে ক্রিম মুছে একটা চুমু দিল দেবনাথের কপালে। কোমল গলায় বললো, তুমি রাগ করছ? আমি কিন্তু তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলি নি। আমি বলছিলাম, আমরা নিজেরা যখন কারুকে ভালোবাসি—তখন নিজেদের পক্ষে অনেকরকম যুক্তি তৈরি করি—কিন্তু অন্যদের বেলায় তা সইতে পারি না। শিপ্রা যখন রমেনকে ভালোবাসে—

—মোটেই না। ও এমনি চোখের ভালোবাসা। আমি কিছুতেই ঐ রাস্কেলটার সঙ্গে খুকুর বিয়ে দেব না।

—ঠিক আছে, মাথা গরম করো না, এখন ঘুমোও!

—আমার ঘুম পায় নি। তুমি ঘুমোও!

—তুমি এখনো রাগ করে আছো; তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না?

—ভালোবাসা? হুঁ! তুমি কত ভালোবাসো, তা তো জানা আছে!

রীনা একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেললো। দেবনাথের একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে এল, মিশে গেল দু'জনের বুক। জোর করে দেবনাথের মাথাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ফিসফিস করে বললো, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি। প্রাণের মতন ভালোবাসি। এর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। আমার যখন মন খারাপ হয়, আমার যখন একঘেয়ে লাগে—তখন আমি একথা খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি! তোমাকে ভালো না বাসলে আমি অনেক কিছুর কারণ খুঁজে পেতাম। তুমি যে এত ভালো, তোমাকে ভালো না বেসে উপায় কি?

রীনার কথায় অত্যন্ত আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। দেবনাথ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়লো। আবিষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলো, সত্যি বলছো?

—এর থেকে সত্যি কথা আর কখনো বলি নি।

চুমুতে চুমুতে দেবনাথের মুখ আচ্ছন্ন করে দিল রীনা। দেবনাথ ফের রীনার বুকের ওপর এক হাত রেখে অন্য হাতে নাইটিটা গা থেকে সরাতে গেল। রীনা সেটা চেপে ধরে বললো, আজ নয়, লক্ষ্মীটি, আজ আমার শরীর খারাপ।

দেবনাথ বললো, ঠিক আছে, তা হলে আলো নিভিয়ে দাও।

গরমের জন্য দরজা খুলে শুয়ে আছে দীপু। কাঞ্চা মেঝেতে শুয়ে ফিসফিস করে নাক ডাকছে আস্তে আস্তে। কুকুরটা শুয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কুকুরটা দু'বার ডেকে উঠতেই দীপু ধড়মড় করে উঠে বসলো। কুকুরটা ছাদের ওপর কাকে যেন তাড়া করে গেল। দীপু তৈরি হয়েই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে খাটের পাশ থেকে টর্চটা নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এল। ছাদে কেউ নেই, কুকুরটা তবু কাকে যেন তাড়া করে ছুটছে!

তবে কি সত্যিই অশরীরী কিছু? কুকুররা কি অশরীরীদেরও দেখতে পায়?

আবছা জ্যোৎস্না উঠেছে, চতুর্দিকে নির্জন, মনে হয় গোটা শহরটাই এখন ঘুমন্ত। দীপুর হঠাৎ মনে হল, এখানে সে বড্ড একা! অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার গা ছমছম করছে। একবার ভাবলো কাঞ্চাকে ডাকবে কিনা। কুকুরটা তখনো কি একটা অদৃশ্য জিনিসকে তাড়া করছে সারা ছাদময়, মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে কুঁই-কুঁই। দীপু দু'বার ডাকলো, লিজি, লিজি! শোন এদিকে! কুকুরটা তার ডাকে পাত্তাই দিল না।

টর্চের আলোটা আবার ভালো করে ফেলতেই দীপু দেখতে পেল, একটা ধেড়ে ইঁদুর। কুকুরটা ইঁদুরটাকেই তাড়া করছে। এতক্ষণ দীপু আলোছায়ার মধ্যে ওটাকে দেখতে পায় নি। দীপু হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারলো না। ছি ছি ছি! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও সেও তো একটু একটু ভয় পেয়েছিল। নির্জন রাত্তিরে সামান্য কোনো কারণেই বিশ্বাস চলে যায়।

দীপু আবার নিজের খাটে ফিরে এলো। কিন্তু ঘুম আর এলো না। ভয় ভাঙাবার জন্য দীপু তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখ ব্যথা হয়ে গেল, কিছুই দেখতে পেল না, শুধুই জ্যোৎস্না পড়ে আছে ম্লানভাবে।

দরজার নীল পর্দাটা উড়ছে হাওয়ায়। সেটার দিকেও তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এই পর্দাটাকেই কিছুক্ষণ আগে তার নবনীতা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু নবনীতাকে দেখলে তার ভয় পাবার কি আছে? নবনীতা তো জলজ্যান্তভাবেই বেঁচে আছে।

খাট থেকে উঠে দীপু একটা সিগারেট ধরালো। আপন মনেই সামান্য হাসলো। নবনীতাকে আর একবার দেখা গেলে মন্দ হত না। এমনিতে তো আর নবনীতার সঙ্গে দেখা হয় না, তবু যদি দৃষ্টিবিভ্রমে দেখা যেত।

সপ্তাহ দু'এক আগে নবনীতার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, তখন দীপু মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। নবনীতাকে দেখে তার গা জ্বলে গিয়েছিল। মেয়েদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। এই নবনীতাই একদিন তাকে বলেছিল, অরুণাংশুকে দেখলে তার গা জ্বলে যায়। গায়ে-পড়া ন্যাকা ছেলে, নেহাত বাবার টাকা আছে আর একটা পুরোনো আমলের অস্টিন গাড়ি আছে, তাই নিয়ে খুব চাল মেরে বেড়ায়। পাক্কা ক্যাপিটালিস্টের বাচ্চা।

অথচ সেই নবনীতাকেই দীপু দেখেছে অরুণাংশুর গাড়িতে চেপে রেড রোড দিয়ে

যাচ্ছে। দীপু তখন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মিটিং-এ যাচ্ছিল। গাড়িতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না, নবনীতা বসেছিল সামনের সিটে, কি একটা হাসির কথায় সে আর অরুণাংশু হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল। কে জানে অরুণাংশুর একটা হাত নবনীতার উরুতে রাখা ছিল কিনা! কিছু বিশ্বাস নেই! নবনীতা যখন অমনভাবে হাসতে পারে—

সেদিন ভূত দেখার মতোই চমকে গিয়েছিল দীপু। যতদূর দেখা যায় সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর অসম্ভব ক্রোধে তার শরীর একেবারে জ্বলে গিয়েছিল। সেদিন মিটিং-এ একটা কথাও তার কানে ঢোকে নি। প্রথমে সে ভেবেছিল, দু'তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অরুণাংশুকে বেদম ধোলাই দেবে। অবশ্য অরুণাংশুকে মারতে হলে বন্ধুদের সাহায্যের দরকার নেই, সে একাই যথেষ্ট। কিন্তু খানিকটা বাদে তার আবার মনে হয়েছিল, এক্ষেত্রে অরুণাংশুর কি আর দোষ! যে বড়লোকের বখাটে ছেলে, সে তো নবনীতার মতন সুন্দরী মেয়ের পেছনে ছোঁক ছোঁক করবেই! নবনীতা তার কাছে মিথ্যে কথা বললো কেন? নবনীতা কেন তাকে এরকম কথা বলে আবার অরুণাংশুর গাড়িতে চাপলো? অত হাসিই বা কিসের?

দীপু সেদিন ঠিক করেছিল, শুধু নবনীতা নয়, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে সম্পর্ক রাখবে না। মেয়েরা সবাই এরকম। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম করাই এক ঝামেলা। একগাদা সময় নষ্ট, কত রকম ন্যাকামি যে সইতে হয়—তার ওপর যদি এরকম অবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়—

আজ ছাদে উঠে প্রথমবার নীল পর্দাটা দেখে তার বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। ঠিক মনে হয়েছিল নবনীতা দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যেই একটা নম্র সলজ্জ ভাব। যেন নবনীতা তার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। দূর! তাও কি হয় নাকি? নবনীতা এ বাড়িতে আসেই নি কোনোদিন। তিনতলায় সোজা উঠে আসা তো অসম্ভব কথা। একদিন শুধু গলির মোড় থেকে নবনীতাকে তাদের বাড়িটা দেখিয়েছিল দীপু।

কিন্তু পর্দাটাকে নবনীতা বলে মনে হল কেন তার! সে তো ক'দিন ধরেই নবনীতার কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল!

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীপু চিত হয়ে শুয়ে রইল। হঠাৎ তার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এ ক'দিন ধরে তার মন জুড়ে ছিল শুধু রাগ। এখন আর রাগ হচ্ছে না পৃথিবীর কারুর ওপর, শুধু অভিমান। পৃথিবীর কেউ তার কথা ভাবে না! নীল পর্দাটার দিকে আর একবার তাকিয়ে দীপু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললো।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো শিপ্রা। মুখে হাত দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করলো, পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে একবার ছুটে গেল দরজার দিকে, দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়েও তার ভয় করলো। ফিরে এল জানলার নিচে নর্দমার কাছে। হুড়মুড় করে বমি করতে লাগল।

একটু আধটু বমি নয়, একেবারে পেট খালি করা। রাত্তিরে কিছুই খায় নি, দিনের বেলার ভাত তরকারি পর্যন্ত উঠে এল বমির সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বমি করলো শিপ্রা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, চোখে অন্ধকার দেখছে, মা-কে ডাকতেও সাহস হল না। কোনো রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। খুট

করে আলো জ্বেলে দেখলো, বেডসাইড টেবিলে এক জগ জল ঢাকা দেওয়া রয়েছে। জলটা আনতে গিয়ে তার পা টলে গেল, তাড়াতাড়ি সামলে নিল খাটের পায়া ধরে। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই।

শিপ্রা আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে জলের জগটা নিয়ে ফিরে এল নর্দমার কাছে। ভালো করে চোখ মুখ ধুলো। মা যাতে বুঝতে না পারে, সেই জন্যই জল ঢেলে বমি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলো মেঝে থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলো না, বার বার তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, মাথা ঘুরে যাচ্ছে। এখন শুয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

খাটের কাছে ফিরে এসে শরীরটাকে হিঁচড়ে বিছানায় তুললো। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, মায়ের মুখে একটা বিষণ্ণতার ছায়া। অবিকল এই রকম বিষণ্ণ মুখই সে দেখেছিল সন্ধ্যেবেলা বাথরুমের দরজার কাছে।

ইস্, আলো নেভানো হয় নি! আবার নামতে হবে? কিন্তু শরীর আর বইছে না। এর মধ্যেই গলা শুকিয়ে আবার তেষ্টা পেয়েছে, পেটের মধ্যে গুলোচ্ছে, কোমরের কাছটায় আর পিঠে অসহ্য ব্যথা। আলো জ্বালা থাকা সত্ত্বেও চোখের সামনে সব কিছু এক একবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

শিপ্রার দারুণ ভয় হল, সে ভাবলো, মানুষ মরে যাবার আগে কি এরকম হয়? আমি কি মরে যাচ্ছি? আমার মরণই ভালো। আমি আগেই আত্মহত্যা করলুম না কেন?

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বেঁচে থাকার দারুণ ইচ্ছে হল। একবার হাত বাড়িয়ে মাকে ডাকতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। সারদিনে মায়ের অনেক খাটুনি যায়—এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, এখন ডাকা উচিত হবে না। শিপ্রা বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এক সময় কান্না থেমে গেল তার। একটা কথা মনে পড়ল, একতলার ঘরের মেঝে খুঁড়ে যে মেয়েটার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল, সে কি আত্মহত্যা করেছিল? তার অবস্থাও কি শিপ্রার মতন হয়েছিল? সে কি এখন শিপ্রাকে টানছে? কাল থেকেই তার আত্মহত্যার কথা মনে হচ্ছে!

কি একটা আওয়াজে শিপ্রা উৎকর্ণ হয়ে উঠল, চোখ মুছে ভালো করে শোনার চেষ্টা করলো। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল, সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে কে যেন নামছে। দরজা বন্ধ, বাইরের সামান্য পায়ের আওয়াজ শিপ্রার শুনতে পাবার কথা নয়, কিন্তু চারদিক এত উৎকট নিস্তব্ধ যে পিঁপড়ের চলার আওয়াজও যেন শুনতে পাওয়া যাবে।

শব্দটা ক্রমশ জোর হচ্ছে। এবার আর কোনো ভুল নেই। ঘড়িতে আড়াইটে বাজে, এখন কে নামবে সিঁড়ি দিয়ে! শিপ্রা সোজা হয়ে বসলো। পায়ের শব্দটা এ ঘরের দিকেই আসছে, খুব কাছে।

শিপ্রা আর থাকতে পারলো না, দু'হাতে মাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো, মা মা, শিগগির—

মা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন।

ঐ যে শোনো পায়ের শব্দ! শিপ্রার চুলগুলো এলোমেলো, চোখ দুটো ড্যাবডেবে, আঁচল খসে পড়েছে।

মায়ের ঘুমোর ঘোর ভালো করে ভাঙে নি। তিনি বললেন, কোথায় শব্দ? কিছু না তো! তুই ঘুমো!

—ঐ যে, ঐ যে—শোনো।

—কই শুনতে পাচ্ছি না তো! আলো কে জ্বাললো?

—মা, এসে পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দুম্ দুম্ করে ধাক্কা পড়লো। মা আর শিপ্রা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। শিপ্রার গলা দিয়ে চিৎকারও বেরুচ্ছে না, একটা অদ্ভুত চাপা ভয়ের বিকৃত আওয়াজ বেরুচ্ছে।

মা-ই একটু সামলে নিলেন। কাঁপা গলায় বললেন, কে? কে?

—দরজা খোলো, আমি দীপু!

শিপ্রা আর্তনাদ করে উঠল, না মা, দরজা খুলো না—খুলো না! ছোড়দা নয়, এবার ছোড়দার রূপ ধরে এসেছে!

—দরজা খোলো না!

—মা খুলো না—খুলো না!

মা খাট থেকে নেমে দরজার কাছে এসেছেন, দরজা খুললেন না। হাতজোড় করে বললেন, তুমি কে বাবা, সত্যি করে বলো! আমরা তো কোনো দোষ করি নি!

—বলছি তো আমি দীপু!

—এত রাত্তিরে কি চাস্?

—শিপ্রার ঘাড় মটকাব?

মা দরজা খুলে দিলেন। দীপুর চেহারা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, চুলগুলো কপালের ওপর ছড়ানো, চোখ দুটো জ্বলছে। ভয়ঙ্কর বিকৃত গলায় সে বললো, শিপ্রাকে চাই, শিপ্রার ঘাড় মটকাব।

মা আর শিপ্রা দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে যাবার ঠিক আগেই দীপু হা-হা করে হেসে উঠল। হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিল কপাল থেকে। বললো, কি, ভয়ে একেবারে মরছিলে তো?

মা ভয়ঙ্কর রাগ করে বললেন, দ্যাখ দীপু, সব ব্যাপারেই ছেলেমানুষী, না? জানিস্, অনেকে এতে হার্টফেল করে?

দীপুর হাসি তবু থামে না।

মা সেই রকম ক্রুদ্ধভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্তিরে কি চাই তোর?

—জলতেষ্টা পেয়েছে। আমার ঘরে জল রাখো নি কেন?

—এত রাত হয়েছে যখন, সকালবেলা জল খেলে চলত না?

—দেখলাম তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। জল না পেলে আমার ঘুম আসবে না।

জলের জগটা আনতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়লো, মেঝের ওপর ছড়ানো বমি। অস্ফুটভাবে বললেন, একি! আর কিছু বললেন না। দীপুকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এনে দিলেন।

দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। দীপু চলে যাবার পরও সে সেই রকম ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। তখনো তার ঘোর কাটে নি। মা দরজা বন্ধ করে শিপ্রার দিকে ফিরলেন।

শিপ্রা শুধু বললো, মা! আর কিছু বলতে পারলো না। আবার মা'র মুখে গাঢ় অন্ধকার ছায়া। শিপ্রার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কি হয়েছে? এত বমি করেছিস কেন? কি হয়েছে আমাকে বল তো?

উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছলো শিপ্রা। এবার অনেকখানি সুস্থ লাগলো তার। মুখ নিচু করে বললো, মা, আমি আর এবাড়িতে থাকতে পারব না!

—কেন? তুই একাই এত বেশি ভয় পাচ্ছিস কেন?

—আমার সব সময় ভয় করছে। আর পারছি না!

—তুই তাহলে কাল থেকে তোর ছোট মাসির বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থেকে আয়!

—ছোট মাসির বাড়িতে গেলেও আমার সারবে না। মা, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে!

—কেন রে? কেন? এই খুকু—

শিপ্রা প্রায় ছুটে এসে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো।

ফুলে ফুলে উঠছে তার সুন্দর সুঠাম শরীরখানি। মা বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি হয়েছে কি? আমাকে বল্—

—মা, আমাকে রমেনকে বিয়ে করতে দাও!

—রমেন? আবার সেই রমেন? কেন, সে ছাড়া অন্য ছেলে নেই?

—ছোটদা রমেনকে অপমান করেছে। কিন্তু রমেনকে ছাড়া আমার চলবে না!

—কেন, রমেন কেন? রমেন কি এমন ছেলে? তোর ছোট মাসি যে ছেলেটির খবর এনেছে, সে তো চমৎকার পাত্র। চেহারাও সুন্দর। ইঞ্জিনিয়ার—ভালো চাকরি করছে।

—মা, অন্য কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

—কেন সম্ভব নয়?

—মা, আমি দারুণ ভুল করে ফেলেছি। তোমরা এখন যদি বেশি বাধা দাও, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

—কি করেছিস্? কি করেছিস্?

শিপ্রা কাঁদতে কাঁদতেই একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললো। মায়ের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে গেল। খুব ক্লান্তভাবে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলেন শুধু, ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ। তোমরা যদি চাও আমি আত্মহত্যা করলেই সব মিটে যায়, তাহলে সত্যিই আমি—

মা এবার ধমক দিয়ে বললেন, এখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড় তো! আর শরীরটাকে খারাপ করতে হবে না।

আলো নেভাবার পরও অবশ্য দু'জনের কারুরই ঘুম হল না। মা আর শিপ্রা কথা বলতে লাগলো রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

পরদিন আসল পুরুত ডাকিয়ে খুব ধুমধাম করে শান্তিস্বস্ত্যয়ন হল। মা সেই পুরুতকেই বললেন খুব কাছাকাছি একটা বিয়ের তারিখ দেখতে। দেবনাথকেও সব খুলে বললেন না। মনে মনে ভয় ছিল, দেবনাথ হয়তো দপ্ করে জ্বলে উঠবে।

দেবনাথ কিন্তু শান্তভাবেই সবটা শুনলো। মুখের একটা রেখাও বদলালো না। যেন ছোটগোছের কোনো ব্যাপারে সে আর রাগবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

ধীরগলায় বললো, ঠিক আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যা পাই ধার নেব, তুমি বিয়ের তারিখ-টারিখ দ্যাখো।

—কিন্তু রমেন যে কোনো চাকরি-টাকরি করে না!

—আমিই খুঁজব এখন চাকরি ওর জন্য—

—ওর বাবা-মা'র সঙ্গেও তো কথা বলতে হবে! তাঁদের মত আছে কিনা!

—সে দায়িত্ব রমেনের।

রীনা আজও যথাসময়ে খেয়ে-দেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল। দীপুও বেরুবার জন্য উসখুস করছে, কিন্তু বাড়ির কাজ না চুকলে বেরুতে পারছে না। খাওয়া-দাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়লো। দেবনাথ বেরুলো একটু বাদে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটু পড়তে যাবে। আর মা বিছানায় শুয়ে একটু চোখ বোজামাত্র চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লো শিপ্রা।

ভবানীপুরে শিপ্রার কলেজের বন্ধু সুজাতা থাকে, মাস আষ্টেক আগে তার বিয়ে হয়েছে। দুপুরবেলা তার স্বামী বাড়িতে থাকে না, সেই সময় প্রায়ই শিপ্রা যায় তার সঙ্গে গল্প করতে। সুজাতাদের টেলিফোন আছে। সেখানে পৌঁছে শিপ্রা বললো, জানিস্ সুজাতা, আমার একটা দারুণ ভালো খবর আছে!

সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কি রে?

শিপ্রা বললো, দাঁড়া আগে ওকে ডাকি!

রমেনদের বাড়িতে ফোন নেই, কিন্তু পাশের বাড়িতে ফোন করলে ওদের ডেকে দেয়। সেই জন্যই প্রায় কোনো দুপুরেই রমেন বাড়ি থেকে বেরোয় না। শিপ্রার গলা শোনা মাত্র সে বললো, দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি। রমেন বেকার, অথচ ট্যাক্সি ভাড়া করে ছুটে এল সুজাতার ফ্ল্যাটে। প্রায় সুজাতার সামনেই শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরে আর কি!

শিপ্রা বলো, জানো, কাল মরতে বসেছিলাম প্রায়। একতলার ঘরে ঐ কঙ্কালটা পাওয়ার পর থেকে আমাদের সারা বাড়িটা এমন হয়ে আছে! কাল সন্ধ্যেবেলা আমি যা দেখলাম, সবাই বলছে আমার চোখের ভুল!

—কি দেখলি রে? কি দেখলি? সুজাতা জিজ্ঞেস করলো।

সবিস্তারে গল্পটা শোনালো শিপ্রা—এখন দিনের বেলা অবশ্য ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়। তারপর বললো, ঐরকম ব্যাপার হল বলেই তো মাকে বলতে পারলুম! নাহলে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না। মা-ও এত সহজে মেনে নিলেন!

রমেন বললো, মেনে না নিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, আমরা আগামী সপ্তাহে রেজিস্ট্রি করতুমই।

শিপ্রা বললো, বাজে বকো না! মায়ের মত না পেলে আমার মনে কিছুতেই শান্তি আসত না।

সুজাতা বললো, তা হলে তোদের ভূতটাকে তোর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, বল্! ওর জন্যই তো হল অনেকটা!

শিপ্রা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, কালকে অজ্ঞান অবস্থায় আমি

স্বপ্ন দেখেছিলুম, ঐ কঙ্কালটা একটা মেয়েরই কঙ্কাল ছিল—আমারই বয়েসী। ওরও আমার মতন অবস্থা হয়েছিল, তারপর আত্মহত্যা করে।

—সবটা স্বপ্নে দেখলে?

—কি জানি, স্বপ্নে দেখলাম না কল্পনা করেছি! মোটমাট আমার বিশ্বাস, ও ছিল ঠিক আমার মতন। তখনকার দিনে তো আত্মহত্যা ছাড়া উপায় ছিল না, এখন কত উপায় আছে। আমি কিন্তু মরতে পারতুম না। মরতে আমার দারুণ ভয় করে।

সুজাতার অলক্ষ্যে রমেন শিপ্রার একটা হাত ধরে একটু চাপ দিল। সুজাতা বললো, তা হলে রমেন, সবই যখন ঠিকঠাক হয়ে গেল, তোমার উচিত আমাকে অন্তত একদিন খাওয়ানো!

রমেন বললো, নিশ্চয়ই খাওয়াব।

শিপ্রা বললো, আমার এত আনন্দ হচ্ছে না, যে কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

দীপু গিয়ে বসে রইলো ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে। দুটো আড়াইটের সময় সেখানে নবনীতা আসবেই।

নবনীতা আর তিনটি মেয়ের সঙ্গে এসে ঢুকেই দীপুকে দেখতে পেল। দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল অন্য টেবিলে। সেখানে গিয়ে আবার তাকাতেই দেখলো, দীপু তার দিকেই চেয়ে আছে। নবনীতা আবার চোখ সরিয়ে নিল। একটু বাদে আবার যেই তাকালো, আবার চোখাচোখি হল। দীপু এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

খানিকটা বাদে নবনীতা যখন খাওয়া শেষ করে বন্ধুদের নিয়ে উঠে পড়লো, দীপুও উঠে দাঁড়ালো। একেবারে নবনীতার পাশাপাশি বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে, একটাও কথা বললো না।

নবনীতার বন্ধুরা ঢুকে পড়লো ক্লাসে। নবনীতা বললো, আমি আজ চলি রে। আমি এই ক্লাসটা কাটব—বাড়িতে আজ দিদি জামাইবাবু আসবে!

লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে নবনীতা, দীপু তার কাছাকাছি, কেউ কোনো কথা বলছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের বাইরে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়ালো নবনীতা, দীপু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নবনীতাকে কিছু বললো না দীপু, এমনিই স্বগতোক্তি করলো, এখন ট্রামে খুব ভিড়!

নবনীতাও দীপুর দিকে তাকালো না। সেও স্বগতোক্তি করলো, যতই ভিড় হোক আমাকে যেতে হবেই!

—না।

—হ্যাঁ।

—না।

নবনীতা আর কথা বাড়ালো না। হাঁটতে লাগলো হ্যারিসন রোডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দীপু। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট পেরুবার পর দীপু আবার স্বগতোক্তি করলো, এতদিনে বুঝি একবারও খবর দেওয়া যেত না।

নবনীতাও স্বগতোক্তি করলো সবাই আমাকে ভুল বুঝবে কেন?

—ভুল বোঝার সুযোগ দিলেই ভুল বুঝতে হয়।

নবনীতা থমকে দাঁড়ালো। এবার সরাসরি তাকালো দীপুর দিকে, দীপু অপরাধীর মতন মুখ করে বললো, যাক, আর কিছু বলতে হবে না!

—তুমি—

—বলছি তো, আর কখনো ভুল বুঝব না।

এবার দু'জনেই হেসে ফেললো উজ্জ্বল মুখে।

একটু বাদে কফি হাউসের টেবিলে মুখোমুখি বসে নবনীতা জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাড়িতে নাকি মানুষের হাড় বেরিয়েছে?

—সে খবর রাখো দেখছি!

—আমি সব খবর রাখি। তুমি না রাখলে কি হয়!

—কে বলেছে তোমায়?

—তা নিয়ে তোমার দরকার কি? বাবাঃ, বাড়ির মেঝেতে কঙ্কাল! তারপরেও সে বাড়িতে মানুষ থাকে! আর কিছু হয় নি?

—হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে খুব ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

—কি রকম? কি হয়েছে বলো না?

—একটা খুব মিষ্টি মেয়ে ভূত, সে কারুর কোনো ক্ষতি করে না, এক এক সময় এক এক জনের চেহারা ধরে আসে। সে-ই আমাকে তোমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের ভেতরের রেস্টুর‍্যান্টে পাশাপাশি বসে আছে রীনা আর সুবিমল। দু'জনেই একটু চিন্তিত।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কাল বলেছিলে?

—না।

—আর কবে বলবে?

—হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না। কাল ঐ কথা বলতে গিয়ে তার বদলে বলে ফেললাম, আমি ওকে ভালোবাসি।

সুবিমল একটু মুচকি হেসে বললো, ও, তাই বুঝি?

রীনা ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল, হ্যাঁ, তাই বলেছি। মিথ্যে কথা বলি নি, সত্যিই আমি ওকে ভালোবাসি।

—তাহলে সুবিমল বোসের তো বিদায় নেওয়াই উচিত!

—তাই নাও না। বাঁচি তাহলে।

—বিদায় নিতে পারছি কই? এমনভাবে বেঁধে রেখেছ কেন?

—তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারবে না, ও সত্যি খুব ভালোমানুষ!

—দেবনাথ যে ভালোমানুষ, তা তো আমিও জানি।

—তাহলে এটা জানো না যে, কোনো সত্যিকারের ভালোমানুষকে কিছুতেই ঠকানো যায় না!

—ঠকাবার দরকারটা কি, আমি চলে যাচ্ছি!

—আজ চলে গিয়ে আবার কাল ফিরে আসবে?

—যদি বারণ করো, তাও আসব না। চিরদিনের মতন চলে যাব।

—পারবে?

—পারতেই হবে। এরকমভাবে তো আর চলে না।

—কিন্তু আমি যে পারব না! সুবিমল, তোমাকেও যে আমি সত্যিকারের ভালোবাসি!

—ছিঃ, বিবাহিতা মহিলার পক্ষে দু'জন পুরুষকে ভালোবাসা মোটেই উচিত নয়।

—সুবিমল তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

—একটুও করছি না।

—তাহলে আমি কি করব বলে দাও!

—ঝগড়াঝাঁটি না করে একদিন ঠাণ্ডা মাথায় দেবনাথকে সব খুলে বলো। বলো যে, তুমি ঝোঁকের মাথায়, আমার ওপর রাগ করে ওকে বিয়ে করেছিলে। কিন্তু তুমি যে ধরনের মেয়ে, যে ধরনের আবহাওয়ায় তুমি মানুষ, তাতে কিছুতেই তুমি ও-বাড়িতে খাপ খাওয়াতে পারছ না। সুতরাং মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স হওয়াই ভালো।

—আমি পারব না, পারব না—কিছুতেই পারব না। ওর তো কোনো দোষ নেই! ওকে তো আমি বললেই ও আলাদা বাড়িতে উঠে যেতে পারে!

—তাহলে বাড়িটা নিয়েই যত গণ্ডগোল?

—সুবিমল, কেন তুমি বোম্বে থেকে আবার ফিরে এলে? বেশ তো চাকরিতে বদলি হয়ে বোম্বে চলে গিয়েছিলে—

—বেশ তো, আবার চলে যাচ্ছি না হয়?

—তুমি বুঝতে পারছ না, দেবনাথকে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর তো কোনো দোষ নেই, আমি নিজেই তো ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম, আমাকে তো কেউ জোর করে বিয়ে দেয় নি। আমি ওর জীবনটা এমন তছনছ করে দেব?

—বেশ তো, দিয়ো না। আমি বোম্বে ফিরে যাচ্ছি।

—তুমি এখানে ফ্ল্যাট পেয়েছো?

—হ্যাঁ, কেন?

—আমার মাথার ঠিক নেই। আমার একবার মনে হচ্ছে, আমি দেবনাথের ওপর অন্যায় করতে পারব না, আবার মনে হচ্ছে—তোমার সঙ্গে তোমার ফ্ল্যাটেই চলে যাই। চলো, তাই যাই। তোমার চিন্তা-ভাবনা করে দরকার নেই।

—বসো, বসো। অত হুড়োহুড়ি করে এসব হয় না। তুমি খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখো, দেবনাথ সম্পর্কে তোমার কোনো দুর্বলতা আছে কিনা?

—হ্যাঁ, আছে। আমি জানি। ও আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করে নি। এমন মানুষ সম্পর্কে কোনো মেয়ের দুর্বলতা না থেকে পারে?

—তুমি আমার কাছে যদি চলে আসো ঝোঁকের মাথায়—তাহলে দেবনাথের জন্য তোমার মনে একটা অপরাধ-বোধ থাকবে। তুমি শান্তি পাবে না। তুমি আমাকেও শান্তি দেবে না, দেবনাথেরও শান্তি নষ্ট করবে।

—তাছাড়া আমি আর একটা কথা ভাবছি। দেবনাথের কাছে যদি আমি অবিশ্বাসী হই, তাহলে হয়তো একদিন তোমার কাছেও অবিশ্বাসী হব। ঐ যে লোকটা অফিসের গেট থেকে আমার পেছন পেছন আসে, ওর চেহারা যদি একটু সুন্দর হত, যদি ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করত—

—যাঃ, তা হয় না!

—কেন হবে না? মেয়েরা একবার অবিশ্বাসী হলে বার বার অবিশ্বাসীও হতে পারে! দেবনাথকে যদি ঠকাই, তাহলে আবার কখনো যে তোমাকেও ঠকাব না—

—তাহলে দেবনাথকে না ঠকানোই তো উচিত মনে হচ্ছে।

—কোনো মেয়ে কি সত্যিই দু'জন পুরুষকে একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে না?

—পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু দু'জন পুরুষের কেউই তা সহ্য করে না। শোনো রীনা, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি—আমরা তো আর ছেলেমানুষ নই। ঝোঁকের মাথায় কিছু করা আমাদের মানায় না। তুমি আর কখনো আমাকে দেখা করতে বলো না। বরং দেবনাথকে সুখী করার চেষ্টা করো।

—আর তুমি?

—আমি বোম্বে ফিরে যাব।

—তোমাকে দেখলে আমি মাথার ঠিখ রাখতে পারব না...

—আমি তোমার মাথা ঠিক রাখতে চাই। আর দেখা হবে না।

—সত্যি আর দেখা হবে না?

—না।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে, বাস বন্ধ ছিল বলে হেঁটেই ফিরছিল দেবনাথ। শর্টকাট করার জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মধ্যে ঢুকেছিল। রেস্তোরাঁটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার চোখে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা সুবিমলের হাতের ওপর রীনার হাত। দু'জন দু'জনের দিকে প্রগাঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

বাগানটার অন্যান্য পাথরের মূর্তির মতন এক মুহূর্ত শুধু অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেবনাথ। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

সেদিন রাত্তিরে আর খাবার টেবিলে একসঙ্গে খাওয়া হল না। শিপ্রা বাড়ি ফিরে শরীর খারাপ, কিছু খাবে না বলে শুয়ে পড়েছে। আসলে সে হোটেলে খেয়ে এসেছে রমেনের সঙ্গে। দেবনাথ অনেক আগেই খেয়ে চলে গেছে নাইট ডিউটিতে। রীনাও একা খেয়ে নিয়ে ঢুকে গেছে নিজের ঘরে। মা দীপুকে একা খেতে দিয়েছেন।

কাঞ্চা চাকরটা আর এ বাড়িতে থাকতে চায় না। কিছুক্ষণ আগে সে জামা-কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে চলে গেছে কাছাকাছি কোনো বাড়িতে তার গাঁওকা আদমির সঙ্গে শুতে। দীপুর ধারণা, ওকে নিশ্চয়ই কেউ কয়েক টাকা বেশি মাইনের চাকরির লোভ দেখিয়েছে—তাই ভূতের অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল।

দীপুকে আগে বলা হয় নি। খাবার টেবিলেই মা দীপুকে শিপ্রার কথাটা বললেন। দীপু তখন নবনীতার সঙ্গে আবার ভাব হয়ে যাওয়ায় এমন ডগোমগো যে, ব্যাপারটাতে সে তেমন গুরুত্বই দিল না। একদিন যদিও রমেনকে সে যথেষ্ট অপমান করেছিল, কিন্তু আজ বললো ঠিক আছে, দাদার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আর আমার বলার কি আছে!

আজ দীপু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবু মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা মেয়েলি গলায় কান্নার আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছে। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারীমূর্তি। নীল কিংবা কালো রঙের শাড়ি, একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে।

দীপু ভালো করে চোখ দুটো রগড়ালো। কালকের মতন ভুল দেখছে না তো? না, কোনো ভুল নেই। দীপুর দিকে পেছন ফেরা হলেও, নারীমূর্তি যে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

আজ আর দীপুর কিন্তু ভয় হল না। অশরীরী কিছু যদি সত্যিই থাকে, আজ দীপু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিতে চায়।

একটুও শব্দ না করে দীপু খাট থেকে নামল। আস্তে আস্তে টর্চটা তুলে নিল। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। মেয়েটি হাতের ওপর মাথা রেখে হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

মেয়েটির খুব কাছাকাছি গিয়ে দীপুর একটু ভয় করতে লাগলো। এ ঠিক ভয়ঙ্কর ভয় নয়, খানিকটা যেন মাদকতা মাখানো ভয়।

আর কাছে গেল না দীপু, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে?

মেয়েটি চমকে সোজা হয়েই দীপুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, দীপু দেখলো বউদি! তবু সতর্কভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখত লাগলো, যদি সত্যিই বউদি না হয়! যদি বউদির মতন চেহারা নিয়ে...ধ্যাৎ! বাজে চিন্তা!

দীপু জিজ্ঞেস করলো, বউদি তুমি?

রীনা ততক্ষণে দ্রুত আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলেছে। বললো, হ্যাঁ, ভাই, আমি। তুমি ঘুম থেকে উঠে পড়লে কেন?

—তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছ?

—এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। দোতলায় অসহ্য গরম, ঘুম আসছিল না।

দীপু এবার এগিয়ে বউদির পিঠে একটা হাত রেখে অনুভব করে নিল। তারপর বললো, বউদি, তুমি কাঁদছিলে?

—কই, না তো?

—হ্যাঁ, আমি শুনেছি। দাদার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

—না, ঝগড়া হবে কেন? দাদা-বউদির ঝগড়ার ব্যাপারে ছোট ভাইয়ের কৌতূহল দেখাতে নেই!

—বউদি, তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো?

—কি আবার হবে! এমনিই গরমের জন্য দাঁড়িয়েছি।

—এত রাত্তিরে, ছাদে? আমাকে ডাকলেও পারতে? যদি হঠাৎ ভয়-টয় পেতে—কাল শিপ্রা যে কাণ্ড করলো—

—আমার ভয় করে না।

—তোমার ভয় করে না? যদি সামনে কেউ এসে দাঁড়াত—হঠাৎ মনে করো সেই মেয়েটিই যদি—

—কোন্ মেয়েটি?

—যার হাড় পাওয়া গেছে?

—সে যে মেয়েই ছিল সত্যিকারের, তা কি ঠিক হয়েছে?

—ও আমি ঠিক জানি।

রীনা একটুখানি সরে দাঁড়িয়ে বললো, তা তাকে দেখলেই বা আমি ভয় পাব কেন? তার সঙ্গে না হয় গল্প করতাম! জিজ্ঞেস করতাম, সে মরলো কি করে? ওখানে পুঁতে

রেখেছিল কেন—এই সব! কিংবা জিজ্ঞেস করতাম, আর আমার মতন একটা দুঃখ ছিল কিনা?

—বউদি, তোমার কি দুঃখ আমায় বলো—

—দীপু চলো, এবার শুতে যাওয়া যাক!

—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো, আমি জানি, তুমি কাঁদছিলে। তোমার কি দুঃখ আমায় বলো, আমি যদি পারি—

ভারী অদ্ভুত এক রহস্যময়ভাবে হাসলো রীনা। সেই হাসির মধ্যে অনেক কিছু মিশে আছে। খানিকটা উদাসীনভাবে বললো, মেয়েদের দুঃখ ছেলেরা কখনো বুঝতে পারে না, ওকথা ছেলেদের কাছে বলতে নেই।

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে। দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনো ছোট্ট ইজের-পরা খুকি। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায়সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক-নাগাড়ে তিন চার কিম্বা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট নজন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলে-মেয়েরা সবাই তখন ছোটছোট, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচুগাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার। একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনসটিটিউট ছিল, সেখানে প্রতি বছর দু-তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল

বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোট আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে-দোরে ঢুকতে দেবেন না।" কিম্বা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নী এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, "নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে-পুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভালো নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেনখন।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন। একদিন হল কি, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধাবয়সী বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায় বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে?"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মিচকি হাসি হেসে বললেন, "ওদের ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা—কোন্‌টা মানুষ আর কোন্‌টা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।"

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নিচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন, হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টারেরা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন। পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালোবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে কিন্তু ড্রাইভার তার ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইস্‌ল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ-কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক! ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে! ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল।

ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়। আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন, তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন, কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে।

প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখবাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর

ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ-ওকে ঠেলছেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচি আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ-ভাল্লুক নই...ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড! এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে? অ্যাঁ? কী হয়েছে? তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন, কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তাঁর মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল, কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে চার-পাঁচ-সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়!

তখনকার মফঃস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, 'আপনার খেলা গণপতির চেয়ে ভালো। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হাঁ অতি আশ্চর্য খেলা—আমিও এরকম আর দেখিনি।"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী? এ তো আপনিই দেখালেন!"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বলেন, "তা বটে আমিই তো দেখালাম। আশ্চর্য!"

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ, আমরা তো পাচ্ছি না!"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাৎ আঁশটে গন্ধ! শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলুম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা-ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে-কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার

শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?''

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, ''এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?''

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, ''ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে এ হচ্ছে ঐ দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহার দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।''

''কারা?'' দিদিমা তবু অবাক।

''বুঝবে বাপু, রোসো।'' বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই, তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই-পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, ''ওরে, কে আছিস?'' বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, ''যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।'' দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, ''লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?'' সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, ''না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি! খুব ভালো ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই!''

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহিগলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরিশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে, কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন—কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেনি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, ''দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল! একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি!''

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, ''মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?''

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, ''সবই তো বোঝেন মশাই! একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।''

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসি তখন

কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসিরা নাবালক-নাবালিকা। মা'র বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর হাঁক দিত, "আয় রে!" অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত।

মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোট জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, "কে খেলবি আয়!" অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাজ হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। দোমোহানীর বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না। হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভালো খেলা শুরু করল। দুটো গোল শোধ দিয়ে আরো একখানা দিয়েছে, এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারিতে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে!" রেফারি গুনে দেখলেন না এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের টিমে চার-পাঁচজন এক্সট্রা লোক খেলছে!"

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গুনে দেখুন!" রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক—এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাট লিসট্ টেন এক্সট্রা মেন ইন দিস টিম!"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায়—এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিম্বা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে, তারা কই? তাদের তো দেখছি না একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো—তারা কই?"

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিনমিন করে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ! এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?"

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে!"

"কে? কাদের কথা বলছো?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন আর বলতেন, "এসব ভালো কথা নয়।

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট্ বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ্ করে সব মিলিয়ে যায়! কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি—একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি! অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল! এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না, বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান আর বলেন, "এ ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা!" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায়-ঘাটে বা হাটেবাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত, তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে! তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান, তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটি সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছো?"

"আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি—চল তো!"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াব কেন? তোমার কিসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কিসের ভয় বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা!"

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে

মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি! এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভালো কথা নয়, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে? অ্যাঁ, কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, "এ তো ভালো কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো? অ্যাঁ, কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ঐ কথা বলে গেছে ভাবা যায়?

বড়পিসিমা

সমরেশ মজুমদার

আমার বড়পিসিমার সঙ্গে প্রেতাত্মাদের খুব যোগাযোগ ছিল।

আমরা তখন থাকতাম চা-বাগানের বাড়িতে। ওখানে গাছগাছালি বেশি, সেসময় ইলেকট্রিকের আলোও যায়নি বাড়িতে অথবা রাস্তায়। সন্ধে নামলেই পৃথিবীটা ঝুপসি কালো হয়ে যেত। আর হ্যারিকেনের আলো ছাড়া এক পা এগোবার উপায় ছিল না।

বাড়িটা ছিল বেশ বড়। শোওয়ার ঘরগুলোর পেছনে চওড়া উঠোন। উঠোনে একটা পেল্লাই বুড়ি কাঁঠালগাছ, লিচুগাছ আর তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকত। তালগাছে ফল হয়নি কোনোদিন। তার ওপাশে আমাদের পায়খানা, উল্টোদিকে রান্না এবং খাওয়ার ঘর। সন্ধের পর ওদিকে যেতে খুব ভয় করত। বড়পিসিমা স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতেন। বাড়িটার পেছনে ছিল সজনেগাছের জঙ্গল, গোয়ালঘর, তার পেছনে ছোট্ট নদী—যেটা চা-বাগানে গিয়ে হুইল ঘোরাচ্ছে। দিনের বেলায় যা একরকম, রাত্রে তার চেহারাই বদলে যেত।

বড়পিসিমার বিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে। পাত্রের বয়স তখন আঠারো। তিনি নাকি খুবই সুদর্শন ছিলেন। বিয়ের পর মাত্র ছয়মাসের জন্যে বড়পিসিমা শ্বশুরবাড়িতে

যান—চা-বাগান থেকে চাকদহে। ফিরে এলেন বিধবা হয়ে। তখন আমার বাবার বয়স মাত্র ছয়মাস এবং ঠাকুমা মারা গিয়েছেন কালাজ্বরে। সেই থেকে বড়পিসিমা এ বাড়িতেই। বাবা-জেঠাদের মানুষ করে আমাকেও সেই চেষ্টা করে গেছেন।

বড়পিসিমার মন ভালো থাকলে ভরদুপুরে একটা গল্প শুনতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'তুমি তাঁদের প্রথম কবে দেখলে?'

বড়পিসিমা বলতেন, 'তাঁদের আবার কি? তোর ঠাকুমাকে দেখলাম। বাবা চলে গিয়েছে অফিসে। তোর জেঠা স্কুলে। আমি তোর বাবাকে ঘুম পাড়াচ্ছি, সে কিছুতেই ঘুমাবে না। মায়ের দুধ না খেলে ঘুমাত না তো! বাইরে বেশ কড়া রোদ। হঠাৎ টিনের চালে মড়মড় করে শব্দ হল। ভাবলাম কোনো গাছ থেকে ডাল খসে পড়ল বোধহয়। তারপর সিলিং-এ শব্দ হল। বুঝলাম বেড়াল ঢুকেছে। হেই-হেই করে তাড়ালাম। আর তারপরেই গায়ে গরম হাওয়া লাগল। হাওয়া আসবে কোত্থেকে, জানলা তো বন্ধ! তখনি বোঁটকা গন্ধ নাকে ঢুকল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে মশারির চালটা নড়ে উঠল, স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'ওরে, ওকে ভরপেট দুধ খাওয়া!'

নাকি-নাকি-স্বর কিন্তু মায়ের গলা চিনতে ভুল হল না। বললাম, 'দুধ খাইয়েছি!"

'তবে কাঁদে কেন?'

'আমি কি করে বুঝব? আমার হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ছে!'

'আহা, তুই ফিরে এসেছিস বলে আমি নিশ্চিন্ত। ওকে দেখিস।' তারপর মা যে চলে গেল সেটা বুঝতে পারলাম গন্ধটা উধাও হয়ে গেল বলে।'

বড়পিসিমার গল্প শেষ হলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ভয় লাগেনি?'

'ভয় লাগবে কেন, বরং খুব রাগ হচ্ছিল। কোনো মা মেয়ে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে বলে নিশ্চিন্ত হয়? কি স্বার্থপর মানুষ!'

'দাদুকে বলনি?'

'বলেছি। কোনো উত্তর দেয়নি, গম্ভীর হয়ে বসেছিল। তারপরেই জনার্দন ঠাকুরকে ডেকে এনে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছিল ধুমধাম করে।'

'আর ঠাকুমাকে দ্যাখোনি?'

'দেখেছি। বাবা তো আবার বিয়ে করেছিল। ছোটমা আসার পর একদিন ভোরবেলায় উঠোনে গিয়েছি—দেখলাম কাঁঠালগাছটা খুব নড়ছে। নিচে যেতেই শুনলাম আমার নাম ধরে মা বলছে, 'আমি চললাম, এখন তো তোরা নতুন মা পেয়ে গেছিস। সতীনের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারব না বাপু। ভাইদের দেখিস। ব্যাস, আর দেখিনি।'

বড়পিসিমার কথা অবিশ্বাস করার কোনো যুক্তি পাইনি। ওই মানুষকে কখনো মিথ্যে বলতে শুনিনি। কোনো কথা তাঁকে বলে কাউকে জানাতে নিষেধ করলে দেখা যেত তিনি না বলে থাকতে পারেন না। বড়পিসিমা খুব সরল মানুষ ছিলেন।

আমাদের বাড়িতে যে মানুষটি কাজ করতেন তাকে আমরা কাকা বলে ডাকতাম। সেই কাকা একবার নালিশ করলেন, রাত্রে নদীতে বাসন মাজতে যাবেন না। নদীর গায়ে একটা সিমেন্টের স্লাব পাতা হয়েছে যার ওপর বসে কাকা বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন।

রোজ রাত্রে পাশে হ্যারিকেন নামিয়ে বাসনমাজা শুরু করলেই কেউ তাঁকে কুল ছুঁড়ে মারে। নদীর গায়ে কয়েকটা কুলগাছ ছিল। বড়পিসিমা সেই রাত্রে কাকার সঙ্গে নদীর ধারে গেলেন। কাকার মুখে শোনা গেল, 'বড়দি পাশে দাঁড়িয়েছিল বলে কেউ আর কুল ছুঁড়ছিল না। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়, শেষ পর্যন্ত ছুঁড়ল! সঙ্গে সঙ্গে বড়দি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে রে? কোন্ হতভাগা?'

প্রথমে সাড়া এল না। বড়দি কুলগাছের দিকে এগিয়ে গেল অন্ধকারে, 'কে ওখানে?'

'আমি মাখন।' নাকি-নাকি গলায় জবাব এল।

'ওখানে কি করছিস?'

'এমনি বসে আছি।'

'কুল ছুঁড়ছিস কেন?'

'মাছের কাঁটা দেখে। রোজ রোজ মাছ খাও তোমরা!'

'তাতে তোর কি? আর আমি তো বিধবা, আমি মাছ খাই?'

'তোমার কথা বলছি না। তবে জানো, আমাদের বাবুর মা দুপুরবেলা রান্নাঘরে লুকিয়ে মাছ খায়। সে-ও তো বিধবা। আমার মাছ খেতে খুব ভালো লাগে।'

'ঠিক আছে, কাল থেকে তোর জন্যে একটুকরো পাঠিয়ে দেব। আর কুল ছুঁড়বি না।'

'আচ্ছা। তুমি খুব ভালো।'

পরের দিন বড়পিসিমা গেলেন পাশের কোয়ার্টার্সে। ওদের চাকর মাখন কুলগাছ থেকে পড়ে মরে গিয়েছিল মাসতিনেক আগে। বড়পিসিমার কথায় তারা সেই কুল গাছের নিচে মাখনের শ্রাদ্ধ করল। তাতে প্রচুর মাছ ছিল। তারপর থেকে কাকাকে আর কুল ছুঁড়ে মারেনি মাখন।

আমার সেজপিসিমা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। জন্মাবার পর মায়ের শরীর খারাপ ছিল বলে ওঁর বুকের দুধ খেয়েছি কিছুদিন। ওঁর মেয়ে আমারই সমবয়সী। চা-বাগান থেকে মাইল দুয়েক দূরে গঞ্জে ওঁদের বাড়ি। পিসেমশাই ব্যবসা করতেন। হঠাৎ খবর এল সেজপিসিমা মারা গিয়েছেন। বড়পিসিমার হাত ধরে আমি গেলাম সেজপিসিমাকে দেখতে। সেই প্রথম আমার মৃতদেহ দর্শন। মনে আছে, দরজার দিকে পা ফিরিয়ে শোওয়া বলে আমি প্রথমে ওঁর সিঁদুরমাখা পা-জোড়া দেখেছিলাম। এলোচুলে শুয়ে আছেন না ঘুমিয়ে, বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু এখনো স্মৃতিতে ওই সিঁদুরলেপা জোড়া-পা জ্বলজ্বল করে।

অনেক কান্নাকাটির পর যখন সবাই ওঁকে শ্মশানে নিয়ে গেল, তখন বড়পিসিমা আবার আমার হাত ধরে ফিরে আসছিলেন। তখন চা-বাগানে মানুষ কম। দুপাশে দেওদার আর শালের মতো ঝাঁকড়া গাছের নিচে নির্জন রাস্তা। কেঁদে কেঁদে পিসিমার মুখচোখ ফুলে গেছে। হঠাৎ বড়পিসিমা দাঁড়িয়ে গেলেন, 'এ্যাই টুনি, তুই কেন সঙ্গে আসছিস? না না, এটা ভালো কথা নয়, বাচ্চা ছেলে ভয় পাবে! তোর তো এখন শ্মশানে থাকা উচিত। কি? না! নিজের দেহ ছাই হয়ে যাচ্ছে—তা নিজের চোখে দেখতে হয়। যাঃ।'

বড়পিসিমাকে আঁকড়ে ধরেছি ততক্ষণে। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না নিশ্চিন্ত হলেন। বাড়িতে ফেরার পর স্নান করলেন, আমাকেও করালেন। তারপর ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে চন্দন দিয়ে আমার কপালে মা শব্দটি লিখে বললেন, 'আজ তোমার এক মাতৃবিয়োগ হল!'

'মানে? আমার মা তো বেঁচে আছে?'

'সে তোমার গর্ভধারিণী মা! টুনি তোমাকে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিল, সে তোমার দ্বিতীয় মা। ভগবানকে বলো তিনি যেন তাকে কাছে ডেকে নেন।'

এর অনেক বছর পরে, আমি তখন চাকরি করি, জলপাইগুড়িতে গিয়েছি। একদিন বড়পিসিমা বললেন, 'তোর জ্যাঠা মারা গিয়েছে রে!'

'মারা গিয়েছে? কবে?'

'তা জানি না। কাল আমার কাছে এসেছিল। খুব বকলাম। তখন হেসে বলল, আর কি হবে বলো, শোধরাতে পারব না তো! বেঁচে থাকলে না-হয় চেষ্টা করতাম।'

জেঠার কার্যকলাপে বিরক্ত ঠাকুর্দা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। আমাদের ওপর নিষেধ ছিল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। জ্ঞান হবার পর তাঁকে আমি দেখিনি। পরের দিন মালবাজার থেকে খবর এল জেঠা মারা গিয়েছেন সপ্তাহখানেক হল।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বড়পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁকে দেখেছেন কিনা। তিনি মাথা নেড়েছেন, 'সবাই তো আর এখানে থাকে না। বাবা অন্য স্তরে উঠে গেছে।'

'আপনি নিজে যখন মারা যাবেন, তখন আমাকে দেখা দেবেন?'

'পাগল! আজন্ম তোদের বাড়িতে বন্দী হয়ে আছি, এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি!'

বড়পিসিমা এখন পর্যন্ত আমাকে দেখা দেননি।

স্বপ্নের মতো

নবনীতা দেবসেন

গাড়ি থেকে নেমেই মনটা ভালো হয়ে গেল। এত চমৎকার একটা বাসস্থান আমি কল্পনাও করিনি। যখন থেকে গাড়ি এই সবুজের ঢেউখেলানো পাহাড়ে চড়ছে তখন থেকেই মনে একটা খুসি ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাড়িতে এসে গাড়ি থামলো সেটার মতো অপূর্ব আর কোনো বাংলো এতটা পথে আমার চোখে পড়ে নি। দক্ষিণে থাকে থাকে নেমে গেছে নানা রকমের ফুল আর বাহারী পাতার গাছে সাজানো বাগান। পশ্চিমে বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে প্রবেশ-পথ এসে গাড়ি বারান্দায় শেষ। এইসব চা-বাগান অঞ্চলে যেমন হয়, কাঠের তৈরি খাস বিলিতি সায়েবী বাংলো।

দুটি তলায় বিশাল বিশাল দুটি চওড়া বারান্দা বাংলোর তিনদিক ঘিরে; আরো পিছন দিকে খানিক দূরত্বে গ্যারাজ ও তার মাথায় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। সামনের বাগান ধাপে ধাপে নেমে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়েছে। সেখানে খাড়াই পাহাড় নেমে গেছে, উপত্যকার দিকে।

'কী ডক্টর দেবসেন, বাংলো পছন্দ?'

'অপূর্ব!'

দূরে পুতুলের ঘরবাড়ির মতো অসমীয়া গ্রাম, খেলনার রেলগাড়ি চলে গেল ভূগোলের মডেলের মতো টোকো গাছের ফাঁক দিয়ে। আমি নড়তে পারছি না।

'চলুন, ওপরে চলুন, আপনার কামরাটা দেখে নেবেন।'

ওপর থেকে আরো আরো সুন্দর। ঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। একটা মস্ত গাছ ফুলে ফুলে গোলাপী।

'আপনার যা দরকার চেয়ে নেবেন। এই বেয়ারা, এই বাবুর্চি, আর গাড়ি ড্রাইভার সবই আপনার সার্ভিসে রইল। এই হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনের সুইচ্। এই কলিং বেল। আর ফোন—'

মি. আখতার হোসেন এদিক-ওদিক তাকালেন—'ফোন নেই এই ঘরে?'

'এখন নাই।' বেয়ারা অম্লানবদনে জানালো, 'কলিং বেলেরও লাইন নাই।'

'কেন?'

বেয়ারা এ-কথার জবাব দেওয়ার দরকার মনে করল না।

'ওপরে কোনো ফোনই নেই?'

'মাস্টার বেডরুমে আছে।'

'কলিং বেল আছে ওখানে?' বেয়ারা মাথা নাড়ে নঞর্থক। ওখানেও বেল নেই।

'তাহলে মেমসাহেব তোমাদের ডাকবেন কেমন করে?'

'জানালা হতে হাঁক দিবেন, বড়ুয়া! বাবুর্চি হোক, মালী হোক, আমি হই—যে কেউ ঠিক চলে আসব।'

কফি এসে গেল। বারান্দায় চেয়ার টেবিলে বসে আরামে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বাইরে তাকাই—আঃ, এমন বাংলোতে তিনদিন থাকতে পারব, ফ্রি!

'ওপাশে নাগা হিলস্, বুঝলেন? অরুণাচল প্রদেশ, আর এপাশে বার্মা বর্ডার। এই গাছটার নাম হলং। কী বড় গাছ, দেখেছেন? বেস্ট টিম্বার দেয়।'

'এত চমৎকার বাড়িটাকে ম্যানেজার-ট্যানেজারের বাংলো না করে গেস্ট-হাউস করলেন কেন? বেশির ভাগ সময়েই তো ব্যবহার হয় না?'

বেয়ারার দিকে তাকালেন মি. হোসেন—'কী বড়ুয়া? লোকজনটন আসে কেমন?'

বেয়ারাকে দেখলেই বোঝা যায় ব্রিটিশ আমলের লোক। হাবভাবই আলাদা। যেমন গম্ভীর, তেমন রাশভারি। ধপধপে সাদা উর্দি, মোজাবিহীন শু জুতো চকচক করছে। মাথায় পাগড়ি। বড়ুয়া বলে—'এইটা তো ভি আই পি বাংলো, এইখানে সারা বৎসরে আর কয়টা লোকই বা আসে! ওই সাতাশ নম্বর বাংলো বেশ ভরা থাকে। ঘরে ঘরে লোক। ঐটাই মেন গেস্ট-হাউস তো!'

'আর এত সুন্দর বাংলোটা—'

'ভি আই পি আর কয়জন আসেন বলুন? সেই যে পেট্রো-কেমিকেলের মিনিস্টার একবেলার জন্য এসেছিলেন, তারপর তো এই মেমসাহেব এলেন, এর মধ্যে কেউই আসেন নাই।'

'তোমরা তাহলে কর কি?' হোসেনের চোখ কপালে উঠেছে।

প্রশ্নটা বড়ুয়ার পছন্দ হল না। তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে বললে,— এই ঝাড়াপোছা করি, পেতল পালিশ করি। বাগ-বাগিচা সামলাই। আর কি!'

'সরকারি চাকরি, কাজ কর-না-কর যাবে না! মজায় আছ বেশ!'

হোসেন সাহেবের এ কথায় কোনো উত্তর দেয় না বড়ুয়া। 'আর কিছু লাগবে? ঘরে ফ্লাস্কে ঠাণ্ডাপানি দিয়েছি, মেশিন আছে। ডিনার কি এইখানে হবে?'

'আরে না না, এখানে একা একা খাবেন কি? ওঁর ডিনার আছে ক্লাবে—

হোসেন তরুণ অফিসার। উৎসাহে টগবগ করছেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে তাঁর ভূমিকাই বোধহয় প্রধান। আমাকে খুব যত্নআত্তি করছেন এঁরা—সত্যি সত্যি যাকে বলে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট, তাই পাচ্ছি। হোসেন বললেন, 'এখন যদি একটু বেড়িয়ে আসতে চান, গাড়ি আছে, যেতে পারেন যেদিকে খুশি। আমরা তো আপনাকে নিতে আসব ছ'টার সময়।'

'এখানটাই এত সুন্দর যে আর কোথাও যেতে ইচ্ছেই করছে না। সত্যি, ঠিক যেন স্বপ্নের মতো।' বড়ুয়ার মুখে একটুখানি হাসি ফুটলো। এ-কথাটি তার মনের মতো হয়েছে বোধহয়। কফি হাতে বসে বসে কোম্পানির গল্প করতে লাগলেন মি. হোসেন। তিনি খুব পুরনো নন এখানে, বড়ুয়া বহুদিনের। তাঁর বাংলো খানিক দূরে। আরেকটা সবুজ টিলার মাথায়।

'কিছু চাইলে হাঁক দেবেন'—বলে বড়ুয়া নেমে যায়।

হোসেন বললেন : 'এটা অদ্ভুত যে কোনো কলিং বেল নেই!' বলতে বলতেই দেয়ালে চোখ যায়। পাখা আলোর সুইচবোর্ডে কলিং বেল!

'আরে, এই তো!' হোসেন উঠে গিয়ে বেল টিপলেন। কোনোই শব্দ শুনতে পেলুম না, আমি অন্তত। 'ডিসকনেকটেড, মনে হয়।' নিজেই মন্তব্য করেন তিনি।

বাইরে চমৎকার বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ। পাহাড়ি সবুজের ওপর তার ছায়া যে কী মোহময়, পশ্চিমবঙ্গে বসে কোনোদিন তা জানা যাবে না। চোখের মুগ্ধতা আর কাটেই না।

'সেরা বাংলোটাই রেখেছে আর কি ভি আই পিদের জন্য। আগে তো সরকারি কোম্পানি ছিল না? প্রাইভেট কোম্পানিতে বাইরে থেকে যারা আসে-টাসে তাদের যত্ন করাটা খুব জরুরি তো? বিজনেস ট্যাকটিকস্!' হোসেনের কথায় আমার মনে হল, আমার ঠিক এটা প্রাপ্য নয়। তা হোক। মাঝখান থেকে আমার মতন অব্যবসায়ীও এমন মজায় থেকে গেলুম। ভালোই হয়েছে, সেরা বাড়িটিকে অতিথিশালা করেছে এরা। পুজোর লেখার মূল্যবান সময়টা খরচা করেও এসেছি যে, সেটা সার্থক। নিজের খরচে জীবনেও এ-রকম একটা বাংলো ভাড়া করে থাকতে পারতুম না আমি! বেঁচে থাকুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হোসেন চলে যাবার পরেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের পরে পাহাড়ের আবছা হয়ে যাওয়া ঢেউয়ের পরে ঢেউ, চোখ যেন টেনে ধরে রেখেছে। বাগানের দিকে তাকাই। একটি জাপানী স্টাইলের ছোট্ট বাগান চোখে পড়ল এবার, খানিক নিচে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একটা ছোট্ট ল্যাম্পপোস্ট, ছোট্ট একটা আঁকাবাঁকা

নীল টালি বাঁধানো নকল নদী, তার ওপরে খুদে খুদে লাল টুকটুকে সেতু। ওমা গো, কী সুন্দর! আমি কিছুই চিনি শুনি না। হঠাৎ মনে হল টেলিফোন বাজছে। যে-ঘরে ফোনের শব্দ হচ্ছে সেই ঘরের দিকে ধেয়ে যাই। ঘরে ঢুকতেই ফোন থেমে গেল। এ-ঘরটায় আমার ঘরের চেয়েও বড় বিশাল এক বিছানা পাতা। এক কোণে আবার এর নিজস্ব ব্রেকফাস্ট-রুম রয়েছে কাচের জানলা ঘেরা। এগিয়ে যাই। এক্সপ্লোর করতে হবে তো? এত সুন্দর বাংলোতে আর কেউ নেই, একলা আমি! আই অ্যাম দ্য মনার্ক অব অল আই সার্ভে! আঃ! বাথরুম ভেবে যে দোরটা ঠেলি, সেটা ড্রেসিং রুম। তার ওপাশে বাথরুম। ড্রেসিং রুমে ঢুকতেই সুন্দর একটা হাল্কা সুগন্ধ নাকে এল।

আরেকটা দোর ঠেলতেই অন্য একটা বেডরুমে ঢুকে পড়ি। এটাই মাঝখানের ঘর। ভারি সুন্দর। এখানেও দ্বৈতশয্যা। এখানে কোনো সিংগল বেডওয়ালা ঘরই নেই দেখছি। এর সঙ্গে কেবল বাথরুম। পাশের যে দরজাটা আধখোলা, তার ফাঁক দিয়ে আমার ঘরটাই দেখা যাচ্ছে, সব দরজায় ভারি ভারি পর্দা, কিন্তু লক করার ব্যবস্থা নেই। তিনটে ঘরের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করা যায়। আমার খুব আহ্লাদ হল। যখন যে ঘরে খুশি ঘুরে-ফিরে থাকা যাবে। সব ঘরেই দিব্যি আলো জ্বলে, পাখা চলে, এয়ার কন্ডিশনিং আছে। খানিক সুইচ টেপাটেপি করে আবার বারান্দায় যাই। সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার আর বাংলোর মাঝে একফালি উপল-বিছানো জমি। খুব বেশি দূর নয়, ডাকলেই ওরা শুনতে পাবে। যেমন অতল নিঃশব্দ এই বাংলো, বাগানে শুকনো পাতা উড়লে বারান্দায় তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সর্বক্ষণ একটা ঝিম-ধরানো ঝিঁঝির ডাকে ঘেরা এই বাংলো। ঘরে এসে খাটে চিৎপটাং হতেই আবার ফোন। এবার আমি উঠি না। তিনখানা কামরা ইন্সপেকশনের ফলে এখন ভি আই পি পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছেন। দরজা নক করে বড়ুয়া বললে : 'মেমসাহেব টেলিফোন এসেছে নিচে।'

বড়ুয়া ফোনটা নিচেই ধরেছে। আমি ওর সঙ্গে নিচে যাই। খাবার ঘরে ফোন। হোসেন বলছেন ছ'টার একটু আগেই তৈরি থাকতে।

বারান্দার প্রেমে পড়ে গিয়ে ঘরটাকে ভালো করে দেখা হয়নি। এবার খুঁটিয়ে দেখি। দেয়ালে বিলিতি গ্রামের শান্ত রঙিন দুটি দৃশ্য ফ্রেমে বাঁধাই অয়েলপেন্টিং। কোণে নাম সই করা আছে—টেড। বাঁ-ধারে বিশাল একটা শাদা আলমারি, তাতে তালা ঝুলছে। অন্য ধারে ছোট একটি আধুনিক স্টাইলের পালিশ-করা ওয়াড্রোব এ ঘরের সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না। ওটাই আমার ব্যবহার্য। এদিকে ড্রেসিং টেবিল। বিশাল প্রমাণসাইজের বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নাটা ওপর-নিচে বেশ দোলানো যায়। বাঃ! বাথরুমে ঢুকি। গা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে হবে। ঝকঝকে বাথটব। তাতে জল ভরতে শুরু করে দিই। ইঃ, কি জোরেই জলের শব্দ হচ্ছে! দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আওয়াজ একটু কমাই। তালাবন্ধ আলমারিতে কী আছে? তালা কেন? সেই 'কঙ্কাল' সিনেমার মতো হঠাৎ খুলে যাবে না তো মাঝরাত্তিরে—আর, এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা মলয়ার মৃতদেহ দেখা যাবে! ওরে বাবা রে!

অন্য ঘরগুলোতে ঢুকে পরীক্ষা করে আসব নাকি? সব ঘরেই কি তালাবন্ধ আলমারি থাকে? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। হ্যাঁ, আট-কোনা ঘরেও রয়েছে। আর উত্তর দক্ষিণ পূর্বদিকে খোলা মাস্টার বেডরুমে? নেই। কোনো আলমারিই নেই। ড্রেসিং রুমে? হ্যাঁ, এখানে আছে। এই তো তালা নেই। টানতেই খুলে গেল। ভেতরে সেই সুন্দর গন্ধ।

কিছু কাচা তোয়ালে ভাঁজ করা আছে। ভূতটূত নেই। যাক, নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে ঢুকে পড়ি।

দারুণ ক্লাব। দারুণ ডিনার। সবই দারুণ। নামেই সরকারি—এখনো বেশ দাপট আছে, প্রাইভেট কোম্পানির দিনগুলো সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। ফিরে এলুম, রাত তখন খুব বেশি হয়নি। এসব পার্টি থেকে বারোটার মধ্যেই ফিরতে পারাটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে যে কাজ শুরু হয় ভোর ছ'টায়, শেষ হয়ে যায় দুপুর তিনটেয়। রাত্রে বেশিক্ষণ তাই পার্টি চলে না। গাড়ি থেকে নেমে দেখি বড়ুয়া বসে ঝিমুচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললো : 'বিছানা তৈরি। স্নান করবেন? জল তৈরি। কিছু লাগবে?'

'এক পট কফি দিয়ে যেও ঘরে।' এবারে তো কালকের বক্তৃতাটা তৈরি করতে হবে, যে জন্যে এতদূর আসা!

আমি রাতপাখি—আমার কাজকর্ম সব রাত্রে। দিনের বেলায় মাথায় কিছু ঢোকে না। রাত্রিজাগরণে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই।

'কফি? এক প—ট? ঠাণ্ডা বিয়ারও আছে কিন্তু মেশিনে, মেমসাব!'

নাঃ, সত্যি সত্যি মেমসাবকে ভি আই পি ট্রীটমেন্টই দিচ্ছে বটে বড়ুয়া! এর আগে হয়তো সারা রাত কফি-খেকো কোন ভি আই পি ওঠেন নি এখানে এসে।

'না, না, বিয়ার আমি খাই না বড়ুয়া, কফিই দাও। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ঘুমটা হত। কফিতে কি ঘুম হবে?'

'আমি তো ঘুমুতে চাই না। আমার কাজকর্ম আছে কিনা? কফিটা খেলে সুবিধে হবে রাত জাগতে।'

'যা বলেন।' বড়ুয়া চলে গেল। আমি আবার বারান্দায় যাই। বাতাসে বনের গন্ধ, বনের শব্দ। কত রকম আশ্চর্য শব্দই যে শোনা যাচ্ছে—আমার খুব ভালো লাগতে থাকে। দূর্—কে এখন রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা নিয়ে ভাবতে চায়? আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। বাইরে ঘন অন্ধকার। এ বারান্দার প্রত্যেকটা আলো জ্বলছে। নিচেরও। এত আলোয় কি রাত্রির রূপ দেখা সম্ভব? সুইচ বোর্ডের দিকে হাত বাড়াই। একটা একটা করে আলো নেবাতে থাকি।

'মেমসাব, ও কি করছেন? লাইটগুলো সব জ্বালা থাকবে।'

'কেন? সারারাত্তিরই জ্বলবে?'

বড়ুয়া নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলে। 'তাই এখানকার নিয়ম। সিকিউরিটির নিয়ম।'

অ।—সত্যিই তো। জঙ্গলের মাঝখানে বাংলো। চারপাশে কিছুই নেই। ঐ রাস্তাটি দিয়েই শুধু সভ্য জগতের সঙ্গে যোগ। বাঘ-ভাল্লুকের কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাগানটা ঘোর অন্ধকার।

বড়ুয়া কফির ট্রে নিয়ে আসে। বলে, 'আমরা এবার শুতে যাচ্ছি, মেমসাব। কিছু কি লাগবে?'

'কিছু না।'

'দরকার হলে ডাকবেন জানলা খুলে। কোয়ার্টার পাশেই।'

'ডাকব। গুড নাইট বড়ুয়া।'

'ও, ক'টায় চা দেব?'

'ছটায় দিয়ো।'

'ব্রেকফাস্ট?'

'সাতটায়।'

'গুড নাইট, মেমসাব।'

বড়ুয়া চলে গেল, নিচে দরজায় চাবি দেবার শব্দ হল। তারপর চারিদিকের স্তব্ধতা যেন চিৎকার করে উঠল। এত বড় বাড়িটায় আর কোনো দ্বিতীয় প্রাণী নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত না।

ঘরে লেখার টেবিল, চেয়ার নেই। বিছানায় গুছিয়ে বসি কাগজপত্তর নিয়ে। এয়ার কন্ডিশনারের গুঞ্জন ছাড়া কোনো শব্দ নেই ভিতরে। বাইরের বনের আওয়াজ এ-ঘরে আসে না। লেখায় মন দিই। লেখা এগুতে থাকে কফির গুঁতোয়। হঠাৎ একবার মনে হল—যাই, বাইরে গিয়ে অরণ্য পর্বতের নৈশ শোভা পরিদর্শন করে আসি গে। আদেখলের ন্যায় কর্ম হচ্ছে জেনেও গুটি গুটি যাই। এমন সুযোগ ক'বার আসে জীবনে?

বারান্দায় যেতে যেতে বাগানের দিকে একঝলক তাকিয়েই মনে হল জাপানি বাগানের ছোট্ট ল্যাম্পপোস্টগুলোয় সব আলো জ্বলছে—ভারি সুন্দর তো! ভালো করে দেখব বলে রেলিঙে ভর দিয়ে যেই তাকিয়েছি, দেখি সব নিভে গেছে! কই জ্বলছে না তো? অথচ স্পষ্ট দেখলুম খুদে আলো জ্বলছে; (S) গড়নের নদীর ধারে ধারে—নাকি চোখের ভুল। রাত খুব কি বেশি হয়েছে? সেই ভোর চারটেয় গাড়ি আসবে, দমদমে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে সাড়ে পাঁচটায়, সেই তাড়ায় রাত্রে শুতেও যাই নি কাল—যদিও রাত্রিজাগরণে আমার কষ্ট নেই, তবু একেবারেই না শুলে মানুষের একটু ক্লান্তি তো...আরে, আরে, ঐ—ঐ তো আবার জ্বলে উঠেছে আলোগুলো! ওদিকের নদীতে নীল জলের আভা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে— মুহূর্তের অন্যমনস্কতা ঘুচে যেতেই দেখি ফের আকাশ, বাগান অন্ধকার। নীল জল মুছে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে।

জলের ওপরে কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল আলোটা এক্ষুনি! ইচ্ছে করতে লাগলো বাগানে বেরুতে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। ভিজতে সাহস হল না। ব্যাপারটা সশরীরে পরীক্ষার প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজেকে সামলে রাখলুম : ছাতা যখন নেই তখন এখান থেকেই দ্যাখা। তাছাড়া জীবজন্তুও আসতে পারে বাগানে রাত্তির বেলায়। দূরের উপত্যকাতে মাঝে মাঝে মিটিমিটি আলোর সারি জ্বলছে, বাস-রাস্তা আছে ওখানে। সেটাই দেখেছি হয়তো। চোখের ভুল।—কবির-কল্পনা। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে এত বড় একটা আলো! বেশ জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে এখানে, তাই কোনো অফিসার এ বাংলো নেয় নি। রোজ রোজ কে আর জঙ্গলে থাকতে চায়?

এমন সময়ে হঠাৎ কোথায় একটা মেশিন চলতে শুরু হল ঘর্ঘর শব্দে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাই। এয়ার কন্ডিশনারটা বিগড়োলো নাকি? নাঃ, ঘরের শব্দ তো যেমনকে তেমনই। কান পেতে বুঝতে পারি শব্দটা অন্যত্র—আরেকটি এয়ার কন্ডিশনারের চালু হবার। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে যাই। কী রে বাবা, কোথাও লুজ কানেকশন ছিল নিশ্চয়! না তো, এটা তো বন্ধ। তবে কি মাস্টার বেডরুমে? পর্দা সরিয়ে দরজা খুলে দেখি আলো জ্বলছে। অর্থাৎ বিকেলে আমি আলো নেবাতে ভুলে গেছি। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার চলছে না। আলোটা নেবাতে ঘরে ঢুকতেই মনে হল একবার ফোনটা বেজে উঠল। এগিয়ে

গিয়ে ফোনটা ধরি। মাউথপিসের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঝিমধরানো সুগন্ধ। কলকাতাতেও এমনি একটা সার্ভিস আছে, হপ্তায় হপ্তায় এসে ফোনে আতর মাখিয়ে যায়।

'হ্যালো?' ওদিকে শব্দ নেই। 'হ্যালো?' 'হ্যালো?' কই, কেউ তো কিছু বলছে না? ফোনটা বাজলো বলেই মনে হল। নাকি বাজে নি? কোনো জবাব নেই। বার কয়েক হ্যালো হ্যালো করে নামিয়ে রাখি। নিশ্চয়ই কোনো মাতালের কাণ্ড। আলো নিবিয়ে দিয়ে ফিরে আসি। আমার ঘরের আলোটা পরদার ফাঁক দিয়ে আটকোনা ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে, পথ দেখতে অসুবিধা নেই। আলোটাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, মেঝের ওপরে যেন একটা আলোর তৈরি ক্রুশচিহ্ন। ফিরে যেতে যেতে মনে হল টেলিফোনের সুগন্ধটা সারা ঘরেই ছড়িয়ে পড়ছে। ফোনটা কি বেজেছিলো? না বাজেই নি?

যেই লিখতে বসা, অমনি মনে হল ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে জঙ্গলের বিচিত্র গুঞ্জন আর রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আবার টেলিফোন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি দৌড়োই ও-ঘরে। পর্দা তুলে, আলো জ্বেলে দেখি—কই, ঘর তো নিঃশব্দ! এ-ঘরে ফোন বাজছিলো বলে তো মনেই হচ্ছে না। কিন্তু ঘরটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মনে হল, এয়ার কন্ডিশনারটা কি চলছে? আগেও একবার দেখে গেছি অবশ্য। পাহাড়ি বৃষ্টিতে এমনি বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়ে গেছে আর কি। তবুও 'সাবধানের মার নেই' পন্থায় এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্রটার দিকে ভালো করে আরেকবার নজর করে দেখি। নাঃ, অফ করাই তো আছে। অথচ ঘর্ঘর শব্দও হচ্ছে কোথাও একটা। সম্ভবত এখানে অন্য কোনো রকম যন্ত্র আছে, যেটা রাত্রে অটোমেটিক্যালি চালু হয়। বাগানের পাম্প, কি বিজলির, ডাইনামো এজাতীয় কিছু হতে পারে। ছাদের ওপরে ইঁদুরের ছুটোছুটি ক্রমশই বাড়ছে। খুটখাট্ খুটুর খুটুর থেকে ঠাশ্-ঠকাশের দিকে। কাঠের বাড়ির এই দোষ। ছাদভর্তি ইঁদুরের রাজত্ব। টেলিফোনটা সত্যি জ্বালালে! লিখতে দেবে না। বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে জল দেবো ভাবি, কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। বাথরুমের দরজা খুলতেই সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসে। ভগবান জানেন, কোন্ এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করে এরা। ঘরে ঘরে স্প্রে করে গেছে কখন এসে! ভালো করে প্রত্যেকটা ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে এসেছি এবারে, যাতে ফোনটা বাজলেও শুনতে না পাই। বেশ পুরু পুরু বার্মাটিকের দরজা। এবারে লেখাটার একটা হিল্লে করতেই হবে। এমন সুযোগ আর কবে পাব? উচিত ছিলো সব পুজোর লেখা-টেখা এইখানে বসেই লিখব। এত নির্জনতা তো কলকাতায় তপস্যা করেও পাওয়া যাবে না! কিন্তু যেই খানিকটা এগিয়েছি অমনি মাথার মধ্যে ঝন্‌ঝন্‌ করে টেলিফোনের বাদ্যি শুরু হয়ে যায়। এবারে আমি মন ঠিক করেই যাই, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আসব। গেলে তো একবারও দেখছি না ফোন বাজছে। অথচ লিখতে বসলেই কানের মধ্যে ক্রিং ক্রিং। এইরকম টিলার ওপর নির্জন বাংলো বাড়িতে মধ্য রাত্রে ফোনটা বেজে ওঠাই তো উচিত—ছেলেবেলা থেকে যত ভূতের গল্প পড়েছি তাতে তাই-ই হয়—অথবা দোতলার জানলার কাচে মৃদু ঠকঠক—ওরে বাবা! কাঠে ঠকঠকটা এখনো অন্তত হয় নি—শুরু হয়ে যাবে না তো এবারে? কখন কাজ রেখে উঠে পড়ি—বন্ধ দোর ঠেলতে ঠেলতে আলো জ্বালতে জ্বালতে বড় ঘরে যাই—ঢুকতে গিয়েই মনে হয়, ওদিকে থেকে কেউ এগিয়ে আসছে। কোনো রকমে আলোটা জ্বেলে ফেলি, অস্থির কাঁপা হাতে। উল্টোদিকের মস্ত দেয়াল-আয়নায় দেখতে পাই, আমিই আমাকে সন্ত্রস্ত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ঘর নিঃশব্দ। এই সুগন্ধেই মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে কি? টেবিলে

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে আসি। শব্দ জব্দ। ফোন আর বাজবে না। সশব্দে নিঃশব্দে, কোনো প্রকারেই না। ঘরে ফিরতে ফিরতে টের পাই, এই এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধটায় কেমন যেন গা গুলোতে শুরু করেছে আমার। বাঙালি ঘ্রাণে এত সব সায়েবি কায়দা কি হজম হবার? গন্ধ বন্ধ করি কি উপায়ে?

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সত্তাটিকে না চিনলে তাঁর চিরকাতর বাঙালি হৃদয়কেও আমরা চিনতে ভুল করব। তাঁর বুকের মধ্যে—ওঃ—ওই যে এবারে বুঝি নীচেয় ফোন বাজতে শুরু করেছে! দরজা খুলে রেগেমেগে নামতে থাকি। দু'পা নেমেই দেখতে পাই, খাবার ঘরের দরজায় দুটি তালা ঝুলছে। আবার উঠে আসি। ও ফোন সারারাতই বাজবে। বাজুক। বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। জাপানি উদ্যানের মৃদু আলোগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে নিবছে। দেওয়ালীর টুনি-বাল্‌বের মতো ব্যবস্থা আর কি! আলোগুলো জ্বলে-নিবে জ্বলে-নিবে কাউকে যেন কিছু সংকেত দিচ্ছে। আমার পা-দুটোকে সজোরে বাগানের দিকে টানছে ওরা। এই পাহাড়ি বৃষ্টিতে তা বলে কিছুতেই বেরুচ্ছি না আমি, যতই ডাকো না তুমি আমাকে। ভিজে শেষে হাঁপানি হয়ে যাক আর কি! শক্ত পায়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। আলোটালো সব নিবিয়ে দিই। লিখতে মন নেই।

ইঁদুররা ছাদের ওপরে যত লাফায় এবারে, আমার তত আনন্দ হয়। ঐ তো বাবা, জ্যান্ত প্রাণী সব কত রয়েছে। আমি মোটেই এখানে একা নই। কেন জানি না, একা একা এত বড় বাড়ি বাগান উপভোগ করার উৎকট এবং গরিবি আহ্লাদটা হঠাৎ উবে গিয়ে কেমন একটা গা-ছমছম ভয়-ভয় ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। বাথরুমের সুগন্ধটা বড্ড যেন বেড়েছে। এ ঘরটাকেও ছেয়ে ফেলেছে। অদৃশ্য এয়ারকন্ডিশনারটি নির্ঘাৎ নীচেই চলছে কোনো তালাবন্ধ ঘরে। ফোনটা কি বাজছে? নীচে না পাশের ঘরেই? ফোনটা কোথায় বাজছে, বেজেই যাচ্ছে—নাছোড় ঘণ্টার শব্দ আমার তন্দ্রালস অর্ধচেতনার মধ্যে সাবানের ফেনার মতন বেড়ে বেড়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—মাঝে মাঝে তারই মধ্যে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করছি, জানলার সার্সিতে খট্‌-খট্‌! তালাবন্ধ বড় আলমারিটা হঠাৎ খুলে যাবে না তো ঠাশ করে? আর এক কোণে সেই 'কঙ্কাল' সিনেমার মতন— ? আজ কফিটা না খেলেই হত, কালকের নিদ্রাহীন স্নায়ুর ওপরে। এতদূর প্লেনে এসেছি, ট্রেনে এলে তো তিনদিন লাগত—তারও স্ট্রেন আছে—ওই, ওই তো খট্‌-খট্‌—না, ওটা ছাদে, ওটা সিলিঙের ফাঁকে ইঁদুরের নৈশভোজ—কিন্তু মাথার মধ্যে ফোনের শব্দটা যে থামছে না—বাড়তে বাড়তে দমকলের ঘন্টির মতো ভয়ংকর, আরো বাড়তে বাড়তে মার্কিন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের মতো প্রচণ্ড মরীয়া শোনাতে থাকে—আমি দাঁতে দাঁত চেপে কম্বলের নীচে ঢুকে পড়ি, কান-মাথা-মুখ কম্বল-মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আপ্রাণ দমবন্ধ চেষ্টায় ইষ্টনাম জপ করতে থাকি। এটাই আমার প্রাত্যহিক নিদ্রাকর্ষণের প্রকৃষ্টতম পন্থা—(জীবনে শেষ পর্যন্ত দুশো আটবারও ইষ্টনাম গুনতে পেরেছি কিনা সন্দেহ!) মাথার মধ্যে এই শব্দ আমি আর শুনতে পারছি না, হে ভগবান, আমার শ্রবণে তুমি শান্তি দাও!

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল পাখিদের ডাকাডাকিতে। জঙ্গলে যে কতরকমের পাখিই থাকে, আর কতই মনমোহিনী তাদের কলকাকলি! তারই সঙ্গে এখনো ঝিঁঝি ডাকছে বনের ভেতরে—এই তো দিন হয়ে-এল-বলে! মাথাটা ভার ভার লাগছে। বারান্দায় বেরিয়েই

মাথা হাল্কা হয়ে গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে। কী সুন্দর সেজেগুজেই না সূর্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শৈলশ্রেণী।

বারান্দা থেকে একদিকের বাকি দুটো ঘরেই বাইরের দরজায় বড় বড় তালা মারা—একমাত্র হৃদয়-হৃদয়েই যাওয়া-আসা করা যায়—যেটা আমি প্রায় গুরুকৃত্যের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে সারারাত ধরে করেছি! কী মনে হল আবার, আমার ঘর দিয়ে মাঝের আটকোণা ঘর পার হয়ে বড় ঘরে যাই—ওই তো রিসিভারটা পাশে নামানো রয়েছে। ঘরে ঢোকার সময়ে দেওয়াল-আয়নায় আবার নিজেকে দেখতে পাই। খাটটা সত্যি মস্ত বড়—মাথার কাছে একটা টানা তাক। কী যেন নেই মনে হতে থাকে—ঠিক বুঝতে পারি না। খাটের মাথার কাছে ওই তাকে কী থাকার কথা ছিলো—এখনি হঠাৎ খেয়াল হয়, বাইবেল! হ্যাঁ, খাটের মাথার ধারে একটা বাইবেল থাকত নিশ্চয়—ওটা কি কালও ছিলো? গন্ধটা এবারে হঠাৎ চিনতে পারি। না আতরের নয়, বিলিতি ইনসেন্সের গন্ধ। গির্জেতে সে ধূপ জ্বলে সেই ধূপের। ঘরটায় গির্জের গন্ধ। কফিনের বাক্সে যে ধূপ জ্বলে, সেরকম। মনে কেমন একটা ভার নিয়ে পিছু হেঁটে বেরিয়ে আসি। ফোনের রিসিভারটাকে ক্রেডলে তুলে রাখা আর হয় না।

বড়ুয়া চা নিয়ে আসে ট্রে সাজিয়ে।—'গুড মর্নিং মেমসাব। আপনার চা।'

'গুড মর্নিং বড়ুয়া। কাল রাত্রে বার বার একটা ফোন আসছিল!'

বড়ুয়া চুপ করে থাকে। ওর এই অভ্যেসটা আমার খুব খারাপ লাগছে।

'তোমাদের কোয়ার্টার থেকে শোনা যায় না রিং? রাত্তিরে?'

'না, মেমসাব।'

'ফোনটা খুলে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই?'

'উপরেরটা খোলা যায়, নীচেরটা যায় না।'

'আজ রাত্রে বরং রিসিভারটা নামিয়ে রেখে যেয়ো, নীচে-ওপরে দু'জায়গাতেই।'

'ঠিক আছে। ব্রেকফাস্ট সাতটায় দেব তো?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা বড়ুয়া, ওই জাপানি বাগিচার আলোয় কি টুনি-বালব লাগানো নাকি? আপনা-আপনিই জ্বলে-নেবে?'

'বলতে পারি না মেমসাব, ওসব ব্যাপার মালী জানে।'

'আচ্ছা কাল রাত্তিরবেলায় নীচের তলায় কিসের একটা মেশিন চালু হল বলো তো?'

বড়ুয়া চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে বলে—'কই, কোনো মেশিন তো চালানো হয়নি রাত্রে?'

'হয়নি? কিসের আওয়াজ হচ্ছিল তবে? কোনো এয়ারকন্ডিশনারে লুজ কনেকশন হয়ে নেই তো?'

'না, মেমসাব।'

'কিম্বা আর কিছু? পাম্প সেট-টেট? ডায়নামো?'

'না, মেমসাব।' বড়ুয়া মাথা নেড়েই চলে।

কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনলুম, সারারাত—খুব স্পষ্ট শুনলুম—

'যাই হোক, জাপানি বাগিচার বাতিগুলো রাত্রে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল!'

'জ্বলছিল নাকি বাতিগুলো? ঠিক দেখেছেন?' এবার বড়ুয়ার নির্বিকার মুখে স্পষ্টই চমক লাগে।

'কেন, তুমি জ্বেলে দাওনি?'

'না, মেমসাব। ওসব মালী জানে।'

পাগড়ি বাঁধা মালী বাগানে উবু হয়ে বসে খুরপি হাতে কাজ করছে। চায়ের কাপ হাতে বাগানে নেমে যাই।

'জাপানি বাগিচাটা ভারি সুন্দর করেছো!'

'হম্ নহী বনায়া মেমসাব, ও অংগ্রেজসাহাব আপনা হাথসে বনওয়ায়া থা। উধরমে মৎ যানা মেমসাব—মিট্টি গিলা হ্যায় বারিশ্‌সে—'

'জাপানি বাগিচার বাতি কি তুমি জ্বালিয়ে গিয়েছিলে কাল?'

বুড়ো মালী ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে ফোকলা মুখে মিষ্টি করে হাসে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলে—'বাত্তি হ্যায় নেহী মেমসাব, উয়ো ছোটা ছোটা বাল্‌ব ইধর মিলতা হী নহী, জ্বলাউঙ্গা কৈসে?'

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বরফের বাতাস নেমে গেল। ইচ্ছে করল চিৎকার করে উঠি, কিন্তু সারা রাত্তিরই তো বাতি জ্বলেছে ওখানে! জ্বলেছে, নিবেছে, জ্বলেছে! কিন্তু মুখে কিছুই বলি না।

আমি বুঝতে পারছি, এখন যদি বড়ুয়াকে জিগ্যেস করি, 'বড়ুয়া, তুমি ঘরে ঘরে কোন্ এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করেছিলে বলো তো, গন্ধটা বড্ড কড়া ছিল।'—বড়ুয়া নিশ্চয় বলবে—'স্যরি মেমসাব, কিন্তু আমি তো কোনো স্প্রে লাগাইনি?' যথাসাধ্য ঘ্রাণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে আরেকবার গন্ধটা খুঁজতে চেষ্টা করি বাতাসে। পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানি বাগানটি আজ সকালের আলোয় কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। রাত্রে যে এ-ই মোহিনী মায়ায় পরীর দেশ হয়ে আমাকে ডাকছিলো, তা কে বলবে!

'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?' ব্রেকফাস্টে হোসেনের সঙ্গে চলে এলেন স্বয়ং ম্যানেজার মিস্টার চ্যাটার্জি এবং ফিনান্স অফিসার শ্রীনিবাসন্।

'আরে আসুন, আসুন। না না, খুবই কমফর্টেবল—'

'রাত্রে ঘুমটুম হয়েছিলো তো?'

'খুব ভালো, খুব ভালো,—থ্যাংকিউ'—

'বাংলোটা পছন্দ হয়েছে তো আপনার? মি. হোসেন অবিশ্যি বলেছিলেন, আপনি এখানে স্যাটিসফায়েড—আমি তবুও এসেছিলাম অন্য একটু সাজেসান নিয়ে—আমার স্ত্রীর খুব শখ আপনাকে একটু আমাদের বাংলো—এই বাংলোর ধারে-কাছে লাগে না, তবু সেটাও একটা অন্যরকম—টিলার ওপরে একটা ঝরনা আছে, একটা ছোট লেক মতনও আছে সামনে—চলুন না, যাবেন নাকি? আমার স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ'—

'অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু কেন মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াবেন, বেশ তো আছি?—আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, এটাকে ম্যানেজারের বাংলো না করে গেস্ট হাউস করা হল কেন? এত সুন্দর বাগানটা!'

'মানে—' একটু গলাখাঁকারি দিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসনই উত্তর দেন, 'এটাই আগে

ম্যানেজারের বাংলো ছিল, একটা রাদার আনফরচুনেট ব্যাপারের পর থেকে আর ম্যানেজারেরা কেউ এখানে থাকেন না।'

'তার মানে?'

'টেড ম্যাথায়াস নামে এক অল্পবয়সী ইংরেজ ম্যানেজার এ-বাড়িতে মারা গিয়েছিল। তারই তৈরি এই টেরাস্‌ড গারডেন, তার নিজের হাতে করে গড়া ওই মডেল জাপানি বাগিচা, তার বাগদত্তা বউয়ের জন্যে উপহার। ছুটি নিয়েছিল, বিয়ে করতে দেশে যাবে বলে। এক রাত্তিরে ট্রাংক কলে হঠাৎ খবর এল—বউ অন্যের সঙ্গে ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে। ম্যাথায়াস সাহেব খবরটা পেয়ে নিজের রগে গুলি চালায়। সেই থেকে অপয়া বাড়ি বলে কেউ এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করতে চায় না আর কি! আর যত আজেবাজে গল্প-গুজবও লোকে রটিয়েছে এই ফাঁকে, সেসব অবিশ্যি কিছু না।'

চ্যাটার্জি বলেন—'কিছু নয় ঠিকই, তবু শুনে-টুনে ভয়ও তো পায়, দেখি লোকে। বয়-বাবুর্চিরাও ঐ অজুহাতে এখানে রাত্রিবাসটা করতে চায় না। সেবার এক ভদ্রলোক তো ভয়ঙ্কর ভয়টয় পেয়ে কেলেঙ্কারি করে ফেলেছিলেন। কীসব শব্দটব্দ শুনেছেন, আলো-ফালো দেখেছেন, তাঁর সারারাত ঘুম হয়নি। হাইপার টেনসনের রুগী, সকালবেলায় সোজা ডাক্তারকে ডাকতে হল। সে এক কাণ্ড! সেই থেকে আমরা আর এটা তেমন ইউজ করি না।'

যতসব ফার্টাইল ইমাজিনেশনের লোক—' মহোৎসাহে বললেন হোসেনসাহেব, 'এই তো ডক্টর দেবসেন দিব্যি ঘুমোলেন, কিছুই ডিসটার্বড হননি। ওসব গল্পসল্প কাউকে বলাই উচিত নয় আগে থেকে।'

'কী, আমাদের কথাটা ভাবছেন একটু?' চ্যাটার্জি বললেন—'গিন্নির আবেদনটা মঞ্জুর হবে তো? আজ রাত্রে?'

আশা করি ওরা খেয়াল করেননি কখন আমার হাতের কাঁটা-চামচ স্থির হয়ে গেছে, অভুক্ত ডিম বেকনের প্লেটে।

গগনের মাছ — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গগন পরশুদিন নাটাগড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার অন্য কোনো নেশা নেই। বন্ধু-বান্ধব নেই। আড্ডা নেই। তাস পাশা নেই। যা আছে তা হল মাছ ধরার ঝোঁক। পুকুর কিংবা বিল দেখলেই তার প্রাণটা নেচে ওঠে। যত তাড়াতাড়ি থাক, যত কাজই থাক, সে জলের ধারে থমকে দাঁড়ায়। জলের রং দেখলেই সে বুঝতে পারে, সেই পুকুর কিংবা বিলে কি কি মাছ

আছে। কত বড় মাছ আছে। মাছগুলোর স্বভাব কি? সহজে ধরা দেবে, না বঁড়শির মুখে গাঁথা টোপটি ঠুকরে ফাতনাটি দুবার নাচিয়ে দিয়ে সরে পড়বে? জলের তলায় ঝাঁজি আছে কিনা, ছোট কাঁকড়া কিংবা কাছিম আছে কিনা, জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সে জলের মতো বুঝতে পারে। তার এই স্বভাবের জন্যে লোকে তাকে মেছো গগন বলে। অনেকের ধারণা গগন পূর্বজন্মে মাছরাঙা ছিল। আগামী জন্মে ভোঁদোড় হয়ে জন্মাবে।

এই মাছের নেশাটি আছে বলেই গগনের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। সদাশিব মানুষ। লম্বাচওড়া চেহারা। সহজ সরল মানুষ। একটা বড় কারখানায় হাতের কাজ করে যা উপার্জন করে, মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার সুখেই চলে যায়। শৈশবেই বাবা মারা যান। লেখাপড়া সেই কারণে খুব বেশিদূর এগোয়নি। বিধবা মা, সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কোনো রকমে ছেলেকে মানুষ করেছেন। পৈতৃক বাড়িটা ছিল তাই রক্ষে। ছোট একতলা বাড়ি। খানচারেক ঘর। দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে গগনের মা সংসার চালাতেন। ভাড়াটে ভালো। ভাড়া নিয়ে কোনো অসুবিধা কোনো কালে হয়নি। সেই ভাড়াটে এখনো আছেন। অনেকটা বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছেন তাঁরা। দুটো পরিবারকে এখন আলাদা করাই শক্ত। বাইশ বছর আগে যা ভাড়া ছিল, এখনো তাই আছে। এক পয়সা ভাড়া বাড়াবার কথা কেউ কখনো বলেননি। এখন গগন রোজগার করছে। ভাড়ার টাকার উপর তাদের আর নির্ভর করতে হয় না। যা আসে সেইটুকুই বাড়তি।

গগনের বাহন হল সাইকেল। পৈতৃক সাইকেল। সেকালের জিনিস। গগনের যত্নে ঠিক সারভিস দিয়ে যাচ্ছে। একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাইকেলটা গগনের সেবায় এতই সন্তুষ্ট যে আবার ফিরে এসেছিল দিনকতক পরে। থানার দারোগা বলেছিলেন, 'গগনবাবু, এরকম বরাত লাখে একটা মেলে।' গগন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সের আড়াই ওজনের একটা কালবোস দারোগাবাবুকে প্রেজেন্ট করে এসেছিল। গগনের মাছ-ধরা এই জন্যেই। নিজে আর কতটা খাবে।! গগন ধরে মাছ, পাড়ার লোকে খায় সেই মাছ। প্রতিবেশীরাই ভালো পুকুরের সন্ধান এনে দেয়। গগন সাইকেলে নানা মাপের ছিপ, হুইল বেঁধে, চার, টোপ নিয়ে, টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে সাতসকালেই বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্ম আর বর্ষার দিনে ছাতা থাকে। ইদানীং এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিডও সঙ্গে রাখে। বারকতক কেউটে সাপে তাড়া করেছিল।

নাটাগড়ের পুকুরটার খবর দিয়েছিল তারই এক সহকর্মী। সে-ই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বলেছিল, বিশাল পুকুর পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে। বারোয়ারি পুকুর নয়, মাছগুলো সেই কারণে ছ্যাঁচড়া নয়। ছিপ ফেলতেই ধরা দেবে। সব মাছই বড়। বৈষ্ণবের পুকুর, কালেভদ্রে জাল পড়ে। খুব জানাশোনা লোক ন-মাসে ছ-মাসে সখ করে ছিপ ফেলে।

গগন অবশ্য ঠিক এই রকম পুকুরে মাছ ধরতে চায় না। সে হল পাকা মাছ-ধরিয়ে। খেলোয়াড়, ত্যাঁদোড়, তেএঁটে মাছ না হলে সে মাছ ধরে আনন্দ পায় না। অনেকদিন তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না বলে এ সুযোগটা সে হাতছাড়া করল না। দেখাই যাক না কি হয়! গগন বেরিয়ে পড়লো। বাহন সাইকেল। সঙ্গে একটা টর্চও নিল। দূরের পথ, পথে আলো থাকবে কিনা কে জানে! সাবধানের মার নেই।

বিশাল পুকুর। সরোবর বলাই ভালো। যাঁদের পুকুর তাঁরা এককালে জমিদার

ছিলেন। একপাশে তাঁদের বিশাল বাড়ি। সংস্কারের অভাবে একটু জীর্ণ। একপাশে পুরোনো মডেলের একটা অস্টিন গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িটা মনে হয় চলে। সামনেই ঢালা ছাদ। ছাদের কার্নিসে একটা পরী ডানা মেলে আছে। যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে। দেউড়িতে এখনো দারোয়ান বসে। গগনের সাইকেলের মতো পুরোনো মনিবের মায়া ছাড়তে পারছে না বলেই বোধ হয় বহাল আছে।

বাগানের গেট পেরিয়ে ইঁট-বাঁধানো পথে এগোতে এগোতে গগন যেন পুরোনো কালের গন্ধ পেল। বহু স্মৃতি যেন ভিড় করে এল। প্রাচীন গাছের কালো গুঁড়িতে সবুজ শ্যাওলা। বছরের পর বছর পাতা পড়ে গাছের তলায় তলায় আর মাটি দেখা যায় না। রোদ খুব কমই পড়ে। পাতা পচার জৈবগন্ধ। জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা ব্যাঙের ছাতা। এক একটা গাছের গায়ে পরগাছা উঠেছে লতিয়ে লতিয়ে। একসময়কার সযত্ন পরিচর্যার বাগান দীর্ঘ অবহেলায় না বাগান, না জঙ্গল এক ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের নানা রঙের মূর্তি চলে যাওয়া একটা কালকে পাথরের অবয়বে ধরে রেখেছে। গগনের মনে হল, মানুষের সমৃদ্ধি কত ক্ষণস্থায়ী! গরিব আছি বেশ আছি বাবা। উত্থানও নেই পতনও নেই। ছেলেবেলায় কথায় কথায় মা বলতেন না—'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে; অতি নিচু হয়ো না গরুতে মুড়িয়ে খাবে।'

বাগানের পথ দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে বেঁকতে বেঁকতে গগন সেই পুকুরের পাড়ে এল। যেখানে তার সারাটা দিন কাটবে জলের ওপর বাতাসের হালকা তরঙ্গ দেখে, ফাতনা দেখে, মাছের বুড়বুড়ি আর ঘাই মারা লক্ষ্য করে। পুকুরটা এক সময় খুব যত্নের পুকুর ছিল দেখলেই বোঝা যায়। চারপাশ ইঁট দিয়ে বাঁধানো। চারদিক থেকে চারটে ঘাট জলের অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। পাথর বসানো ঘাটের পৈঠের জোড় জায়গায় জায়গায় ছেড়ে গেছে। সেইসব ফাঁকে ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে। কতকালের পুরোনো জল, যেন আলকাতরা গোলা। চারিদিক শান্ত নির্জন। কোথায় একটা পাখি ডাকছে, টুই-টুই—।

গগন জল চেনে। পুকুরটা দেখে তার ছিপ ফেলতে ইচ্ছে হল না। তার মনে হল, চারিদিকে যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। জলে, ভাঙা ঘাটে পুরোনো দিনের অনেক গোপন কথা যেন শ্যাওলার মতো ছড়িয়ে আছে। বড়লোকের পুকুর দেখলেই গগনের আত্মহত্যার কথা মনে হয়। মনে হয় জলের তলায় চেনবাঁধা কঙ্কাল আছে। মনে হয় পুকুরের মাঝখানে গভীর একটা কুয়ো আছে, যেখান থেকে মাঝরাতে চেন শিকল আর লোহার কড়া নাড়াবার ঠনঠন শব্দ ওঠে। কেউ যেন গুমরে কেঁদে ওঠে, আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও! মাঝে মাঝে সোনার বালা পরা একটা হাত মাঝ-পুকুরে জলের ওপর ভেসে উঠে কিছু একটা ধরার নিষ্ফল চেষ্টা করে আবার তলিয়ে যায়। গগন এসব কখনো দেখেনি, তার মনে হয়।

ঘাটের বাঁধানো বেদীতে বসে, পাশে তার ঝোলাঝুলি সাজসরঞ্জাম নামিয়ে রেখে গগন চারপাশটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল। চারিদিকে বড় বড় রাই ঘাস গজিয়েছে, সাপের আত্মগোপনের জায়গা। গগন খুব হতাশ হল। এই পুকুর নিয়ে গল্প লেখা চলে, মাছ ধরা চলে না। হঠাৎ পুকুরের মাঝখানে জল উথলে উঠল। ঘাই দেখে মনে হয়, সের তিরিশ ওজনের একটা মাছ। এতবড় মাছ ছিপে পড়লেও ছেড়ে দিতে হবে। এ মাছ কেউ খায় না।

এতদূর এসে গগনের ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ বসে থাকতে অবশ্য খারাপ লাগছে না। জল থেকে রোদের তাতে গরম ঠাণ্ডা মেশানো একটা ভাপ উঠছে। গাছের পাতায় ছায়া কাঁপছে। ঘাসের ডগা সিরসির করে হাওয়ায় দুলছে। অনেক সব পুরোনো দিনের কথা গগনের মনে আসছিল। পুরোনো কথা যত মনে পড়ছিল, মনটাও তত বিষণ্ণ হচ্ছিল। একবার মনে হল, ফিরে যায়। তারপরে মনে হল, অনেকে আশা করে থাকবে—গগন কখনো ফেলিওর হয়নি।

টিনের কৌটো খুলে গগন চার, টোপ সব একবার দেখে নিল। মনে মনে বলল, এসেছি যখন, এক হাত ফেলেই দেখি, কি হয়! পুকুরের দিকে তাকিয়ে গগনের মনে হল, মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতো অজানা সম্ভাবনা নিয়ে স্থির অচঞ্চল। ঘাটে বসে কি মাছ ধরা যায়? গগন হেসে উঠল। একটু আঘাটায় বসতে হয়। বসবে কি করে! বাঁধানো পাড় ঢালু নেমে গেছে। অগত্যা ঘাটের শেষ পৈঠেতে বসে গগন ছিপ ফেললে। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। খুব প্রাচীন মাছও সাঁ সাঁ করে শব্দ করে, গগন শুনেছে। অবশ্য নিজের কানে কখনো শোনেনি।

ফাতনার উপর বারেবারে একটা ফড়িং এসে বসছে। ঠিক বসছে না, কেঁপে কেঁপে উড়ছে। জলের উপর ছোট্ট একটা মাথা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে সরে যাচ্ছে। জোলো হাওয়ার গরম ঠাণ্ডায় গগনের চোখে যেন ঘুমের আমেজ আসছে। প্রচুর নেশা করলে মানুষের এই অবস্থা হয়। তবু গগন জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এক সময় তার মনে হল বঁড়শিটা কিছুতে ঠোকরাচ্ছে। গগন ফাতনাটা কায়দা করে সোজা করে নিল, হেলে গিয়েছিল।

ফাতনাটা হঠাৎ ডুবে গেল। গগন প্রস্তুত ছিল, সুতোটা একটু টান করেই আলগা দিল। বড় মাছ বলেই মনে হচ্ছে। এ পুকুরে ছোট মাছ নেই, গগন জল দেখেই বুঝেছে। এও বুঝেছে, চালাক মাছ একটাও নেই, সব কটা বোকা গাধা। খাদ্য আর টোপের পার্থক্য বোঝে না। তা না হলে বঁড়শি ফেলতেই ধরত না। গগনের মনে হল, মাছটা না খেলেই ভালো হত। অনর্থক এখন খেলাতে হবে। শেষে উঠে আসবে শ্যাওলা ধরা পাঁকগন্ধ এক মাছ। যাকে মাছ না বলে মৎস্যাবতার বললেই ভালো হয়। যার বয়স হয়তো পঞ্চাশ বছর।

মাছটা অবশেষে উঠল। যা ভেবেছিল তাই। মাছটা ইচ্ছে করলে ন্যাজের ঝাপটা মেরে গগনকে কাবু করে ফেলতে পারে। ইচ্ছে করলে খেয়েও ফেলতে পারে। সারা গায়ে কালো আঁশের উপর এক ধরনের সাদা সাদা লালা জড়িয়ে আছে। গগনের হাত ঠেকাতেই ইচ্ছে করছিল না। কোনো রকমে ঘাটের পৈঠেতে ফেলল! গগন আশ্চর্য হয়ে দেখল, মাছটার নাকে এক সোনার নথ লাগানো। অবাক কাণ্ড! মাছটা খাবি খাচ্ছে, চিঁ চিঁ করে একটা শব্দ করছে।

গগন কি করবে ভাবছে। এমন সময়ে তার পেছনে হাল্‌কা চুড়ির কিন কিন শব্দ হল। গগন চমকে ফিরে তাকাল। তার পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ন-দশ বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে। একরাশ ঘন কালো চুল। আকাশের মতো নীল বড় বড় দুটো চোখ। হাতে গোল গোল দুটো সরু সরু মিছরি কাটা সোনার চুড়ি।

গগন তাকাতেই মেয়েটি বললে—ওমা তুমি আমার ভোলাকে ধরেছ! তুমি কি গো, ওকে ছেড়ে দাও!

গগন বললে, এর নাম বুঝি ভোলা?

—হ্যাঁ গো, দেখছ না ওর নাকে নোলোক। আমার মা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমার নাম কি মা?

—আমার নাম চুমকি। তুমি আগে ছেড়ে দাও, জানো না বুঝি জলের বাইরে মাছ বেশিক্ষণ বাঁচে না!

—দিচ্ছি মা, ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছিলুম তো!

—আমার সঙ্গে পরে কথা বলবে। আগে ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর। জলের মাছকে কেউ ডাঙায় তোলে!

গগন তাড়াতাড়ি মাছটাকে জলে ছেড়ে দিল। মুখ না ঘুরিয়েই বললে, এই নাও তোমার ভোলা আবার জলে চলে গেল। আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে—বল মা, আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে?

ভোলা তখন ন্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে। গগন কোনো উত্তর না পেয়ে ফিরে তাকালো। কোথায় কি, কেউ কোথাও নেই! গগন জোরে জোরে ডাকল,—চুমকি, চুমকি! বাতাসের শব্দ, সেই পাখিটা ডাকছে টুই-টুই।

নির্জন দুপুর। বড় বড় গাছের তলায় আলোছায়ার খেলা।

গগনের কেমন ভয়-ভয় করল। মনে হল দুপুর নয়, চারিদিকে নিশুতি রাত নেমে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, সে কি মানুষ? ছমছমে মন নিয়ে গগন বাগানের গেটের কাছে ফিরে এল। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো, চুমকি বলে এ বাড়িতে কোনো মেয়ে আছে? প্রশ্ন শুনে দারোয়ানের মুখটা কি রকম হয়ে গেল। কেন বাবু? গগন বললে,—না, বেশ মেয়েটি। এইমাত্র আমার সঙ্গে কথা হল, তারপর কোথায় যে চলে গেল হঠাৎ! দারোয়ান হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল—সে বাবু অনেককাল আগের কথা। এই বাড়ির মেজোবাবুর ছোট মেয়ে ছিল। বিশ-বাইশ বছর আগে ওই পুকুরে ডুবে মারা যায়। মেজবাবুও বেঁচে নেই। মাইজী এখন বালিগঞ্জে থাকেন। ওই ছিল একমাত্র মেয়ে। কি করে যে ডুবে মারা গেল কেউ জানে না। এই বাড়ির একটা ঘরে এখনো তার খাটবিছানা পাতা আছে। সব খেলনা বই সাজানো আছে। মাইজী মাঝে মাঝে আসেন। আজও এসেছিলেন। এই একটু আগে চলে গেলেন।

গগন তাকিয়ে দেখল, সেই অস্টিন গাড়িটা নেই।

গগনের নাটাগড়ের গল্প কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গগন কিন্তু মাছ আর ধরে না। সব মাছই এখন তার কাছে ভোলা। চুমকি তাকে নিষ্ঠুর বলেছিল, সেই কথাটা তার মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

'মাছ কি ডাঙায় বাঁচে! তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো!'

নীল চোখ, কোঁকড়া চুল, চুড়ির মিঠে রিনি রিনি।

মাছের নেশা আর গগনের নেই।

তেত্রিশ নম্বর ঘর — দিব্যেন্দু পালিত

সেদিন দিনটাই ছিল গোলমেলে। কোনো এক রবিবার। পরের দিন সকাল নটায় এক বড়সড় সরকারি আমলার সঙ্গে জরুরি মিটিং। রাতের প্লেনে গেলেই হত, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লি যাবার ফ্লাইট প্রায়ই দেরি করে বলে ভোরের ফ্লাইটেই যাব ঠিক করেছিলাম। আর কিছু না হোক, তাতে হাতে থাকত পুরো একটি দিন, সময়টা কাজে লাগানো যেত অন্যভাবে—তারপর ধীরেসুস্থে পরের দিন যাওয়া যেত মিটিংয়ে।

কিন্তু গোড়াতেই হয়ে গেল গণ্ডগোল। ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল ঘড়িতে। ঘুম যখন ভাঙল দেখি সাড়ে পাঁচটা। তার মানে অ্যালার্ম বাজেনি। ডিসেম্বরের ভোর সাড়ে পাঁচটায়, অন্ধকার ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে চারদিক—সেটা সান্ত্বনার বিষয় নয় কোনো; ছটা পনেরোর ফ্লাইট কাঁটায় কাঁটায় উড়ে যাবে ঠিকই। ফাঁকা রাস্তায় তীব্র গতিতে ট্যাক্সি ছুটলেও আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে কম করেও আধঘণ্টা লাগবে। যাই হোক এইসব ভাবনা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখলুম যা ভয় পেয়েছিলাম তাই, চেক-ইন কাউন্টার ফাঁকা। একজন অফিসার বললেন, দশ মিনিট আগে এলেও উপায় ছিল। প্লেন টেকঅফের জন্যে রওনা হয়ে গেছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই উড়ে যাবে আকাশে।

টিকিটটা যাতে বাতিল না হয়ে যায় এবং সিট পাওয়া যায় সন্ধ্যার ফ্লাইটে, সেই ব্যবস্থা করে ফিরতে হল অগত্যা। তবু ভাবনা গেল না। আর কিছু নয়, হোটেল বুক করা আছে সকাল থেকে, অন্তত সেখানে জানিয়ে দেওয়া দরকার যাতে বুকিংটা ক্যানসেল না করে। ছোটখাটো কোম্পানি আমাদের, দিল্লিতে ব্রাঞ্চ নেই কোনো। ওখানকার কাজকর্ম দেখার জন্যে আছে একজন সংযোগ অফিসার, নাম সদাশিব রায়। দিনতিনেক আগে ফোনে কথা বলার সময় সদাশিব বলেছিল, দিল্লিতে এখন কোনো হোটেলে জায়গা পাওয়া মুশকিল—একে ট্যুরিস্টদের মরশুম, তার ওপর একই সঙ্গে চলেছে ট্রেড ফেয়ার আর কমনওয়েলথ কনফারেন্স। যাই হোক লোধি এস্টেটের কাছাকাছি একটা মাঝারি হোটেলে আমার জন্যে রুম বুক করে সদাশিব বলল পালাম এয়ারপোর্টে আসবে।

ফ্লাইট মিস করে ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুধুই মনে হতে লাগল, হয়রানি আমার চেয়ে বেশি সদাশিবের—ফ্লাইট ল্যান্ড করার সময় হয়ে এল প্রায়;

বেচারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে এয়ারপোর্টে পৌঁছে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! তখনি ঠিক করে নিলুম, আরো কিছুক্ষণ পরে, অর্থাৎ সদাশিবকে বাড়িতে ফেরার সময় দিয়ে, ট্রাঙ্ক করব দিল্লিতে, উদ্দেশ্য দুটো। এক, ব্যাপারটা বিস্তারিত জানানো এবং হোটেল বুকিংটা যাতে ক্যানসেল না হয় তা দেখা। অবশ্য ক্যানসেল হলেই যে রাস্তায় ঘুরতে হবে তার কোনো মানে নেই। সদাশিব ওর বাড়িতেই উঠতে বলেছিল। তাছাড়া দিল্লিতে থাকেন আমার এক জেঠতুতো দাদা এবং মাসিও। ঠিকানা জানা আছে, তেমন তেমন দরকার হলে এই দুটো জায়গার যে কোনো একটাতে ওঠা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। তবে কিনা অফিসের কাজে গিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠা আমার ঠিক পছন্দ হয় না।

ট্রাঙ্ককল করতে গিয়েই পড়লুম ঝামেলায়। বলেছি না, দিনটাই ছিল গোলমেলে—হঠাৎ একেকটা দিন যেমন হয় আর কি, নিজের ইচ্ছে, পছন্দ ও প্রয়োজনমতো যা করতে যাওয়া যায় তাতেই পড়ে বাগড়া। ঘণ্টা তিনেক ট্রাঙ্ক লাইনে সদাশিবকে পাবার অপেক্ষা করে যখন আবার তাগাদা দিলুম, ওদিক থেকে ট্রাঙ্ক অপারেটর মিষ্টি গলায় জানিয়ে দিল, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না—দিল্লির সমস্ত লাইন 'ডাউন'।

যে-কোনো সিজনড এয়ার ট্র্যাভেলারই এক আধবার ফ্লাইট মিস করার অভিজ্ঞতায় ভুগেছেন—কলকাতার রাস্তার ভয়াবহ জ্যাম যে-কোনো দিনই যে-কারুর সামনে ঘটিয়ে তুলতে পারে এই পরিস্থিতি। আর টেলিফোনের লাইন না পাওয়া নিয়েও অত হা-হুতাশ করার মানে হয় না কোনো—না পাওয়াটাই বরং অনেক বেশি স্বাভাবিক।

দিনটা যে গোলমেলে তার আর একটি প্রমাণও পেয়ে গেলুম। সকালে আমার দেরিতে পৌঁছনোর জন্যে এক মিনিটও অপেক্ষা করেনি ফ্লাইট। কিন্তু সন্ধ্যায়, রিপোর্টিং টাইমের আধঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলুম, বোম্বের ফ্লাইট আসছে দু'ঘণ্টারও বেশি দেরিতে—সেই এয়ারক্র্যাফ্টই কলকাতায় যাত্রী নামিয়ে ও তুলে দিল্লি যাবে; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আড়াই তিন ঘণ্টার পরে ছাড়বে দিল্লির ফ্লাইট।

হতাশ বোধ করলেও হাল ছাড়লুম না আমি। বুকশপ থেকে নিক কার্টারের একটা সস্তা থ্রিলার কিনে জুত হয়ে বসলুম লাউঞ্জে। তখনি ভাবলুম, সদাশিব নিতান্তই বোকা লোক নয়। কাজটা কত জরুরি বুঝলে এটাও বুঝতে পারবে কোনো কারণে সকালে না যেতে পারলেও রাত্রে ঠিকই পৌঁছে যাব।

অবশেষে সত্যি সত্যিই যখন প্লেন থেকে দিল্লিতে নামলুম, রাত তখন প্রায় দেড়টা। প্লেন ল্যান্ড করার পরই হোস্টেসের ঘোষণা শুনে বুঝেছিলাম জব্বর শীত পাব বাইরে। বাইরে আসতেই টের পেলুম শীত কাকে বলে। হঠাৎই যেন কেউ একটা বরফের মুখোশ এঁটে দিল মুখে। অবশ হয়ে আসছে চামড়া, হাত-পা। অবশ্য একেবারেই যে প্রস্তুত ছিলাম না তা নয়। গলা-উঁচু পুলোভারটা কানের কাছে টানাটানি করে যতটা সম্ভব ঢেকে ফেললুম ঘাড়ের পিছনটা। কনকন করে উঠল স্যুটকেস-ধরা বাঁ হাতের আঙুলগুলো। এমনিতে ব্যস্ত দিল্লি এয়ারপোর্ট সম্ভবত ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ; এই মাত্র এসে পৌঁছনো কলকাতার যাত্রীদের তাড়াহুড়ো ও খাপছাড়া কথাবার্তার শব্দে জেগে উঠতে না উঠতেই শান্ত হয়ে গেল আবার।

এত রাতে, এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নির্দিষ্ট খবর না পেয়েও সদাশিব অপেক্ষা করবে আমার জন্যে এমন আশা করিনি। তবু এয়ারপোর্টের বাইরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলুম

কিছুক্ষণ। আশপাশে দাঁড়ানো যাত্রীদের ভিড় কমতে লাগল ক্রমশ। মনঃস্থির করে নিলুম আমি। এত রাতে খবর না দিয়ে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া উচিত হবে না। হোটেলেই যাব। যতই ভিড় থাকুক, রাত কাটাবার জায়গা পাব না এমন হতে পারে না। একান্তই যদি কোনো কারণে বুকিং ক্যানসেল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হোটেল থেকেই বরং ফোন করা যাবে সদাশিবকে।

এইসব ভেবে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে বসলুম একটা ট্যাক্সিতে। হোটেলের নাম বলতে মাফলারে কান-মাথা-মুখ-ঢাকা বেঁটেখাটো চেহারার ড্রাইভারটি একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর আর কিছু না বলে কুয়াশার ভিতর দিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল ট্যাক্সিটা।

অল্প গা-ছমছম করলেও ভয় কেটে গেল যখন মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই আমাকে হোটেলের সামনে পৌঁছে দিল ট্যাক্সিওলা। কিছু বাড়তি সমেত ভাড়া মেটাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল আমার, সকাল থেকে যতগুলি যাত্রার মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়েছে আমাকে তার মধ্যে এই ট্যাক্সি চড়ার ব্যাপারটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। এমনও হতে পারে, ভাবলুম, ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরোবার পরই শুরু হয়ে গেছে আর একটা দিন। গতকালের দিনটি গোলমেলে ছিল বলে আজকের দিনটাও যে একই রকম হবে তার মানে নেই কোনো। বোধ হয় ফাঁড়া কেটে গেল। এখন হোটেলে একটা রুম পেলেই হল। একবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারলেই বিছানায় ছুঁড়ে দেওয়া নিজেকে। তারপর ঘুম। ভাবতে ভাবতেই শরীর কাঁপিয়ে উঠে এল লম্বা এক হাই।

সদাশিবের ঠিক-করা হোটেলটা যে মাঝারি ধরনের তা আগেই বলেছি। পাঁচ-তারা হোটেলের রমরমা নেই এখানে। যেটুকু না জ্বাললেই নয়, তার বেশি আলো নেই কোথাও। আলো অন্ধকারে নিঃশব্দ পড়ে আছে লবি—একটিও লোক নেই সেখানে। শুধু লম্বা একটি সোফায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে ঘুমোচ্ছে একটি লোক। ঢাকা বলেই মুখ চোখ দেখা যায় না। এইসব দেখতে দেখতেই রিসেপশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলুম আমি।

কাউন্টারের ভিতর দিকে চেয়ারে বসে গল্প করছিল দুটি যুবক। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

'ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান উই ডু ফর ইউ?'

যে কথা বলল, 'দুজনের মধ্যে সেই যুবকটি বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবান। অন্য জন বেঁটে ও রোগা—হাতের মুঠোয় আড়াল করে ধরা সিগারেট। গাল ভাঙা ও চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া। এক পলক দু'জনকেই দেখে নিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম আমি। বললুম, 'বুকিং আছে আমার নামে—একটা রুম চাই—'

লম্বা যুবকটি বলল, 'দুঃখিত। কোনো রুম খালি নেই।'

'তা কি করে হবে!' চিন্তিত গলায় বললুম আমি, 'আমার নামে বুকিং কনফার্ম করা আছে!'

'কনফার্ম করা আছে!' যুবকটি অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর কাউন্টারের পিছনে র‍্যাকের ওপর রাখা বড় মাপের বুকিং রেজিস্টারটা টেনে নিয়ে ওলটাতে লাগল। খানিক পরে বলল, 'আপনার বুকিং ছিল গতকাল সকালে। না আসার জন্য ক্যানসেল হয়ে গেছে। উই হ্যাড নো ফারদার ইনফরমেশন!'

'ক্যানসেল হয়ে গেছে!' দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলুম নিশ্চিত শুকিয়ে গেছে আমার মুখ। বললুম, 'ফ্লাইট মিস্ করেছিলুম বলেই আসতে পারিনি। অন্তত রাতটা কাটানোর জন্যে কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনারা!'

'রুম খালি থাকলে নিশ্চয়ই করতাম, স্যার। উই আর হিয়ার টু হেল্প ইউ!'

বাঁধা বুলি। প্রত্যাখ্যানেও মিশে আছে সৌজন্যের হাসি। আমার রাগ হল, সঙ্গে ছেঁকে ধরল এক ধরনের অসহায়তা। কী করব বুঝতে পারছি না। একটা ট্যাক্সি পেলে অবশ্য চলে যাওয়া যায় জেঠতুতো দাদা কিংবা মাসির বাড়ি। একটা চাণক্যপুরী এবং অন্যটা চিত্তরঞ্জন পার্কে—জায়গাগুলোও কম দূর নয় এখান থেকে। ট্যাক্সি অবশ্য ফোন করলেই পাওয়া যায় দিল্লিতে। কিন্তু এত রাত্রে? না, সদাশিবের ওখানেও যাওয়া যায় না। ভাবতে ভাবতেই আমি তাকালুম লবির দিকে। ওইখানেই শুয়ে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যায় কিনা ভাবলুম। বন্ধ কাচের দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেই কুয়াশার দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। লম্বা যুবকটি রিসিভারে কান লাগিয়ে কি শুনল যেন, তারপর বলল, 'সরি, উই আর ফুললি বুক্‌ড!'

মনঃস্থির করতে না পেরে আমি বললুম, 'একটা ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে?'

'দেখছি।' লম্বা যুবকটি বলল, 'আপনি বসুন লবিতে—'

আমি লবিতে গিয়ে বসলুম। এতক্ষণে কানে এল ঘুমন্ত লোকটির মৃদু নাক ডাকার শব্দ। কান পর্যন্ত ঢাকা পুলোভারের নীচে ঘামতে লাগলুম আমি।

ইতিমধ্যে কাউন্টারের বেঁটে যুবকটির সঙ্গে লম্বা যুবকটি নিজেদের—সম্ভবত পাঞ্জাবী ভাষায় কী বলাবলি করল বুঝতে পারিনি। লম্বা যুবকটি হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সকাল আটটার আগে ছেড়ে দিলে এখন আপনাকে একটা ঘর দিতে পারি—'

'ও-কে!' আমি উঠে দাঁড়ালুম, 'সকাল হলে আমি অন্য হোটেল খুঁজে নিতে পারি—'

'এখানেও কোনো গেস্ট চলে যেতে পারে, তখন আপনাকে অন্য রুম দেওয়া যাবে। তবে আটটার মধ্যে বম্বে থেকে আসবে একজন। তার জন্যে একটা রুম কনফার্ম করা আছে—'

তখনকার যা অবস্থা তাতে যে কোনো শর্তেই আমি রাজী। পিছনের কী-হোলের গায়ে লাগানো হুক থেকে একটি চাবি নিয়ে বেঁটে যুবকটির হাতে দিল লম্বা যুবকটি! বেঁটে যুবকটি কাউন্টারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে—'

ঘরটা দোতলায়। নাম্বার তেত্রিশ। যুবকটি দরজায় চাবি লাগিয়ে তালা খুলে আলো জ্বাললো। তারপর আমার হাতে চাবিটি দিয়ে 'গুড নাইট' বলে চলে গেল। দেখলুম সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে বেঁটে ও রোগা একটা চেহারা। যেমনই ব্যবহার করুক, শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য যুবক দু'টির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলুম আমি।

ঘরটা খারাপ নয়। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলুম দরজাটা। স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখলুম লাগেজ বক্সের ওপর। ঘুম পাচ্ছে। অবশ্যই ঘুম ছাড়া আর কোনো কাজ নেই এখন।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে গেলুম টয়লেটে। ব্র্যাকেটে ঝুলছে একটা ব্যবহার করা তোয়ালে, সাবানটাও ব্যবহৃত। বাথ-টবের মাথা থেকে অগত্যা টেনে নিতে হল ভাঁজ করা তোয়ালেটা। তেষ্টা পেয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গ্লাসে জল ঢালতে

গিয়ে দেখি সেটাও ভর্তি নয় পুরোপুরি। তখন মনে হল হয়তো কিছুক্ষণ আগেও এই তেত্রিশ নাম্বার ঘরে আর কেউ ছিল। চলে যাবার পর বিছানা ইত্যাদি পরিপাটি করে রাখা হলেও—যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি ঘরটা—নতুন আগন্তুকের জন্যে নতুন জিনিসপত্রও দেওয়া হয়নি। রিসেপশনের যুবকটি অবশ্য বলেছিল সকালে কেউ আসবে বম্বে থেকে। তার জন্যেই আলাদা করে রাখা আছে ঘরটি। হয়তো সকালেই পরিষ্কার করত। আমি তো উটকো লোক। ঘরটা যে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এটাই ভাগ্যের ব্যাপার।

বেড স্যুইচ জ্বেলে নিবিয়ে দিলুম বড় আলোটা। তখনি চোখে পড়ল, কাচের জানলার পর্দা টানা নেই। এগিয়ে গিয়ে পর্দা টানার আগে কাচে মুখ চেপে বাইরেটা দেখে নিলুম আমি। অন্ধকারে ঘন গাছ-গাছালি নিয়ে থমকে আছে লোধি গার্ডেনস্—দৃষ্টি ছড়ানো যায় না। রিল-দেওয়া পর্দাটা টানতে টানতে গভীর ক্লান্তিতে হাই উঠে এল আবার। বিছানায় এসে চাদর জড়ানো কম্বলের ভিতর শরীরটা সেঁধিয়ে দিলুম আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যেভাবে শুরু হয়েছিল দিনটি—শেষ অন্তত সেভাবে হয়নি। তিনটে বাজে প্রায়। শীতের দিল্লিতে সাড়ে সাতটার আগে সকাল হয় না। তার মানে ঘণ্টা চারেক অন্তত ঘুমোতে পারব নিশ্চিন্তে। হাত বাড়িয়ে বেড স্যুইচ টিপতেই অন্ধকার ছেয়ে গেল ঘরে। মনে হল ঘুম আসছে। হু হু করে সারা শরীরে ঘুমের আবির্ভাব টের পেলুম আমি।

কতক্ষণ জানি না—ঘুম না তন্দ্রা, কোন্ ঘোরে ছিলুম তাও বুঝতে পারলুম না ঠিকঠাক।

উঠে বসলুম বিছানায়। না, ভুল হয়নি। আমার ঘরের টয়লেটে ঘটাং করে ফ্লাশ টানার শব্দ পেয়েছিলুম, তারই জেরে এখনো পাচ্ছি কমোডে জল গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। অদ্ভুত তো!

শব্দটায় ধাতস্থ হতে যেটুকু সময় লাগে। তারই আগেই বেড-স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললুম আমি। উঠে গিয়ে টয়লেটের দরজা খুলতে চোখে পড়ল না কিছুই। ঝিরঝিরে শব্দটাও মিলিয়ে গেছে তখন। বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, রাতের নৈঃশব্দ্যে দূরের শব্দ অনেক সময় কাছে চলে আসে—পাশের ঘরের ফ্লাশ টানার শব্দটাকেই ঘুমের ঘোরে ভুল করেছি। মাঝ থেকে ঘুমটা ভেঙে গেল!

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম আবার। এবং ঘুমিয়েও পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, আচ্ছন্নতার মধ্যেই মনে হল জানলার পর্দাটা বেশ জোর দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল কেউ—ঘড়ঘড় শব্দ হল রিলের। মনে হলেও গা করলুম না তেমন; ঘুমের আগ্রহে পাশ ফিরলুম। শীতে জড়িয়ে আসছে সারা শরীর।

কিন্তু ওইভাবে কিছুক্ষণ আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতেই টের পেলুম, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ মিশে যাচ্ছে আমার নিঃশ্বাসে। অস্বস্তি বেশি হওয়ায় পরিষ্কার ঘুম থেকে জেগে উঠলুম আমি। আর তখনি বিস্ময় আর আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে এল আমার। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, জানলার পর্দাটা সত্যিই সরানো আর রাইটিং টেবিলের সংলগ্ন চেয়ারটিতে বসে জানলার দিকে মুখ করে সিগারেট টানছে কেউ। অন্ধকার বলেই আদল স্পষ্ট হয় না। কিন্তু লাল জ্বলজ্বলে একটুকরো সিগারেটের আগুন চোখে পড়ছে ঠিকই। পোড়া সিগারেটের গন্ধ ক্রমশ আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে।

সম্ভবত চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলুম আমি, গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না কোনো। আতঙ্কের শেষ অবস্থায় পৌঁছে বেড স্যুইচটা টিপে আলো জ্বালতে পারলুম শুধু। আশ্চর্য!

সব ঠিকঠাক আছে। জানলার পর্দাটা যেমন টানা ছিল তেমনই টানা—চেয়ারটা চেয়ারের জায়গায়। সিগারেটের ধোঁয়ারও নামগন্ধ নেই কোনো।

ঘামছিলুম। সেই অবস্থাতেই মনঃস্থির করে ফেললুম, আর ঘুমোবার দরকার নেই। আলোটা জ্বলুক। অন্তত ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই জেগে থাকতে হবে আমাকে। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। শব্দহীন চারদিকে ঘুমের নিশ্চিন্তি। শুধু আমিই জেগে আছি।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সদাশিবকে ফোন করে বললুম সব। সদাশিব বলল, 'কী আশ্চর্য! ওই তেত্রিশ নম্বর ঘরটাই দিয়েছিল আপনাকে!'

'কেন?'

সদাশিব বলল, 'পরশু রাত্রে ওই ঘরে মোহিনী চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন। আজকের কাগজেই আছে খবরটা—'

আমি কিছু বলতে পারলুম না। তাহলে কি ভূতের সঙ্গেই রাতটা কেটে গেল আমার!

বামরার রহস্য

বুদ্ধদেব গুহ

ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাসের ছোটকাকার নাম বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তিনিও জঙ্গলের ঠিকাদার ছিলেন এবং বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন জায়গাতে ঠিকাদারী করেছেন। প্রায় বছর কুড়ি হল শরৎ বোস রোডের ধারে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি বাড়ি করে থিতু হয়েছেন।

উনি একবার নেমন্তন্ন করলেন আমাদের "বামরা"তে যাবার। বামরা-ও একটি পূর্বতন দেশীয় করদ রাজ্য, যে রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন একসময়ে চাঁদুবাবুর বাবা।

কলকাতা থেকে আমরা ঝাড়সুগুদা হয়ে বামরাতে গিয়ে পৌঁছলাম এক সকালে। আমরা মানে—আমি, বাবা, প্রশান্তকাকু আর দুর্গাকাকু।

সেই সময়ে, বামরাতে বীরেনবাবু ঠিকাদারী করছিলেন কিনা মনে নেই আজ। সম্ভবত কাঠের ব্যবসা করছিলেন। কিছুদিন সম্ভবত গইলকেরাতেও কাজ করেছিলেন এবং সিংভূম জেলারও কিছু জঙ্গলে। তখন বামরাতে তাঁর একটি 'বাসা' ছিল। অনাড়ম্বর

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ডাল, ভাত, তরকারি, পাওয়া গেলে মুরগি বা মাংস, সঙ্গে খাঁটি ঘি। মাছও খেতাম সম্ভবত, ঠিক মনে নেই; বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগের কথা। হীরাকুঁদ বাঁধ তখনো হয়েছে কিনা ঠিক মনে নেই। হয়ে থাকলে সেখান থেকে মাছও হয়তো পাওয়া যেত। বামরাতে তাঁর বাসার পেঁপে গাছে বিরাট বিরাট স্বাদু পেঁপে ধরেছিল তা মনে আছে। উনি বলতেন ওখানের মাটি খুব ভালো।

বামরাতে একদিন থেকে আমরা রওয়ানা হলাম বীরেনবাবুর জিপে করে কিলবগার দিকে। 'কিলবগা' জায়গাটি কোনো মানচিত্রে পাওয়ার কথা নয় কারণ বামরার ফরেস্ট ম্যাপেও হয়তো বা খুঁজে পাওয়া যাবে না। জঙ্গলের মধ্যে কিলবগা নামক স্থানে বছর দুই আগে বীরেনবাবুর একটি ক্যাম্প ছিল কাঠ কাটার। তখন সেখানে একটি খড়ের ঘরও ছিল। সেই ঘরটিতে কোনোক্রমে মাথা গুঁজে থাকা যাবে এই অভিপ্রায়ে এবং আশায় আমরা সেই পাণ্ডববর্জিত জায়গার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

পথে একটা নদীও পেরিয়েছিলাম জিপে। ভারি সুন্দরী নদী। নাম, কনসর। অনেক মাইল জিপ চালিয়ে আমরা দুপুরবেলাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম কিলবগাতে। গিয়ে দেখা গেল, সেই পর্ণকুটিরের আর কিছুই বিশেষ অবশিষ্ট নেই। কাছেই একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের মানুষরাই, যখন ওঁর কাজ ছিল এই অঞ্চলে, তখন তাঁর কাজ করত। ড্রাইভার গিয়ে খবর দিতেই লোকজন এল।

প্রায় ভেঙে-পড়া কুটিরটি পরিষ্কার ও মেরামতি করতে গিয়ে তার মেঝে থেকে অগণ্য কেউটে সাপের অগণ্য বাচ্চা বেরিয়ে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো।

প্রশান্তকাকু বললেন, গুহসাহেব, আমি কিন্তু মরে গেলেও মাটিতে শুচ্ছি না।

বাবা বললেন, পালঙ্ক আর এখানে কোথায় পাবেন প্রশান্তবাবু? যার যার হোল্ড-অল পেতেই তো শুতে হবে।

বীরেনবাবু অবশ্য সন্ধে নাগাদ শুধু প্রশান্তবাবুর জন্যেই একটি চৌপাই-এর বন্দোবস্ত করেছিলেন গ্রাম থেকে।

যখন জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কুটিরের চালের ছিদ্রান্বেষণ করে নতুন শন বিছিয়ে দিচ্ছিলো গ্রামের মানুষেরা, তখন জমি থেকে কেউটের বাচ্চার সঙ্গে কিছু স্বাস্থ্যবান এবং অত্যন্ত সুদর্শন ফর্সা মেঠো ইঁদুরও বেরোল। ওরা পটাপট হাতে তুলে ফটাফট পাথরে মেরে আগুনে ঝলসে পরমানন্দে খেতে লাগলো। আমি ভাবলাম, আম্মো-বা বাদ যাই কেন সে অভিজ্ঞতা থেকে! লেখকের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলা যায় না এ-কথাও যেমন সত্যি, আবার একজন লেখক কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর নিজের জন্যে করেন না। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর রসনার স্বাদ, তাঁর হৃদয়ের প্রেম-বিরহ, তাঁর জীবনের আনন্দ-বেদনা, তাঁর শরীরের সব সুখ এবং অসুখ তিনি নিঃশেষে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদেরই বিলিয়ে দেন। একজন লেখকের মতো প্রকৃত রিক্ত, নিঃস্ব আর কেউই নন। অবশ্য সেই লেখক যদি আমারই মানসিকতার হন।

তবে শুধুই আগুনে ঝলসে খেতে পারিনি আমি, একটু নুন ও লংকার ইন্তেজাম করতে হয়েছিল। তবে জংলী ইঁদুরের স্বাদ সত্যিই অপূর্ব।

জায়গাটি এবং কুটিরটিকে বাসযোগ্য করে এবং আমাদের খিদমদগারীর জন্যে দু'জন রংরুট সৈন্য মোতায়েন করে দিয়ে জিপ নিয়ে বীরেনবাবু ফিরে গেলেন বামরাতে। কাল

ভোরেই আবার জিপ পাঠিয়ে দেবেন। তারপর থেকে যে তিন দিন আমরা থাকব, জিপটি আমাদের কাছেই থাকবে।

বীরেনবাবু একটু পরেই ফিরে এলেন মুখ শুকনো করে। বললেন, গুহসাহেব, বড় বিপদ! এখানে নাকি একটি ম্যানইটার বাঘ অপারেট করছে! কী করবেন? ফিরে যাবেন নাকি বামরা?

বাবা হেসে বললেন, ভালোই বলেছেন। আমাদের দেখে কি আপনাদের মায়া হচ্ছে?

দুর্গাকাকু বললেন, শিকারের খোঁজেই তো আসা মশায়! এমন সুসংবাদে আপনি মুষড়ে পড়ছেন কেন?

না, না। আপনাদের যদি কিছু হয়!

হবে আবার কি? তবে দুর্গাবাবু আর লালা দেখবে, যদি খোঁজ পাওয়া যায়। আমি আর প্রশান্তবাবু খাব-দাব, তেল মেখে চান করব।

প্রশান্তকাকু বললেন, মানুষ খায় না এমন বাঘের সন্ধান দিতে পারেন না মশায় দু-চারটে? আমার বেয়াই-এর রাজত্বে তো সবই শম্বর, হরিণ, শুয়োর, হাতি ও বাইসনের বাচ্চা-খাওয়া বাঘ। অত ভালো ভালো মাংস থাকতে খামোখা মানুষের মতো বাজে মাংস খাওয়ার দরকারই বা কি?

দুর্গাকাকু বললেন, আপনি যান বীরেনবাবু, অন্ধকার হয়ে এল। জঙ্গলে জঙ্গলেই রাস্তা, তা ছাড়া বাঘ তো অ্যালসেশিয়ান কুত্তা নয় যে মালিকের ঘরে বাঁধা আছে। মানুষখেকো বাঘ তো নয়ই।

যাই।

এদের সবাইকেই বলে দিন যে যদি কোথাও 'কিল' হয়, তবে যেন অবশ্যই খবর দেয় আমাদের। যে খবর দেবে তাকে একশ টাকা বকশিশ দেওয়া হবে।

চারধারে চেয়ে দেখলাম যে জায়গাটা তৎক্ষণাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু আমাদের খিদমদগারির জন্যে যারা থাকবে তারা ছাড়া। বুঝলাম যে, সকলেই জানে বাঘের খবর।

সে রাতে দুর্গাকাকুই ফার্স্টক্লাস ভুনি খিচুড়ি রাঁধলেন। সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা আর নরম ওমলেট। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ঠিক হল যে বাইরের আগুনের সামনে পালা করে পাহারায় থাকব। যেখানে আস্তানাটা, তার কাছাকাছি কোনো গাছও ছিল না, জঙ্গলও নয়। জায়গাটা ফাঁকা, কেন জানি না। রাস্তা থেকে কিছুটা ভিতরে। পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ি নালা বয়ে গেছে। নালার মধ্যে একটি দহ হয়েছে। তাতে বদ্ধ জল। অনেক মাছ রয়েছে তাতে দেখলাম। ঠিক করলাম পরদিন কোনো কায়দায় কিছু মাছ ধরে মৎস্যমুখী করা যাবে। গাছের কথা এজন্যে বললাম যে, গাছে বসে পাহারাতে থাকলে নজর অনেক দূর অবধি চলত, তবে মানুষখেকো বাঘ অত বোকা নয়। তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। কারা খাদ্য আর কারা খাদক সে জ্ঞান তাদের অতি টনটনে।

তবে একথা ঠিক যে, মানুষখেকো বাঘ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত ছিল। হাজারীবাগের সীতাগড়ার মানুষখেকোর অভিজ্ঞতা অবশ্য ছিল কিন্তু সে বাঘ রেকর্ড সাইজের হলেও তার মানুষখেকো বদনামটা প্রায় জোর করেই দেওয়া। সে মাত্র দুটি মানুষ খেয়েছিল। তবে একথাও ঠিক যে, মারা না পড়লে সময়মতো সে অনেক মানুষ হয়তো খেত।

আমাদের বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম প্রণব রায় (বন্দুক রাইফেলে অলিম্পিক প্রতিযোগী) মধ্যপ্রদেশের কুখ্যাত পান্নার মানুষখেকো চিতা মারতে গেছিল। মারতে পারেনি সময়াভাবে, কিন্তু তার সঙ্গে এনকাউন্টার হয়েছিল। প্রণবের মুখে সেই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম।

যাই হোক, সেই রাত পোহালে আমরাও খুশি হলাম যে সাপে আমাদের কামড়ায়নি এবং বাঘে আমাদের খায়নি বলে। আর বাঘ-সাপও অবশ্যই খুশি হল তারা আমাদের হাতে 'ফওত' হয়নি বলে।

কিন্তু যা ঘটার তা ঘটলো পরদিন বা পরের রাতে। সেটা ঘটনা, না দুর্ঘটনা, না আমার বিকার তা এখনো সঠিক জানি না। কারোকে বলতে লজ্জাও করে। আবার না বললেও পেট ফাটে। চাঁদুবাবুর পিতৃদেবের রাজত্বে আমার যে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা চাঁদুবাবুকে বলতে চাঁদুবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে আমার চোখে চেয়েছিলেন। সত্যি বলছি কিনা পরখ করার জন্যেই বোধহয়। তারপর বলেছিলেন, যারা জঙ্গলে ঘুরেছে ছোটবেলা থেকে তারা এই কাহিনী আজগুবি বলে উড়িয়ে হয়তো দেবে না কিন্তু শহরের লোকে ঠাট্টা করবে।

আমি বলেছিলাম, করলে করবে। শহরের লোকের সঙ্গে রুজির সম্পর্ক ছাড়া আমার অন্য সম্পর্ক নেই। তাদের আমার ভালোও লাগে না।

এবার ঘটনাটা বলি।

সকালে আমরা মুড়ি আর নিজেদেরই ভাজা বেগুনি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। তারপরে জিপটা আসতে জিপে করে চারদিকে একটু ঘুরে দেখে আসবার জন্যে বেরোলাম। খোঁজখবর নিতেও। প্রথমেই যে গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানেই শুনলাম যে গতকাল বিকেলেই মানুষখেকো বাঘে একটা বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেকে নিয়েছে। রাতেই যে নিয়েছে তা অবশ্য কেউই জানত না, ওরা জানতে পারে আজই সকালে এবং আকস্মিক ভাবেই। ওরা মড়িটিকেও আবিষ্কার করেছে। একটি পা, পেছনের কিছু অংশ এবং বাঁ হাতটি খেয়েছে বাঘে। তারপর মড়িকে টেনে নিয়ে একটি শুকনো নালার মধ্যে রেখেছে গাছের চন্দ্রাতপের নীচে, যাতে উপর থেকে শকুন না দেখতে পায়। নালাটার ওই অংশটি শুকনো হলেও অন্য অংশে জল আছে। তবে বাঘ মড়ির কাছাকাছি নেই, কারণ ওরা একটু আগেই মড়ি দেখে এসেছে।

মড়িতে মিছিল করে না যাওয়াই ভালো। তাই আমি আর দুর্গাকাকুই গেলাম জিপ ছেড়ে। আধমাইলটাক হেঁটে গিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি পরিষ্কার মাঠ। সেখানে কোনো গাছ-গাছালি নেই। মনে হয়, কিছুদিন আগেই ক্লিয়ার-ফেলিং হয়েছে। শালের প্ল্যানটেশান ছিল আগে। এ-অঞ্চলের শালগাছ বেশ ভালো।

অপরিসর নালাটি। পড়ে থাকা ছেলেটির মুখ দেখলে ভারি মায়া হয়। মুখে কিন্তু তার একটুও বিকৃতি ছিল না, বরং গভীর এক প্রশান্তি ছিল। মানুষখেকো বাঘের কবলে পড়েও সে যেন মৃত্যুর মুহূর্তে ভয় পায়নি একটুও, যেন আনন্দিতই হয়েছে—এমনি শান্তশ্রী তার মুখে।

মৃত মানুষকে তো জিজ্ঞেস করা যায় না সে যে কেন খুশি অথবা অ-খুশিই বা কেন? তাই মনে মনে নানা কথা কল্পনা করে নিলাম।

আমি আবদার করলাম গুরুজনদের কাছে যে, একাই বসব মাচাতে মানুষখেকো বাঘের অপেক্ষাতে। তবলা, ক্ল্যারিওনেট এবং জগঝম্প নিয়ে মাচাতে বসে যাত্রাপার্টির হরকৎ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

পিতৃবন্ধু দুর্গাকাকু অনুমতি দিলেন। বাবা অথবা প্রশান্তকাকুর পক্ষে সারারাত মাচার নীচে শব নিয়ে মাচার উপরে নিঃশব্দে বসে থাকা অসম্ভবই ছিল। সারা বছর চেয়ারে-বসা কাজ করে হঠাৎ মানুষখেকো বাঘ মারতে ইচ্ছা করলে সেই বাঘের খাই-খাই ভাবকেই তোল্লা দেওয়া হবে। আমি তখনো পুরোপুরি চেয়ারের আঠাতে আটকাইনি, প্রায়ই শিকারে যাই এবং নিয়মিত টেনিস খেলি। তাই আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস স্বভাবত বয়স্ক গুরুজনদের চেয়ে বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও আমি একা বসব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েও যে খুব একটা ভালো কাজ করিনি তা পরে বুঝেছিলাম।

গোলমাল না করে মাচার কাছ থেকে সকলেই ধীরে ধীরে জিপের দিকে ফিরে গেলেন। আমি একাই রইলাম, আড়াল নিয়ে, যদি বাঘ আবার ভাগ্যক্রমে মড়িতে ফেরে। বড় বাঘ অনেক সময় দিনমানেও ফেরে মড়িতে। তার বেলা কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম খাটে না। বাঘ মানেই অনিয়মের সংজ্ঞা।

কিছুক্ষণ পর দড়িদড়ার বিকল্পে ''নই'' (বন্যলতা) এবং একটি দড়ির খাটিয়া নিয়ে জিপ ফিরে এল। দুর্গাকাকুর সঙ্গে পরামর্শ করে যে গাছে মাচা বাঁধলে বাঘের যাওয়া-আসার পথ এবং মড়িটিও চোখে পড়বে এমন একটি গাছকে আগেই চিহ্নিত করে রেখেছিলাম, তাতেই মাচা বাঁধতে বসলাম। গাছটি একটি তেঁতরা গাছ—বেশ ঝাঁকড়া।

মাচা বাঁধা হলে মাচাতে উঠে একটু নড়েচড়ে দেখলাম রাতে গলে পড়ব কি পড়ব না, শব্দ হয় কি হয় না কোনোরকম। তবে যাঁরাই বাঘ শিকারের জন্য মড়ির উপরের মাচায় কখনো বসেছেন, তাঁরাই জানেন যে দিনমানে শব্দ-টব্দ বোঝা আদৌ যায় না। দিনে যে মাচা নিঃশব্দ, রাতের গভীর নিস্তব্ধতাতে সেই মাচাই দিব্যি বাঙ্ময় হয়ে উঠে শিকারীর সাংঘাতিক অস্বস্তি এবং বিপদ ঘটাতে পারে।

মাচাতে বসে দেখলাম মড়িটা মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ক্লিয়ার-ফেলিং হয়ে যাওয়াতে মড়ির বাঁ পাশটাতে বিস্তীর্ণ মাঠ। দুধলি ঘাসের মতো ঘাস গজিয়েছে সেই মাঠময়। তবে সে ঘাস এত বড় হয়নি যে, বাঘ আমার নজর এড়িয়ে তার মধ্যে দিয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার বিশ্ব-চরাচর উদ্ভাসিত-করা জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসতে পারবে।

মন বলল, বাঘ এলে আসবে ডানধারের গভীর জঙ্গলেরই মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মড়ি থেকে তার ফিরে যাওয়ার দাগ চলে গেছিল ওই বাঁদিকের মাঠেরই মধ্যে দিয়ে—মাঠ-পেরুনো জঙ্গলের গভীরে, বন-কোরকে। সেদিকের হরজাই জঙ্গলে কিছু মিটকুনিয়া, রশি, বিজা, কুরুম, হলুদ ইত্যাদি গাছ ছিল। হলুদ আর হলুদ গাছ এক নয়। হলুদ গাছ ছোট ছোট হয়, ঝাড়ের মতো; আর হলুদ এক রকমের বড় গাছ, সস্তার ফার্নিচার হয় ওই কাঠে। সস্তার দিনকালে জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহৃত হত। বিজা ইত্যাদি গাছ খুবই শক্ত কাঠের গাছ। সাধারণত খুব উঁচু পাহাড়ি জায়গাতেই হয়। কিন্তু এই অঞ্চলটি কমবেশি সমতলই, তাই ওইসব পাহাড়ি গাছ সেখানে দেখে একটু অবাকই হলাম।

ঠিক হল যে অহিংস জৈনদের মতো খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে, একটি কম্বল আর জলের বোতল সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মাচায় উঠে পড়ব, কমপক্ষে এক ঘণ্টা মতো বেলা থাকতে থাকতেই। আমার রাইফেলের আওয়াজ শুনলে দুর্গাকাকু খিদমদগারদের সঙ্গে নিয়ে জিপ নিয়ে রাতের বেলাই হ্যাজাক জ্বালিয়ে মাচার কাছে আসবেন বাঘ অথবা আমার মৃতদেহের খোঁজে।

আর রাতে গুলির শব্দ না শুনলে রাত পোয়ালেই আসবেন।

আমাদের কিলবগার নির্জন, অনাড়ম্বর এবং গরিবী আস্তানার খিদমদগারদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মৈথুনানন্দ। আমাদের থাকা-খাওয়ার, আদর-যত্নের বন্দোবস্ত সেখানে সাদামাটাই ছিল। কিন্তু আন্তরিকতার অন্ত ছিল না। বীরেনবাবু বাহুল্যে বিশ্বাস করতেন না বটে কিন্তু আমাদের কোনোরকম অসুবিধেই যাতে না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর।

খুঁটিনাটি সবকিছুর বন্দোবস্ত করে তবেই তিনি গতরাতে ফিরে গেছিলেন, চরে-বরে খেতে দিয়ে। অত্যাধিক আদর করলে অতিথির স্বাধীনতা যে ক্ষুণ্ণ হয়, এই সরল কথাটা অনেকেই বোঝেন না।

'মৈথুনানন্দ' নাম এর আগে কোথাওই শুনিনি। পাঠক, আপনিও শুনেছেন কি?

ছেলেটি আমারই বয়সী হবে। তখন ওর পঁচিশ বছর মতো বয়স। স্বাস্থ্যবান, হাসিখুশি, রসিক। কথায় কথায় ওড়িয়া প্রবাদ আওড়ায়। খিলখিল করে হাসে। জংলী নিম গাছে উঠে "দাঁতন" পেড়ে দেয়। নিজে অবশ্য গুড়াকু লাগায় পরিপাটি করে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নামটি কে রেখেছিল বাপ?

মৈথুনানন্দ হেসে বলেছিল, কাঁই, মোর বাপ্পা!

কারো বাবা নিজের ছেলের নাম মৈথুনানন্দ রাখতে পারেন তা জেনে আমার খুবই অবাক লেগেছিল। বি-পিতা বা উপপিতা হলেও না হয় কথা ছিল।

বিকেলে যখন জিপে করে বেরোচ্ছি অকুস্থলের উদ্দেশে, তখন দুর্যোধন জিপ চালিয়ে নিয়ে চলল আর সঙ্গে মৈথুনানন্দ। খিদমদগারদের মধ্যে দুর্যোধন সব্যসাচী অথবা বিচিত্রবীর্য, কম্বাইন্ড হ্যান্ড। যখন যা প্রয়োজন সবেতেই সে সামিল হাসিমুখে। আমার কম্বল আর জলের বোতলের জিম্মা নিয়েছিল মৈথুনানন্দ।

জঙ্গলে এপ্রিলের শেষ অবধিও ঠাণ্ডা থাকে। রাতে তো থাকেই।

বাবা ও দুর্গাকাকু তখন ডিনারে মুগের ডালের খিচুড়ি হবে না মুসুর ডালের, এ নিয়ে সিরিয়াস আলোচনাতে মত্ত। এবং তাতে তরকারি পড়বে-না ভাজা-ভুজি হবে? মনান্তর হয়-হয় ভাব। ছেলেকে মানুষখেকো বাঘে নেবে কি না নেবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা দেখা গেল না আমার বাবার। বরং প্রশান্তকাকুই জিপের পাশে এসে "গুড লাক লালা, কাল সকালে বাঘ আনতে যাব।" বলে আমাকে হ্যান্ডশেক করে বিদায় দিলেন।

আমি বললাম, যাই।

উনি জিভ টাগরাতে ঠেকিয়ে, কল্যাণসূচক একটু চক্ শব্দ করে বললেন, যাওয়া নেই বাবা—এsso!

কিলবগার ডেরা ছেড়ে বেরোবার পরেই ব্যস্তবাগীশের মতো একটু বেশি আগেই রওয়ানা হয়েছি বলে মনে হল। গরমের দিন, সূর্য ডুবতে তখনো বেশ দেরি ছিল।

এমন সময়ে শ্রীমান মৈথুনানন্দ বলল, চালন্তু বাবু। আপনংকু শরীর টিকে মেরামত্ব করি দিউচি!

কেমতি?

আমি শুধোলাম অবাক হয়ে। শরীর কি মোটরগাড়ি যে মেরামত করবে?

তা ছাড়া আমার শরীরে তো কোনো বৈকল্য ঘটেনি!

ও চোখ নামিয়ে, নাক নাড়িয়ে বলল, চালন্তু চালন্তু আইজ্ঞাঁ! দেখিবে! বলেই দুর্যোধনকে চোখ টিপে কি যেন ইশারা করল।

শরীর মেরামতির প্রস্তাবে দুর্যোধনের কিন্তু যে খুব একটা আহ্লাদ হল, এমন মনে হল না। মানুষটা সিরিয়াস ধরনের। দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণে তার যতটা মতি, পুরুষের "শরীর-গতিক" নিয়ে ততটা যে নেই, তার হাল-চাল দেখেই দু'দিনেই বুঝেছিলাম।

হবু মানুষখেকো-বাঘ শিকারী আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম। একে দুর্যোধন তায় মৈথুনানন্দ। একেই বলে সোনায় সোহাগা! এদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বোটকা-গন্ধ প্রেমানন্দ মানুষখেকো বাঘের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব তো আদৌ?

মৈথুনানন্দর চোখের ইশারাতে দুর্যোধন জিপের স্টিয়ারিং আমাদের গন্তব্যের উল্টোদিকে ঘোরাল। এবং মিনিট দু-তিনেকের মধ্যেই লাল-ধূলি-ধূসরিত নির্জন পথপাশে, শালের ঘন ঝাঁটিজঙ্গলের মধ্যে একটি ঝুপড়ির সামনে জিপটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো।

এবারে থ্রি-সিক্সটি-সিক্স, নাইন পয়েন্ট থ্রি রাইফেলটা আনিনি। সঙ্গে নিয়েছি বাবার থার্টি-ও-সিক্স ম্যানলিকার শুনার। এই রাইফেলটি ব্যবহার করতে আরো সুখ, হালকা বলে নিশানা নেওয়াও যায় চকিতে। তবুও আমার হাতের রাইফেল সঙ্গে না থাকাতে মনটা খুঁতখুঁত করছিল।

কে জানত কিলবগাতে এসে মানুষখেকোর এমন হঠাৎ মোকাবিলা করতে হবে! তাছাড়া শিকারে তো আসিওনি, জঙ্গলে থাকতেই এসেছি। আমাদের কোনোকিছুই শিকার করার পারমিটও ছিল না। তাই তো নিত্যানন্দ হয়ে মাছ ধরছিলাম কিলবগার দহতে।

দুর্যোধন জিপ নিয়ে দশ মাইল দূরের বড় গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর করে এসেছে সকালেই। বাঘটিকে ম্যানইটার ডিক্লেয়ার করেছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। অতএব এই বাঘ মারার জন্য পারমিটের দরকার তো নেইই, উল্টে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হলে চামড়াপ্রাপ্তির উপরে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারও আছে।

বারে বারেই আমার শুধু মৃত ছেলেটির কথাই মনে হচ্ছিল। সে বয়সে আমার চেয়েও ছোট। এর আগে দুর্ঘটনাতে মৃত শব বহু দেখেছি কিন্তু বাঘে-মারা-মৃতদেহ দেখা ওই প্রথম। বাঘে-মারা জানোয়ার এক জিনিস, আর মানুষ অন্য। বিভীষিকার সৃষ্টি হয়, তার উপরে দুর্গন্ধ। নানারকম মিশ্র অনুভূতি হয়। অস্বস্তিকর।

তাছাড়া মানুষখেকো-বাঘে-মারা মানুষের মৃতদেহ তো বটেই, মানুষখেকো বাঘের হরকৎ সম্বন্ধেও, বলতে গেলে, তখন আমি প্রায় সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। বেশ কয়েক বছর পরে কালাহান্ডীর জঙ্গলে গেছিলাম কে. ই. জনসন, জিম ক্যালান এবং দুর্গাকাকুর সঙ্গে। সেখানে সুন্দরবনেরই মতো মানুষখেকো বাঘেদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু সেখানে যদিও প্রতি গ্রাম থেকেই কমবেশি আগে মানুষ নিয়েছে একথা জানা গেছিল, কিন্তু আমরা সেখানে থাকতে মানুষ একটিও মারেনি বাঘে, গরু মেরেছিল অবশ্য। বাঘে মানুষ না মারলেও সেবারে জনসন সাহেব বড় বাঘ মেরেছিলেন, অ্যাট লাস্ট। সে-কাহিনী আছে 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'র প্রথম খণ্ডে। অবশ্য সুন্দরবনে গেছিলাম তার আগে বহুবারই, কিন্তু সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে "ফক্কুরি" করার সাহস হয়নি আমার মতো বীরপুরুষের।

জিপ থেকে নামতে বলল মৈথুনানন্দ আর দুর্যোধন।

শুনলাম, দু-তিনজন মানুষ কথা বলছে ঝুপড়ির ভিতরে।

আমি বললাম, মানুষখেকো বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এই বনের মধ্যে ঝুপড়িতে কী হচ্ছে? কারা থাকে এখানে? বন্দুক আছে? এরা কারা? বন্দুক নেই, গুলি নেই—কী দুঃসাহস!

দুর্যোধন হেসে বলল, বন্দুক নাহি আইজ্ঞা, তবে গুলি অছি।

গুলি! বন্দুক নেই তো শুধু গুলি দিয়ে কি করবে?

হউ, এ গুলি, সে গুলি নহে! বলেই হাসল মৈথুনানন্দ।

তার বড় আহ্লাদ হয়েছে মনে হল। কিন্তু আহ্লাদের কারণটি বোঝা গেল না।

মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে দেখি, দুজন লোক সে প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে ছুরি দিয়ে এককাঁড়ি কচি কচি পাতা, কোন্ গাছের পাতা তা বোঝা গেল না, চিরে চিরে সরু সরু ফালি করছে। আরেকজন একটা অদ্ভুত-দর্শন পাত্রে সেই পাতার ফালিগুলো নিয়ে ভাজছে, খুব মনোযোগ দিয়ে, কাঠের উনুনে। জঙ্গলে উনুন মানেই অবশ্য কাঠেরই উনুন। সেই অদ্ভুতদর্শন পাত্রটা দেখতে অনেকটা প্রদীপের মতো, কিন্তু দু'পাশের কানা আরো উঁচু।

আমি বললাম, ওগুলো কিসের পাতা?

একটি লোক মুখ না খুলে, কারণ তার মুখ গুণ্ডি আর পানে ভরা ছিল, আমাদের গায়ে পানের পিক না ছিটিয়ে, কোনোক্রমে বলল, পিজুড়ি-পত্র!

অর্থাৎ পেয়ারা পাতা।

ওড়িশাতে পেয়ারাকে পিজুড়ি, কাঁঠালকে বলে পনস আর পেঁপেকে বলে অমৃতভাণ্ড। লোক তিনটি আমাকে তাদের সেই হাউড-আউটে গদা-হস্তে ভীমের মতোই রাইফেল-হস্তে ঢুকতে দেখে আদৌ খুশি হয়নি বলে মনে হল। মুখ গোমড়া করে ছিল। ওদের ওই ঝুপড়িটিও কিলবগাতে আমাদের আস্তানারই মতো পরিত্যক্ত বলে মনে হল। কোনো বে-আইনী অপকর্ম করার জন্য আইডিয়াল।

পাতাগুলো বেশ কড়া করে কুড়মুড় করে ভাজতে ভাজতে ওগুলো যখন কালো হয়ে এল, তখন মাটিতে রাখা অন্য একটি পাত্র থেকে কী এক গাঢ় তরলিমা উপুড় করে সেই প্রদীপাকৃতি পাত্রে ঢেলে দিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিবিষ্টমনে নাড়তে-চাড়তে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই পাত্রটা নামিয়ে নিলো উনুনের উপর থেকে। তারপর তিনজনে মিলে হাতে হাতে ছোট ছোট গুলি পাকাল সেই পক্ব বস্তু দিয়ে। ছোট মানে, গোল মুড়ির মতো কিন্তু গোলমরিচের চেয়ে বড়।

দুর্যোধন বলল, বাব্বু, মত্বে দ্বিটা টংকা দিয়ন্তু!

দু'টাকার একটি নোট বের করে দিলাম হিপ-পকেটের পার্স থেকে ওকে।

সেই টাকার বিনিময়ে গোটাআষ্টেক কেলে, দুর্গন্ধ বড়ি সংগ্রহ করে মৈথুনানন্দ বলল, চালন্তু আইজ্ঞা। এব্বে গুট্টে নিয়ন্তু, আউ রাত্বিরে দেহ ভল না পাইলে আউ গুট্টে নেই নিবে—বুঝিলে বাব্বু?

আমি বললাম, হঃ। কিন্তু জিনিসটা কি?

একটা মুখে ফেলেই দেখো না! সর্বরোগহারী, সর্ব ভয়নাশিনী, হঃ আইজ্ঞা। শক্তিপ্রদায়িনী, অন্টপরাস, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠকাঠিন্য যেত্বে প্রেকার রোগ অছি সব্ব নিরাময় হই যিবে।

এ পাটুরে গুলি পশিবে আউ সে পাটুরে রোগ বাহিরিবে!

হঃ আইজ্ঞা। পশিবে আউ রোগ বাহিরিবে, টিক্কে দেখি হেব্বনি, বুঝি পারিবেনি। হঃ, আউ কঁন?

মনে মনে বললাম, বাবা! এ যে নাজিম সাহেবের ওড়িশী সংস্করণ! "গোলি অন্দর জান বাহার"—সাথেসাথ!

মানুষখেকো বাঘের ভয় আমাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছিল ক্যাম্প ছেড়ে বেরুবার পরেই। কী হল জানি না, কোন্ প্রক্রিয়াতে হল জানি না, বড়িটি খাওয়ার সামান্যক্ষণ পর থেকেই কিন্তু বেশ চাঙ্গা চাঙ্গা লাগতে লাগল। পঞ্জাবিরা জিজ্ঞেস করলে যেমন বলে না, কি হাল হ্যায়?

চেঙ্গা!

আমিও বেশ "চেঙ্গা" হয়ে গেলাম।

বললাম, মত্বে আউ দ্বি-চারিটা দিয়ো! আউ টংকা লাগিবে কি?

মৈথুনানন্দ গুড়াকু দিয়ে মাজা কেলে কেলে দাঁত বের করে হেসে, শোনা যায় এমন স্বগতোক্তি করলো, গুলি বাজিলারে বাজিলা!

এমন করে বলল, যেন বাঁশি বাজার কথা বলছে। রাধার বুকে যেন শ্যামের বাঁশিই বাজলো।

সেই কুঁড়েঘরের মানুষগুলি কিন্তু আমাকে টোটালি ইগনোর করছিল। রীতিমতো অপমানিত লাগছিল আমার।

আরো কিছু "টংকার" বিনিময়ে অ্যাডিশনাল গোলাগুলি সংগ্রহ করে আমরা ঝুপড়ি থেকে বেরোলাম।

ওদের বললাম, দ্যাখো দেরি হয়ে গেল, মাচাতে গিয়ে বসতে বসতে অন্ধকারই হয়ে যাবে প্রায়। কী যে করছ তোমরা!

মৈথুনানন্দ বাঁ হাতের পাতা দিয়ে চোখ আড়াল করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী দিয়ে একটি গোল্লা পাকিয়ে সূর্যকে জরিপ করে বলল, বহত দেরি অছি বেল বুড়িবাকু। কাই আপন্ব এতে চঞ্চল হেল্বে বাবু!

তারপর বলল, হঃ, "রাজা বুঝা, যাহা বুঝিবে, বুঝিবে।"

অর্থাৎ হ্যাঃ, রাজার মাথায় যা ঢুকল, তার আর নড়চড় নেই!

মৈথুনানন্দ এক চোটেই চারখানি বড়ি মুখের মধ্যে চালান করে দিয়েছিল। এক গুলিই যথেষ্ট, তার চার গুলির চোট।

দুর্যোধন কিন্তু একটিও গুলি খেল না।

মৈথুনানন্দকে বলল, যড়া, তোর জমারু রেপনসিবিলিটি জ্ঞান নাত্তি! ফিরিকি বাব্বুমানংকু খাইবা-পিবা দেখিবি, সেমানংকু দেহ টিপি দেবি, না যড়া তু অফিম-গুলি গিলি বসিলু! আউ বাব্বুটা ম্যানইটার মারিবা পাঁই যাউচি, তাংকু পর্যন্ত দেলি! তু যড়া বেধুয়া।

আফিং?

বলে কি এরা?

আমার বুদ্ধি ফিরে আসতে লাগল, উপে গেছিল যা।

আমি ভেবেছিলাম, চ্যবনপ্রাশ-টাশ কিছু হবে বুঝি।

নাম শুনেই ধাক্কা খেলাম একটা। কিন্তু মিথ্যা বলব না, খেয়ে বেশ চাঙ্গা-চেঙ্গা লাগতে লাগলো।

জীবনে কোনো এবং কোনোরকম অভিজ্ঞতা থেকেই বঞ্চিত হতে চাইনি। তখন তো জানতাম না যে একদিন লেখক হব! কিন্তু আজ যখন পেছন ফিরে তাকাই তখন বুঝতে পারি এই জীবনে যা-কিছুরই মুখোমুখি হয়েছি তার সবকিছুকেই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে

টক্কর মেরে যাচাই করে নেওয়ার যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল, তা লেখক হিসেবে আমাকে অবশ্যই বিচিত্র সব শারীরিক এবং মানসিক অভিজ্ঞতাতে সম্পৃক্ত করেছে। সেই অভিজ্ঞতার নৈবেদ্য, নিঃসংশয়ে আমার পাঠক-পাঠিকাদের ভোগে লেগেছে। লেখকের নিজের জীবনেই যদি সুখ দুঃখ মিলন বিরহ এবং নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা পরম তীব্রতার সঙ্গে অনুভূত না হল, লেখকের জীবন তাতে সিঞ্চিত না হল, তবে পাঠক-পাঠিকাকে কোন্ মূলধন দিয়ে তিনি আনন্দ অথবা দুঃখ দেবেন? কোনো প্রকৃত লেখকই সম্ভবত তাঁর নিজের জন্য বাঁচেন না। তাঁর জীবনের যা-কিছু অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা তা তিনি নিঃশেষে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের বিলিয়ে দিতে পেরেই ধন্য বোধ করেন। নিজের জমার ঘরে তাঁর যতই শূন্যতা বাড়ে, যতই তিনি নিঃস্ব হয়ে উঠতে থাকেন, ততই তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। হয়তো সেই সঙ্গে তাঁর পাঠকের মনও।

মাচাতে ওঠার আগে একবার ভালো করে জল খেয়ে নিলাম। পরে জল না খেলেই ভালো। ওয়াটার-বটল থেকে জল খেলে সেই নড়াচড়া ও শব্দ ধূর্ত মানুষখেকোকে সাবধান করে দেবে। মাচায় চড়ে কম্বলটা আর ওয়াটার-বটলটা পাশে রেখে "সেটলড" হলে পরে মৈথুনানন্দ ও দুর্যোধন জোরে জোরে কথা বলতে বলতে হেঁটে গেল দূরে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের নীচে পার্ক-করে রাখা জিপের কাছে। তারপর তারা জোরে হর্ন বাজিয়ে, ইঞ্জিনের ঝড়ের মতো গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে কিলবগার ক্যাম্পে ফিরে গেল। ইচ্ছে করেই, যাতে বাঘ ধারেকাছে থাকলে ভাবে যে, যে-আপদেরা এসেছিল তারা বিদায় হল।

ওরা চলে যেতেই নিস্তব্ধতা নেমে এল।

বৈশাখের বন-পাহাড় আমাদের দেশে যে কী সুন্দর তা কী বলব! "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। সার্থক জনম আমার তোমায় ভালোবেসে।" কানাডা, স্টেটস, জাপান বা ইওরোপের বিভিন্ন দেশের হেমন্তর সুন্দর রঙেও অবশ্য লাল হলুদ বাদামি খয়েরি কালোতে দাঙ্গা লেগে যায়। তবে আমাদের দেশের পর্ণমোচী বনের এই পাতা-ঝরানোর সময়ে যে সৌন্দর্য তার কোনো তুলনাই নেই। আমাদের বনে পাহাড়ের বৈশাখী-পূর্ণিমার, শ্রাবণী-পূর্ণিমার এবং লক্ষ্মী-পূর্ণিমারও তুলনা নেই। তবে লক্ষ্মী-পূর্ণিমাতে একবার সুইট্জারল্যান্ডে ছিলাম। তুষারাবৃত আল্পস পর্বতমালাকে ভারী সুন্দর লেগেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের নেপাল সীমান্তের বা কুমায়নী বা গাড়োয়ালি হিমালয়ের যা গাম্ভীর্য, যা ব্যক্তিত্ব, যা সৌন্দর্য—তা পৃথিবীর আর কোথায় আছে?

দোল-পূর্ণিমাতে আলো তেমন খোলে না, কারণ রাতে তখনো আমাদের বনে-পাহাড়ে কুয়াশা, হয়, শিশির ঝরে। আকাশে তখনো কিছু জড়তা থাকে, সম্বন্ধ করে বিয়ে-করা নববধূর মতো। কিন্তু বৈশাখে প্রকৃতি যেন লজ্জাহীনা প্রেমিকার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে—"ও যে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে, না না না। যত আমি বলি তবে এবার যে যেতে হবে, মুখপানে চেয়ে বলে, না না না, ও যে মানে না মানা।" দারুণ খসস্ আর ফিরদৌস আর জুহি আতরের মিশ্র গন্ধ ওঠে বনে বনে তখন। শিলাজতুর গন্ধ তীব্র, উগ্র, কানীন অথচ স্নিগ্ধ। অননুভূত কামনার বার্তা বয়ে নিয়ে এলোমেলো হাওয়া ছোটাছুটি করে এদিক-ওদিকে, খেলা করে চাঁদের আলোর সঙ্গে। আলো-ছায়ার বাঘবন্দী খেলা—ছেলেবেলাতে আমরা খেলার সাথীদের সঙ্গে যেমন এলেবেলে খেলতাম।

সেই চাঁদটা থালার মতো উঠল পূর্ব দিগন্তে। আর সূর্য অস্ত গেল পশ্চিমে। প্রকৃতি যেন যাদু করলো আমায়, মোহাবিষ্ট।

পরক্ষণেই মনে হল একবার যে, আফিং-এর গুলি খেয়ে আমার এই প্রকৃতি-তন্ময়তা বেড়ে গেলো না তো! যদি জিওমেট্রিক প্রগ্রেশানে বেড়ে যায়, তবে কী হবে? আমি তো আর শিশু নই, মৈথুনানন্দর কথা শুনে "টিক্কে শরীর মেরামতী" করতে গিয়ে যমালয়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে পৌঁছনোর ইচ্ছা যে কেন চাগলো কে জানে! চিরদিন এমনি করে এলাম, জীবনের সব ক্ষেত্রেই। কোনো উচিত কর্মই করা হল না এ জীবনে।

তারপরে ভাবলাম, বাবাদের খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? মৈথুনানন্দ তো 'আউট' হয়ে যাবে, একমাত্র দুর্যোধনই 'ইন' থাকবে আর থাকবেন আমার বেচারী পিতৃদেব। অনেক জন্মের পাপ না থাকলে এমন সন্তানের জন্ম দেন তিনি।

কী হচ্ছে কে জানে! কোথায় বাঘের আগমনের উপরে এবং ছেলেটির অর্ধভুক্ত শবের উপরে মনোনিবেশ করব তা নয়, মন আমার পুটুসঝোপের নীচের খুদে বটেরের মতো ইতি-উতি, নড়ি-চড়ি, উড়ি-উড়ি করছে! অহিফেন কি চঞ্চলতা প্রদান করে? তাহলে চৈনিক দার্শনিকেরা কোন্ নেশা করেন—চণ্ডু, চরস! চণ্ডু-চরসের সঙ্গে আফিং-এর কী তফাত, তা তো ওসব না খেলে ছাই বোঝাও যাবে না। অবশ্যই কোনোদিন খেতে হবে।

তবে গাঁজা খেয়েছি শ্মশানে এবং পাহাড়ে। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সিদ্ধিও খেয়েছি একসময়ে নিয়মিত, আমার চেলা, সিঙ্গুরের পূর্ণ-পাধার কল্যাণে। পূর্ণ, পূর্ণতার সংজ্ঞা। একেবারে সাক্ষাৎ মহাদেব। লুঙি পরে। সিদ্ধি খায়। 'হ্যালো'র জায়গাতে বলে—'ব্যোম শংকর'। তার প্রকাণ্ড কোল্ডস্টোরেজের দারোয়ান প্রকাণ্ড লৌহফটক খোলার সময়েও বলে 'ব্যোম শংকর'। তার রাজত্বে ব্যোম শংকরই হচ্ছে হ্যালো, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড নাইট সব কিছুই। পূর্ণ বেনারস থেকে বিশুদ্ধ সিদ্ধির গুঁড়ো এনে দিয়েছিল আমাকে প্লাস্টিকের কৌটোতে। ফ্রিজে থাকত। অফিস থেকে ফিরে এলেই আমার তৎকালীন বাহন, ওড়িশার রাজকণিকার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠি ভালো করে পেস্তা বাদাম দিয়ে দুধ সহযোগে ভালোবাসা গুলে বানাত। তারপর ফ্রিজে রেখে দিত। চান করে উঠে জম্পেস করে এক গ্লাস সাবড়ে দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লেই ব্যস। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের হেপাজতে চলে যেত, নিজের মন চলে যেত শ্মশানে, কি দক্ষিণেশ্বরে। বেটি কালী প্রতি রাতে বাধ্য মেয়ের মতো দর্শন দিত। কারা যেন তাঁত বুনত আকাশে বিচিত্রবর্ণের সব সুতো টান টান করে। আমি না গেয়েই গাইতাম, "যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ, অযাচিত তব দান!"

রাত কত কে জানে, একটা কালপ্যাঁচা ডেকে উঠল ডানদিকের কনসর-এর দিকের গভীর জঙ্গল থেকে দুরগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্ করে। তার পরক্ষণেই একটা লক্ষ্মীপেঁচা সপ সপ করে ডানা নাড়িয়ে বাঁ দিকের দুধল ঘাসে-ভরা উদাসী প্রান্তরকে কোনাকুনি পেরিয়ে গেল। নীচে তাকিয়ে দেখলাম, ছেলেটির হলুদ-রঙা বগল-ছেঁড়া জামাটাকে সাদা দেখাচ্ছে চাঁদের আলোতে। আর শরীরের রক্ত-ভেজা অংশগুলি আর মাটিকে কালো মনে হচ্ছে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি স্থির হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যে, সময়ও বিশ্রাম নিচ্ছে এখন। ঈষৎ হাওয়াতে দোলাদুলি-করা শাখা-প্রশাখা ঝোপ-ঝাড় ছায়া ফেলছে। ছায়া নড়ছে, ছায়া সরছে, আর ছায়ার সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলছে চাঁদের আলো। আমার খুব ইচ্ছে হল আমিও একটু দাবা খেলি, নীচের সাদা-কালো চৌখুপি জমিতে। বার্গম্যান-এর "The Seventh Seal" ছবির নায়ক যেমন খেলেছিল মৃত্যুর সঙ্গে। তখন রাত কত কে জানে!

এই রাত আমাকে মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে। আমি ছেলেটির অর্ধভুক্ত শব এবং মানুষখেকো বাঘ, দুয়ের কথাই বেমালুম ভুলে গেলাম।

জলপিপাসা পাচ্ছিল খুবই, ওয়াটার-বটল খুলে জল খেলাম। তারপর খুব ইচ্ছে করলো আরেকটা গুলি খেতে। একটার বদলে দুটো গুলি খেয়ে ফেললাম একসঙ্গে। কিন্তু নেশা-টেশা আমার হয়নি। একটা দারুণ ঘোর—সুন্দর, আচ্ছন্ন ভাব।

এখন রাত কত তা কে জানে? বাবারা শেষ পর্যন্ত কোন্ ডালের খিচুড়ি খেলেন? সঙ্গে আর কী খেলেন? কিলবগাতে আসা অবধি তো শুধু খিচুড়িই খাওয়া হচ্ছে। এবেলা খিচুড়ি ওবেলা খিচুড়ি। বীরেনবাবু বামরা থেকে আমাদের বয়ে এনে এই কেউটের বাচ্চা-ভরা আর মানুষখেকো বাঘের আস্তানাতে ডাম্প করে দিয়ে সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, আর পাত্তাই নেই। ধারেকাছে বাজার-হাটও নেই। থাকলে কি আর বাবা এবং তাঁর সঙ্গীরা কিছুরই বা কারোরই পরোয়া করেন?

এখন রাত কত তা কে জানে?

ছেলেটি কি বিবাহিত? ওর ছেলেমেয়ে ক'টি? কে জানে!

এখন রাত কত তা কে জানে!

দারুণ লাগছে। মোহনের ছোটকাকা? ফাসকেলাস হোস্ট। এত জায়গাতে শিকারে গেছি, কোথাওই তো পিজুড়ি-পত্র ভাজা খাইনি, আফিমের তরলিমা-মাখা! অহো, কী দারুণ অনুভূতি!

এখন রাত কত তা কে জানে!

আচ্ছা, বাঘটা কি গুলি খেতে আসবে আমার হাতে? এই গুলি কোন্ পত্রের সঙ্গে কোন্ তরলিমা মেখে তৈরি করেছে ইংল্যান্ডের ইলি-কিনক কোম্পানি? কে জানে!

এ কী! হঠাৎই যেন শুনলাম, মল বাজার শব্দ? মেয়েদের পায়ের মলের শব্দ? মানুষখেকো বাঘের রাজত্বে, রাতের বেলা, মেয়েদের পায়ের মলের শব্দ?

অথচ ওড়িশার এইসব অঞ্চলের মেয়েরা তো মল তেমন পরে না!

কে এই...?

বাঁদিকে চেয়ে দেখি, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে-যাওয়া মাঠ পেরিয়ে সত্যিই একটি মেয়ে হেঁটে আসছে, যেন চাঁদের আলোতে ভাসতে ভাসতে—আসছে সোজা এদিকেই—যেন ছেলেটিরই দিকে।

কিন্তু...। আশ্চর্য!

এখন রাত কত তা কে জানে!

কিন্তু মেয়েটি স্থানীয় মেয়ে নয়। উত্তর ভারতে, বিহারে যেমন করে শাড়ি পরে মেয়েরা, মেয়েটি তেমন করেই শাড়ি পরেছে। আঁচল দিয়েছে উল্টোদিকে। তার আঁচল নৌকোর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে হাওয়াতে, আর পায়ের মল বাজছে রিম ঠিম রিম ঠিম।

মেয়েটা কি পাগল!

ও কি জানে না, যে-কোনো সময়েই বাঘ ওর ঘাড়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিতে পারে!

এ কী! এ কী! মেয়েটা যে সত্যিই আরো এগিয়ে আসছে। ফাঁকা মাঠটার প্রায় আধাআধি চলে এসেছে। নাঃ, এবারে তো চেঁচিয়ে কিছু বলতে হয়ই ওকে! গাছ থেকে নেমে, রাইফেল হাতে ওকে নিরাপদ জায়গাতে পৌঁছে দিতে হয় নিয়ে গিয়ে!

আমি চেঁচিয়ে বলতে গেলাম, এই যে, শুনো বহিন, শুনো!

কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজই বেরুল না। কে যেন গলা টিপে ধরলো আমার! ছেলেটা, না বাঘের দাঁত? নাকি মৈথুনানন্দই? সে নরাধম কোথায়? হতভাগা!

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ যখন বেরুল না, ঠিক তখনি ছেলেটির শব যেখানে পড়েছিল, সেখানে একটু খসখস শব্দ শুনলাম। শুকনো পাতা পায়ে মাড়ালে যেমন শব্দ হয় তেমন। শবের চারদিকে এবং উপরেও শুকনো পাতা পড়ে ছিল। তাহলে নিশ্চয়ই বাঘ এসেছে। আসার সময় পেল না? আমি বাঁদিকে যখন চেয়ে মেয়েটিকে দেখছিলাম, ঠিক তখনি বাঘ এসেছে ডানদিক থেকে!

পরক্ষণেই নীচে চেয়ে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে এল।

না, বাঘ নয়। বাঘ আসেনি।

ছেলেটি নালা ছেড়ে উঠে এসে চাঁদের আলোয়-ভরা মাঠে দাঁড়াল। পাঠক, বিশ্বাস করুন, ছেলেটি—যার একটা পা আর একটা হাত বাঘ খেয়ে গেছিল, কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম যে সেই অক্ষত অবস্থাতে ধুতি আর পাটভাঙা হলুদ জামাটি গায়ে মেয়েটির দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল আর মেয়েটিও যেন দৌড়ে আসতে লাগল তার দিকে। ওরা নিশ্চয়ই চেনে একে অপরকে! ওরা কি প্রেমিক-প্রেমিকা? চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে, হেসে হেসে মিলিত হতে চলেছে?

তারপরে?

তারপরে কি হল তা আমি জানি না পাঠক।

মাচার নীচে বারে বারেই খুব জোরে জিপের হর্নের শব্দে চোখ মেলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

দেখি, রোদ উঠে গেছে। বৈশাখের ভোরের হাওয়া বনের মিশ্র সুগন্ধ বয়ে নিয়ে রাতের সব ক্লান্তি অপনোদিত করে দিচ্ছে।

দুর্গাকাকু স্টিয়ারিং-এ ছিলেন, বললেন, কি হল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? রাতে বাঘ কি এসেছিল?

আমি কী বলব!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। তারপরই তাড়াতাড়ি নীচের দিকে চেয়ে দেখি, ছেলেটি যেমন শুয়ে ছিল তেমনই শুয়ে আছে। মৃতদেহটি শুধু আরো একটু ফুলেছে। একটু মানে ফুলে ঢোল। রাতে হাওয়াটার মুখ ছিল অন্যদিকে, এখন মুখ ফিরিয়েছে সে, দুর্গন্ধে বমি পাবার যোগাড়। নীল মাছি উড়ে উড়ে বসছে শবের উপরে নাকে-মুখে। কালকে মাছি ছিল না।

কী হল? বাঘ আসেইনি নাকি? দুর্গাকাকু আবারও শুধোলেন।

আমি মাথা নাড়লাম দুদিকে।

কাকে বলব, কী করে বলব—আমি যে অহিফেন-সেবী! আমি যে কমলাকান্ত হয়ে গেছি! আমার কথা তো কেউই বিশ্বাস করবে না, এমনকি প্রসন্ন গয়লানিও নয়।

দুর্গাকাকু শবের চারদিকে হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে দেখলেন, রাতে বাঘ এসেছিল কিনা নিরীখ করবার জন্য। এলে নালার নরম মাটিতে এবং শুকনো পাতাতেও তার চিহ্ন থাকত।

আমি নেমে এলে দুর্যোধন আর গ্রামের দুজন লোক চৌপাইটা গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে আগে আগে এগোল। গ্রামের পথে গিয়ে পড়লে দুর্গাকাকু জিপ স্টার্ট করলেন। আমি পাশে বসলাম। দুর্যোধন পেছনে উঠে বসলো।

আমি জানতাম, বাঘ আসবে না। ম্যানইটার বাঘ চার-ডবল চালাক হয়। বাঘ তো রাতে অন্য কিল করার মতলবে আমাদের ভিজিট করেছিল এসে।

দুর্গাকাকু স্বগতোক্তি করলেন।

তাই? মৈথুনানন্দ কোথায়? অবাক হয়ে বললাম আমি।

সে তো রাতে প্রায় বাঘের পেটেই গেছিলো আর একটু হলে। ব্যাটা আফিংখোর! বীরেনবাবুকে বলতে হবে এমন ইরেসপনসিবল লোকজন না-রাখতে। জঙ্গলে এদের মতো মানুষের উপরে ভরসা করে থাকা যায়!

তাই? বলেই আমি চুপ করে গেলাম। কাল বিকেলের পর, আমার মুখে ওই প্রথম কথা ফুটলো, তাই?

দুর্গাকাকু বললেন, ভেরি স্যাড!

কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যে ছেলেটিকে বাঘে ধরেছে, তার স্ত্রী গতরাতেই আত্মহত্যা করেছে। বিহারী মেয়ে, এক ঠিকাদারের মেয়ে, অবস্থাপন্ন। ওই ছেলেটির সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিল বলেই বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। ওরা বনের ধারে, কিলবগার নালাটারই পাশে, আমাদের পর্ণকুটির যেখানে তারই দুটি বাঁক পরে, একটি ঝুপড়ির মধ্যে থাকত। ছেলেটি ক্যুপ কাটত জঙ্গলের। তাকে পরশু বিকেলে বাঘে নেয়। মেয়েটি গতরাতে আত্মহত্যা করে, গাছ থেকে শাড়িতে ফাঁস দিয়ে ঝুলে।

আমরা তো ভালো জায়গাতেই ক্যাম্প করেছি!

আমি বললাম।

হ্যাঁ। আগে খোঁজখবর না নিয়ে এলে এমনি হয়। আর বীরেনবাবু তো কাঠের ব্যাপারী—কাঠ চেনেন, জঙ্গল তো আর চেনেন না! হয়তো ভালোও বাসেন না।

দুর্গাকাকু বললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার ডেড বডি কোথায়? মানে মেয়েটির?

চটে মুড়ে নিয়ে যাবে গ্রামের লোকেরা একটু পরেই বামরাতে—পোস্টমর্টেমের জন্য। আমি বলেছি যে, বাঘ যখন এলই না তখন ওই ছেলেটির লাশও নিয়ে যাওয়া উচিত একই সঙ্গে দাহ করার জন্য।

তাই তো উচিত।

আমি বললাম।

কিন্তু তা হবে না। দারোগা না এলে...। যদি ছেলেটির লাশ না নিয়ে যায়, তবে আজ রাতে আবারও বোসো তুমি।

না, না। আমি না।

আমি বললাম।

কী হয়েছে তোমার? হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছো!

দুর্গাকাকু বললেন।

তারপর আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, মানুষখেকো বাঘ কি অত সহজে মারা যায়? এ তো আর গো-খেকো মাথা-মোটা একগুঁয়ে বাঘ নয়? একবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে শিকারপুর চা-বাগান যেতে...

দুর্গাকাকু স্মৃতিমন্থন শুরু করলেন।

আমি নিরুত্তর রইলাম।

বললাম, মেয়েটিকে কে দেখেছে?

কোন্ মেয়ে?

যে আত্মহত্যা করলো?

দুর্যোধন গিয়ে দেখেছে শোরগোল শুনে। ওদের ঝুপড়ি আমাদের ক্যাম্প থেকে বেশি দূরে তো নয়!

কীরকম শাড়ি পরেছিল মেয়েটি?

আমি শুধোলাম দুর্যোধনকে।

ছাপাশাড়ি বাবু। খয়েরি ফুলফুল, সাদার উপরে।

হুঁ।

আমি এবারে স্বগতোক্তি করলাম।

তারপরই বললাম পায়ে কোনো গয়না ছিল?

হ্যাঁ।

কি? পায়জোর?

না, না। পায়জোর নয়—মল। ওরা তো বিহারী, মল পরে। রুপোর মল ছিল।

তাই?

আমি বললাম।

দুর্গাকাকু বললেন, কী ব্যাপার! তুমি হঠাৎ মেয়েটি সম্বন্ধে এতখানি ইনকুইজিটিভ হয়ে উঠলে যে?

নাঃ!

মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগে যুগান্তরের তুষারবাবুর একটা বই পড়েছিলাম, "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না"।

আমি কাকে দুষব এখন? মৈথুনানন্দ, না অহিফেনবাবু, না নিজেকেই? যাকেই দোষ দিই না কেন, এই ঘটনার কথা তো পাঁচজনকে বলা যাবে না। তাই আমার মনে মনেই থাকলো। পাঠক, যার যেমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তাই গ্রহণ করবেন। আমি আর কী বলব—একে আফিং-খোর, তায় ভূত-দেখা মানুষ!

(আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'বনজ্যোৎস্নায়—সবুজ অন্ধকারে' ২য় খণ্ড থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত)

ভূত ও রিপোর্টার

তারাপদ রায়

এই গল্পের নাম পাঠ করে অনুগ্রহ করে কেউ আমাকে ভূতবিদ্বেষী ভাববেন না।

ভূতবিদ্বেষী হতে গেলে যে পরিমাণ সাহস, যে রকম মোটা বুকের পাটা লাগে তা আমার নেই, কস্মিনকালেও ছিল না।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। ভূতের সঙ্গে যদি আমার শত্রুতা নাই থাকবে, আমি যদি ভূতবিদ্বেষী নাই হই তাহলে ভূতের মতো একটি প্রাচীন জীবকে আমি কেন এমন বিপদে ফেলব, আমি কেন ভূতকে রিপোর্টারের মুখে ঠেলে দেব।

সত্যি কথাটা হল আমি ভূতকে রিপোর্টার সাহেবের মুখে ঠেলে দিইনি। রিপোর্টার সাহেবই তাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

সম্পাদক মহোদয় রিপোর্টার সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন খরা কবলিত অঞ্চলে, সেই দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের একটা বাস্তবানুগ প্রতিবেদনের জন্যে।

কিন্তু রিপোর্টার সাহেব যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারেননি। তার আগেই প্রবল বৃষ্টি নামে এবং একটি স্থানীয় নদীতে ঢল ওঠে, পুরো এলাকা জলে ডুবে বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। খরার প্রতিবেদন করতে এসে বন্যার প্রতিবেদন করা সম্পাদক মহোদয়ের মনঃপুত হবে কিনা এই চিন্তা করে সদর অফিসে রিপোর্টার ফোন করতে গেলেন। কিন্তু এই বন্যায় ফোন অচল, টেলিগ্রামও তাই।

অকুস্থলের রেল স্টেশনে প্লাটফর্মের পাশে একটা পোড়ো ঘরে জলবন্দী হয়ে রইলেন রিপোর্টার সাহেব।

যথাসময়ে এ জায়গায় পৌঁছাতে পারলে রিপোর্টার সাহেবের এত নিগ্রহ হত না।

কিন্তু এখানে আসতে পথে চারদিন দেরি হয়ে গেছে। সেটা অবশ্য রিপোর্টার সাহেবের দোষ নয়।

পথে এক জায়গায় আফ্রিকার সোমালিয়ায় গণধর্ষণের প্রতিবাদে রেল অবরোধ হয়েছিল। দেড় দিন রেলপথ আটকিয়ে রাখে অবরোধকারীরা। অবশেষে জংশন স্টেশন থেকে রেলের বড় সাহেব এসে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ভবিষ্যতে যাতে এরকম আর না হয় সেটা তিনি দেখবেন। তখন রেল লাইন অবরোধ ওঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা বেগতিক দেখে রেলের ড্রাইভার, ফায়ারম্যান এবং

গার্ড—সবাই পলায়ন করেছেন, তাঁদের খুঁজে পেতে আনতে আরো দেড় দিন। অবশেষে রেলগাড়ি চালু করতে আরো একদিন। সবসুদ্ধ চারদিন দেরি হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় দিন থেকে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেটাও অবশ্য অবরোধ উঠে যাওয়ার একটা কারণ, চতুর্থ দিনের শেষে জলে ভাসতে ভাসতে রেলগাড়ি এসে যখন খরা অঞ্চলে, জেলাসদরে পৌঁছেছে তখন সরকার সেটাকে বন্যাগ্রস্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন।

এত কথা অবশ্য ভূতের গল্পে আসা উচিত নয়। কিন্তু গল্পটা ছোট ও পুরনো। তাই পটভূমিকা রচনা করবার জন্যে ভনিতা একটু দীর্ঘ করতে হল।

ফোন বিকল। টেলিগ্রামের খুঁটি জলে উপড়িয়ে পড়ে আছে। ট্রেন আসছে না। রিলিফের নৌকো এখনো এসে পৌঁছয়নি।

প্লাটফর্মের একপ্রান্তে পোড়ো ঘরে রিপোর্টার সাহেব আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণত রেল প্লাটফর্ম জলে ডোবে না। কিন্তু স্টেশন মাস্টার সাহেব বলেছেন দুবছর আগেও নাকি ডুবেছিল, বিশেষ করে খরার পরে বন্যা হলে সে নাকি খুব মারাত্মক।

প্লাটফর্মের পোড়ো ঘরের ভেতরটা একটা লোক লাগিয়ে ওয়াটারপ্রুফ করিয়ে নিয়েছিলেন রিপোর্টার সাহেব। কিন্তু প্রথম রাতেই ফ্যাসাদে পড়লেন।

চারদিনের ক্লান্তির পরে মেঝের ওপরে চাদর বিছিয়ে মাথায় পোর্টফোলিয়ো ব্যাগটা দিয়ে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘণ্টা কয়েক পরে কী একটা খসখসে শব্দে ঘুম ভাঙল তাঁর। ঘুম চোখেই টের পেলেন ঘরের মধ্যে কী যেন একটা ঘুরছে।

চোখে অন্ধকারটা সয়ে যাওয়ার পর রিপোর্টার সাহেব দেখতে পেলেন ভাঙা ঘরের বেড়া ঘেঁষে ঘেঁষে জীর্ণ শীর্ণ কী একটা ছায়ার মতো ঘুরছে।

একবার গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

ছায়ামূর্তি পালটা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?'

বেশ ন্যাকান্যাকা খোনা খোনা গলায়। রিপোর্টার সাহেব সে গলা শুনে বুঝতে পারলেন তাঁর ঘরে ভূত ঢুকেছে। তিনি জানতে চাইলেন, 'তুমি কি ভূত?'

ভূত বলল 'হ্যাঁ। আমি এই ঘরে থাকছি। তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ কেন?'

রিপোর্টার সাহেবের খেয়াল হল কেউ কেউ তাঁকে এ ঘরে থাকতে মানা করেছিল, বোধহয় এই কারণেই। কিন্তু এ নিয়ে এখন চিন্তা করে লাভ নেই। বরং ভূতের একটা ইন্টারভিউ যদি এই সুযোগে নেওয়া যায়। ভূতের মতো মানুষদের ইন্টারভিউ তো সারা জীবন ধরে নিচ্ছেন কিন্তু সাক্ষাৎ জ্যান্ত ভূতের সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্র জগতে হইহই পড়ে যাবে, সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক তৈরি হবে।

রিপোর্টার ভূতকে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, 'শোনো আমি একজন রিপোর্টার। তোমার ইন্টারভিউ নিতে চাই।'

রিপোর্টার এবং ইন্টারভিউ—এই শব্দ দুটো শুনে ভূত থরথর করে কাঁপতে লাগল, হাত জোড় করে বলল, 'আমি এই ঘর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার মতো থাকুন। আমাকে নিয়ে কিছু লিখতে যাবেন না।'

রিপোর্টার বললেন, 'এ তো ভয়ের কিছু নেই। তোমার নামও জানি না। তোমার

ছবিও তোলা যাবে না। কেউ বুঝতেই পারবে না যে আমি তোমারই সঙ্গে কথা বলেছি। কাগজে লিখে দেব নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ভূত।

এরপরেও ভূত ইতস্তত করছে দেখে রিপোর্টার বললেন, 'অবশ্য রিপোর্টের মধ্যে বার কয়েক 'বিশ্বস্ত সূত্রে' ব্যবহার করেও নামধাম গোপন করতে পারি।

ভূত কী বুঝল কে জানে। সে বলল, 'আপনাদের পাল্লায় পড়লে কারো পরিত্রাণ নেই, তা আমি জানি। যাক, যা কপালে আছে হবে। কী জানতে চান বলুন।'

রিপোর্টার ততক্ষণে পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ খুলে ডট কলম, নোটবই সব বার করেছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথমে বলো, তুমি কী করে ভূত হলে?'

এর উত্তরে ভূত একটা আশ্চর্য কথা বলল। সে জানাল, 'আমি বোধহয় ভুল করে ভূত হয়েছি।'

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে রিপোর্টার সাহেব বললেন, 'ভুল করে ভূত? সে আবার কী?'

ভূত বলল, 'সে বড় দুঃখের কথা। বউয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করার জন্যে চারদিন আগে এই স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে নির্জন মাঠের পাশে রেললাইনে গলা দিয়ে শুয়েছিলাম।'

রিপোর্টার বললেন, 'কিন্তু চার দিন আগে তো রেল লাইন অবরোধ চলছিল।'

ভূত বলল, 'তা আমি জানব কী করে? একদিন, দুদিন, তিনদিন চলে গেল, রেল এল না। কিন্তু এল সাংঘাতিক বৃষ্টি। জলের তোড়ে আর খিদের চোটে আমি মারা পড়লাম। কিন্তু এভাবে মারা পড়লে তো আর ভূত হয় না। আনন্যাচারাল ডেথ বা অপমৃত্যু না হলে তো ভূত হওয়া যায় না। আমার মতো সাধারণ মৃত্যু, অনাহারে, না খেয়ে মৃত্যু তো এদেশে সবসময়ে হচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে কি ভূত হয়?'

এই ভৌতিক প্রশ্ন শুনে রিপোর্টারের মনে একটা অন্যরকম সন্দেহ দেখা দিল। কারণ ভাঙা ঘরের ফাটা বেড়ার মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো তখন ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে এবং রিপোর্টার দেখতে পেয়েছেন যে, ভূতের ছায়া পড়েছে জ্যোৎস্নায়, যেটা অসম্ভব। রিপোর্টার ভূতকে বললেন, 'তুমি কি সত্যি ভূত? তোমার হাত দিয়ে আমাকে একটু ছোঁও দেখি।'

ভূত বলল, 'এত দূর থেকে হাত দিয়ে আমি আপনাকে ছোঁব কী করে?'

রিপোর্টার বললেন, 'তাহলে তো তুমি ভূত নও। ভূতেরা যে যতদূর ইচ্ছে হাত লম্বা করতে পারে।'

ভূত এবার খুব চিন্তা করল, তারপর বলল, 'তা হতে পারে। আমি বোধহয় এখনো ভূত হইনি। বোধহয় এখনো মারাও যাইনি। বৃষ্টির সময় রেললাইন থেকে উঠে এখানে চলে আসি। চারদিন পেটে অন্ন নেই। ভাবলাম মরে ভূত হয়ে গেছি।'

রিপোর্টার সাহেব তাঁর পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ খুলে দুদিনের সঞ্চয় পাঁচশো গ্রাম চিঁড়ে আর একটু গুড়ের একটা ঠোঙা বার করে ভূতকে খেতে দিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পরে বহু কথা হল দু'জনের মধ্যে।

দু'দিন পরে কলকাতায় ফিরে রিপোর্টার সাহেব তাঁর প্রতিবেদন পেশ করলেন।

'বন্যাকবলিত অঞ্চলের ভুখা মানুষের আত্মকাহিনী।'

ওরকম মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন বহুকাল কোনোও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

সপ্তর্ষি আর হারানো বিকেল

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বহরমপুর পেরিয়ে কান্দীর পথে পড়তেই রাস্তার দুধারে বাড়িঘর আর গাছপালার চেহারা বদলে যেতে লাগল। মাটির রংও এখানে সামান্য লাল। সপ্তর্ষির বাবা বুঝিয়ে দিলেন—মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো রয়েছে বলে ওইরকম রং। এখান থেকেই নাকি রাঢ়বঙ্গের শুরু। রাঢ়বঙ্গ বলতে ঠিক কি বোঝায় সপ্তর্ষি জানে না, তবে সময়মতো বাবাই নিশ্চয় বলে দেবেন। বাবা বেশ ভালো লোক, বাবার সঙ্গে বেড়াতে মজা লাগে।

দুপাশে ধূ ধূ মাঠ, মাঝখান দিয়ে কালো পিচের রাস্তা চলেছে সোজা। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে অজস্র তালগাছ। কোথাও আবার খোলা প্রান্তরের ভেতর তালগাছগুলো জড়াজড়ি করে একজায়গায় ভিড় করে রয়েছে। এখানকার তালগাছ দেখতে একটু যেন অন্যরকমের, গুঁড়িটা বেশ মোটা, আর মাটির একেবারে কাছ থেকেই প্রথমে কিছুটা বেঁকে তারপর সোজা উঠেছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দু-একটা বিরাট শিমুল গাছ, পাতা নেই, ডালগুলো লাল ফুলে ভর্তি।

বাবা হঠাৎ বললেন—বিকাশ, গাড়িটা এখানে একটু থামাও তো। এই বাঁদিকে—পথের বাঁদিকে কয়েকটা বড় গাছের ছায়ায় কিছু লোক বিশাল দুটো উনুন জ্বালিয়ে কি যেন করছে। সেখানে গাড়ি থামতেই তারা অবাক হয়ে তাকাল। সপ্তর্ষিও অবাক। এতবড় উনুন আগে সে কখনো দেখেনি। উনুনের ওপর লোহার চাদর জুড়ে তৈরি বড় কড়াই চাপানো, সে কড়াইতে কি যেন জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। অত উঁচুতে নাগাল পাবার অসুবিধা বলে জ্বালা দেবার দেবার কাজে ব্যস্ত লোক-দুজন দুটো প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে কাঠের হাতা নাড়ছে। চারদিকের বাতাসে একটা খুব চেনা চেনা মিষ্টি গন্ধ।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কি করছে বলতে পারিস?

সপ্তর্ষি মাথা নাড়ল।

বাবা বললেন—আমারই অন্যায়। কলকাতায় চাকরি নিয়ে তোকে একেবারে শহুরে ছেলে বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু এই হচ্ছে আসল দেশ, বুঝলি? শহরে আর কটা মানুষ থাকে? ওরা গুড় জ্বাল দিচ্ছে, বুঝেছিস? আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করছে। আয়, তোকে আখের রস খাওয়াই—

গুড়ওয়ালারা ভারি ভালো। নতুন মাটির ভাঁড়ে করে তিনজনকে পেটভরে রস খাওয়াল তারা। সপ্তর্ষির বাবা পয়সা দিতে গেলে কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোকটা মাথা চুলকে বলল—আজ্ঞে আপনারা অতিথি, দু-ভাঁড় রস খেয়েছেন, ওর দাম দিতে হবে না—

—না না, সে কি কথা! সে হয় না—

সে কিছুতেই পয়সা নিতে রাজি হল না, বলল—আমাদের এমনি কত রস তো মাটিতে পড়েও নষ্ট হয়। আজ খোকাবাবু খেয়েছে, তার দাম নেব? খোকাবাবুর নাম কি?

সপ্তর্ষির নামটা তারা ঠিক বুঝতে পারল না। তাদের ছেলেপুলেদের নাম গণেশ, রামু, কার্তিক এইসব হয়। তবু তারা হেসে বলল—বেশ নাম, ভালো নাম।

সপ্তর্ষির বাবা তাদের নমস্কার করে গাড়িতে এসে উঠলেন।

কান্দী শহরে না ঢুকে তারা বাসস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে বাইপাস ধরে পাঁচথুপীর রাস্তায় এসে পড়ল। এবার রাস্তা আরো সরু আর খারাপ। কিন্তু পথে যে জায়গাগুলো পড়ছিল তার নাম খুব সুন্দর। পুরন্দরপুর, গোকর্ণ। আর দশ-বারো কিলোমিটার গেলেই পাঁচথুপী।

পথে বেরুলে কত মজার ঘটনা দেখা যায়। যেমন গোকর্ণ ছাড়িয়ে কিছুদূর এসে হঠাৎ গাড়ি থামাতে হল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট ছাগলছানা তার মায়ের দুধ খাচ্ছে। সরু রাস্তা, পাশেই নাবাল-জমি, ধানক্ষেত। এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। দু-তিনবার হর্ন দেওয়া হল, কিন্তু তারা নির্বিকার। বিকাশ নেমে তাড়া দেবার উদ্যোগ করছিল, সপ্তর্ষির বাবা বারণ করলেন—থাক, ওদের বিরক্ত কোরো না। বেশ লাগছে দেখতে। পেটভরে খেয়ে নিক বাচ্চাটা।

কিন্তু একটু বাদেই উল্টোদিক থেকে আসা বড় একটা লরির এয়ার হর্নের বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে তারা দুজন ধানক্ষেতে নেমে গেল।

পাঁচথুপী ঠিক শহর নয়, আবার গ্রামও নয়। বসতির ভেতরের পথ ভাঙাচোরা, পথে ধুলো। বহুদিন আগে এখানে নাকি পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। সেই কারণে নাম হয়েছে পাঁচথুপী। বোধহয় পঞ্চস্তূপী থেকে। এখন অবশ্য আর স্তূপ নেই, তবে পোড়ামাটির সুন্দর মন্দির আছে একটা।

সেই পোড়ামাটির নবরত্ন মন্দিরের সামনেই রাস্তার ওপর কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি দেখে তাঁরা এগিয়ে এলেন। সপ্তর্ষির বাবাও বললেন গাড়ি থামাতে।

মাঝারি গড়নের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন প্রৌঢ় মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এই তো রেবতীবাবু। যাক, আপনি এসে গিয়েছেন, আর চিন্তা নেই—

সপ্তর্ষির বাবা হেসে বললেন—কেন, আমি আসব না, এমন ভয় করেছিলেন নাকি?

—না দাদা, ঠিক তা নয়। আসলে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক তো, শহরের বড় বড় পণ্ডিতেরা আমাদের অনুষ্ঠানকে কতখানি গুরুত্ব দেবেন সেটা আমরা ঠিক করে উঠতে পারি না। তবে আপনার ব্যাপার আলাদা, আমি সবাইকে বলেছি—দেখো তোমরা, রেবতীবাবু ঠিক সময়মতো এসে যাবেন। চলুন দাদা, বিশ্রাম করে খেয়ে নেবেন। বিকেল চারটে থেকে সেমিনার। এটি ছেলে বুঝি? কি নাম খোকা? বাঃ বাঃ, বেশ—

একটা বিশাল বাড়িতে তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। গল্পের বইতে এমন বাড়ির কথা পড়লেও, বাস্তবে কখনো দেখেনি সপ্তর্ষি। সিংদরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথমে একটা বড় বাঁধানো চত্বর, ফুটবল খেলা যায় এত বড়। চত্বর পেরিয়ে রাধামাধবের মন্দির। তার সামনে নাটমন্দির, ভোগের ঘর। এসব পার হয়ে বাইরের মহল। মাঝখানে উঠোন ঘিরে তিনদিকে দোতলা বাড়ির ঘরগুলো দাঁড়িয়ে। কার্নিশে অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে, পলস্তারা খসে

পড়েছে। একতলার টানা বারান্দার ওপরদিকে লোহার আঁকড়ি দিয়ে দুটো পুরনো পালকি ঝোলানো। এ দুটো মহল পার হয়ে তবে শুরু হয়েছে ভেতরের মহল। কতবার যে ডানদিকে বাঁদিকে ফিরলো সপ্তর্ষি, কত অলিগলি পার হয়ে চলল, কত সরু সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠল-নামলো তা মনে করে রাখা কঠিন। বাড়ির বর্তমান মালিক সুধীন্দ্রনারায়ণ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। এবার দোতলার একটা ঘরের সামনে থেমে তিনি বললেন—এইটেয় আপনারা থাকবেন। আপনার গাড়ির চালকের জন্য নীচে আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। লাগোয়া বাথরুমে জল দেওয়া আছে, হাতমুখ ধুয়ে নিন। দুপুরের খাবার এখানেই দেবে। কোনো অসুবিধে হলে বলবেন।

মেঝেতে সেকেলে পশমের আসন পেতে খাবার জায়গা হল। পরিবেশন করতে লাগলেন সুধীনবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে। মেয়েটি ভারি মিষ্টি দেখতে, নাম শ্রেয়া। বয়েসে সে সপ্তর্ষির চেয়ে কিছু বড় হবে। সুধীনবাবু পাশে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। খেতে খেতে সপ্তর্ষির বাবা বললেন—কি বিরাট বাড়ি আপনাদের! অনেক পুরনো, না?

সুধীনবাবু হেসে বললেন—হ্যাঁ, প্রায় তিনশো বছর।

—বলেন কি!

—তাই। তবে গত আশি-নব্বই বছরের মধ্যে আর মেরামত হয়নি। মেরামত করবার সঙ্গতিও নেই। সব আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে।

—কখানা ঘর আছে এ বাড়িতে?

—একশো চল্লিশটা?

রেবতীবাবু খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন—কটা?

—একশো চল্লিশটা। তবে এখন মাত্র চুরানব্বইটা ব্যবহার করা হয়।

—চুরানব্বইটা ঘর ব্যবহার করেন! লোক কজন আপনারা?

সুধীনবাবু বললেন—চারজন। হাসছেন? আসলে ঘরগুলো খুলে, ঝাঁট দিয়ে পরিচ্ছন্নও তো রাখতে হবে। ঘরের সব আলাদা আলাদা নাম আছে, জানেন?

—কি রকম?

যেমন, এই যে ঘরটায় আপনি রয়েছেন, এটার নাম নীল ঘর। পাশেরটা সবুজ ঘর। তারপর আছে হলুদ ঘর, ফলের ঘর, খাটের ঘর, ফুলের ঘর—সেকালের কর্তাদের নামে নামে ঘর। আজ আর হবে না, কাল সকালে আপনাদের রাধামাধবের বিগ্রহ দেখাব।

—এখনো পুজো হয়?

—রোজ। ওই একটা পুরনো রেওয়াজ এখনো বন্ধ হয়নি। তিনথালা অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। পূজারী আছেন, বংশানুক্রমিকভাবে তাঁরাই পুজো করে আসছেন।

খাওয়াদাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে সুধীনবাবু সপ্তর্ষির বাবাকে সভার জায়গায় ডেকে নিয়ে চলে গেলেন।

সপ্তর্ষির ব্যাগে দু-তিনখানা বই ছিল। কোথাও বেড়াতে গেলে সে সঙ্গে পছন্দমতো কিছু বই নেয়। একখানা বই নিয়ে সে বিছানায় আধশোয়া হয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বইয়ে কিছুতেই মন বসল না। পড়ন্ত বেলার রোদ্দুর খড়খড়িওয়ালা জানালা দিয়ে তার বিছানায় আর মেঝেতে এসে পড়েছে। রোদ্দুরের রংটা কেমন যেন মন খারাপ করে দেয়, কবেকার সব ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ে। অনেক—অনেক আগেকার

দিনের কথা। কিন্তু অতদিন আগের কথা কি করে মনে আসবে তার? তার তো মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। তবু এই বাড়িটায় ঢোকামাত্র তার যেন কেমন অদ্ভুত মনের ভাব হচ্ছে, সামান্য জ্বর এলে যেমন একটা আরামদায়ক আলস্য ঘিরে ধরে।

নীল ঘর, খাটের ঘর, ফুলের ঘর! সুন্দর নামগুলো।

নির্জন, পুরনো বাড়িতে ঝিমঝিম করে ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। জানালার বাইরেই বাতাসে দুলছে বকুলগাছের ডাল। তার ছায়া পড়েছে মেঝেতে। এখনো আবহাওয়া ভালো, এরপর গরম বাড়তে শুরু করবে। সারাদিন হাঁসফাঁস গরমের পর বিকেলে ঝিলমিল দেওয়া বারান্দায় বসে আরাম করে বাদামের সরবৎ খাওয়া—আঃ!

হঠাৎ বিছানায় সোজা হয়ে বসল সপ্তর্ষি। আশ্চর্য তো! বাদামের সরবৎ কথাটা মাথায় এল কেন তার? বাদামের সরবৎ বলে সত্যি কিছু হয় নাকি? সে অন্তত কখনো খায়নি। তাহলে এমন একটা পানীয়ের নাম তার মনে এল কি করে? কোনো গল্পের বইতে পড়েছে কি? কে জানে!

দরজা দিয়ে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল—কি করছ? বই পড়ছ?

—হ্যাঁ। ভেতরে এসো, ওইখানে দাঁড়িয়ে কেন?

ঘরে ঢুকে খাটের এককোণে বসল শ্রেয়া। বলল—কেমন লাগছে আমাদের বাড়ি?

—খুব ভালো লাগছে। এতবড় বাড়ি আমি আগে কখনো দেখিই নি। শহরে আমাদের বাড়িতে মাত্র তিনটে ঘর, তাও ছোট ছোট। এমন মাঠও নেই। তোমরা কত মজায় থাকো!

—ঠিক বলেছ, কলকাতায় যেতে আমার একটুও ভালো লাগে না।

সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—তুমি কলকাতায় গিয়েছ?

—বছরে দুবার যাই। ভবানীপুরে আমার মামাবাড়ি।

শ্রেয়া বেশ পড়াশুনো করে, এ ব্যাপারটা সপ্তর্ষির বেশ ভালো লাগল। তার হাতের বইটা দেখিয়ে শ্রেয়া জিজ্ঞেস করল—কি বই ওটা?

—অবনীন্দ্রনাথের রচনাসংগ্রহ, 'নালক' বলে লেখাটা পড়ছি। তুমি বই পড়তে ভালোবাস?

—হুঁ-উ। বাবা অর্ডার দিয়ে ডাকে বই আনিয়ে দেন। আমি অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' পড়েছি। তুমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' পড়েছ?

উৎসাহে সোজা হয়ে বসে সপ্তর্ষি বলল—পড়েছি। উঃ, দারুণ বই! জানো, বড় হয়ে আমিও ওইরকম আফ্রিকায় অ্যাডভেঞ্চার করতে যাব। বাওবাব গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে থাকব আর পায়ে হেঁটে কালাহারি মরুভূমি পার হব। হীরের খনিও আবিষ্কার করব—

শ্রেয়া বলল—আমিও যাব। বড় হয়ে।

সপ্তর্ষি একটু সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল। মেয়েরা কি এরকম অ্যাডভেঞ্চারে বের হয়? সচরাচর তো শোনা যায় না। তারপরেই তার মনে হল—হতেও পারে। মেয়েরা তো আজকাল অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে উঠছে। আফ্রিকায় যেতে বাধা কি?

শ্রেয়া বলল—চল, তোমাকে প্যাঁচা দেখিয়ে আনি। যাবে?

—প্যাঁচা? কোথায়?

—ভেতরমহলের দালানের কার্নিশে। এসো দেখাচ্ছি—

—আমাদের দেখলে উড়ে পালাবে না?

—নাঃ। ওরা দিনের বেলা দেখতে পায় না তো, সেজন্য চুপচাপ বসে থাকে। এসো—

আবার অনেক অলিগলি পেরিয়ে, অনেক সরু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে ওরা দোতলার তিনদিক ঘেরা একটা ছাদমতো জায়গায় এসে পৌঁছল। তিনদিকের দেয়াল ওপরে উঠে চওড়া কার্নিশে শেষ হয়েছে। তারই এক জায়গায় আঙুল তুলে নির্দেশ করে শ্রেয়া বলল—ওই দেখ!

দেখে সপ্তর্ষি অবাক। কার্নিশের ওপর একটু অন্ধকারমতো কোণ বেছে নিয়ে পাশাপাশি চার-পাঁচটি প্যাঁচা গম্ভীরমুখে বসে আছে। এত কাছ থেকে এর আগে আর কখনো প্যাঁচা দেখেনি সপ্তর্ষি। লোকে খারাপ চেহারার সঙ্গে তুলনা করতে 'প্যাঁচার মতো' বলে কেন তা সে বুঝতে পারল না। এরা তো বেশ সুন্দর দেখতে। সপ্তর্ষি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তারাও অকুতোভয়ে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রেয়া বলল—এরা কিন্তু সব লক্ষ্মীপ্যাঁচা, জানো? বাড়িতে থাকলে মঙ্গল হয়—

এইসময়ে শ্রেয়ারই বয়েসী আর একটি মেয়ে ভেতরবাড়ির দরজা দিয়ে ছাদে এল, শ্রেয়াকে দেখে বলল—এই যে! তুই এখানে, এদিকে আমি সারাবাড়ি খুঁজছি! লাইব্রেরিতে যাবি না?

শ্রেয়া সপ্তর্ষির দিকে ফিরে বলল—ও আমার বন্ধু কুন্তলা। আমরা দুজন একটু লাইব্রেরিতে যাব মায়ের জন্য বই বদলে আনতে। কিছুক্ষণ একা থাকো, কেমন? অসুবিধে হবে না তো?

—না না, তুমি যাও। আমি বরং তোমাদের বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।

—দেখো, হারিয়ে যেয়ো না—

শ্রেয়া আর তার বন্ধুর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা পায়রা ডেকে উঠল—বাক্ বাক্ বাকুম্। বিকেলের রোদ্দুর মিলিয়ে আসছে একটু একটু করে। ছাদের ওধার দিয়ে যে সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে নীচে নেমে গেল, সেটা দিয়ে নামলে কোথায় পৌঁছানো যায়? দেখা যাক।

কয়েক ধাপ নেমে প্রথম বাঁকের পরেই আবছা আলো-আঁধারি। হাতড়ে হাতড়ে সাবধানে নামতে গিয়ে সপ্তর্ষির মনে হল—নাঃ, এ সিঁড়িটা বরাবরই বিপজ্জনক রইল। সেবার তো সে পা-ফসকে পড়েই যাচ্ছিল, নেহাত বৃন্দাবন ধরে না ফেললে একেবারে মুখ থুবড়ে—

অন্ধকারেই সিঁড়ির মাঝামাঝি দেয়াল ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সপ্তর্ষি।

কবে সে এ বাড়িতে পা-ফসকে পড়ে যাচ্ছিল? বৃন্দাবনই বা কে?

ভয়ের একটা অনুভূতি গুলি পাকিয়ে বুক বেয়ে গলার কাছে উঠে আসছে। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বুক-ঢিপ-ঢিপটা কমলে অবশ্য তার মনে হল—এতে ভয় পাওয়ার কি আছে? ইস্কুলে মাস্টারমশাইরা বলেন—'সপ্তর্ষি, তুমি বড় কল্পনাপ্রবণ!'—এত পুরনো বাড়ি দেখে মনে মনে সে নানারকম কল্পনা করতে শুরু করেছে, এছাড়া অন্য কারণ কিছু নেই।

আবার সে নামতে আরম্ভ করল। একতলার লম্বা একটা বারান্দায় সিঁড়ি শেষ হল। মেঝেতে পুরু ধুলো আর চামচিকের নাদি পড়ে আছে। এই মহলে লোকজন কেউ বাস করে না। সারি সারি তালাবন্ধ ঘর, কবজায় মরচে ধরে রয়েছে। কারা বাস করত এইসব ঘরে?

একটু এগিয়ে সরু একটা গলি। কিছু না ভেবেই সপ্তর্ষি ডানদিকে বাঁক নিল। কেন তা সে জানে না। গলির পরে নাটমন্দির। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে বিশাল কাঠের দরজায় শেষ হয়েছে। দরজায় সিঁদুর আর চন্দনের দাগ। ওঃ, এটাই তাহলে রাধামাধবের মন্দির! হ্যাঁ, এ জায়গাটা রোজ পরিষ্কার করা হয়। ধুলোময়লা নেই। নাটমন্দিরের ছাদ এক জায়গায় ভেঙে পড়েছে, সেখান দিয়ে আসা পড়ন্ত ম্লান আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে চারদিক।

—ছোটকর্তা যে!

চমকে ফিরে তাকাল সপ্তর্ষি।

একজন খুব বুড়ো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন নাটমন্দিরের ওপাশের বারান্দায়। খাটো ধুতি পরা, খালি গা, টকটকে রং। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি আর লম্বা সাদা চুলে মানুষটাকে মানিয়েছে খুব ভালো।

মানুষটি আবার বললেন—খবর কি ছোটকর্তা? দেখতে এলেন বুঝি সব কেমন আছে?

সপ্তর্ষির ভয় কেটে গিয়েছে, সে বলল—আপনি কে?

—আমি রামগতি। রামগতি ভট্টাচার্য। অনেকদিন তো হল, আপনি সব ভুলে গিয়েছেন—হেঃ, হেঃ হেঃ! আসুন, আসুন—

বুড়োমানুষেরা এমন সব কথা বলে যার কোনো মানে হয় না। কি ভুলে গিয়েছে সে? তাকে ছোটকর্তা বলেই বা কেন ডাকছেন এ ভদ্রলোক? তবে লোকটি বেশ ভালো, কেমন আপন মানুষের মতো।

সে পায়ে পায়ে নাটমন্দির পার হয়ে রামগতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রামগতি সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হুঁ, নব কলেবর! তা ভালো, ভালো—

রামগতির পায়ে সেকেলে বউলওয়ালা খড়ম, গলায় সাদা ধপধপে মোটা পৈতে। সপ্তর্ষি বুঝল ইনিই সেই পুরোহিতমশায়, যাঁর কথা তোমার বাবা বলেছিলেন। সে জিজ্ঞাসা করল—আপনি বুঝি এইখানেই থাকেন?

একগাল হেসে রামগতি বললেন—আর কোথায় যাব ছোটকর্তা? সবাই চলে গেল, আমিই কেবল একা পড়ে রইলাম। আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছে কিনা বাড়িটার ওপরে।

বিকেলের ছায়া আরো ঘন হয়ে এসেছে। খিলানের ওপর কয়েকটা পায়রা উড়ে এসে বসল।

সপ্তর্ষি বলল—সন্ধ্যেবেলা রাধামাধবের পুজো হবে না?

—হবে। আরতি হবে, তারপর শীতলভোগ দিয়ে ঠাকুরের শয়ন দেওয়া হবে।

—আপনি কোন্ ঘরে থাকেন?

রামগতি বললেন—ভোগের ঘরের পাশে আমার সেই পুরনো ঘরখানাতেই। আসুন না কেন—

খড়মের খটাখট শব্দ তুলে রামগতি এগিয়ে চললেন। মন্দির বাঁয়ে রেখে সরু গলিটা কিছুদূর এগিয়ে যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেইখানে একটা ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়ালেন। হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে অল্প আলোতে চোখে পড়ে দেয়ালের ধারে খাট, মেঝেতে কুশাসন পাতা, তার সামনে গঙ্গাজলের পাত্র, কোশাকুশি।

সন্ধ্যেবেলা আহ্নিক করবেন রামগতি, তার জোগাড় করা রয়েছে। ঘরে ঢুকে একটা জলচৌকি সপ্তর্ষিকে এগিয়ে দিলেন তিনি, নিজে বসলেন কুশাসনে।

ঘরের মধ্যেটায় যেন একশো কি দুশো বছর আগেকার বাতাস থমকে আছে। আবহাওয়ায় প্রায় মিলিয়ে আসা মৃদু ধূপের গন্ধ। দুশো বছরের ওপার থেকে কাদের যেন খুব চেনা গলার আওয়াজ আবছা কানে আসে। কারা যেন খুব ভালোবাসত, খুব আপন ছিল—এই বাড়িটায় থাকত তারা।

বাইরের দালানে পায়রার ডানার ঝটাপট শব্দে বৈকালী নির্জনতা আরো গাঢ় হয়ে আসে। সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—বাড়ির এদিকটাতে তো কেউ থাকে না, আপনার ভয় করে না একা থাকতে?

রামগতি হেসে বললেন—নাঃ, ভয় করবে কেন? এ আমার চেনা জায়গা, ছোটবেলা থেকে এখানে বড় হয়েছি। তাছাড়া রাধামাধব যেখানে রয়েছেন সেখানে আর ভয় কি?

—আপনি কি করেন সারাদিন?

—পাহারা দিই। সারাদিন, সারারাত্তির।

অবাক হয়ে সপ্তর্ষি বলল—সে কি! কি পাহারা দেন আপনি?

রামগতি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন—সবকিছু। এই বাড়িঘর, মন্দির, ভাঙা পালকি, খসে পড়া কড়িবরগা, ফেলে আসা দিনগুলো—সেগুলোকেই বেশি করে পাহারা দিতে হয়, নইলে পালিয়ে যাবে কিনা!

পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এ কথাগুলো সপ্তর্ষির খুব ভালো লাগল।

রামগতি আবার বললেন—আর সেই জিনিসটা তো রয়েইছে, সেটাও পাহারা দিতে হয়।

এই কথাটা রামগতি বললেন প্রায় ফিসফিস করে, তাঁর গলার স্বরে রহস্যের ছোঁয়া।

কিসের কথা বলছেন রামগতি? সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—কোন্ জিনিসটা?

—হেঃ হেঃ,হেঃ, ছোটকর্তা সব ভুলে গিয়েছেন! আপনিই তো লুকিয়ে রাখবার জন্য আমাকে দিয়েছিলেন। মেজকর্তার তখন মতিগতি ভালো নয়, তাঁর হাতে পড়লে কি হয় ঠিক নেই—তাই আমাকে দিলেন।

সপ্তর্ষি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে রামগতি বললেন—মনে পড়ছে না? আচ্ছা আসুন—

খড়মের শব্দ তুলে আবার অন্ধকার গলিপথ পার হতে লাগলেন রামগতি। নাটমন্দিরের পেছনে ভোগের ঘরের ঠিক পাশ দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে যেন মাটির তলায়। বৃদ্ধ পুরোহিত সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চললেন। একটু ইতস্তত করে সপ্তর্ষিও তাঁকে অনুসরণ করল। এখানে বোধহয় বাতাস চলাচল করে না, কেমন ভ্যাপসা গন্ধ পরিবেশে। সিঁড়ি নেমে শেষ হয়েছে একটা ছোট্ট চৌকো ঘরে। কিছু নেই সেই ঘরে, কেবল কোণের দিকে ইঁট দিয়ে গাঁথা বেশ বড় একটা চৌবাচ্চা। রামগতি চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—এই যে, এটার নীচেই আমি আর আপনি রাত্তিরবেলা লুকিয়ে ফেলেছিলাম মূর্তিটা। জগদ্ধাত্রী মূর্তি। ওপরে আবার ইঁট পেতে মশলা দিয়ে গেঁথে দিয়েছিলাম। ঠিক এই কোণটাতে—

কাঁপা গলায় সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করল—কিসের চৌবাচ্চা এটা?

—গঙ্গাজলের। নিত্যপূজার গঙ্গাজল বহরমপুর থেকে পেতলের বড় বড় পনেরো-কুড়িটা জালায় ভর্তি করে গরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়ে নিয়ে আসা হত। বছরে একবার, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, চৌবাচ্চার পুরনো জল বের করে, পরিষ্কার করে আবার নতুন জল ভর্তি করা হত। ওই অক্ষয় তৃতীয়ার রাতেই তো আমরা মূর্তিটা লুকোলাম—

সপ্তর্ষি বলল—গরুর গাড়িতে কেন, বাসে আনলে তো তাড়াতাড়ি হয়—

এবার রামগতি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাস কি?

ব্যাপারটা সপ্তর্ষির কেমন যেন লাগল। যতই সেকেলে মানুষ হোন না কেন, বাস দেখেন নি তাও কি হতে পারে? পাঁচথুপী থেকেই তো রোজ কত বাস ছাড়ে।

রামগতি বললেন—চলুন ছোটকর্তা, ওপরে যাই। জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে ভালোই করলাম, আপনি তো সব ভুলেই গিয়েছিলেন!

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়িয়ে রামগতি বললেন—আসি তাহলে?

সপ্তর্ষি বলল—আবার যদি কখনো আসি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়ে রামগতি বললেন—সে কথা বলা যায় না, সে বলা মুশকিল। আচ্ছা—

তাঁর খড়মের আওয়াজ মিলিয়ে গেল বাঁকের ওধারে।

একা একা ফিরে চলল সপ্তর্ষি। তার চারদিকে নামছে মন খারাপ করে দেওয়া সন্ধ্যা।

সে রাত্তিরে যতবার তার ঘুম ভাঙল সে শুনতে পেল লক্ষ্মীপ্যাঁচার ডাক।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে গরম গরম আটার লুচি আর আলুচচ্চড়ি দিয়ে দারুণ ব্রেকফাস্ট হল। সুধীনবাবু বললেন—তাড়াতাড়ি ঝোলভাত করে দিচ্ছি, আপনারা খেয়েদেয়ে রওনা হন—

সপ্তর্ষির বাবা বললেন—না ভাই, তার উপায় নেই। বিকেল পাঁচটার মধ্যে আমার বাড়ি পৌঁছতে হবে। সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে—

—বেশ, তাহলে চা খেয়ে নিন, তারপর আপনাদের রাধামাধবের বিগ্রহ দেখিয়ে আনি।

আবার সেই নাটমন্দির, ভোগের ঘর, চকমিলানো দালান। রেবতীবাবু ভাবপ্রবণ কবিপ্রকৃতির মানুষ, প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবারের ভদ্রাসন দেখে তিনি ভারি খুশি। বললেন—সত্যি, এসব দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। শিক্ষিত আর ধনী দেশ হলে জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে এ বাড়ি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। কই, মন্দির তো বন্ধ দেখছি।

সুধীনবাবু বললেন—তাই তো! পুরোহিত আজ দেরি করছে কেন?

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের ধুতি-পরা চাদর-গায়ে লোক নাটমন্দিরে প্রাঙ্গণে ঢুকে বলল—এই যে সুধীনদা, একটু দেরি হয়ে গেল আজ!

সুধীনবাবু তাকে বললেন—নাও, তাড়াতাড়ি মন্দির খোলো, এঁরা বিগ্রহ দেখবেন।

তারপর সপ্তর্ষির বাবার দিকে ফিরে বললেন—এই হচ্ছে দুর্গাগতি, বর্তমান পূজারী।

দুর্গাগতি মন্দিরের তালা খুলছে, সপ্তর্ষি আশ্চর্য হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। এই

লোকটা বর্তমান পূজারী! তাহলে গতকাল বিকেলে যাঁর সঙ্গে পরিচয় হল সেই রামগতি কে? রামগতি আর দুর্গাগতি—নাম দুটোও তো বাপ-ব্যাটা কিম্বা দুই ভাইয়ের বলে মনে হচ্ছে!

কথা বলতে বলতে রেবতীবাবু আর সুধীন্দ্রনারায়ণ একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সপ্তর্ষি দুর্গাগতিকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার বাবা রামগতি ভট্টাচার্য এখন কি আর পুজো করেন না?

বিশাল তালায় চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে দুর্গাগতি চমকে তার দিকে তাকিয়ে বলল—রামগতি আমার বাবা না তো, আমার ঠাকুর্দার বাবা। তিনি আর কি করে পুজো করবেন? তিনি তো মারাই গিয়েছেন আজ একশো বছরের ওপর। তুমি তাঁর নাম কি করে জানলে? ওঃ বুঝেছি—সুধীনদা গল্প করেছেন।

সপ্তর্ষি আস্তে করে সেখান থেকে সরে এল।

বলে কি লোকটা? একশো বছরের ওপরে মারা গিয়েছে মানে? কাল তাহলে সে কার সঙ্গে গল্প করল?

বাবা এখনো কথা বলছেন সুধীনবাবুর সঙ্গে। সপ্তর্ষি চট করে নাটমন্দিরের ওপাশ দিয়ে সরু গলিটায় গিয়ে পড়ল। এই সকালবেলাতেও গলিটা আবছা অন্ধকার। একটু এগিয়ে রামগতির ঘর। সে ঘরের দরজায় মরচে ধরা একখানা পুরনো তালা ঝুলছে। তালার গায়ে মাকড়সার জাল, ঝুল। দরজার সামনে বারান্দায় ধুলো-ময়লা পড়ে আছে কতদিনের। এ দরজা অন্তত বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে কেউ খোলেনি!

কিন্তু এই ঘরটার মধ্যে বসে গতকাল বিকেলে সে রামগতির সঙ্গে কথা বলেছে!

সপ্তর্ষির আর একটুও ভয় করছে না। বরং খুব মহৎ কিছু, সুন্দর কিছুর মুখোমুখি হলে মনে যে শান্ত আনন্দের ভাব জাগে, তাই জাগছে।

মন্দিরের সামনে ফিরে আসতে আসতে সপ্তর্ষি শুনতে পেল সুধীনকাকা এখনো তার বাবাকে পুরনো দিনের গল্প শোনাচ্ছেন। তিনি বলছেন—সেকালের মানুষগুলো সবদিক দিয়েই বড় হত, কি চেহারায়, কি মনে। আমার প্রপিতামহের আমলে আমাদের এক কর্মচারী ছিল, তার নাম বৃন্দাবন। শুনেছি সে নাকি একবার আমাদের বাড়ি ডাকাত পড়লে কেবল লাঠি ঘুরিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল। এজন্য কিছু পুরস্কার দিতে চাওয়া হয়েছিল, সে নেয়নি। বলেছিল—আজন্ম এ বাড়িতে আছি, মরবও এখানে। ও নিয়ে করব কি? রাখব কোথায়?

বৃন্দাবন! এই নামটাই সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কাল তার মনে এসেছিল।

চারদিকে তাকাল সপ্তর্ষি। এই বিরাট বাড়িটার সঙ্গে একদিন তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এর ঘরে ঘরে বাস করত তার প্রিয়জনেরা। ভাগ্য আজ তাকে এখানে এনে তার চোখের সামনের আবরণ সরিয়ে দিয়েছে। গল্পের বইতে এমন ঘটনা পড়েছে সপ্তর্ষি—বাস্তবেও হয় তাহলে!

সুধীনকাকাদের অবস্থা এখন পড়ে গিয়েছে। এ সময় যদি বেশ কিছু টাকা হাতে পান, তাহলে বাড়িটা মেরামত করতে পারেন, শ্রেয়ার খুব ভালো বিয়ে দিতে পারেন—আরো কত কি ভালো কাজে লাগাতে পারেন।

চৌবাচ্চার নীচে গাঁথা রয়েছে মূর্তিটা। রামগতি বলেছিলেন—ধাতুর তৈরি! কি

ধাতু? সোনা? রূপো? যাই হোক না কেন, তার দাম অনেক—অনেক হবে! জিনিসটা ন্যায্যত সুধীনকাকুর প্রাপ্য। আর কতদিন ওটা পড়ে থাকবে ওখানে?

মূর্তিটার সন্ধান সে বলে দিলে খুব হই-চই হবে, সবাই তাকে প্রশ্ন করবে, বিরক্ত করবে—কিন্তু সুধীনকাকার খুব উপকার হবে। অবশ্য সুধীনকাকাকে বলে দেওয়া যায়, তিনি যেন সপ্তর্ষির নাম কাউকে না বলেন।

বিগ্রহ দেখবার জন্য তার বাবা তাকে ডাকছেন।

সে এগিয়ে গেল। তারপর সুধীন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল—কাকা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

ভূতের কথা

যমদত্ত

(অ-দার্শনিক প্রবন্ধ)

আমি বাঙালি ভূতের কথা বলিব। বাঙালি ভূতের সঙ্গে অতি শৈশব হইতে পরিচয়, যে ভূতের ভয়ে ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর বাঁশতলা দিয়া বাড়ি ফিরিতে হইলে রাম! রাম! বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া যাইতাম। আমি বাঙালি ভূতের কথা বলিব বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে খোট্টা ভূত, ইংরাজ ভূতদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি। আমি আদৌ parochial বা communal বা sectarian নহি। বাংলাদেশে মরিয়া যাঁহারা ভূত হইয়াছেন, যেমন চুড়েল, দেও, ghost, মাও-ছে-লাই-পিঙ, তাঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করি। একবার আচিপুরের চীনা গোরস্থানের পাশ দিয়া মোটরে করিয়া যাইতেছি—সেদিন শনিবার অমাবস্যা। যেই গোরস্থানের কাছে আসিলাম, অমনি হাজার হাজার ছোট ছোট আরশুলা, বড় বড় আরশুলা উড়িয়া আমাদের নাকে-মুখে বসিতে লাগিল, গাড়ি চালানো দুর্ঘট। শুনিলাম এই তিথিতে চীনা ভূতেরা গোর হইতে উঠিয়া আরশুলা ধরিয়া খায়—তাই আরশুলারা ভয়ে পলাইতেছে। এঁরা সব আছেন। আমি সতেরোটি হেডিং-এ ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিব।

ভূত কথাটি একটি generic term, সব রকম ভূতদের, যেমন (খাঁটি) ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, আলেয়া, কন্ধকাটা, পেঁচো, কুনী, বুনী ইত্যাদি সকলকে বুঝায়। আমরা সাধারণত ভূত কথাটি ভূতদের, সর্বপ্রকার ভূতেদের জাতিবাচক generic term হিসাবে ব্যবহার করিব। আমাদের এই ভূতের সহিত বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো প্রকার সম্বন্ধ নাই।

উৎপত্তি

প্রথমে ভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম গরুড় পুরাণে আছে যে জীবাত্মা চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিবার অব্যবহিত পূর্বে গো-জন্ম লাভ করে। গো-জন্মের পর মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে; এইজন্য বাংলায় একটি কথা চলতি আছে যে, ‘গো-জন্ম উদ্ধার হইল’ অর্থাৎ মানুষ হইল; উন্নতির পথের গাঁট খুলিয়া গেল। আর মানুষ মনুষ্যজন্মে নিজ নিজ সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলে স্বর্গ-নরক ভোগ করে, কেহ কেহ নিরন্তর দুষ্কার্য করিলে, বাপ-মাকে অশ্রদ্ধা করিলে, খাইতে না দিলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়।

অনেকে আজকাল এইসব পৌরাণিক সত্য বিশ্বাস করেন না; সেজন্য একটি পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিব। আজকাল ইংল্যান্ড, আমেরিকার কথা বাদ দিলেও দেখা যায় পৃথিবীর সর্বত্র এমন কি হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষেও, পাকিস্তানের তো কথাই নাই—পাকিস্তানীরা তো ভারত হইতে জোর করিয়া গরু-বাছুর লুঠ করিয়া ‘‘লিয়াকতী-কাবাব’’ বানাইবার সনদ পাইয়াছেন—ব্যাপকভাবে গো-হত্যা হইতেছে। এইসব গরু পরজন্মে মানুষ হইয়া জন্মাইতেছে; ফলে জনসংখ্যা দ্রুত, অসম্ভব দ্রুত বাড়িতেছে। এইরূপ হারে বাড়িতে থাকিলে আর ২৫০ বছর বাদে মানুষ পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না।

ব্যাসদেবের কথা সেকেলে বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, একালের প্রখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি ভূত ও মানুষ লিখিয়া নাম করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে মানুষ মরিয়া ভূত হয়, আর ভূত মরিয়া মার্বেল হয়। মানুষ মরিয়া যে ভূত হয় একথা জ্ঞান হইবার পূর্ব হইতে ঠাকুরমা, দিদিমা, ছোট পিসির মুখে শুনিয়াছি। আমাদের বাড়ির আহ্লাদি ঝি ও ‘‘আতর’’-এর মুখে শুনিয়াছি। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। স্কুলের লাইব্রেরিতে Ghost stories বলিয়া সুদৃশ্য বাঁধাই বই দেখিয়াছি। মানুষ মরিলে যে ভূত হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না।

নিবারণ ঠাকুর্দা বলিতেন যে ব্রাহ্মরা ভূত বিশ্বাস করিতেন না; এজন্য ব্রাহ্মরা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছেন। সরকারি সেন্সাস রিপোর্টে আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে সত্যের খাতিরে আমরা জাস্টিস মিত্র যে কথা বলিতেন, তাহাও উল্লেখ করিতে বাধ্য। তিনি বলিতেন, সেন্সাস রিপোর্টে ব্রাহ্মদের অনুল্লেখের অন্য কারণ আছে। ‘‘রাজা রামমোহন রায় হিন্দু থাকিয়া মুরগী খাইবার পন্থা আবিষ্কার করায় লোকে দলে দলে ব্রাহ্ম হইয়া গেল; তখনকার দিনে যদি সেন্সাস লওয়া হইত তাহা হইলে দেখা যাইত লাখেলাখ ব্রাহ্ম। তাহার পর গোঁড়া আনুষ্ঠানিক হিন্দুরা মুরগীকে ‘‘সীতাপতি বিহঙ্গম’’ বলিয়া চালাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র নাকি পঞ্চবটি বনে নিত্য বন্য কুক্কুট শিকার করিতেন, এজন্য উহার একটি নাম রামপাখি। লক্ষ্মণ-শূকর-মাংসের শিককাবাব করিতেন—যাহাকে শূলপক্ক বরাহমাংস বলে। কালিদাস তাঁহার কাব্যে একথা লিখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব শূকর-মাংসের পিঠা খাইয়া দেহত্যাগ করেন। হিন্দুরা প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে সীতাপতি বিহঙ্গম খাইতে লাগিলেন। লোকে কি দুঃখে আর ব্রাহ্ম হইবে?

‘‘একবার দেওঘরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে ঘড়ি-ঘরের নিকট টাকায় ৮/১০ টা করিয়া সীতাপতি বিহঙ্গম বিক্রয় হইতেছে। এক হিন্দু স্ত্রীলোক শিবগঙ্গায় স্নান সারিয়া বাবা বৈদ্যনাথের পূজা দিয়া কপালে প্রসাদী চন্দন ও বাঁ হাতে বেশ বড় চ্যাঙড়া প্রসাদী

পেঁড়া লইয়া ফিরিতেছেন। মুখে তৃপ্তির হাসি; তারপর ঘড়িঘরের কাছে আসিয়া ডান হাতে যতগুলির ঠ্যাং ধরে ততগুলি সীতাপতি বিহঙ্গম খরিদ করিয়া বাড়ি চলিলেন। আর এক ব্রাহ্মিকা সকাল হইতে পায়চারি করিয়া কড়া মেঠো রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন— তিনি শিবগঙ্গায় স্নান, বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে পারেন না, বাবার প্রসাদী চন্দন বা প্রসাদী পেঁড়া লইতে পারেন না, পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট হইবার ভয়ে। আর দোকানীরা সব পেঁড়াই বাবার প্রসাদী পেঁড়া বলিয়া হাঁকিতেছে। তিনি কেবলমাত্র সস্তা বলিয়া গোটাকয়েক সীতাপতি বিহঙ্গম লইয়া ঘরে ফিরিলেন। লোকে কি আশায় আর ব্রাহ্ম হইবে! আর হিন্দুদের পর্দা তো ছিঁড়িয়া ফর্দা ফর্দা হইয়া গিয়াছে।”

মানুষ মরিয়া ভূত হয় সত্য—কিন্তু ইহাই ভূত হইবার একমাত্র পন্থা নয়। তবে সাধারণত মানুষ মরিয়া ভূতেদের খুব বেশি সংখ্যাধিক্য। অন্যান্য উপায়েও দুই চারিটি ভূত হয়। বাংলায় একটা কথা খুব চলিত আছে—“ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ”। ভূতের ছেলে ভূত না হইলে এই কথাটির সৃষ্টি হইত না; আর ভূত-পেত্নীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাহাদের ছেলেপুলে হওয়া সম্ভব। বুনীর ছেলে হইয়াছিল। দুই চার জন ভূত এইরূপে ভূতের ছেলে ভূত—ইহারা খাঁটি দুই পুরুষে ভূত, ইহাদের ভৌতিক কৌলীন্য খুব বেশি।

আবার কোনো কোনো মানুষ না মরিয়াও ভূত হয়—যেমন আবাগীর বা আবাগের বেটা ভূত। যুধিষ্ঠির না মরিয়াও সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, একথা স্বয়ং ব্যাসদেব মহাভারতে লিখিয়াছেন। যুধিষ্ঠির যদি না মরিয়াও স্বর্গে যাইতে পারেন, তবে আবাগের বেটাকে কেন মরিয়া ভূত হইতে হইবে? তিনি সশরীরে সোজা ভূত হইতে পারিয়াছেন। আমরা অতি কষ্টে বহু অনুসন্ধানে এই আবাগের বেটা ভূতের বংশতালিকা সংগ্রহ করিয়াছি। আপনাদের অবগতির জন্য বলিতেছি শুনুন। যথা ঃ—

১।	আবাগে	৫।	কিমাকার	৯।	আক্‌কুটে
	।		।		।
২।	ভূত	৬।	বিচ্ছিরি	১০।	উড়ন-চৌড়ে
	।		।		।
৩।	অদ্ভুত	৭।	বিদিকিচ্ছিরি	১১।	নচ্ছার
	।		।		।
৪।	কিম্ভূত	৮।	বিদকুটে	১২।	পাজী
	।		।		।
				১৩।	ছুঁচো

Evolution-সূত্রে যেমন বানর হইতে মানুষ হইয়াছে, তেমনই মানুষ হইতে devolution-সূত্রে কেন ছুঁচো হইতে পারে না? ইহা হওয়া সম্ভব এবং আমরা ইহা হওয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

দেখা যাইতেছে যে তিন রকমে ভূত হয়—(১) মানুষ মরিয়া ভূত (২) ভূতের বেটা ভূত (৩) আর আবাগের বেটা ভূত—ইঁহারা না মরিয়াই বহু পাপবলে ইহজন্মেই সশরীরে ভূত হইয়াছেন।

স্থিতি

ভূতের উৎপত্তির কথা বলিলাম। এইবার ইঁহাদের মর্ত্যে স্থিতির কাল সম্বন্ধে কিছু বলিব। মানুষ বা অন্য প্রাণী হইলে বলিতাম ইঁহারা গড়ে কত বছর বাঁচেন। মানুষ বা অন্য প্রাণীদের

শৈশব, যৌবন, বৃদ্ধত্ব ও অবশেষে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি আছে। ভূতেদের কিন্তু শৈশব নাই। সকলেই একেবারে সাবালক ভূত হয়। তাঁহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহাদের বেশ বয়স হইয়াছে। ভূতেদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইতে পারে না—কারণ তাঁহারা পঞ্চভূতে সৃষ্ট নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে অমর, চিরস্থায়ী, তাহাও নহে।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে অন্তত ৫,০০,০০০ লক্ষ বছর আগে। উত্তর আফ্রিকায় ও আফ্রিকার রিফ্ট্ভ্যালিতে যেসব অস্মীভূত নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাদের রেডিও-কার্বন ও রেডিও-পটাসিয়াম পদ্ধতিতে বয়স, অর্থাৎ সেগুলি কতদিন আগেকার, নির্ণয় করা হইয়াছে। সেই সময়ে পৃথিবীতে ১০,০০০ হাজার মানুষ ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। আর আজ ২৫,০০০ লক্ষ মানুষ। গড় ধরিলে ১২,৫০০ লক্ষ মানুষ বরাবর ছিল। আর জীমূতবাহন বলিয়াছেন ২০ বছরে এক পুরুষ। বাঙালি যতীন্দ্রমোহনবাবু দেখাইয়াছেন যে এইসব মানুষের গড় পরমায়ু ৩০-এর কাছাকাছি। এমতে ৫,০০,০০০ বৎসরে হয় ২৫,০০০ পুরুষ। তাহা হইলে মোটামুটি হিসাবে ১২, ৫০০,০০,০০০×২৫,০০০ মানুষ মারা গিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যাটি ভাবিয়া দেখুন—$৫^{৫}\times১০^{১০}$। এত লোক ভূত হইয়া থাকিলে প্রত্যেক মানুষের পিছনে ১২,৫০০ করিয়া ভূত। যদি একহাজার মানুষের মধ্যে একজনও মরিয়া ভূত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষের পিছনে ১২/১৩ জন করিয়া ভূত। এত ভূতের দাঁড়াইবার স্থান নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া ধরিতে হয় যে বহু ভূতের ভূতত্ত্ব লোপ পাইয়াছে।

আমরা হিন্দুরা পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করি। বৃদ্ধ-প্রপিতামহকে পিণ্ড দিতে হয় না। এক এক পুরুষ জীমূতবাহনের ব্যবস্থানুযায়ী ২০ বছর ধরিলে ৮০ বছরে আমার পূর্ব-পুরুষ উদ্ধার হইয়া গিয়াছেন। এমতে ভূতের ভূতত্ব থাকিবার গড় কাল ৮০ বছর। কোনো কোনো ভূতের মেয়াদ ইহার ডবল হইতে পারে। ইহার মধ্যে যদি গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া থাকি তো আরো শীঘ্র তাঁহারা ভূতত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই হিসাব হইল সাধারণ ভূতের বেলায়, অর্থাৎ যাঁহারা মানুষ ছিলেন, পরে মরিয়া ভূত হইয়াছেন।

কিন্তু এই হিসাব ভূতের বেটা ভূত ও আবাগের বেটা ভূতের বেলায় খাটে না। আমাদের মনে হয় তাঁহাদের ভূতত্ব সহজে যায় না। কতদিনে তাঁহাদের ভূতত্ব শেষ হয় এ বিষয়ে গবেষণা আবশ্যক। তবে নিবারণ ঠাকুর্দার মত এই যে, আবাগের বেটা ভূতের বংশে যখন ছুঁচোর আবির্ভাব হয় তখন তাহার ভূতত্ব ঘোচে।

ভূতেদের বয়স বাড়ে না, যে যে বয়সে ভূতত্ব লাভ করিয়াছে সেই বয়সের ভূতই থাকে।

লয়

গয়ায় পিণ্ড দিলে ভূতের ভূতত্ব শেষ হইয়া যায়। আবার ৮০ হইতে ১৬০ বৎসরের মধ্যে সকল ভূতের ভূতত্ব কালক্রমে নষ্ট হয়। যাহারা মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে, তাহারা মরিলে মার্বেল হয়—একথা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন। গয়ার চারিদিকে যে রামশিলা, প্রেতশিলা, আকাশ-গঙ্গা, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি পাহাড় আছে, তাহা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। ফল্গু বালিচাপা পড়িয়া অন্তঃসলিলা হইয়াছে এই কারণে।

সংখ্যা

পৃথিবীতে বহুপ্রকারের বহু ভূত আছে; ইহাদের সংখ্যা কত তাহা এযাবৎ নির্ধারিত হয়

নাই। পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় ভূতের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হয়—কারণ পৃথিবীর সকল লোকই 'ভূত' নহে, একটা মোটা রকমের অনুপাত হইতেছে সাধারণ লোক। অথচ বাংলার কৃষিবিভাগ হইতে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় লিখিত আছে যে 'বাংলায় যতেক সংখ্যক লোক, তাহার অর্ধেক সংখ্যক গরু'। এই সব গরু মরিয়া ভূত হইতে পারে না—কাজে কাজেই ভূতের সংখ্যা জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি হইতে পারে না।

আমরা ভূতেদের সংখ্যার একটি upper limit নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব—কতদূর সফল হইয়াছি তাহা আপনারা বিচার করিবেন। চিত্রগুপ্তের বিচারালয় দ্বাদশ যোজন লম্বায় ও দ্বাদশ যোজন প্রস্থে। আর আমাদের পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। সাধারণ বুড়া আঙ্গুলের ঘের মাপ $^{১}/_{৪}$ বর্গ ইঞ্চির কম নহে। চিত্রগুপ্তের বিচারালয় যদি এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পরমাত্মায় ভরিয়া যায়, আর তিলধারণের স্থান না থাকে, তাহা হইতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরমাত্মার সংখ্যা হইতেছে ঃ—

$(১২ \times ৪ \times ২ \times ১৭৬০ \times ৩ \times ১২)^২ \times ৪ = ৬৪, ২৩, ১৮, ৩৩৬$। এক কথায় ৬৫ কোটি। আর ইহাদের মধ্যে সকলেই ভূত হয় না, যাহাদের স্বর্গ ও নরক বাসের হুকুম হয় তাহারা এই সভা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। এমতে ভূতের ঊর্ধ্বসংখ্যা হইতেছে ৬৫ কোটি—আর বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা, ৬৫ কোটি চীনাদের ধরিয়া মোটমাট ২৫০ কোটি।

বয়স

পূর্বেই বলিয়াছি যে ভূতের শৈশব নাই, একেবারে সাবালক হইয়া ভূত হয়েন। মানুষ ইহজীবনে পাপ করিলে মরিয়া ভূত হয়; মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন যে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের কোনো পাপ হয় না। তাহার পর সাবালক না হওয়া পর্যন্ত যে পাপ করে তাহা যমরাজ মাপ করিয়া দেন, কিছুকাল ধরিয়া ঘৌড়দৌড় করাইবার পর। যমদূতেরা কান ধরিয়া যে বেগে ঘোড়দৌড় করান তাহাতে প্রাণান্ত হইতে হইতে কোনোমতে টিকিয়া থাকে। সাবালক না হইলে মানুষকে পাপ অর্শায় না—আর হিন্দুমতে ১৬ বছরে সাবালক হয়। জীমূতবাহনের মতে বাঙালিরা সাবালক হয় ১৫ পার হইয়া ১৬য় পা দিলেই; আর খোট্টা, উড়িয়া, অন্ধ্র, মারাঠীরা প্রভৃতি হয় পূর্ণ ১৬ হইলে। এমতে বাঙালি ভূতের সংখ্যা বা অনুপাত কিছু বেশি। তবে বাঙালিরা বেশিদিন বাঁচেন না অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়। বাঙালি ভূতের গড় বয়স হইতেছে ৩০ হইতে ৩৫। তাহার পর তাঁহারা ৮০ বছর ধরিয়া ভূতগিরি করেন—যদি না তাঁহাদের গয়ায় পিণ্ড দেওয়া হয়।

আগে গয়ায় যাওয়া খুব কষ্টকর ছিল। গ্রামের একজন যদি গয়ায় যাইত, তবে পাড়া-পড়শীর নাম ও গোত্র লইয়া যাইত ও তাহাদের নামে পিণ্ড দিত। এমতে ভূতের সংখ্যা খুবই কমিয়া যাইত। আজকাল গয়ায় যাইবার সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেরা বাপেরই গয়া করেন না, তা অন্য লোকের গয়া করিবেন। ফলে relatively বাঙালি ভূতের সংখ্যা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। আর ইঁহারা মাঝে মাঝে আমাদের ঘাড়ে চাপেন। ইঁহারা যে আমাদের ঘাড়ে চাপেন তাহার প্রমাণ সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে—কি স্কুলে, কি কলেজে, কি মিটিংয়ে, কি ট্রামে বাসে রাস্তায়, লোকের কথাবার্তা ও আচরণ দেখিয়া মনে হয় যে কোনো দুষ্ট ভূত ঘাড়ে চাপিয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বায়ু হইল আমাদের পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই ভূত হয়েন। যম যখন

সত্যবানের প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন এই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বায়ুই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্বে এই কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে। মানুষের অঙ্গুষ্ঠের পরিমাণ গড়ে ৩ কিউবিক সেন্টিমিটার, আর বায়ুর ওজন প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ০.০০১২৯৩ গ্রাম। সেমতে গড়ে পরমাত্মার ওজন ১৭/১৮ গ্রেন। ইহার সবটাই ভূত হয় না। সরিষার মধ্যে ভূত ঢুকিলে সরিষার ওজন বাড়িয়া যায়—এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু সরিষার ওজন বাড়ে ৬/৭ গ্রেন করিয়া। সেমতে ভূতের ওজন ৬/৭ গ্রেন হইতে ১৭/১৮ গ্রেণের মধ্যে। আমরা সর্বাপত্তি খণ্ডনের জন্য ভূতের ওজন ইহার মাঝামাঝি, অর্থাৎ ১১১/২-১২১/২ গ্রেন ধরিলাম। এ বিষয়ে আরো গবেষণা আবশ্যক। বাংলায় আজকাল পিল-পিল করিয়া D.Phil হইতেছে; যাঁহারা D.Phil-প্রত্যাশী তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ পুরাতন ও নবীন বঙ্গ-সাহিত্য ঘাঁটিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণের সমাধান করেন, তাহা হইলে নিখুঁতভাবে ভূতের ওজন নির্ধারিত হইতে পারে। সমীকরণটি এই :—

$$\frac{d^n y}{dx} f(cx + iy) = (a + ib)\sqrt{ni}$$

ভূতের ওজন কম হইলেও, তাহাদের হাত-পা লিকলিকে সরু কাঠির মতন হওয়াতে তাহাদের Ponderal index খুব বেশি। অতি সহজেই মানুষের ঘাড় মটকাইয়া দিতে পারে।

ভূতের size

গ্যাস যেমন অল্প জায়গায় থাকিতে পারে, আবার বাড়িয়া পৃথিবীব্যাপ্ত হইতে পারে, ভূতেরাও তেমনি নিজেদের শরীর ইচ্ছামতো কমাইতে পারে। বাংলায় একটি কথা চলতি আছে যে "সরিষার মধ্যে ভূত"; ভূত ছোট হইয়া সরিষার মধ্যেও ঢুকিতে পারে। আবার তালগাছ সমান লম্বা হইতে পারে। ভূতেরা যখন মানুষকে ভয় দেখাইতে ইচ্ছা করে তখন তালগাছ-সমান উঁচু হয়; আর তালগাছের মাথায় বসিয়া পা ঝুলাইয়া নিচে দিয়া যেসব মানুষ যায় তাহাদের গলায় পা দিয়া টিপিয়া মারিয়া ফেলে। ভূতেরা যে শুধু ইচ্ছামতো ছোট-বড় হইতে পারে তাহা নহে, ছোট থাকিয়াও একটা হাত বা পা খুব বেশি লম্বা করিতে পারে, গলাটা লম্বা করিয়া ও-বাড়ির দোতলায় কি হইতেছে দেখিতে পারে। "গদখালির হাত"এর ব্যাপারটা বলিলে আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ঘটনাটি আজ হইতে ৭০/৮০ বছর আগেকার। যশোহর জেলার গদখালি একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম; গ্রামে মহামারী দেখা দিল, বাড়িকে বাড়ি উজাড়, কে কাহাকে দাহ করে ঠিক নাই, অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। বিদেশে এক যুবক চাকুরি করিত; দেশে মা ও স্ত্রী থাকিত; খবর না পাইয়া খবর লইতে দেশে আসিল। গ্রামে যখন পৌঁছাইল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; অন্ধকারে মনে হইল যেন দুই-চারিজন পরিচিত লোক পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, কেহ কথা কহিল না। বাড়িতে গিয়া হাঁক দিল 'মা! মা! বাড়ি আসিয়াছি'। ঘোমটা দিয়া স্ত্রী জলভরা গাড়ু রাখিয়া গেল। মা থালায় করিয়া খাবার দিয়া বসিয়া আছেন, সবই অন্ধকার—বুঝিল প্রদীপে দিবার মতন তৈল নাই; তাই অন্ধকারে খাইতে দিয়াছেন। মা কিন্তু কোনো কথা বলেন না; খাইতে খাইতে যুবকটি বলিল যে আচার হইলে ভালো হইত। মা (তখন ভূত হইয়াছেন) অমনি হাত বাড়াইয়া শিকার উপর হইতে আচারের হাঁড়ি

নামাইয়া দিল। যুবকটি বুঝিল মা মরিয়া ভূত হইয়াছেন, তাই কথা কহিতেছেন না। বাড়ির বাহির হইয়া ছুটিয়া রেল স্টেশনে আসিল ও মিটিমিটি আলোয় রাত কাটাইয়া ভোরের ট্রেনে কলিকাতায় আসিল। এই ঘটনার কথা তখনকার দিনের বিখ্যাত সাপ্তাহিকপত্র বঙ্গবাসীতে (যে বঙ্গবাসীর নামে সর্বপ্রথম সিডিসানের মোকদ্দমা হয়) প্রকাশিত হয়। সেই হইতে "গদখালির হাত" প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

ঠাকুরমার পেয়ারের ঝি আহ্লাদির মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছি : পাশের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব, ঢিল ফেলে, ময়লা ফেলে। এ বাড়ির ছোট কর্তা বলিলেন যে দুষ্ট লোকের কাজ, ভূত যদি সত্য সত্য থাকে তো গলা বাড়াইয়া দেখা দিক। সেদিন শনিবার, অমাবস্যা, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে—যে-ই ছোট কর্তা ঐ কথা বলিলেন, অমনি জানলার গরাদ ভেদ করিয়া এক কালো তিজেল হাঁড়ির মতন মুখ, গলাটা সরু হাঁসের গলার মতন, চোখ দুটো ভাঁটার মতন ছোট—কর্তার সামনে হাজির। ছোট কর্তা অজ্ঞান হইয়া গেলেন; আমরা সব রামনাম করিতে লাগিলাম। ভূত হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

ভূতের রং

বাঙালিদের মধ্যে ফরসা লোকের অভাব নাই। কেহ বা ধবধবে ফরসা, কেহ গৌরবর্ণ, বেশির ভাগ উজ্জ্বল শ্যাম বা শ্যামবর্ণ, অনেকে কালো, দুই-চারিজন মিশমিশে কালো। আবার এমন লোকও আছে, কালো হইতে হইতে একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে। বাঙালির গাত্রবর্ণ লইয়া কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এযাবৎ হয় নাই। আমরা বাঙালি সাহিত্যিকদের, অর্থাৎ যাঁহারা কবিতা ছাপাইবার জন্য মাসিকপত্রের সম্পাদকদের কাছে যাওয়া-আসা করেন, এইরূপ ২৩৪ জনের গাত্রবর্ণ Martin's scale-এ মাপিয়াছিলাম। নিম্নে তাহা শতকরা হিসাবে দিলাম। এই তথ্য সমগ্র বাঙালি জাতির পরিচায়ক না হইতেও পারে। হিসাবটি এইরূপ :—

শতকরা

খুব ফরসা	গৌর বর্ণ	উজ্জ্বল শ্যাম	শ্যাম	কালো	ঘোর কালো মায় নীল
১	৯	১৭	৩০	৪১	২

ভূতেদের মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য থাকিলেও বেশির ভাগ ভূত পনেরো আনা তিন পাই ভূত—ঘোর কালো। ইহারা সকলেই বাঙালিভূত। পেত্নীদের মধ্যে শতকরা ১০৮ জন মিশমিশে কালো। এক ব্রহ্মদৈত্যই যা ফরসা বা গৌরবর্ণ। পেঁচো নীলবর্ণের—কালো নহে। ভূতেরা আলকাতরার মতন কালো, তামাক খাইবার টিকার মতন খসখসে কালো। এইজন্য বাংলায় বলে "ভূতের মতন কালো"; পৌষ সংক্রান্তিতে যখন মেটে হাঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হয় তখন তাহার তলাটি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এমন কালো হয় যে আমরা বলি তলাটি হইয়াছে ঠিক যেন 'কেলে ভূত'।

ভূত যে কালো তাহা নিরীশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার পুরাতন ভৃত্যে :—

"ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।"

... ...

কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত, তামাক সাজিয়া আনে।"

ভূতেদের মধ্যে কালো রংয়ের প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয় পূর্বে বাঙালিরা—বেশির ভাগ খাঁটি বাঙালি খুব কালো ছিল; এখন অল্পে অল্পে মোগল যুগে রেড়ির খোল ও সর মাখিয়া, ইংরাজ আমলে সাবান ঘষিয়া, এখন স্বাধীনতার যুগে সাবান স্নো, ট্যালকম পাউডার মাখিয়া ও ঔষধ খাইয়া ফরসা হইতেছে। ব্রহ্মদৈত্যেরা বরাবরই ফরসা, কেহ কেহ ধবধবে ফরসা, কেহ কেহ গৌরবর্ণ; কন্ধকাটারা ও পেঁচো নীল রংয়ের। কন্ধকাটাদের নীল হইবার একটি কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি—আগেকার দিনে নবাব-বাদশাহরা যাহাদের গর্দান লইতেন, তাহারাই অপঘাতে মৃত্যু হওয়ায় কন্ধকাটা হইত; আর রক্ত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের কালো দেহ রক্তহীনতাহেতু নীল হইয়া যাইত। পেঁচো কেন যে নীল তাহা বাহির করিতে পারি নাই। মাম্‌দোরাও কালো।

ভূতের চেহারা

ভূতের বা পেত্নীর চেহারা কদাকার; রং তো কালো, তাহার উপর চেহারায় কোনো লালিত্য নাই। সুপুরুষ ভূত আর কাঁটালের আমসত্ত্ব বা সোনার পাথরবাটি একই কথা। রাম দেখিতে খুব কদাকার; এইজন্য রামের চেহারা বর্ণনা করিবার সময় বলি রামকে ভূতের মতন দেখিতে। ভূতের চোখ দুইটি ভাঁটার মতন, লাল গোল গোল—যেন কোটর থেকে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। আমাদের মতন পদ্মপলাশলোচন বা অঞ্জননয়না নহে। ভাঁটা কাহাকে বলে আজকালকার ছেলেছোকরারা তো বটেই, অনেক বয়স্ক শহুরে লোকেও জানেন না। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই না-জানাটাকেই তাঁহারা গৌরবের মনে করেন। অনেক শহুরে লোকের মতন তাঁহারা ধানগাছের তক্তা ও আফিমকাটের বাড়ি বলেন। এজন্য যদি ভাঁটা কাহাকে বলে বুঝাইবার চেষ্টা করি তো আপনারা রাগ করিবেন না, ধৈর্য ধরিয়া শুনুন। আমরা বাল্যকালে পাড়াগাঁয়ে ভাঁটা লইয়া খেলা করিয়াছি। 'ছাঁদা'-মাটির গোল্লা—২/৩ ইঞ্চি ব্যাস, আগুনে পুড়াইয়া ইটের মতন লাল করা হইত। এই ভাঁটা দৈবাৎ কিনিতে পাওয়া যাইত; সচরাচর তৈয়ারি করিয়া লইতে হইত। কুমোরবাড়ির 'ছাঁদা'-কাদায় বড় বড় গোল্লা তৈয়ারি করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হইত, তারপর কুমোর যখন 'পোনে' আগুন দিত সেই সময়ে পোড়াইয়া লওয়া হইত। 'পোন' ভাঙ্গিলে ছাই ঘাঁটিয়া ভাঁটা বাহির করা হইত।

ভূতের চোখগুলা তো ভাঁটার মতন, দাঁতগুলা মূলার মতন লম্বা ও সাদা অন্ধকারেও দূর হইতে ঠাহর হইত। কশের পাশের দুইটি দাঁত আরো বড় বড়, হাতির দাঁতের ন্যায় সর্বদাই বাহির হইয়া থাকে। ভূতেরা নখ কাটিতে পায় না, এজন্য নখগুলি বাড়িয়া বড় বড়। আঁচড়াইয়া দিলে সারি সারি দাগ কাটিয়া রক্ত বাহির হয়। এজন্য ছোট ছেলেরা কাঁটা-বনে খেলা করিতে গেলে যদি সরু সরু সারি সারি ছড়ে যাওয়ার দাগ হইত তো বলিত ভূতে আঁচড়াইয়া দিয়াছে। কান দুইটি কচুপাতার মতন—মানুষের তুলনায়, গাধার তুলনায় খুব বড় বড়।

ভূতের নাক চ্যাপ্টা; খ্যাঁদা নাক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় খ্যাঁদা ভূতের কথা বলিয়াছেন, 'ইনি ভূতেদের মধ্যেও খ্যাঁদা'। এই খ্যাঁদা চ্যাপ্টা নাকের দরুন ভূতেরা খোনা খোনা কথা বলে—যেমন দেঁ-না, দেঁ-না, মাঁ-ছ খাঁ-বোঁ-ও, মাঁ-ছ, খাঁ-বোঁ-ও। নিজেদের

মধ্যে যখন কথা বলে, নাকিসুরে ফিড়িঙ, মিড়িঙ, পিঙ,... এই রকম শব্দ শুনা যায়। শাঁখচুন্নীরা যেন শাঁখের ভিতর ফুঁ দিয়া কথা বলিতেছে বলিয়া মনে হয়। অনেকটা ভোটের সময় চোঙ্গা-ফোঁকার মতন; তফাত এই যে মোটা আওয়াজের বদলে নাকি সরু আওয়াজ। ভূতেরা খ্যাঁদা হইলেও পেত্নীরা নহে। নাকেশ্বরী ভূতিনীর (ইনি ভূতের পত্নী যখন নিশ্চয়ই পেত্নী) কথা আপনারা সকলে জানেন। নাকেশ্বরী ভূতিনীর নাক আড়াই হাত লম্বা; কিন্তু তাই বলিয়া পেত্নীদের নাক অত লম্বা নয়; তবে মানুষের তুলনায়, ভূতেদের তো কথাই নাই, নাক খুব লম্বা। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে পেত্নী, গুয়ে-পেত্নী ও শাঁখচুন্নীদের নাক গড়ে ৪ আঙ্গুল লম্বা। পেত্নীরা দীর্ঘ নাকের সাহায্যে এক ক্রোশের মধ্যে ইলিশ মাছ ভাজা হইলে তাহার গন্ধ পায় ও খাইতে ছুটে। জব্দ হইয়াছিল আমাদের পাড়ার নেড়ি গোয়ালিনীর কাছে। নেড়ি ইলিশ মাছ ভাজিতেছে, ছেঁচা ব্যাড়ার পাশে এক পেত্নী মাছভাজা খাইবার লোভে দেঁ-নাঁ এঁ-ক-টা; দেঁ-নাঁ এঁ-ক-টা বলিতেছে। নেড়ি দিচ্ছি বলিয়া খুন্তী পুড়াইয়া হাতে ছ্যাঁকা দিয়াছিল। সেই থেকে নেড়িকে আর পেত্নীরা জ্বালাতন করিত না। একথা আমরা নেড়ির নিজমুখ হইতে শুনিয়াছি।

ভূতের দেহ লিকলিকে প্যাঁকাটির মতন, হাত-পা খুব সরু সরু, যাকে বলে অস্থিপঞ্জর-সার। মাথাটা কিন্তু দেহের তুলনায় খুব বড়—যাকে বলে হেঁড়ে মাথা। এইজন্য হেঁড়ে মাথার ছেলেকে সহজে ভূতে পায়। ভূতেরা সাধারণত খুব লম্বা হইয়া থাকে; তালগাছে পা ঝুলাইয়া বসিলে পা মানুষের গলাসমান ঝুলিয়া থাকে। ভূতের 'গোড়-মুড়ো'টা কিন্তু উল্টানো। অর্থাৎ পায়ের আঙ্গুলগুলি পিছনদিকে থাকে, মানুষের মতন সামনের দিকে নহে। অনেক শিশু-পাঠ্য ভূতের গল্পের বইতে কিন্তু ভুল করিয়া পায়ের আঙ্গুল সামনের দিকে করিয়া ছবি ছাপা আছে—ইহাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভূতের সম্বন্ধে ভুল ধরণা হইবে; এবং সর্বভারতীয় ভৌতিক পরীক্ষার বাচনিক অংশে ফেল করিবে। ইং ১৮৩০ সালে ছাপা এক ভূতের গল্পের বইয়ে ভূতের যে ছবি ছাপা আছে তাহাতে গোড়-মুড়া উল্টানো দেখানো আছে—এই বই অত্যন্ত দুর্লভ, কোনো পুস্তকাগারে নাই, আমাদের কাছে ইহার কয়েকটি ছেঁড়া পাতা আছে—আপনারা ইচ্ছা করিলে দেখিয়া যাইতে পারেন। ভূতেদের গোড়-মুড়ো যে উল্টানো তাহার আর একটি প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা অতি নিঃশব্দে চলিতে পারে।

ভূতেরা যে প্রস্রাব করে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ইং ১৯৩০ সালের শীতকালে আমি ও আমার এক ভাই—ইনি বিজ্ঞান কলেজের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত অধ্যাপক, রাত্রি ৯/১০টার সময় দাঁইহাট স্টেশনে নামিয়া, গরুরগাড়ি না পাইয়া, হাঁটাপথে বাশুলীর মিত্র-জমিদারবাবুদের বাড়িতে এক সরু মেটে জঙ্গলাকীর্ণ গলিপথ দিয়া হাঁটিয়া রওনা দিই। এক জায়গায় খুব ঘন বাঁশঝাড়, সেই বাঁশবনের মধ্য দিয়া যাইতেছি এমন সময়ে জামার উপর, গালের উপর জল পড়িল, ভয়ানক দুর্গন্ধ—ভূতের প্রস্রাব কিনা! দুষ্ট লোকে ভয় দেখাইতেছে মনে করিয়া টর্চ জ্বালাইলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; পরে ভয় পাইয়া উচ্চৈস্বরে রামনাম করিতে ও চারিদিকে টর্চ ফেলিতে বাঁশঝাড়ের উপর লাফালাফি শুরু হইল—ভূতেরা পলাইতে লাগিল। বোধ হয় লেজ ছিল।

পেত্নীদের নাকের কথা বলিয়াছি; তাহারা দেখিতে কিরূপ সে সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিব। ৬০/৭০ বছর আগে 'প্রতাপবোসের নীরি' বলিয়া এক বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন,

ইনি ছিলেন কিন্নরকণ্ঠী। নাটোরের ছোট তরফের রাজা গোলকেন্দ্র ইঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "বাঁধা" রাখিতে চাহেন, নীরি রাজি হয়েন নাই। পরে সরল মিত্র—যাঁহার পিতামহকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে শ্রীশচন্দ্রের ছবি আঁকিয়াছেন—ইঁহাকে 'বাঁধা' রাখেন। এই নীরিকে নাকি পেত্নীর মতন দেখিতে—একথা সেকালের বহু বড় মানুষের, বড় মানুষদের মোসাহেবের ও মাহিনা-করা ওস্তাদদের মুখে—যাঁহারা নীরিকে বহুবার দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে বহুবার শুনিয়াছি। নীরিকে দেখি নাই, বহু অনুসন্ধানে নীরির ছবি বা ফটোও পাই নাই। পাইলে আপনাদের দেখাইতাম পেত্নী কিরূপ দেখিতে। পেত্নীরা দেখিতে অতি কদাকার।

ভূতেরা (এক আলেয়া ছাড়া) কেহ জল ছোঁয় না, স্নান করে না—এজন্য কথায় বলে "গুলিখোর ভূত"। আবগারী বিভাগের অত্যাচারে গুলিখোরের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। গুলিখোরেরা স্নান করে না, পাছে নেশা কাটিয়া যায়। বাবা জগন্নাথ বছরে একবার স্নানযাত্রার দিন স্নান করেন—ফলে ১৪/১৫ দিন জ্বর হয়; পাকা গুলিখোরেরা বাবাকেও টেক্কা দিয়াছে। রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডার বিশুখুড়ো একজন সেকেলে পাকা গুলিখোর, তিনি বলিতেন, বিবাহের পর এই ৫০/৬০ বছর স্নান করি নাই, যেদিন কাশীমিত্রের ঘাটে যাইব সেইদিন ছেলেরা জোর করিয়া স্নান করাইয়া দিবে। স্নানে শুধু যে নেশা কাটিয়া যায় তাহা নহে, দেহও পচিয়া যায়, যেমন আলনার দড়ি কতদিন টেঁকে, আর পাতকুয়ার দড়ি কত শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হয়। এই স্নান না করা বা জল না ছোঁয়ার দরুণ ভূতেদের গায়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ। ভূতেদের গায়ে দুর্গন্ধ হইলেও, কেহ কেহ এমন কি পায়খানায় বাস করিলে—খুব বেশি দুর্গন্ধ বোধ হইলে ভূতেরা পলাইয়া যায়—এজন্য কথা আছে 'গন্ধে ভূত পলায়'। কিরূপ দুর্গন্ধ হইলে ভূত পলায় তাহার একটি নমুনা দিব। রাসায়নিক পরীক্ষাগারের Kipp's apparatus হইতে যে গন্ধ বাহির হয় তাহাতে ভূত পালায়, একথা কলেজে পড়িবার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মুখে বহুবার শুনিয়াছি। তিনি যে একথা বলিয়াছিলেন, হয় না হয় জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বাবু ও জ্ঞান মুখার্জীকে প্রশ্ন করিতে পারেন।

ভূত তাড়াইবার তিনটি উপায় : (১) দুর্গন্ধে ভূত পালায়। (২) মন্ত্রপূত সরিষা পড়ায় দৌড় দেয়, আর (৩) মারের চোটে সরিয়া পড়ে। এই তিনটির মধ্যে সহজ হইতেছে গন্ধে ভূত ভাগানো।

ভূতেদের চুল খোঁচা খোঁচা, শুয়োর-কুচির মতন; ইহারা টেরি কাটিতে পারে না। পেত্নীরা এলোচুলে থাকে। মামদোদের মাথা কামানো, তবে দাড়ি আছে। কাহারও বুব্বুর দাড়ি, কাহারও নূর, কাহারও গালপাট্টা, আবার কাহারও চাপদাড়ি। দাড়ির রং হয় সাদা, না হয় ঘোর বাদামী। L' Aumaine de Moude Mussulman নামক বিখ্যাত পত্রিকায় ফারসী বইয়ের আশেপাশে যেসব চিত্রবিচিত্র করা থাকে তাহা ছাপা হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আমরা মামদোদের দাড়ির বর্ণনা করিলাম।

ব্রহ্মদৈত্যদের গলায় পৈতা—মোটা, সাদা ধবধবে, অন্ধকারেও ঠাহর হয়, মাথায় জটা, ঋষিতুল্য দাড়ি; পায়ে ঘোঁড়তলা কাঠের খড়ম, খটাখট করিয়া চলেন, গোড়-মুড়ো উল্টানো নহে। এই বর্ণনা আমরা অধর মিত্রের মায়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একহাতে গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া বুকের ভিতর কাপড় চাপা দিয়া শিব গড়িয়া নিত্য গঙ্গাস্নান সারিয়া পূজা করিতেন; বলিতেন দুই হাতে শিব গড়িলে বাঁ-হাত ঠেকিয়া শিবের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়।

পিশাচদের মুখ গাধার মতন—গাধার মুখের চেয়ে লম্বা, সরু ও উল্টানো। অর্থাৎ পিছনদিকে মুখ ফেরানো। পায়ে ঘোড়ার ন্যায় ক্ষুর—লাফাইয়া লাফাইয়া চলে; হেলিকপ্টারের মতন শূন্যে উঠিতে পারে; ইহারা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িলে জিভ বাহির করিয়া খায়, চাটিয়া খাইতে পারে না। খুব রোগা। দেহের রং কালো, মুখের রং গাধার মতন। যাহারা বাপ-মাকে খাইতে দেয় নাই, তাহারাই নাকি মরিয়া পিশাচ হয়।

পেঁচোর রং নীল, মাথাটা দেহের তুলনায় খুব বড়—একটি ছোট ছেলের মাথায় ধোবার বোঝা চাপাইলে যে রকম দেখিতে হয় সেই রকম। ছোট ছোট আঁতুড়ে ছেলেদের পেঁচোয় পাইলে তাহারা যে নীল হইয়া যায় তাহার কারণ পেঁচো স্বয়ং নীল। পেঁচো রক্তের ন্যাকড়ায় বাস করে, তখন খুব ছোট হইয়া থাকে।

আলেয়া জলায় থাকে; হাঁ করিলে দপ করিয়া আলো জ্বলিয়া থাকে, মুখ বন্ধ করিলে খপ করিয়া নিবিয়া যায়। ইহাদের দেহ কেহ দেখিতে পায় না, গায়ে একরকম বিশিষ্ট গন্ধ, সে গন্ধ বেশি নাকে যাইলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া যায়, সময়ে সময়ে মরিয়াও যায়। ইহারা মানুষকে পথ ভুলাইয়া ঘোরাইতে ভালোবাসে, সহজে মারিতে চাহে না, তবে কখনো কখনো জলার পাঁকে ডুবাইয়া দেয়।

যেসব শ্যাওলা-আগাছা-পূর্ণ দীঘিতে "জটে বুড়ি" থাকে, সে সব দীঘিতেও ইহারা থাকে। তবে জটে বুড়ির সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই বলিয়াই মনে হয়।

এবার কন্ধকাটার কথা বলিতেছি; খালি মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, একেলা কাহাকেও পাইলে, বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ছেলে, ধরিয়া খায়। ইহার এক মাটির মূর্তি দেখিয়াছি। হুগলী জেলার কামারকুণ্ডু রেল স্টেশনে নামিয়া মাইলখানেক দূরে এক বিলের ধারে। মূর্তিটি উচ্চতায় আন্দাজ ৩ ফুট, লিকলিকে হাত-পা, নখ খুব বড় বড়, মাথা নাই, কাঁধের উপরটা প্লেন, আমাদের যেখানে নাভিকুণ্ডলী সেখানে প্রকাণ্ড এক হাঁ, দাঁত বাহির করিয়া আছে, চোখ নাই, নাক নাই, কান নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম এ কার মূর্তি, বলিল কন্ধকাটার। ধান-কাটা হইলে অনেকে ধান চুরি করে, এই মূর্তি ধান-ক্ষেতে বসাইয়া দিলে কন্ধকাটা চোরেদের তাড়াইয়া দেয়।

চণ্ডুর শুধু মাথা আছে; ঘরের কড়িকাটে মাঝে মাঝে আইসে। সহজে মাথাটিও দেখিতে পাওয়া যায় না, শুধু গলার স্বর শুনিতে পাওয়া যায়—যে কোনো মানুষের স্বর অনুকরণ করিতে পারে। চণ্ডু এইমাত্র আমার স্বর অনুকরণ করিল, একটু পরে হেঁড়েগলায় কথা বলিল, আবার খানিকক্ষণ বাদে চিঁচিঁ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলিল। চণ্ডুকে নাকি সহজে পোষ মানাইতে পারা যায়। আমাদের পাড়ার "হাপু" খেলোয়াড় নিতাইয়ের এইরূপ একটি পোষা চণ্ডু ছিল। সে অনেকের স্বর অনুকরণ করিতে পারিত। কখনো তালগাছের মাথা থেকে, কখনো মাটির নীচে থেকে কথা বলিত।

দানো নাকি মানুষের চেয়েও বড়; তবে তাহাকে যে কেহ দেখিয়াছে একথা শুনি নাই। মড়ার উপর দানো বসিলে মড়া ভয়ানক ভারি হয়। কখনো কখনো মড়া খাটিয়ায় উঠিয়া বসে। দানো জ্যান্ত মানুষকে ধরে না। যেসব মানুষ মরিবার কালে "দোষ" পায়, তাহাদেরই খালি দানোয় পায়।

কোনো কোনো ভূতের আবার শিং গজায়। এই শিং মাথার মধ্যখান দিয়া গজায়—এই শিং হরিণের শিংয়ের মতন ডাল-পালাওয়ালা নহে, মহিষের মতন

বাঁকানোও নহে, গরুর শিংয়ের মতন—১১/২ হাত খাড়া উঁচু। কারণ, ঠাকুমার পেয়ারের আহ্লাদি ঝি ও দিদিমার ঝি "আতর" ("আতরের" একটা নিজস্ব নাম ছিল, দিগম্বরী বা নিস্তারিণী এই রকম একটা কিছু, দিদিমাকে সেই নাম ধরিতে নাই, তাই দিদিমা আদর করিয়া তাহাকে "আতর" বলিয়া ডাকিতেন) উভয়ের মুখ হইতেই শুনিয়াছি। যাহারা জীবৎকালে স্ত্রীর রোজগারে খায়, তাহারা মরিয়া ভূত হইলে এইরূপ বড় শিং গজায়।

বেশির ভাগ মামদোর একটা গোঁজের মতন লেজ আছে। এই লেজ সাধারণত বেঁড়ে নেড়ি কুত্তার মতন গুটাইয়া রাখে। একবার যদি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া এই লেজ মাটিতে পুঁতিতে পারে, তাহা হইলে রোজার বাপের সাধ্য নাই যে তাহাকে তাড়ায়। একথা আমরা মুন্সী তামিজুদ্দীনের মুখে বহুবার শুনিয়াছি।

ভূতের শক্তি

ভূতেরা সাধারণত খুব পরিশ্রমী হয়; ভূত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—একটা না একটা কাজ বা অ-কাজ করা চাইই চাই। গঙ্গাচরণ ময়রা বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ ভূতের ওঝা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কলিকাতায় বর্তমান ছিলেন—তাঁহার নামে শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে। শুনা যায় যে তাঁহার বসতবাটিতে পোষা ভূত ছিল; ইহাদের তিনি একটা না একটা কাজে সর্বদাই নিযুক্ত রাখিতেন। কালক্রমে তাঁহার একটি বাড়তি ভূত জুটিল; তাহাকে কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, এইজন্য তিনি উঠানে একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহাকে আদেশ দিলেন যে ওঠা-নামা করো। ওঠা-নামা শেষ হইলে তোমাকে অন্য কাজ দিব। সে ক্রমাগত ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

ভূতের নিজের কোনোও লাভ নাই এমন কাজও ভূত করিতে ভালোবাসে। এইজন্য "ভূতের বেগার খাটা" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূতের চেহারা লিক্‌লিকে সরু কাঠির মতন হইলে কি হয়, খুব ভারি ভারি বোঝা—যাহা মানুষে তুলিতে পারে না, ভূতেরা অনায়াসে বহিতে পারে। এইজন্য "ভূতের বোঝা" কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভূত সাধারণত গাছে বাস করে; একটি ভূত নিমগাছে থাকিত ও গৃহস্থকে জ্বালাতন করিত। ওঝা আসিয়া তাহাকে মন্ত্র দিয়া বাঁধিয়া বলিল, 'কি হইলে তুই চলিয়া যাইবি?' যে ভূত, সে মানুষ থাকা কালের নাম ও গোত্র বলিল, আর বলিল যে আমার নামে গয়ায় পিণ্ড দিলে চলিয়া যাইব। ওঝা বলিল, 'কি করিয়া জানিব যে তুই চলিয়া গিয়াছিস?' ভূত বলিল যে, আমি যাইবার আগে নিমগাছটি ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইব। গৃহস্থ অনেক পয়সা খরচ করিয়া গয়ায় পিণ্ড দিলেন; যেদিন পিণ্ড দেওয়া হইল সেদিন দ্বিপ্রহরে কোথাও কিছু নাই, হাওয়া নাই, ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, মড়মড় করিয়া প্রকাণ্ড নিমগাছটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই নিমগাছের গুঁড়িটি দেড়হাত ব্যাসের—নিমকাঠ খুব শক্ত কাঠ—ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে ভূতের গায়ে কি জোর!

ভূতেরা খুব দ্রুত যাইতে পারে। মরিবার পর মানুষের জীবাত্মাকে যমদূতেরা যমপুরে লইয়া যায়। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আছে যে এখান হইতে যমালয়ের দূরত্ব ৯৯,০০০ হাজার যোজন। যমদূতেরা ভুল করিয়া যদি কাহাকেও লইয়া যায়, তাহা হইলে সে লোককে মৃত বলিয়া মনে হইবে। আর ফেরত দিয়া গেলে সে আবার বাঁচিয়া উঠিবে। যমদূতের এই যাতায়াতের জন্য মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দিগকে ১২ দণ্ড বা ১২x২৪=২২৮ মিনিট অপেক্ষা

করিতে বলিয়াছেন স্মার্ত ভট্টাচার্য। যমদূতেরা মানুষের জীবাত্মাকে প্রতি সেকেন্ডে ৩৬ মাইল বেগে লইয়া যায় ও লইয়া আসে। জীবাত্মা যদি মরিয়া ভূত হয়, তাহা হইলে এই ভূতও অত দ্রুত যাইতে পারে। জেট-প্লেন ঘণ্টায় ৩০০/৪০০ শত মাইল যায়—ভূতের গতির তুলনায় জেট-প্লেন গরুরগাড়িরও অধম।

বাসস্থান

ভূত কোথায় থাকে? ভূত ও পেত্নী সাধারণত আশশেওড়া গাছের ডালে থাকে; নিম, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছেও থাকে, বাঁশবনেও থাকে। কোনো কোনো ভূত তালগাছের মাথায় থাকে; কিন্তু বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া নারিকেল গাছে থাকে না। মাম্‌দোরা খেজুরগাছের মাথায় থাকে। দৈবাৎ পোড়ো পাকা বাড়ি বা পাইখানা পাইলে সেখানে থাকে। গুয়ে-পেত্নীরা কিন্তু কুয়া-পায়খানায় থাকিতে ভালোবাসে। ব্রহ্মদৈত্যরা বেলগাছেই থাকিতে ভালোবাসে, কখনো কখনো অশ্বত্থ গাছে থাকে। পরশুরাম বলিয়াছেন যে পরিত্যক্ত ইট খোলায় ভূতেরা থাকেন—কিন্তু এইটে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের শিবমন্দিরের কাছে একটা প্রকাণ্ড কনকচাঁপার গাছ আছে; এই গাছে এক ব্রহ্মদৈত্য থাকেন; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর খড়ম-পায়ে খটাখট করিতে করিতে শিবমন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে ইঁহাকে অধর মিত্রের মা দেখিয়াছেন—এমন কি পূর্ণিমার রাতেও। যে অধর মিত্র পরে কাশীবাসী রামলিঙ্গস্বামী বলিয়া পরিচিত, যিনি পূর্বাশ্রমে নিজের অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, গৃহদাতা ননুবাবুকে ভুবনমোহিনীর কথায় বিষ দিয়াছিলেন; ইহার একমাত্র পুত্র, আমাদের পঞ্চুদাদা, বিবাহের একমাসের মধ্যে দীননাথ ভট্টাচার্যের ব্রহ্মশাপে মরিয়া কলিকালেও যে ব্রহ্মশাপ ফলে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইনি কেবলমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলিয়া এ্যাফিডেবিট করিয়া প্রকৃত সত্যকে এপিঠ-ওপিঠ করিতে পারিতেন। খসুদত্ত বলিতেন যে, অধর পারে না এমন কাজ পৃথিবীতে নাই।

আলেয়ারা জলায় থাকে, কুনী-বুনীদের কুনী ঘরের কোণে ময়লা, ঝুল, মাকড়সার জাল, ধুলো পাইলে সেখানে থাকেন; আর বুনী গৃহস্থবাড়ির আনাচে-কানাচেতে ভাঁটগাছ, শেয়ালকাঁটা, মুক্তকেশী, বনকচু প্রভৃতি আগাছার বনে ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া চুল, ভাঙা কুলা, ভাঙা ধুচুনি প্রভৃতি পড়িয়া থাকিলে সেখানে থাকেন। ইঁহারা দুই বোন। বুনীর ছেলে হইলে ভট্টাচার্য মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "কুঁনীকে বঁলবেঁ বুঁনীঁর ছেঁলেঁ হঁইয়াঁছে।" ভট্টাচার্য ভয় পাইয়া গিন্নীকে এই কথা বলিলে কুনী ঘরের কোণ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঁয় দিঁবস?" কঁয় দিঁবস?" ভট্টাচার্য অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

ভূতেরা আগে শ্মশানে-মশানে থাকিত; বিশেষ করিয়া যদি কাছেপিঠে নিমগাছ, অশ্বত্থগাছ প্রভৃতি থাকিত। এখন শ্মশানে এমন কি পাড়াগাঁয়ের শ্মশানেও রাত্রিতে আলো জ্বলে। এইজন্য নিমতলা, কাশীমিত্র, কেওড়াতলা, রতনবাবুর ঘাটে ভূত নাই। মশান তো উঠিয়া গিয়াছে। ভূতেরও থাকিবার কষ্ট হইতেছে। তাহারা আজকাল ভালো-মানুষ বা মানুষী সাজিয়া মানুষের ঘাড়ে ভর করিতেছে।

ভূতের ধর্মবিশ্বাস

ভূতদের অপর নাম অপদেবতা, এইজন্য ইঁহারা হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে গ্রাহ্য করে

না। কিন্তু হিন্দুর তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে ইঁহারা শিবের ভক্ত। শিব ভূতেদের পালন-সংরক্ষণ করিবার ভার নন্দী ও ভৃঙ্গীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। নন্দী বা ভৃঙ্গী ইঁহারা স্বয়ং কেহই ভূত নহেন। নন্দী পূর্বে দধীচি মুনির শিষ্য ছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে একজন প্রধান শিবভক্ত হইয়া উঠেন। ইনি একদা স্বীয় গুরুসহ দক্ষালয়ে যায়েন; দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষকে ছাগমুণ্ড হইবে বলিয়া শাপ দেন। পরে ইনি শিবের প্রধান অনুচর হয়েন, এবং দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় বীরভদ্রকে সাহায্য করেন। ইনি শিবের কাছে যে সব ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য ইত্যাদি থাকে তাহাদের নিত্য সিদ্ধিপানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ভৃঙ্গী পূর্বে অন্ধকাসুর ছিলেন; মহাদেবের বরে ভৃঙ্গী-নামে তাঁর অনুচর হয়েন। একবার মা-দুর্গার কথা না শুনায় মা-দুর্গার শাপে বানর-মুখ হয়েন।

বাংলা দেশে বহু দেবোত্তর আছে, কিন্তু কোনো ভূতোত্তর নাই। উত্তরপ্রদেশে কিন্তু ভূতোত্তর আছে। একবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই প্রশ্ন তোলা হয় যে, ভূত যখন দেবতা নয়, তখন ভূতোত্তর অসিদ্ধ। জজেরা কিন্তু ভূতোত্তর সিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত করেন।

ভূতেরা কিন্তু রামনাম সহ্য করিতে পারে না। রামনাম শুনিলেই দূরে পালায়। ঠিক কি কারণে পালায় জানি না; তবে মনে হয় ইহাদের সমগোত্রীয় রাক্ষসদের রামচন্দ্র নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া ভয়ে পালায়, কি জানি যদি আমাদেরও নিধন করেন।

ভূতেদের কতকগুলি prejudice আছে। সবগুলি জানি না—যেমন আলো ভালোবাসে না, লোহা ছুঁইতে পারে না, হলুদ পোড়ার গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, গঙ্গাজল ছুঁইতে বা ডিঙ্গাইতে পারে না; তুলসীগাছের সাত হাতের মধ্যে থাকে না। পরশুরাম গঙ্গার পূর্ব-পারের পানিহাটির ভূতকে গঙ্গাপার করাইয়া রিষড়া-কোন্নগরে লইয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভব এইসব ভূত নৌকা করিয়া বা হাঁটিয়া বিবেকানন্দ ব্রিজ দিয়া পার হইয়াছিল।

ভূতের সম-শ্রেণী বা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী

চণ্ডীর দেবী কবচে আছে যে দেবী কবচ পাঠ করিতে কুলজা, মালা, ডাকিনী, শাকিনী, ঘোরা, অন্তরীক্ষচরা উপদেবতা, মহারথা ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল কুষ্মাণ্ড ও ভৈরব প্রভৃতিরা ক্ষতি করিতে পারে না। আমরা ইঁহাদের সকলকে ভূতের সমশ্রেণী বা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বলিতে পারি। রাক্ষসের কথা উঠিলে খোক্কোসের কথা মনে পড়ে—তামিল, তেলেগু, হিন্দিতে খোক্কসের প্রতিশব্দ নাই। ইনি খাঁটি বাঙালি। বেতালের কথা উঠিলে বিক্রমাদিত্যের তালবেতালের কথা মনে পড়ে, 'তাল'ও একরকম উপ-দেবতা। মা-কালীর কাছে ডাকিনী-যোগিনীরা থাকেন। যোগিনীদের সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্র আছে। যক্ষর কথা উঠিলে কিন্নরদের কথা মনে পড়ে। মা ছিন্নমস্তার এক পার্শ্বে আছেন বর্ণিনী। এ ছাড়া আছেন অসুরগণ; জ্বরাসুর ইঁহাদের একজন। ইনি দেখিতে কিরূপ সে সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণনা আছে। যথা ঃ—

"সর্বরোগমধ্যে জ্বর অতি ভয়ঙ্কর।
সেই জ্বর শিবভক্ত অতি অসুন্দর॥
তিনপাদ ছয় হস্ত নয়টি লোচন।
কালান্তক যমসম বিকট নিষ্ঠুর॥

বায়ু পিত্ত কফ আর ত্রিদোষজ জ্বর।
চতুর্বিধ রোগে প্রাণী ভোগে নিরন্তর।।"

তবে আজকাল হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

দেবতা অসুরগণ ক্রমে হয় অদর্শন
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে টলিয়া।

তাই ইঁহাদের বড় একটা দেখা যায় না। দেখিতে না পাইলেও ইঁহারা আছেন। ভূতেদেরও সেই অবস্থা। আগে ভূতের উৎপাত প্রায়ই শুনা যাইত, আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে ভূত, তথাপি ভূতের উৎপাতের কথা যে শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ ঘরের কেচ্ছা সহজে কেহ প্রকাশ করিতে চাহে না। ভূতের উৎপাতের কথা কমিলেও ভূতের সংখ্যা কমে নাই।

১৩৬৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যার কথাসাহিত্য হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সংসর্গ

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

কমলজিৎ কউরকে বাপের বাড়িতে ফেলে দিয়ে চলে গেল তার শ্বশুর যশবন্ত্ সিং মান। পুরো গিল্ খানদানের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে গেল। কমলজিতের বাবা গুরবচন সিং গিল্ মেয়েকে ধাক্কা মারতে মারতে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে স্ত্রীকে সাবধান করে দিল।—খবরদার! কেউ যদি দরজা খুলতে চেষ্টা করে তো খতম করে দেব একদম।

রূপীন্দর কউর গিল্ স্বামীকে চেনে। মিথ্যে শাসানি নয় এটা, যা বললো সত্যিই তাই করে বসতে পারে এখন। মাথা ঠিক নেই, অকল্পনীয় অপমান আর দুর্দান্ত ক্রোধে দাউদাউ জ্বলছে জাঠ-রক্ত। রূপীন্দর কউরও খাঁটি শিখের মেয়ে, শিখ-পাঞ্জাবীর বউ, জাঠের গরম রক্ত তারও। কিন্তু সে এখন জ্বলছে না, পুড়ছে। সরমের চ্যাটচেটে বিষ পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে তাকে। এই লজ্জা এই যন্ত্রণা মেয়ের মা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। জন্মদাতা বাপও না।

কৃপাণে হাত রেখে দাঁত কড়মড় করে কঠিন শপথ নিতে নিতে বেরিয়ে যায় গুরবচন সিং গিল্। আর একই সঙ্গে চোখে জল আর জ্বালা নিয়ে গুরু নানকের ছবিতে মাথা কোটে রূপীন্দর কউর গিল্।—হায় গুরুজী, হায় রাব্বা, এ কি করলে তুমি!

যাকে নিয়ে এত অশান্তি সেই কমলজিৎ কউর মান? সে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটুতে মুখ রেখে বসে আছে। লজ্জা-সরম বা ভয়-উদ্বেগ কিচ্ছু নেই। বরাবর হেসেছে সে, এখনো বন্ধ ঘরে বসে বসে হাসছে। স্বামী-সোহাগ পেয়েছে সে। সোহাগরাতেই স্বামী-সংসর্গ হয়েছে তার। সে সুহাগন। কুল্‌দীপের বাচ্চা রয়েছে তার পেটে।

প্রথমে খেয়াল করেছিল কমলজিতের শাশুড়ি, সুখদেব কউর মান। বউ খেতে পারে না, প্রায়ই বমি করে, চোখের নিচে কালির আস্তর। সুখদেব কউর ভেবেছে, নিশ্চয় কোনো অসুখ করেছে তার বহুর। হবে না? যা ঘটে গেল...! চোখের জল মুছতে মুছতে কমলজিতের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সস্নেহে জিগ্যেস করেছিল, তোর বাপুজিকে বলি ডাগদার আনতে?

কমলজিৎ উল্টে তার শাশুড়িকে জিগ্যেস করল, কিঁউ? এখনি ডাগদার এসে কি করবে?

—তোকে দেখে যাবে। জরুর কোনো বিমার হয়েছে তোর।

বিমার? অসুখ? কমলজিৎ খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতেই তারপর একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল শাশুড়িকে।—বিমার-টিমার কিছু না... চার বেটাবেটির মা তুমি, তবু বুঝতে পারলে না কি হয়েছে আমার?

সুখদেব কউর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। খানিকক্ষণ হাঁ করে কমলজিতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বউকে ধরে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে চলল। সঙ্গে হিসহিসানি—কি বললি তুই? বল্! নিজের মুখে খোলসা করে বল্...

কমলজিৎ হাসি থামিয়ে খুব সহজভাবে বলে উঠেছিল, বাচ্চা এসেছে পেটে, আজতক তিন মাহিনা চলছে।

সুখদেব কউর মান নিজের মুখে চেপে ধরেছিল বেরিয়ে আসা চিৎকারটা আটকাতে। তারপর এলোপাথাড়ি মারতে মারতে কমলজিৎকে শুইয়ে ফেলেছিল। কাজের লোকেরা উঁকিঝুঁকি দিতে হুঁশ ফিরে পেল। ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকতে ঢাকতে দৌড়লো স্বামীর 'আপিস' ঘরের দিকে। যে ঘরে সবসময় বাইরের লোকের ভিড়, লোকজন নিয়ে যশবন্ত্ সিং মান যেখানে পলিটিক্স ইলেকশন ভোট এ-সমস্তের কাজকাম আলাপ-আলোচনা সারে, যে ঘরে সুখদেব কউর কখনো যেত না, সেই ঘরের অন্দরের দিকের দরজার শেকল ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। করেই চলল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকালো যশবন্ত্ সিং। স্ত্রীর চুড়ি পরা হাত শিকল নাড়িয়েই চলেছে। অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল যশবন্ত্ সিং মানে। সুখদেব তো এভাবে কখনো কাজের ঘরে এসে ডাকে না!

স্বামীর কানে-কানে কথা বলল সুখদেব কউর। মাথা ঘুরে চোখে ধাঁধা দেখল গাঁয়ের মাতব্বর মানুষ, রাজনীতির লিডার যশবন্ত্ সিং মান। স্ত্রীর হাত চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল কমলজিতের ঘরের দরজায়। চাপা গর্জন করে উঠল, ডাকো ছোঁড়িকে! আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলুক তোমাকে যা বলেছে তা সাচ্ বাত্!

সুখদেব কউরকে ডাকতে হল না। মাথায় ওড়না জড়িয়ে ধীরপায়ে শ্বশুরের সামনে

এসে দাঁড়াল কমলজিৎ। যশবন্ত্ সিং-এর চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে স্পষ্ট জানাল, হাঁ, যা বলেছি সাচ্ বলেছি।

সাহস দেখে তাজ্জব হয়ে গেল দুজনে। যশবন্ত্ সিং মান কোমরের কৃপাণে হাত দিল।—কে? কে সে? নাম বল্ তার?

মুখ তুলে পরিষ্কার জবাব দিল কমলজিৎ।—তোমাদের বেটা, কুলদীপ সিং মান।

বিরাশিসিক্কা থাপ্পড়ে ছিটকে পড়ল কমলজিৎ কউর। বাইরে থেকে শেকল তুলে যশবন্ত্ সিং স্ত্রীকে বলল, আমি বদ্যি আনছি, তুমি বুড়িয়াকে খবর পাঠিয়ে আনাও। ওরা ঠিক বলতে পারবে।

বুড়িয়া এ খানদানের পুরনো দাই-মা। যখন ডাক্তার-বদ্যির চল্ ছিল না তখন এ বংশের সমস্ত প্রসব তার হাতেই হত। এখন বুড়া হয়ে গেছে কিন্তু তার অভিজ্ঞতার দাম অনেক। যশবন্ত্ সিং মানের বিশ্বস্ত বদ্যি আর বুড়িয়া কমলজিৎকে পরীক্ষা করে জানিয়ে গেল, ঠিকই...গর্ভই হয়েছে...আর বহু তো নিজের মুখেই স্বীকার করছে তিন মাহিনা ধরে...

মাথার পাগড়ি খামচে ধরল যশবন্ত্ সিং মান। সুখদেব কউর মুখে উড়নি চেপে কেঁদে উঠল। আর ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে হাসল কমলজিৎ। 'সুহাগন' হয়েছে সে। এই সোজা কথাটা এরা বুঝতে পারছে না কেন?

কমলজিৎ কউরের 'সোজা কথাটা' ক্ষুরধার কৃপাণের চেয়েও বহুগুণ তীক্ষ্ণ হয়ে মান খানদানকে টুকরো করে দিচ্ছিল। যশবন্ত্ সিং হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল।—চল্ তোর বাপের ঘরে গিয়ে এর 'ফয়েসলা' হবে।

কমলজিৎ কউর মান সুহাগন নয়। কমলজিৎ কউর মান বিধবা। সবাই জানে সোহাগরাতই হয়নি তার। শরীরে সে কুমারী। কিন্তু এখন তার পেটে তিন মাসের বাচ্চা।

পাঞ্জাবের ফরিদকোট জেলার এক গ্রাম দওলতপুরা। সেখানকার সমান সমান দুই সম্পন্ন জাঠের ঘর—মান আর গিল্। তাদের দুই ছেলে যশবন্ত্ সিং মান আর গুরবচন সিং গিল্। ছোট থেকে একসঙ্গে ওঠাবসা, একসাথে বড় হওয়া। বিয়ে-শাদিও কয়েক দিনের এদিক-ওদিকে। তাদের বউরা, সুখদেব কউর মান আর রূপীন্দর কওর গিল্ও স্বামীদের বন্ধুত্বের সুতোয় নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে। যশবন্ত সিং মানের তিন মেয়ের পরে একমাত্র ছেলে কুলদীপ। আর কুলদীপের জন্মের পরের বছরেই এতদিন ধরে নিঃসন্তান থাকা গিল্ বংশের কোল ভরে এল কমলজিৎ। গুরবচন সিং মিঠাই নিয়ে নাচতে নাচতে গেল জিগরী-দোস্ত যশবন্তের বাড়ি। যশবন্ত্ সিং গম্ভীর মুখে বলল, মেয়ে হয়েছে বলে এত ফুর্তি কিসের? ও ছোঁড়ি কি তোমার নাকি?

গুরবচন সিং গিলের হাসি নিভে গেছিল। হকচকিয়ে স্বামীর দিকে তাকালো সুখদেব কওর মান, তার কোলে এক বছরের কুলদীপ। স্ত্রী আর বন্ধুর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে লোফালুফি খেলা শুরু করল যশবন্ত্ সিং মান। দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে হাসির ঝিলকানি।—ও ছোঁড়ি আমার। ওর জন্যেই তো তিন-তিন মেয়ের পর এই বেটা এসে বসে আছে এক বরষ ধরে। এ কুলদীপ, লেড়কি সেয়ানা হলেই উঠিয়ে নিয়ে আসবি। এ ঘরই তো আসলি ঘর ও ছোঁড়ির।

ছুঁড়ে দেওয়া কুল্দীপকে এবার লুফে নিল গুরবচন সিং গিল্। অট্টহাসি, কোলাকুলি,

জড়াজড়িতে বুড়ো-খোকা হয়ে গেল দুই বন্ধু। সুখদেব কউর ছুটল মিষ্টি আনতে। গুরবচনের কাঁধে চেপে ফিকফিকিয়ে হাসতে লাগল ছোট কুল্‌দীপ। তাই দেখে বাল্লে-বাল্লে করে কয়েক পাক ভাঙরা নেচে নিল গুরবচন সিং।—দেখেছ? ছোঁড়ির কথায় এখনি কেমন খুশ্‌ হয়েছে আমার দামাদ?

...যশবন্ত্‌ সিং মান আর গুরবচন সিং গিলের ছোটবেলার মতোই হাত-ধরাধরি করে বড় হতে লাগল কুল্‌দীপ আর কমলজিৎ। ঝগড়া মারামারি দস্যিপনা চলত পাল্লা দিয়ে। দুজনের মায়ের হাতেই একসঙ্গে চড়-চাপড় যেমন খেয়েছে, তেমনি একসাথে দুই মায়ের কাঁখে চেপে ঘুরেছে দুজনে। ক্রমশ মারামারিটা চলে গিয়ে ঝগড়ার জায়গায় এল অভিমান। আর ছোটবেলার দস্যিপনা চেহারা পাল্টালো বড়বেলার নতুন খেলায়, যার নাম প্রেম। এর সঙ্গে মিশল অন্ধ বিশ্বাস যা ছোট্টবেলা থেকে শুনে এসেছে তারা—ওদের জন্মের আগে থেকেই স্বয়ং রাব্বা (ভগবান) এ শাদি পাক্কা করে রেখেছেন।

বিয়ের দিন ঠিক হল কমলজিতের কুড়ি আর কুলদীপের একুশ বছরে। গুরবচন সিং একটু পুরনো ধাঁচের। সে চেয়েছিল আরো আগেই শুভ কাজটা হয়ে যাক। কিন্তু যশবন্ত সিং রাজনীতি করা, আধুনিক, আর প্র্যাকটিক্যাল বেশি। সে বন্ধুকে বুঝিয়েছিল, আজকালকার জমানায় ছেলের অন্তত বি.এ. পাশটা করে থাকা উচিত। তাছাড়া,—একটা চোখ টিপে চার ছেলেমেয়ের বাপ যশবন্ত্‌ কম বয়েসের ফিচেল হাসি দিয়েছিল।—এখন অ্যাডভারটাইসমেন্টে সমানে বলছে না বিশ বছরের আগে মেয়েদের মা হওয়া ঠিক নয়? কিন্তু ও ছোঁড়া-ছোঁড়ি সেই ছোট্ট থেকে এমন গায়ে গায়ে লেগে মিশেছে যে শাদি হওয়া মাত্র আমরা নানা-নানী দাদা-দাদী হয়ে যাব। তাই একটু দেরি করিয়ে দেওয়াই ভালো।

বন্ধুর কথায় গুরবচন সিং গলা ফাটিয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করেছিল।

যশবন্ত্‌ সিং মান পাক্কা কথার মানুষ। কমলজিতের বিশ বছর হতে হতে কুল্‌দীপও বি.এ. পাশ করে নিল ফরিদকোট জেলা-কলেজ থেকে। যশবন্ত্‌ সিংহও ভালো দিন দেখে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আর দওলতপুরার বিশিষ্ট লোকেদের নিয়ে গেল গুরবচনের বাড়ি। আঙটি, লাল চুড়ি, দোপাট্টা-চুড়নী আর মিঠাই দিয়ে মেয়ের 'সগন' করে এল। ক'দিন পরেই মেয়ের চাচা মামা আর গ্রামের দলবলের মিছিলের আগে আগে হাঁটতে লাগল গুরবচন সিং গিল। আঙটি, ঘড়ি, জরির পাগড়ি নিয়ে গিয়ে ভাবী জামাইকে আশীর্বাদ করে 'মঙ্‌গ্‌না' সেরে বিয়ের দিন ঠিক করে ফিরল যশবন্ত্‌ সিং মানের বাড়ি থেকে।

শুভকাজ সকালবেলায়, বেলা বারোটার মধ্যে সারতে হয়। শাদির সক্কাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল গিল খানদান। ছেলের বাড়ি থেকে আসা হলদি, আটা, দহি, তেল দিয়ে মেয়েকে বাপের ঘরের শেষ কুমারী-স্নান 'নাইধোই' করিয়ে কনের সাজে সাজালো গাঁওয়ের মেয়েরা। বিয়ের মণ্ডপ তৈরি, শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' স্থাপন করে গুরুদ্বারার পূজারীঠাকুর 'গ্রন্থি' অপেক্ষা করছে বরাত আসার জন্যে। বধূবেশে বসে কমলজিৎ ভাবছে—চুলের চূড়ায় কাঠের নতুন কাঙ্গা (চিরুনি), হাতে ঝকঝকে কড়া (বালা), কোমরে বড় কৃপাণ, মাতার মঙ্‌গ্‌নার আশীর্বাদী জরির পাগড়ি—কুল্‌দীপ আসছে সত্যিই এবার তাকে 'উঠিয়ে নিয়ে যেতে'—যেটার জন্যে তাদের দুজনেরই জন্ম, যা তাদের জন্মের আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। গায়ে কাঁটা দিল কমলজিৎ কওর গিলের, যে আর একটু পরেই কমলজিৎ কওর মান হয়ে যাবে।

যশবন্ত সিং মান বরাত নিয়ে ঢুকল গুরবচনের বাড়িতে। কিন্তু বর ছাড়া বরাত। শাদির আগে বর গুরদ্বারায় প্রণাম সেরে মেয়ের বাড়ি যাবে এটাই সামাজিক রীতি। গুরদ্বারা থেকে বেরুনোর সময় তাকে তুলে নিয়ে গেছে উগ্রপন্থীরা। যশবন্ত সিং মান তাদের শত্রু, তার রাজনৈতিক আদর্শ তাদের বিপক্ষে। ভারতবর্ষ যাতে টুটা-ফাটা না হয় সেদিকে মদত দেয় সে। তারা অনেক চেষ্টা করেছে যশবন্ত সিং-এর মতো কাজের লোককে তাদের দিকে টানতে, কিছুতেই পারেনি। দওলতপুরা গাঁওকে যে উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি বানানো যাচ্ছে না তা যশবন্ত্ সিং মানের জন্যেই। তাই আজ শাদির দিন মওকা বুঝে কুল্‌দীপকে তারা নিয়ে গেছে। বদলি চুক্তি—ছেলে ফেরত চাও তো হাত মেলাও।

যশবন্ত্ সিং মান ওই অবস্থাতেই বরাত নিয়ে মেয়ের বাড়ি এল। খবরটা ততক্ষণে সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেছে, কান্নার রোল উঠেছে গুরুবচন সিং-এর ঘরে, মাথায় হাত দিয়ে মণ্ডপে বসে আছে গুরবচন সিং গিল্। যশবন্ত্ বন্ধুর হাত ধরে বলল, শেরের বাচ্চা কখনো হায়নার সঙ্গে হাত মেলায় না। ওঠো, যা হবার হয়েছে, কিন্তু ছোঁড়ি যেন লগনভ্রষ্ট না হয়। আমার দলের যত জাঠ ছেলে আছে, তাদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ কমলের জন্যে বেছে নাও।

বন্ধুর হাত ধরে কেঁদে ফেলল গুরবচন সিং।—কুল্‌দীপের বদলে কি করে আমি কমলকে...কাকে বাছতে বলব...

কারুর কিছু বলতে হল না কমলজিৎ কওরকে। মণ্ডপে বেরিয়ে এসেছে সে। বলল, জাঠ মেয়ে একবারই স্বামী বাছে। কুল্‌দীপের ছবি আনাও। ছবির সঙ্গেই আনন্দকারজ হবে।

'আনন্দকারজ' অর্থাৎ বিয়ে। পাঞ্জাবের পুরনো প্রথা এটা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ঘরে ঘরে এরকম হয়েছে। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বহুদিন থেকে, সে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফেরার, কবে ফিরবে বা ফিরবে কিনা কোনোই ঠিক নেই, তখন তার ছবির সঙ্গেই বিয়ে করেছে মঙ্গেতা, তার বাগ্‌দত্তা বধূ। এরপরেই হয়তো শহীদ হবার খবর এসেছে ছেলের, বৈধব্য মেনে নিয়ে সেইসব মেয়েরা সারাটা জীবন ছবির সম্পর্ককেই মেনে গেছে।

সেইভাবে বিয়েয় বসল কমলজিৎ। কুল্‌দীপ সিং মান ছবির মধ্যে থেকে তার দিকে চেয়ে হাসছে। ছবির ওপর গোলাপী চাদর বিছিয়ে একটা কোণা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিয়ের বাণী পাঠ শুরু করল গ্রন্থি। চোখ বন্ধ করল কমলজিৎ কওর। তার জেদে বিয়ের প্রত্যেকটা নিয়ম নিখুঁতভাবে মানা হল। এক এক মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে কুল্‌দীপের ছবি নিয়ে চাদরের খুঁট ধরে পবিত্র গ্রন্থসাহেবকে চারবার প্রদক্ষিণ করল কমলজিৎ, সম্পন্ন হল 'চার লামা'। এরপর 'আরদাস'। আনন্দকারজ অর্থাৎ শুভবিবাহের শেষ পর্ব। কুলদীপের ছবি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কমলজিৎ। সবাই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল। গ্রন্থি সুর করে প্রার্থনা করে চলল—'দওলতপুরার যশবন্ত্ সিং মান আর সুখদেব কওর মানের সুপুত্র কুল্‌দীপ সিং মানের সঙ্গে গুরবচন সিং গিল আর রূপীন্দর কওর গিলের একমাত্র পুত্রী কমলজিতের আনন্দকারজ শেষ হল। রাব্বা, তোমার কৃপায় ধর্মত এরা এখন স্বামী-স্ত্রী, এদের তুমি সুখী রেখো...'

এবার মেয়ে বিদাই। চোখ মুছতে মুছতে রূপীন্দর কওর দেশি ঘিউতে পাকানো

আটার প্রসাদী হালুয়া ছবিতে জামাইয়ের মুখে ছুঁইয়ে, মেয়েকে খাইয়ে সবার হাতে বেঁটে দিল। কুল্‌দীপের ছবির গোলাপী চাদরের আঁচলে কমলজিতের মাথা নিজের হাতে ঢেকে দিল যশবন্ত্ সিং মান। গুরবচন সিং গিল্-এর বুক থেকে গিল খানদানের একমাত্র মেয়েকে মান বংশের বধূর স্বীকৃতি দিয়ে নিজের বুকে টেনে নিল যশবন্ত্। কমলজিৎকে ডাকল, চল্ বহু, আপনা ঘর চল্...

যশবন্ত্ সিংকে এই প্রথম বাপ সম্বোধন করল কমলজিৎ কওর মান। অস্ফুটে বলল, বাপুজী!...

যশবন্ত্ সিং মানের বাড়ি। যেখানে কুলদীপের উঠিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল কমলজিৎকে, সেখানে তার ছবি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমলজিৎ কওর মান। চোখের জলে ভেসে ছেলের ছবি আর বউ বরণ করল সুখদেব কওর মান। কমলজিৎ শাশুড়ির চোখ মুছিয়ে ডাকল, বিজি! (মা)

পেটের মেয়ের মতো কোলেপিঠে বড় হওয়া ছোঁড়ির মুখের এই নতুন সম্পর্কের ডাক আজ হু হু করে কাঁদালো সুখদেব কউরকে। বউকে জড়িয়ে ধরল।—বেটি!

কমলজিৎ তার ঠোঁটে আঙুল রাখল।—উঁহু, বহু বোলো!

সোহাগরাত। সব আলো নেভাতে নেই। দুলহা এসে চুড়নি সরিয়ে দুলহানের মুখ দেখবে। তারপর...তারপর সে-ই আলো নিভিয়ে দেবে। একখানা মাত্র বাতি জ্বালিয়ে রেখে ফাঁকা ঘরে খালি বিছানায় একলা বসে এতক্ষণে বুকভেঙে কেঁদে উঠল কমলজিৎ।—কুল্‌দীপ! কুল্‌দীপ! আমি যে সুহাগন হয়েছি তোমার!...কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্রান্ত অবসন্ন কমলজিৎ।

ঘুম ভেঙে গেল। শরীরের ওপরের চাপে আর ভারে সে নড়তে পারছে না। ঘোর কাটিয়ে এক ঝটকা মেরে উঠতে গেল। আরো নিবিড় হল শরীরের ওপরের শরীর। ঘুমের ঘোর নয়! সত্যিই—সত্যিই! রাত নিঝুম, ঘরের আলো নেভানো, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কমলজিতের বড় চেনা এই স্পর্শ, এই গন্ধ। ঠোঁটের ওপর কুলদীপের তপ্ত ঠোঁট, বুকের ওপর চওড়া বুক, আর...আর বাকিটা...বাকিটা সেই চেনা শক্ত হাত চিনিয়ে দিতে যাচ্ছে। কমলজিৎ গুঙিয়ে উঠল, কুল্‌দীপ!

কুল্‌দীপ সিং মান কমলজিতের মুখে হাত চাপা দিল। ফিসফিসিয়ে বলল, চুপ! এখন কোনো কথা নয়!...খরকৃপাণের মতোই এক তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ কমলজিতের মধ্যে ঢুকে গেল। তীব্র ব্যথা, তীব্র সুখ। শিউরে উঠল কমলজিৎ, আ! আঃ, আ—আ—আহ্...

বড় ঘড়িতে রাত তিনটের ঘণ্টা। লাফ দিয়ে উঠল কুলদীপ সিং মান। কমলজিতের ঠোঁটে ঘন করে চুমু খেয়ে বলল, যাচ্ছি। আমি যে এসেছিলাম কাউকে বলবে না, তাহলে আর আসতে পারব না।

কমলজিৎ আঁকড়ে ধরল স্বামীকে।—কবে ছেড়ে দেবে ওরা তোমাকে?

কুল্‌দীপ হাসল।—ছাড়বে কি! ওদের কাছ থেকে তো পালিয়েছি আমি!

কমলজিৎ আরো জোরে ধরে রইল কুল্‌দীপকে।—কিন্তু কতদিন এভাবে পালিয়ে বেড়াবে? আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো!

কুল্‌দীপ সিং মান অনেক আদর করল তার সুহাগনকে।—এখন না। সময় হলেই ঠিক

এসে নিয়ে যাব। আর যখনই পারব রাতে এরকম লুকিয়ে চলে আসব। কাউকে বলো না যেন!

—না, না, না। কথা দিল কমলজিৎ।

জানলা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ল কুল্‌দীপ। জানলায় দাঁড়িয়ে রইল কমলজিৎ। ভোরের আর বেশি দেরি নেই। ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে তিনটে। পেছন ফিরে তাকালো কুলদীপ, হাত নাড়লো, ছায়াছায়া আঁধারের মধ্যে দিয়ে কমলজিতের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

বিছানায় এসে বসল কমলজিৎ কউর। সারা শরীরে এক আশ্চর্য স্বাদ। হাঁটতে-চলতে কষ্ট হচ্ছে, কোমর টনটন করছে ব্যথায়, তবু বড় মধুর এ যন্ত্রণা। নেশার মতো মাদক আচ্ছন্নতায় চোখ বুজে আসছিল। শুয়ে পড়তে গেল। বুকে আঙুল লেগে চিনচিন করে উঠল জ্বালায়। কাপড় সরিয়ে দেখল কুলদীপের হাতের লোহার কড়ার ঘষায় চামড়া ছড়ে গেছে। হাসল কমলজিৎ, ঘুমিয়ে পড়ল।

ধড়মড় করে জেগে উঠল কমলজিৎ কউর। কখন সকাল হয়ে গেছে! দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা পড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখে তার শ্বশুর—যশবন্ত্ সিং মান। তার চোখ রক্তবর্ণ। কমলজিৎকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে গেল। সেখানে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে সুখদেব কউর, গুরবচন সিং গিল আর রুপীন্দর কউর মুখ ঢেকে কাঁদছে। মেয়েকে দেখে হাহাকার করে উঠল তারা। ঘরে আরো অনেক লোক। তাদের টুকরো টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছিল কমলজিৎ। পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কুল্‌দীপ সিং মান।

তার সঙ্গে সোহাগরাত বানাতে আসার ফলেই তাহলে...গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কমলজিৎ।—কব্, কব্, কব! কখন?

যশবন্ত্ সিং তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কেঁদে উঠল।—রোও বিটিয়া, কাঁদ বেটি কাঁদ। সে নেই—'কখন' তা জেনে কি হবে?

গুরবচন সিং কান্নার মধ্যে বলল, কাল রাত বারোটার ইধার-উধার।

সব্বাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠল কমলজিৎ। হাসতে হাসতে সমানে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—না, না, না, না...

পাগল হয়ে গেল নাকি মেয়েটা? গুরুবচন আর যশবন্ত্ একসঙ্গে ভীষণ ঝাঁকুনি দিল কমলজিৎকে।—হ্যাঁ বেটি হ্যাঁ। রাত বারোটা নাগাদ পালাতে গিয়েই...। গলা বন্ধ হয়ে গেল দুই হতভাগ্য বাপের। যশবন্ত্ সিং মান তার একমাত্র ছেলের নিশানী ছেলের বউয়ের হাত ধরে মিনতি করল, হোঁশ মে আ বেটি, হোঁশ মে আ! কাঁদ বেটি কাঁদ!

কিন্তু কাঁদবার বদলে ফুলে ফুলে হেসেই চলল কমলজিৎ কউর। তবে তো এদের জরুর গলতি হয়েছে! রাত বারোটার পরে তো কুল্‌দীপ আর ও...। বুকের খাঁজে হাত দিল কমলজিৎ। ছালওঠা চামড়া জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে চিনচিনিয়ে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল কমলজিৎ এবার। তবে তো আচ্ছা বুদ্ধু বানিয়েছে সকলকে তার কুল্‌দীপ! সাড়ে তিনটের সময় জানলা দিয়ে লাফিয়ে নেমে তো সে...। না, না। মুখে চুড়নি গুঁজে দিল কমলজিৎ। কাউকে সে কিচ্ছু বলবে না। সে জবান দিয়েছে। জানাজানি হয়ে গেলে কুল্‌দীপ আর তার কাছে আসতে পারবে না!

তিন মাস পরে সোহাগ রাত না হওয়া কুমারী বিধবা কমলজিৎ কউর নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দিল সে তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা।

হাজার জেরা, মারধোর, কিন্তু না—তার এক কথা।—বাচ্চার বাপ কুল্‌দীপ সিং মান। এ ছাড়া আর কিচ্ছু বলব না আমি।

বলবে কি করে? মান বংশের ইজ্জত নিয়ে তাদের মরা ছেলের দোহাই দিয়ে খেলতে নেমেছে যে বেইমান ছোকরি! যাকে মেয়ের চেয়ে বেশি আদরে তারা বুকে করে রেখেছিল। তবু যশবন্ত্ সিং স্ত্রীর কাছ থেকে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে চাইল।—কুল্‌দীপের কারণেই...মানে বিয়ের আগেই কি...

সুখদেব কউর দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল।—না। মাসের ঋতুস্নান সেরেই এ বিয়ে হয়েছে। তখন গর্ভ হতে পারে না। এ গর্ভ হয়েছে শাদির পরে। যেখানে সোহাগরাত পর্যন্ত হয়নি, তার আগেই যেখানে কুল্‌দীপ...। কাঁদতে কাঁদতে হিসহিসিয়ে উঠল সুখদেব।—হঠাও, এ কালনাগিনকে হঠাও জী...

আর কোনো সন্দেহ রইল না।

...ফেটে পড়ল গুরবচন সিং গিল্। এ হতে পারে না। মেয়ে তার পাগল হয়ে গিয়ে কি না কি বলেছে সেই অজুহাতে বিধবা মাথা খারাপ বউকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে এই ফিকির। মুছে গেল ছোটবেলা থেকে চুন্ চুন্ করে গড়ে ওঠা দোস্তি। মাঝে কমলজিৎ, তার দুধারে দুই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো যশবন্ত্ সিং মান আর গুরবচন সিং গিল। এসব ঝগড়া আস্তে হয় না। লোক জমে গেল। গর্জন করে উঠল গুরবচন।—খবরদার! বলো বউয়ের ওপর দরদ ফুরিয়েছে, বিধবা বউকে আর রাখতে চাইছ না। কিন্তু বদনামী করো না। গুরুবচন সিং গিল্ অমন শও বিটিয়াকে জীবনভোর খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে, কিন্তু তার জাঠ-লহু বদনামী সহ্য করে না।

জাঠ লহু? জাঠ রক্ত? ঘেন্নায় থুতু ফেলল যশবন্ত্ সিং মান।—সেজন্যেই তো আরো লজ্জা আমার। জাঠের লহুতে এত ময়লা?

ছাতি ফুলিয়ে বিশাল হয়ে উঠল গুরবচন সিং। কোমর থেকে কৃপাণ টেনে নিতে গিয়েও সামাল দিল।—ঠিক আছে! এখুনি আমি ফরিদকোট যাচ্ছি। সেখান থেকে সবথেকে ভালো মেয়েদের ডাগদার এনে কমলকে পরীক্ষা করাব। তোমরা সবাই সাক্ষী থাকবে। যদি এ কথা মিছা হয় তো গুরুজীর শপথ—আবার কৃপাণে হাত দিল গুরবচন।

যশবন্ত্ বুক টান করে বলল, তখন তোমার কৃপাণের সামনে এ কলিজা ধরে দেব। সবাই সাক্ষী। কিন্তু তোমার মেয়েকে জিগ্যেস করছ না কেন?

—ও তো পাগল! কুল্‌দীপের মরার খবর পেয়েই তো ও পাগল হয়ে গেছে। ওকে জিগ্যেস করে কি হবে?

শান্ত মুখে এতক্ষণে কথা বলল কমলজিৎ।—না বাপু, আমি সুহাগন, কুলদীপের বাচ্চার...

থাবা দিয়ে মেয়ের মুখ বন্ধ করে দিল গুরবচন সিং গিল্। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার, লেডি গাইনি ডাক্তার, প্যাথোলজিস্ট, ফরিদকোট থেকে নানারকম পরীক্ষার

পুরো টিম নিয়ে এসে গুরবচন সিং গিল্ যখন ঘরের দরজা খুললো তখন কমলজিৎ কোমায় আচ্ছন্ন। সব ব্যবস্থা নিয়ে আসতে আসতে পুরো দুটো দিন এর মধ্যে কেটে গেছে। কমলজিতের অবস্থা দেখে তীব্র ভর্ৎসনা করে ওই অবস্থাতেই যাবতীয় টেস্ট সারল ডাক্তাররা। রায় বেরুল—ফল্স্ প্রেগনেন্সি! পেটে বাচ্চা নেই!

গ্রামের বিশিষ্ট লোকেরা জড়ো হয়েছে গুরবচনের বাড়ি। যশবন্ত্ সিং-ও এসেছে। ডাক্তাররা, বিশেষ করে মহিলা ডাক্তারটি বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। মা হবার তীব্র লিপ্সা থেকে মেয়েদের, বিশেষ করে বিবাহিত মেয়েদের, অনেকসময় এরকম হয়। আর কমলজিৎ কউর তো সবদিক থেকেই রিক্ত। প্রচণ্ড মানসিক আকাঙ্ক্ষা থেকে তার এরকম হতেই পারে। তবে, খরদৃষ্টিতে ডাক্তারটি বিঁধল যশবন্ত্ সিং মান আর গুরবচন সিং গিল্‌কে, এখন যে অবস্থা হয়েছে এর, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। আমাদের যা করার করেছি...।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তারা। গুরবচনের পায়ের কাছে বুকের জামাটা ছিঁড়ে দিয়ে আছড়ে পড়ল যশবন্ত্ সিং মান। গুরবচন সিং গিল বাঘের গলায় গর্জে উঠল, আরো অনেক কঠিন শাস্তি তোমায় আমি দেব! জাঠ-গিলের রক্তে এত ময়লা, না?

গাইনি ডাক্তার ঘুরে তাকালো। গুরবচনকে ডেকে বলল, একটু শুনুন এদিকে এসে!

সকলের কানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল তারা। লেডি ডাক্তার আস্তে আস্তে বলল, নীতির দিক থেকে আপনার বন্ধুর সঙ্গে ঝামেলা না করাই আপনার উচিত। আপনার মেয়ের প্রেগনেন্সি ফল্‌স, কিন্তু ভার্জিন—কুমারী সে নয়। তার পুরুষ-সংসর্গ হয়েছে।

হাঁ করে উঠল গুরবচন সিং গিল্, ডাক্তার সহানুভূতির গলায় বলল, বিশ্বাস করুন...এখনকার টেস্ট-এ এগুলো ধরা যায়, এক্ষেত্রেও ধরা পড়েছে।

চলে গেল তারা। একইভাবে পড়ে রয়েছে যশবন্ত সিং মান। তার সামনে এসে দাঁড়াল গুরবচন সিং গিল। বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে মেয়ের ঘরে এসে বসল। দুজনের বুক তখন দুভাবে জ্বলছে।

রাত। হঠাৎ কমলজিতের চোখ খুলে গেল। নেভার আগের প্রদীপের মতো দপদপে দৃষ্টি। দরজার দিকে চেয়ে হাসিমুখে ডেকে উঠল, কুল্‌দীপ! এসেছ? এবার সময় হয়েছে আমাকে নিয়ে যাবার? দেখেছ, আমি কথা রেখেছি। সোহাগরাতে যে আমার কাছে এসেছিলে কাউকে তা বলিনি!

গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল যশবন্ত্ সিং মানের। শাদির দিন কুলদীপের গলায় তার নিজের হাতে পরিয়ে দেওয়া গুরুজীর লকেট! গুরদ্বারা থেকে তুলে নিয়ে যাবার সময়েও যেটা তার গলায় ছিল কিন্তু সৎকারের সময় আর পাওয়া যায়নি, সেটা কমলজিৎ বেণীর ভেতর থেকে বের করেছে! যশবন্ত্ সিং মান বন্ধুর হাত খামচে ধরল। রুদ্ধশ্বাসে কথাটা জানাল।

ততক্ষণে প্রদীপ নিভে গেছে। চোখ বন্ধ, বিছানায় পড়ে আছে কমলজিৎ। চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে রূপীন্দর কওর। এবার গ্লানিমুক্ত হয়ে শুদ্ধ কান্না কাঁদতে পারল গুরবচন সিং গিল্।—ছোঁড়ি হামাদের সত্যিই সুহাগন, দোস্ত!

—সমাপ্ত—